Janmabhumi Registered No C. 284.

১২৯৭সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

[৩৬শ বর্ষ] ১৩৩৭, বৈশাখ, [১ম সংখ্যা]

১। জন্মভূমির বর্ষারম্ভে মঙ্গলাচরণ ১
২। অন্তর্য্যামী শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ, ... ২
৩। উতথ্য সংবাদ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর ৪
৪। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ, ... ৮
৫। প্রার্থনা—শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... ১৬
৬। শ্রীমদ্ বালানন্দ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৭
৭। স্বর্গীয় পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, ... ২৬
৮। গান - শ্রীমতী সরসীবালা রায় ৩০
৯। পক্ষপাতের দোষ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ কাব্য রত্নাকর ৩১
১০। দুটি ভাব—শ্রীরাজেন্দ্র ৩২

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

26-7 30

জন্মভূমি-কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

... ত্ত দ্বারা প্রকাশিত

জ্বরে যম জাঃ ম ... সর্ব্বত্রপ্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বর ছাড়ে! ... বিচার নাই

মূল্য ৸০, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০ ... ভ।

জারমলীন লিমিটে ...

৩২।B, মজাপুর ...

TelegrNom;... BIBGERML ... 1388.

সন ১৩৩৭ সাল—

জন্মভুমির অভাবনীয় বিরাট উপহার।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য নিধি, বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বণিতার পরমাদরের সম্পত্তি।

সাধক কমলাকান্ত।

সাধক কমলাকান্তের অপূর্ব্ব জীবনী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, প্রায় ৫০০ পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ছাপা কাগজ বাঁধাই উৎকৃষ্ট। সাধক কমলাকান্ত বিরচিত যাবতীয় সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

জন্মভূমির গ্রাহকগণ **বিনামূল্যে** উপহার পাইবেন।

জন্মভূমির বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা ও উপহার প্রেরণ করিবার ডাঃ মাঃ ৷৵০ দশ আনা মোট ২৷৷৵০ দুই টাকা দশ আনা সত্বর প্রেরণ করিয়া সত্বর গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন।

এরূপ সুবর্ণ সুযোগ হারাইবেন না। বিলম্বে হতাশ হইবেন।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ দত্ত। জন্মভুমি কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট কলিকাতা।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী)

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

ষট্‌ত্রিংশ ভাগ—ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ। ৩৬শভাগ ১৩৩৭

১৩৩৭ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা হাউখোলা দত্তবাটী

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে

স্বত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Printed by N. Dutta at the
"JANMABHUMI PRESS".
39, Manick Bose's Ghat Street,
CALCUTTA.
1931.

[বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা] [ডাঃ মাঃ ৷৵০ ছয় আনা]

ষট্‌ত্রিংশ বর্ষের সূচীপত্র।

—:*:—

১।	অন্তর্য্যামী	শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ,	২
২।	অর্থ যথার্থ কার? ধন্য কে?	„ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৭৯
৩।	অন্তর্ধানে	„ কমলাকান্ত বসু বি, এ,	১২৭
৪।	আষাঢ়ে	শ্রীমতী শৈলবালা বসু বি, এ	৬৩
৫।	আগমনী	„ „ „	১৬১
৬।	আনন্দময়ীর আগমনে	শ্রীযুক্ত হরিভূষণ রায়	১৭৭
৭।	আগমনী	„ রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর	১৮৩
৮।	আবাহন গীত		১৮৮
৯।	ঈশ্বর আরাধনা ও সুখ	„ „	৩৩১
১০।	উতথ্য সংবাদ	„ „	৪
১১।	উচ্ছ্বাস	„ আশুতোষ ঘোষ	২৭৭
১২।	উচ্ছ্বাস	„ দেবীপদ চট্টোপাধ্যায়	২৭৮
১৩।	কে জান্‌তে পারে?	„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত	৪৪
১৪।	কীর্ত্তন	„ „	১৯৫
১৫।	কে তুমি?	„ গোপীনাথ দাস	১৯৬
১৬।	কেনারাম ও তৎপুত্র বেচারাম	„ কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,	২৩০
১৭।	গান	শ্রীমতী সরসীবালা রায়	৩০
১৮।	গান	„ „	৫৩
১৯।	গীত	„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত ১৫৩, ১৮০,	৩৪৪
২০।	গোপনে	„ কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ,	২৯৪
২১।	গুরু-দর্শন	„ আশুতোষ ঘোষ	৩৬৪
২২।	জন্মভূমির বর্ষারম্ভে মঙ্গলাচরণ		১
২৩।	জন্মভূমির মায়া	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ, চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর	২৩৯
২৪।	জগন্নাথ দর্শন	„ শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ	২৪৮
২৫।	জীবন সাঁঝে	„ জহরলাল বিশ্বাস	৩৩৩

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
২৬।	জ্ঞান ও দুঃখ	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৬১
২৭।	ঝুলন	„ জহরলাল বিশ্বাস	১৬০
২৮।	ডাক্তার রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর		১৪৯
২৯।	দাঁত ও আঁত		১২৮
৩০।	দুটিভাব	„ রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৩২
৩১।	দোখ্‌নে হাওয়া	„ কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ,	২৬২
৩২।	নদী		১২৩
৩৩।	নিজ-নিকেতন	„ আশুতোষ ঘোষ	৩৬০
৩৪।	নূতন ও পুরাতন	„ „	৩৪৩
৩৫।	পক্ষপাতের দোষ	„ রাজেন্দ্রনারায়ণ কাব্যরত্নাকর	৩১
৩৬।	পিতৃমাতৃ-ভক্তিমাহাত্ম্য	„ „	১০৪
৩৭।	পৌরাণিক	„ „	১২৩
৩৮।	প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ	„ কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ,	৮
৩৯।	প্রতিমা বিসর্জ্জন	শ্রীমতী সরসীবালা রায়	১৬৮
৪০।	প্রাণ নাই কার?	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপধ্যায়	৬৪
৪১।	প্রার্থনা	„ অনিল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৬
৪২।	ভুঁইফোঁড়	„ আশুতোষ ঘোষ	১০৬
৪৩।	ভগবৎ-প্রাপ্তি	„ বলাইলাল মুন্সী, সাহিত্যরত্নাকর	২৪৪
৪৪।	মণি রহস্য	„ রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১৮৫
৪৫।	মস্তক মুণ্ডন	„ আশুতোষ ঘোষ	২৩৫
৪৬।	মহাকবি কালিদাসের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব	„ কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এল,	৩৩৫
৪৭।	মা আমার	„ রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২১৫
৩৮।	মানভূমের পল্লীশ্রী	„ কমলাকান্ত বসু বি, এ,	৫৫, ৭৫
৪৯।	মোটর সাইকেলে ১২০ মাইল	„ হরিভূষণ রায়	৯৭
৫০।	মুখের মত	„ „	২১৬
৫১।	মৌ	„ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়	৩০০
৫২।	যুগাবতার ও যুগধর্ম্ম	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২৫৪, ২৬৫
৫৩।	রথযাত্রা	„ দুর্গাপদ কাব্যতীর্থ	৯৫
৫৪।	রথ সঙ্কীর্ত্তন	„ শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ	৯৬
৫৫।	রাস-ক্রীড়ায় সৃষ্টিতত্ত্ব	„ শ্রীযুক্ত রাজেবন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৩১৬, ৩৪৪

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
৫৬।	রূপ-সনাতন কথা	„ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৬৭, ৩০৩
৫৭।	রৌদ্র সেবনের উপকারিতা		৫০
৬৮।	বিজয়া দশমীর দিনে	„ রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর	১৯৩
৫৯।	বিড়ালের তপস্যা	„ „	১৮৪
৬০।	বিষ-বৃক্ষে সূর্য্যমুখী ও জলমণি	„ রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী	১৫৪, ১৯৭
৬১।	বিরহী	„ কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ,	৩৮০
৬২।	বৈষম্যে বরণ	ডাঃ „ নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, বি,	১২৮
৬৩।	শুক্ল-যজুর্ব্বেদ সংহিতা প্রকাশিকা	শ্রীযুক্ত তারানন্দ ব্রহ্মচারী	২৫০
৬৪।	"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং"	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ কাব্যরত্নাকর	২৯৭
৬৫।	শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গল বা কালকেতু	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৩৮, ৮৪, ১১৪, ১৩৭, ১৮৯, ২১৯, ২৫২, ২৮১, ৩০৯, ৩৪৫, ৩৭২,	
৬৬।	শ্রীমদ্‌বালানন্দ	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭, ৫৯, ৮১ ৯৯, ১৩১, ১৬৪, ২০৪, ২২৫, ২৫৭, ২৮৯, ৩২১ ৩৫৩
৬৭।	শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মাতৃদর্শন	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর	১২৯
৬৮।	শ্রীরাধার প্রেম	শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী	৩৩
৬৯।	সংসারীর প্রতি আশার ছলনা	„ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৪২
৭০।	সর্ব্বসহা জননী আমার	„ নবীনকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৮১
৭১।	সৎ প্রসঙ্গ	„ রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৯১
৭২।	সাধক সঙ্গীত	„ শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ	১৩৬, ৩৬০
৭৩।	সাধুসঙ্গের মহিমা	„ রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর	১৯৯
৭৪।	সাধু ভবানাস্তাম্	„ দুর্গাপদ কাব্যতীর্থ	৩৬৭
৭৫।	সুখ কোথায় ?	„ অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	২৬৩
৭৬।	সৌভরি ঋষির উপাখ্যান	„ রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৪৫
৭৭।	স্বর্গীয় পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,	২৬
৭৮।	স্বপ্ন কথা	„ দেবীপদ চট্টোপাধ্যায়	১৪৬
৭৯।	হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র	„ ভুবনমোহন সাংখ্যতীর্থ	৬৫
৮৬।	হরির লীলা	„ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৩৬২

সূচীপত্র সমাপ্ত।

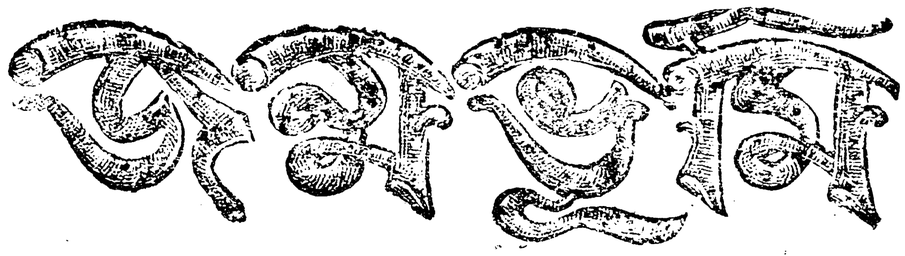

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৬শ বর্ষ } ১৩৩৭ সাল, বৈশাখ। { ১ম সংখ্যা।

জন্মভূমির বর্ষারম্ভে মঙ্গলাচরণ।

সর্ব্বমঙ্গলময় পরমপিতা পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রসাদে আমাদের "জন্মভূমি" মাসিক-পত্রিকা পঞ্চস্ত্রিংশবর্ষ অতিক্রম করিয়া এই ১৩৩৭ সাল, নববর্ষের প্রথম মাসে ষষ্ঠস্ত্রিংশ বর্ষে প্রবেশ করিল। বর্ষপ্রবেশের মঙ্গলাচরণে সেই মঙ্গলময়ের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণিপাত। গ্রহবৈগুণ্যবশে গতবর্ষে রোগে শোকে নানা বিঘ্ন সংঘটনে আমরা এক প্রকার অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম; পরীক্ষাক্ষেত্রে বিঘ্নবিনাশন বিশ্বপিতার অপার করুণায় সেই নিদারুণ পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হইয়াছি। সামাজিক ব্যবহার অনুসারে আমরা ঢাক বাজাইয়া বর্ষ বিদায় করি, ঢাকের বাদ্য কর্কশ হইলেও এ সময় সেই বাদ্যকে আমরা মঙ্গলবাদ্য জ্ঞান করিয়া থাকি, বর্ষ শেষে দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে আমাদের উৎসব হয়, সেই উৎসবের মূলাধার উৎসবসাগর বিশ্বমূলাধার, সেই কারণেই আমরা সমস্ত উৎসবে মানস-দর্পণে সেই বিশ্বরূপের রূপচ্ছবি অবলোকন করি, মঙ্গলাচরণে পুনরায় বিশ্ব-মঙ্গলময়ের শ্রীপদকমলে শরণাপন্ন হইলাম। সানুনয় প্রার্থনা এই যে, বর্ত্তমান নববর্ষের প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত যেন আমরা সর্ব্বপ্রকার শুভানুষ্ঠানের সঙ্কল্পব্রতে মঙ্গলফল লাভ করিয়া সফলকামে সুখী হইতে পারি।

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশ মীড্যম্ ॥”

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরমপতি, সেই পরাৎপর, প্রকাশবান ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা স্মরণ করিয়া আমাদের এই “জন্মভূমি” ক্ষুদ্র মাসিকপত্রিকা পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পূর্ণ হইল, ষষ্ঠত্রিংশ বর্ষ আরম্ভ। আমরা এই বর্ষ বৃদ্ধির উল্লাসে জগদীশ্বরকে অকপটচিত্তে প্রণিপাত করিয়া জন্মভূমির গ্রাহক ও অনুগ্রাহক হিতৈষী মহোদয়গণের সানুনয় করুণা ভিক্ষা করিতেছি।

অন্তর্য্যামী

লেখক—শ্রীকমলাকান্ত মৈত্র বি, এ।

নীরবে রহিলে স্বামী।
এতদিন ছিলে হৃদয় মাঝারে
কভু না জানিনু আমি॥
প্রভাতে উঠিয়া মন্দিরের দিকে
ধুপ-দীপ আদি লয়ে।
যাই আমি তব নামটি স্মরিয়া
ক্ষুদ্র ভেলাটি ব'য়ে॥
কতই খুঁজেছি কতই ডেকেছি
কতই কেঁদেছি আমি।
তবু নাহি দেখা বারেকের তরে
দিলে গো অন্তর্য্যামী॥

নিষ্ঠুর তুমি অতি।
তোমারে যে ডাকে মন প্রাণ দিয়ে
করনা তাহার গতি॥

শীত গ্রীষ্ম যারা সব করি হেলা
করে গো তোমার নাম।
নির্দ্দয় প্রভু ভুলেও না কভু
বাড়াও তাদের মান॥
পথের কাণ্ডারী সর্ব্ব ভয় হারী
সুপথে দাও হে মতি।
মায়া মোহ সব ঘুচাইয়া দাও
ওহে ত্রিভুবন পতি॥

স্নেহময় নারায়ণ!
ধুয়ে দাও যত শোক তাপ জ্বালা
লইনু চরণে শরণ॥
আগে আগে চলি দেখাও আমারে
কোন্ পথে যাব আমি।
কোন্ পথে গেলে তোমারে লভিব
“মানুষ” হইব স্বামী॥
হৃদয়ের বল দাও গো আমারে
ধন্য হোক্ এ জীবন।
তোমারি চরণে সঁপে দিনু দেব
তোমারি দেওয়া মন॥

হৃদয়ের হৃষীকেশ!
শেষ ভিক্ষা মোর দেখা দাও হরি
ধরিয়া মোহন বেশ॥
ভক্তের মন জানিতে তো পার
তুমি হে অন্তর্য্যামী।
ও রাঙ্গা চরণে থাকে যেন মতি
তুমি যে আমার স্বামী॥

শেষের দিনেতে নামটি লইব
না হবে ভয়ের লেশ।
অন্তরে মুখেতে "হরি হরি" বলি
হয় যেন মোর শেষ॥

উতথ্য সংবাদ।

লেখক—শ্রীযুক্তরাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর।

পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, উতথ্যপত্নী মমতারগর্ভে বৃহস্পতির ঔরসে ভরদ্বাজ ও দীর্ঘতমার জন্ম। দেব-গুরু বৃহস্পতি মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র। উতথ্য মুনি বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ।

বহু সদ্‌গুণ সম্পন্ন উগ্রতপাঃ মহর্ষি বৃহস্পতি দেবগণের গুরু। তিনি ভ্রাতৃ-জায়া মমতায় গমন করিয়াছিলেন। গর্ভস্থ (উতথ্যের ঔরসে জাত) বালক বারংবার নিষেধ করিলেও ইনি কাম-পরতন্ত্র হইয়া মমতায় সঙ্গত হন এবং গর্ভস্থ বালককে "অন্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ কর" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। বলিহারী দেবতা! দেবতার কি এই কর্ম্ম? ধর্ম্ম উপদেষ্টার আসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজেই ধর্ম্ম বিগর্হিত আচরণ করিলে লোক তাহাকে মানিবে কেন?

প্রকৃত কথা "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" ধর্ম্মের তত্ত্ব অতি গুহ্য ব্যাপার। উহার বিষয়ে যিনি যত বেশী আলোচনা করিবেন এবং গভীর ভাবে চিন্তা করিবেন তিনিই তত আনন্দের তরঙ্গে দোদুল্যমান হইবেন।

কামার্ত্ত মানবেরও যে কার্য্যে সঙ্কোচ হয়, দেবগুরু বৃহস্পতির পক্ষে সে কার্য্য অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার। অতএব ইহার তত্ত্ব চিন্তার যোগ্য। প্রথমতঃ ধরা যাউক বৃহস্পতি কে? ব্রহ্মার মানস পুত্রের মধ্যে অন্যতম পুত্র অঙ্গিরা। ইনি ব্রহ্মার মুখে জাত। অঙ্গ শব্দার্থ শরীরের একদেশ। "অঙ্গং মনসি কায়ে চ" ইতি কল্পদ্রুম। অঙ্গ+ইর্ অস্+কর্ত্তৃবাচ্যে। অঙ্গিরস=অঙ্গিরাঃ। তাহা হইতে উতথ্য ও বৃহস্পতির উৎপত্তি। কর্দ্দম মুনির কন্যা শ্রদ্ধা ইহাদের জননী। অঙ্গিরার কন্যাগুলির নামও তত্ত্ব পূর্ণ। সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি এই চারি কন্যা অঙ্গিরার।

উঃ শব্দের অর্থ শিব, ব্রহ্মা, কল্পদ্রুম ধৃত কামধেনু তন্ত্র বচনে উ কারের সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, উকারং পরমেশ্চানি অধঃ কুণ্ডলিনী স্বয়ম্। পীত চম্পক সঙ্কাশং পঞ্চদেব ময়ং সদা॥ পঞ্চ প্রাণ ময়ং দেবি চতুর্ব্বর্গ প্রদায়কম্॥ হে ঈশানি! উকার স্বয়ং অধঃ কুণ্ডলিনী শক্তি। তাঁহার বর্ণ পীত চম্পক। তিনি গণেশাদি পঞ্চ দেবময়। (১) তিনি পঞ্চপ্রাণ ময়ী। (২) ইনি ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ প্রদায়িকা।

"উ" বিষ্ণু ব্রহ্মা ও শিব। তাহার তথ্য অর্থাৎ তত্ত্ব। "উতথ্য" শব্দের অর্থ বিষ্ণু তত্ত্ব। মমতা শব্দের অর্থ মায়া। "বৃহস্পতি শব্দের অর্থ বাক্‌পতি, বাগীশ। বৃহতী+পতি বৃহস্পতি; নিপাতন সিদ্ধ। বাগীশ্বর ব্রহ্মা। ব্রহ্মা কোনও সময়ে বিষ্ণু মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ছিলেন, এই সামান্য কথায় ঐ পৌরাণিক অসম্ভব গল্পের উৎপত্তি হইয়াছে।

জগদ্ব্যাপী বিষ্ণু মায়া। তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব কেহই বুঝিতে পারে না। তাঁহার বিশেষ ভক্তজন ব্যতীত তাঁহাকে বুঝিতে কাহার সাধ্য আছে? শিব, কপিল, সনক, সনন্দাদি চতুষ্টয় ব্রহ্মাপুত্র নারদ, ব্রহ্মা, জনক, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, ধর্ম্ম ও অর্জ্জুনাদি ভক্তগণই তাঁহার তত্ত্ব কথঞ্চিৎ জ্ঞাত আছেন।

বিষ্ণু মায়া যে কিরূপ শ্রীগীতায় তাহার উল্লেখ আছে যথা—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে॥ অর্থাৎ আমার এই ত্রিগুণ ময়ী দৈবী মায়া অতিশয় দুরত্যয়া (দুরধিগম্যা) যে আমাকে জানে, সেই কেবল আমার এই বিষ্ণু মায়া হইতে উদ্ধার পায়। অর্জ্জুনকে শ্রী ভগবান এই কথা বলিয়াছেন।

---

(১) গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ ব্রহ্মা বিষ্ণুং শিবং শিবাং।
মতান্তরে—"শিবং ভাস্কর মগ্নিঞ্চ কেশবং কৌশিকী স্তথা।
এতান্ প্রপূজয়েদ্ আদৌ সর্ব্ব সিদ্ধিফল প্রদান্॥
শিব, সূর্য্য, অগ্নি, (ব্রহ্মা) বিষ্ণু ও দুর্গা এই পঞ্চ দেব।

(২) প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ প্রাণ। "যজ্ঞ" বৈ প্রাণাঃ" এই বচনে পঞ্চ যজ্ঞের নাম পঞ্চ প্রাণ। দেব যজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূত যজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও ব্রহ্ম যজ্ঞ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মায়ায় মোহিত হইলে "দীর্ঘতমার" উৎপত্তি হয়। তমঃ শব্দের অর্থ—প্রকৃতির গুণ বিশেষ। তাহার কার্য্য মোহ ও সংহার। তাহার ধর্ম্ম যথা—প্রমাদ মোহ, ভয়, ক্লান্তি বিষাদ শোক অরাতি অনার্য্যতা। শ্রম তন্দ্রা মোহ ও পাপ অন্ধকার।

দীর্ঘকাল ধরিয়া তমো নিমগ্ন থাকার নাম দীর্ঘতমাঃ। বিষ্ণু পুরাণে "তমঃ" উৎপত্তির উল্লেখ দেখি। যথা:—

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয় কথয়াম্যেষ শৃণুষ্ব সু সমাহিতঃ।
যথা সসর্জ্জ দেবোঽসৌ দেবাদীনখিলান্ প্রভুঃ॥
সৃষ্টিং চিন্তয়তস্তস্য কল্পাদিষু যথা পুরা।
অবুদ্ধি পূর্ব্বকঃ সর্গঃ প্রাদুর্ভূত স্তমোময়ঃ॥
তমো মোহো মহা মোহ স্তামিস্রঃ হ্যন্ধ সংজ্ঞিতঃ।
অবিদ্যা পঞ্চ পর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥

(প্রথমাংশে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ)

অস্যার্থঃ—পরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয়! প্রভু যে প্রকারে দেবাদির সৃষ্টি করিলেন, তাহা বলিতেছি, সুসমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। পুরাকালে কল্পাদিতে যেরূপ সৃষ্টি ছিল, তাহা চিন্তা করিতে করিতে অবুদ্ধি পূর্ব্বক তমোময় সর্গ প্রাদুর্ভূত হইল। উহা পাঁচ প্রকার যথা—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পঞ্চ পর্ব্বা অবিদ্যা।

"তমঃ" অর্থে দেহাদিতে আত্মাভিমান। "মোহ" পুত্রাদিতে স্বামী অভিমান। "মহা-মোহ" রূপ, রস, গন্ধ শব্দাদিতে ভোগ স্পৃহা। "তামিস্র" তৎ প্রতিঘাতে ক্রোধ। "অন্ধতামিস্র" বিনাশ শঙ্কায় নিত্য তদ্ রক্ষণে অভিনিবেশ। (৩)

(৩) বৃহস্পতি অর্থাৎ বাগীশ্বরের ঐ পঞ্চ প্রকার অবস্থাই ঘটিয়াছিল। "আমি" জ্ঞানে সঙ্গত হওয়া। "ভরদ্বাজের" পুত্রত্বে স্বাম্যাভিমান। পঞ্চ তন্মাত্র রূপিণী "মমতায়" ভোগ স্পৃহা। দীর্ঘতমাঃ" কর্ত্তৃক তৎ প্রতিঘাতে ক্রোধ। এবং ক্রোধ বশে তাহাকে অভিশাপ দেওয়া। নিজের যশঃ বিনাশ শঙ্কায় গোপনে মৈথুন। এই সকলের নিগূঢ় তত্ত্ব মৎ প্রণীত "রূপক ও উপশয়" প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে।

অতএব এক্ষণে মোটামুটি বুঝিতে পারিলাম যে দেবগুরু বৃহস্পতি (তিনি ব্রহ্মাই হউন আর শিবই হউন) উতথ্য, বিষ্ণু তত্ত্ব, পরমেশতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া বিষ্ণু মায়া "মমতায়" মুগ্ধ হন। মমতা অবিদ্যা। তিনি গর্ভবতী ছিলেন অর্থাৎ গর্ভে দীর্ঘতমাঃ আদি পঞ্চমায়া প্রসুপ্ত ছিল। তাহাতে (পঞ্চ পূর্ব্বা অবিদ্যাতে) দেবগুরু নিমগ্ন হইয়া "উতথ্য" ভুলিয়া যান। তাহার পর যখন তাঁহার মায়াবরণ মুক্ত হইল, তখন ভরদ্বাজকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েন। (১)

তাহা হইলে সূত্র হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিষয়টির তাৎপর্য্য দাঁড়াইতেছে যে পরব্রহ্মা দেবের ইচ্ছায় অঙ্গিরাঃ (অঙ্গং মনসি কায়ে চ স্মর্ত্তব্য)। অঙ্গিরাঃ হইতে বৃহস্পতি। (২)

বৃহস্পতি অবুদ্ধি পূর্ব্বক দীর্ঘতমার জন্ম দেন অর্থাৎ বিষ্ণু মায়ায় মজিয়া উতথ্যের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া যান। বিষ্ণুপুরাণে ধরাস্তবে দেখিতে পাই যে,

"যদেতৎ দৃশ্যতে মূর্ত্ত মেতজ্ জ্ঞানাত্মন স্তব।
ভ্রান্তি জ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপম যোগিনঃ॥
জ্ঞান স্বরূপ মখিলং জগদেতদ বুদ্ধয়ঃ।
অর্থ স্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহসংপ্লবে॥

অর্থাৎ এই যে মূর্ত্তরূপ (বরাহরূপ) দৃষ্ট হইতেছে ইহা তোমার জ্ঞানময় রূপ। কিন্তু অজ্ঞেরা জগৎকে ভূতময় দেখিতেছে। অবুদ্ধিগণ জ্ঞান স্বরূপ, এই অখিল জগৎকে স্থূলরূপে দৃষ্টি করতঃ মোহ সংপ্লবে ভ্রমণ করিতেছে।

"অবুদ্ধিগণ" মায়াচ্ছন্ন জীবগণ জ্ঞান স্বরূপ ভগবানকে বুঝিতে না পারিয়া "মমতায়" বিষ্ণু মায়ায় মুগ্ধ হওত দীর্ঘতমার সৃষ্টি করিতেছে! ইতি।

(১) "ভর" এই কথায় দেবগুরু "দ্বাজ" বলিয়াছেন অর্থাৎ এই সূত্র উতথ্যের ক্ষেত্রে বৃহস্পতির ঔরসে জাত বলিয়া "দ্বাজ" এইজন্য "ভরদ্বাজ" নাম হইল।

মহান্তরে রাজর্ষি ভরত কর্ত্তৃক ঐ "দ্বাজ" পুত্র "বাজ" অর্থাৎ পালিত হয়েনএই নিমিত্ত ভরদ্বাজ নাম।

(২) "বৃহস্পতি" নামা দেবগুরু আছেন বটে কিন্তু বৃহস্পতি শব্দের অর্থ বাক্‌পতি হইলে শিব ও বিষ্ণু হয়। শিব জায়ার নাম "তারা" বৃহস্পতি পত্নীর নামও তারা। বাগীশ্বর হইতে জ্ঞানীর (বুধ) উৎপত্তি। চন্দ্র পুত্রও বুধ। চন্দ্র মহাদেব।

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ

লেখক — শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ।

"আজ এত সকাল সকাল চল্লে যে? না—কিছুতেই এখন যাওয়া হতে পারে না, এক কাপ চা না খেয়ে কোন মতেই যেতে পাবে না"—এই বলিয়া একটি সুন্দরী ষোড়শী আধুনিক ভাবে শিক্ষিতা কুমারী তর্জ্জনী দেখাইয়া নিকটস্থ চেয়ারে উপবিষ্ট একটি নিরীহ যুবককে শাসাইল। যুবকের দৃষ্টি স্থির—সে যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না। যুবককে সে সময় লোকে দেখিলে বলিবে, হয় সে খুবই নির্লজ্জ, না হয় একটি উচ্চ শ্রেণীর পাগল। কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত যে, শ্রীমান্ অমরনাথ নির্লজ্জ বা পাগল এই দুইটির মধ্যে কোনটিই নহে। সে যে নির্লজ্জ নয়, তার প্রমাণ যে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলা দূরের কথা স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ উঠিলে রাগিয়া উঠিত, এই কারণে বন্ধুবর্গের নিকট অনেক সময় টিট্‌কারী খাইত। আর সে কোন পুরুষেই পাগল নয়, কারণ গত বৎসর সে সসম্মানে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপস্থিত এম, এ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। অমর নাথের শারীরিক শক্তি যদিও একটু অসাধারণ শ্রেণীর ছিল, তবুও তাহার মানসিক শক্তি মোটেই ছিল না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেশীক্ষণ সে বেলার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিল না—মুখ নিচু করিয়া নিজের কোটের বোতাম খুঁটীতে খুঁটীতে বলিল,—"আজ একটু দরকার আছে, যদি সময় পাই তবে সন্ধ্যার সময় আসিব।" অমরের এই কথাগুলি বেলার ভাল লাগল না—সে বলিল,—"না হয় একটু পরেই যাবে। এখন বেলা ত অধিক হয়নি।" অমর নাথ সহাস্তে বলিয়া উঠিল,—"না বেলা আর এমন কি হয়েছে, এই সবে সাড়ে বারটা বইত নয়? তোমার কাছে বসে থাক্‌লে যে বেলা বেড়ে যাবে না তার কোন মানে নেই—সময় নিজের কাজ ঠিক ক'রে যাবে। এখন আমি যাই।" বেলা অমরের হাত দুটী ধরে মিনতি-ভরা সুরে বলিল, "সন্ধ্যে বেলায় আস্‌বে তো? অমরনাথ বলিল, "আস্‌বো।" অমর নাথ চলিয়া গেল, বেলা একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া একখানি কৌচের উপর নিজের দেহ ভার এলাইয়া দিল।

অমরনাথ অম্বর পুরের অমায়িক ও প্রজা বৎসল জমীদার শেখর বাবুর একমাত্র পুত্র। নিজেদের গ্রাম্য স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার পর

তাহার মাতার ঘোরতর বাধা সত্ত্বেও তাহার পিতা তাহাকে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। সে কলিকাতার একমেসে সাধারণ লোকের মত থাকিয়া লেখাপড়া করে। যদিও অমরনাথ ধনী পিতার একমাত্র আদরের দুলাল, তথাপি সে বিলাসিতা ও গর্ব্বিত ভাবকে মোটেই পছন্দ করে না এবং মেসের ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবরা কেহই তাহাকে ধনীর সন্তান বলিয়া জানিত না। তাহাকে তাহার দেশ বা পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে অন্য প্রসঙ্গ পাড়িয়া সে কথা চাপা দিত, বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে সে মিথ্যা কথা পর্য্যন্ত বলিতেও কুণ্ঠিত হইত না। মেসের সকলেই তাহার অমায়িক ব্যবহারে তাহাকে ভালবাসিত এবং কলেজেও ছাত্র হিসাবে [illegible]র বেশ সু-নাম ছিল। কি এক পর্ব্ব উপলক্ষে সেদিন তাহার কলেজ বন্ধ ছি[illegible] মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া সে নিদ্রার আয়োজন করিতেছিল। এমন [illegible] হঠাৎ তাহার দৃষ্টি গলির অপর পার্শ্বের মিঃ চৌধুরীর বাড়ীর দোতালার খোলা জানালার উপর পড়িল। অনেক দিন সে বেলাকে জানালায় দাঁড়াইতে দেখিয়াছে, কিন্তু অদ্যকার সাক্ষাতে কে যেন কোথা হইতে গোপনে তাহার কিশোর হৃদিপটে একখানি মধুর ছবি আঁকিয়া দিল। অন্যদিন হইলে সে নিজেই তাহার জানালা বন্ধ করিয়া দিত, আজ সে পারিল না—সে একদৃষ্টে তাহার মানস প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিল, বেলা জানালা হইতে সরিয়া গেল কিন্তু অমর নাথের মন হইতে মূর্ত্তিমতী বেলা সরিয়া গেল না। মনে মনে চৌধুরী বাবুদিগের পরিবার বর্গের সহিত সুপরিচিত হইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। অমরনাথের সহিত চৌধুরী মহাশয়দিগের একদিন একটি অভাবনীয় ব্যাপারে পরিচয় ঘটিয়া গেল। সেদিন সারাটা দুপুর চুপ করিয়া ঘরের কোনে বসিয়া কাটাইয়া বৈকাল বেলা অমরনাথ একটু বেড়াইতে বাহির হইল। কিছুক্ষণ অনির্দ্দিষ্ট ভাবে এদিকে ওদিকে বেড়াইবার পর সন্ধ্যাকালে সে মেসে ফিরিতেছে, এমন সময় হঠাৎ একটা সরগোল উঠিল অমরনাথ দেখে যে, এক গাড়ীর ঘোড়া ক্ষেপিয়া চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। গাড়ীর ভিতর হইতে বামা কণ্ঠের চাপা আওয়াজ শোনা যাইতেছে। গাড়ীর চালক বহু চেষ্টা করিয়াও ঘোড়াকে বশে আনিতে পারিতেছে না। রাস্তার উভয় দিকেই অনেক লোক জমা হইয়াছে। সকলেই হায়—হায় করিতেছে। কিন্তু বিপদের সম্মুখীন হইয়া কেহই

ঘোড়াটিকে ধরিতে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। অমরনাথ ক্ষণকালের জন্য ব্যাপারটি বুঝিয়া লইল, মুহূর্ত্তের মধ্যে জামার আস্তীন গুটাইয়া এক লাফে গিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ফেলিল। ঘোড়াও ছাড়াইবার অনেক চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু অমরনাথের বজ্রমুষ্টির নিকট এই অশ্ব পুঙ্গবকে হার মানিতে হইল। ঘোড়া শান্ত হইবার পর গাড়ীর আরোহীরা গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল। অমর নাথের কিন্তু সে দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই. সে প্রাণপণে ঘোড়ার লাগাম দুই হাত দিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে নিজেই চমকিত হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ বেলাকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া সে আত্মহারা হইয়া একদৃষ্টে বেলার দিকে চাহিয়া রহিল। চৌধুরী সাহেব যখন তাহার পিঠে হাত দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া আসিতে বলিলেন, তখন যেন সে বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিল। প্রথমে কিছুতেই গাড়ীতে উঠিতে চাহিল না, কিন্তু শেষে চৌধুরী সাহেবের পীড়াপীড়িতে এবং বেলার একান্ত অনুরোধে তাহাকে গাড়ীতে উঠিতে হইল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে পর চৌধুরী সাহেব বলিলেন. "তুমি না থাকিলে আজ যে আমাদের কি দশা হইত, তাহা ভগবানই জানেন। তোমার সঙ্গে যদিও আমাদের আলাপ পরিচয় নাই তথাপি আমরা সকলেই তোমাকে চিনি। তুমি আমাদের বাড়ীর সাম্‌নের মেসে থাক না ?" অমর নাথ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া গাড়ীর দরজা দিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। অমরনাথকে বেলা যেন কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তার হাতের দিকে লক্ষ্য পড়াতে বলিয়া উঠিল, "একি হাতখানি যে অনেকখানি কেটে ফেলেছেন! মাগো—সে দিকে একেবারেই যে আপনার ভ্রূক্ষেপ নেই! দেখি হাতখানা এইদিকে একবার।" অমরনাথ নিজের হাতের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "বোধ হয় লাগামটী ধরার সময় অবাবধান বশতঃ সামান্য একটু কেটে গেছে—ওতে কিছু হবে না।" বেলা তাহার কথায় কাণ না দিয়া নিজের সিল্কের রুমাল দিয়া অমরনাথের হাতখানি বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল। গাড়ী আসিয়া চৌধুরী সাহেবের ফটকে দাঁড়াইল। যদিও তখন অমর নাথের মেসে ফিরিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, তথাপি গাড়ী হইতে নামিয়া সে মেসে যাইতে চাহিল, বেলা অমরনাথকে অনুরোধ করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তায় সময় কাটাইয়া এবং আগামী কল্য সন্ধ্যা বেলায় তথায় পুনরায় যাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া, সে প্রায় রাত্রি এগারটার সময় নিজের মসে ফিরিল। আনন্দাধিক্য

বশতঃ অমরনাথের সে রাত্রে কিছুতেই নিদ্রা হইল না। যাহাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য সে দিবারাত্রি চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে এত শীঘ্র এবং এত সহজে যে আলাপ হইবে, তাহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর। আজ তাহার মত জগতে সুখী কে ?

অমরনাথ পরদিন হইতে প্রত্যহই চৌধুরী সাহেবদের বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করিল এবং এমন অনেক দিন গিয়াছে যে, সে কলেজ পর্য্যন্ত না গিয়া বেলার সহিত গল্পে গুজবে কাটাইয়া দিয়াছে। ক্রমে ক্রমে উভয়েই প্রেম ডোরে আবদ্ধ হইয়া পড়িল এবং তাহারা এক প্রকার স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তাহারা বিবাহ সূত্রে পরস্পরে আবদ্ধ হইবে। এই কথা কিছু দিনের মধ্যেই চৌধুরী সাহেবের কাণে গিয়া উঠিল। যদিও একমাত্র কন্যা বেলাকে তিনি জীবনে সুখী করিতে চান, তথাপি তাহাকে তিনি এক নিঃসহায় দরিদ্রের হাতে সমর্পণ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক। তিনি কথাবার্ত্তার মধ্যে বহুবার অমরনাথকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন, কোন উত্তরেই তিনি তাহার অভিজাত্যের বা অর্থের কোনরূপ পরিচয় পান নাই এবং সেই হেতুই তিনি অমর নাথের সহিত বেলার বিবাহ না দিয়া মনে মনে ধনে মানে কুলে শীলে উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে ছিলেন।

শনিবার—কলেজের ছুটির পর অমরনাথ মেসে না যাইয়া বেলাদের বাড়ীতে গেল। বেলা সবে মাত্র ঘুম হইতে উঠিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিল। অমরনাথ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ঘরে প্রবেশ করিতে না করিতেই চৌধুরী সাহেব কোথা হইতে ঝড়ের মত আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন ও বেলার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি একটু অন্য ঘরে যাও, অমরের সঙ্গে আমার একটি গোপনীয় কথা আছে।" বেলা কি যেন কি কথা বলিতে যাইতেছিল; তাহার মুখের কথা মুখেই রহিল— চৌধুরী সাহেব গম্ভীর গলায় বলিয়া উঠিলেন, "আমার ইচ্ছা নয় যে, তুমি অমরের সহিত এতটা বেশী মিশামিশি কর। এই বাড়াবাড়ির জন্য তুমি ভবিষ্যতে খুব কষ্ট পাইবে। তোমার মার মৃত্যুর পর হইতে আমিই তোমাকে মানুষ করেছি; সেইজন্য তোমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমি তোমাকে এবং অমরকে নিষেধ করছি যে, তোমরা যেন আজ হইতে পরস্পর না মিশামিশি কর। হ্যাঁ আর এক কথা তুমি যদি ভেবে থাক যে, আমি অমরের সহিত তোমার বিবাহ দিব, তাহলে সে আশা মন থেকে বিসর্জ্জন দাও— সামান্য দরিদ্রে সঙ্গে মিষ্টার চৌধুরীর মেয়ের বিয়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

অমরনাথ নম্রভাবে বলিল,—"আপনি কি জগতে অর্থকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন—নিজের মনের সুখ ও শান্তি কি মানুষের কাছে কিছুই নয় ?" চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয় লইয়া তর্ক করিতে মোটেই চাই না।"

এই ব্যাপারের পর প্রায় ৬।৭ মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। বেলা এখনও অমরনাথকে ভুলিতে পারে নাই—অমরও বোধ হয় বেলাকে ভুলে নাই,—যদিও তাহার ভাবে ও কথাবার্ত্তায় তাহা অপ্রকাশ থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে বেলা চাকরের মারফতে অমরনাথকে ৩।৪ খানি পত্র দিয়াছিল, কিন্তু অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াও একখানি পত্রেরও জবাব পায় নাই। চাকরকে উত্তরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, "বাবু পরে জবাব পাঠাবে বলেছেন।" অমরনাথ অবশেষে চি... জালায় সে মেস পরিত্যাগ করিয়া অন্য মেসে চলিয়া গেল। বেলা মাঝে মাঝে ...ু জানালা দিয়া অমরকে দেখিতে পাইত, কিন্তু এখন তার আরও কষ্ট হই... ...ক করিবে উপায় নাই। বাধ্য হইয়া তাহাকে মনের আগুণ মনেই চাপিয়া ...খিতে হইল। একদিন সন্ধ্যার সময় বেলা বায়োস্কোপ দেখিতে গেল। অমর নাথের মনও সেদিন ভাল ছিল না, কার... সেই দিনই সকালে পিতার পত্রে সে একটা খবর পাইয়াছে। পত্রে তাহার ... লিখিয়াছেন যে, তাঁহার কোন এক বন্ধুর একমাত্র কন্যার সহিত তা... বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন এবং খুব সম্ভব শীঘ্রই তাহাকে বিবাহে... ...ী যাইতে হইবে। কি করিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া বৈক... ...মনে করিল, সিনেমায় গেলে হয়ত মন ভাল হইতে পারে। এই ভাবিয়া অমরনাথও, সিনেমার দিকে চলিল। বায়োস্কোপে ঢুকিয়া আসনে বসিতে যাইয়া বেলা পাশের আসনে অমরনাথকে উপবিষ্ট দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, বলিল,—"তুমি এখানে ?" অমরনাথ তাহার দিকে চাহিয়া একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল,—"সিনেমায় আসতেও কি তোমার বাবার নিষেধ আছে নাকি ? আমি যদি জান্‌তাম্ যে আজ তুমি আস্‌বে তাহলে বোধ হয়, এদিকে আসতাম্ না কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি মোটেই জান্‌তাম্ না যে আজ তুমি আস্‌বে।"

বেলা সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল,—"যাক্ সে কথা—তুমি যে প্রতিজ্ঞায় একেবারে কলির ভীষ্ম তা আমি জানি। এখন তোমার শরীর কেমন আছে ? চেহারা যে খুব রোগা হয়েছে দেখ্‌ছি।"

অমরনাথ কথার কোন জবাব দিল না দেখিয়া বেলা বলিল,—"আচ্ছা আমি যে পর পর চারখানি পত্র দিলুম্ তার কোন উত্তর দিলে না কেন ?"

"কোনরূপ দরকার নেই বলেই উত্তর দিইনি।"

"কোনরূপ দরকার নেই ? আমাকে পত্রের উত্তর দেওয়ার দরকার নেই ? আমি আর কি ব'লব যার দরকার বোঝ তাই কর। কালকে তুমি সিনেমায় আস্‌বে ?"

"না—কাল বোধ হয় বিশেষ কাজের জন্য বাড়ী যাব।"

"এমন কি জরুরী কাজ যার জন্যে তোমাকে কালই যেতে হবে ?"

"জরুরী না হ'লে কি আর এত তাড়াতাড়ি বাড়ী যাই। আজ বাবার চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন যে, তিনি তাঁর কোন এক বন্ধুর কন্যার সহিত আমার বিয়ের সব ঠিক্‌ঠাক্ ক'রেছেন এবং তার জন্যই আমাকে শীঘ্র বাড়ী যেতে হবে।"

বেলা যেন অমরনাথের কথা বুঝিতে না পারিয়া বলিল,—"তোমার বিয়ে ? অমর নাথ অন্যদিকে চাহিয়া উত্তর দিল, "হাঁ।"

"কার সঙ্গে ?"

"এই যে বল্লুম্—বাবার এক বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে।"

বেলার মাথা ঘুরিয়া উঠিল—বায়োস্কোপের ছবি তাহার চক্ষের সাম্‌নে হিজিবিজির মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অমরনাথের সহিত প্রথম আলাপ হইবার পর বেলা নিদ্রায় ও জাগরণে মনের মধ্যে কত রঙ্গীন স্বপ্নের ছবি আঁকিয়াছিল। আজ অমরনাথের একটা সামান্য কথায় তাহার প্রাণের সমস্ত আশা জলবুদ্‌বুদের মত প্রাণেতেই মিশাইয়া গেল। অমরনাথের সম্মুখে সে আর বসিতে পারিল না—অমরনাথের তপ্ত নিঃশ্বাস তাকে ছুরির মত বিঁধিতে লাগিল। মাথা ধরার ভাণ করিয়া আসন ত্যাগ করিয়া সে ধীরে ধীরে সিনেমা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। গৃহে প্রত্যাগমন করিলে চৌধুরী সাহেব ডাকিলেন, বেলা—বেলা—

"কি বাবা ?"

"কাল সকালের গাড়ীতে আমাদের অম্বর পুরের জমীদার শেখর বাবুর বাড়ী যেতে হবে। যাবার জন্য তিনি বিশেষ ক'রে লিখেছেন। তাঁর মত বন্ধুর কথা সহজে ঠেলা যায় না। হ্যাঁ আর একটা কথা শেখর বাবু খুব ধনী লোক; তিনি তাঁর একমাত্র ছেলের জন্য আমার নিকট তোকে চেয়েছেন—আমিও যে

তাদেরা জী আছি, তা আমি তাঁকে লিখেছি। মাত্র ২।১ দিন সেখানে থাক্‌ব—বেশী কিছু সঙ্গে নিতে হবে না। আমি মনে করেছি যে, বারবার তাঁর কাছে যাওয়া হয়ে উঠ্‌বে না, সেইজন্য কালই শেখর বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা সব ঠিক ক'রে ফেলব আর যদি শেখর বাবুর ছেলে উপস্থিত থাকে এবং সব বিষয়ে সুবিধা দেখি, তাহলে আশীর্ব্বাদও শেষ ক'রে আস্‌ব। যাক্—যা হয় পরে দেখা যাবে—কাল সকাল সাতটার সময় গাড়ী মনে থাকে যেন। এখনই যা যা নিতে হবে সব গুছিয়ে ঠিক ক'রে লও, আমি ঐ দিকের কাজগুলো একটু তাড়াতাড়ি সেরে লই।" এই কথা বলিয়া চৌধুরী সাহেব ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। পিতার এই কথায় বেলা যেন একেবারে গাছ হইতে পড়িল। অনেক দিন আগে সে একদিন কথায় কথায় অমরনাথের কাছে শুনিয়াছিল যে, তাহার বাড়ী অম্বর পুর নামক এক গ্রামে। কিন্তু শুধু গ্রামটি মিলিলে তো হবে না—অমরনাথ তো জমিদারের পুত্র নয়। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে অমরনাথের সহিত সিনেমায় বসিয়া যে কথা হইয়াছে, তাহা তাহার মনে হইল। অমরনাথও বলিয়াছে যে, তাহার বাবার কোন এক বন্ধুর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে তাহার বিয়ের সম্বন্ধ হ'চ্ছে এবং তার জন্য তাকেও কাল বাড়ী যেতে হবে। তবে কি তারই সঙ্গে গোপনে বিয়ের কথাবার্ত্তা চল্‌ছে? দোটানার মধ্যে পড়িয়া বেলা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। মনে মনে ভগবানকে প্রণাম করিয়া বলিল—"হে—নারায়ণ আমার এই ধারণা যেন সত্য হয়। আলমারীর উপরের তাক হইতে একটা টিক্‌টীকি ডাকিয়া উঠিল, টক্ – টক্ – টক্।

আজ দুপুর বেলায় বেলারা অম্বর পুরে এসেছে। অমর নাথের মাতা ও ভগ্নী নমিতা চারিদিকে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বেলার সহিত নমিতার এই অল্প সময়ের মধ্যে এত ভাব হইয়া গিয়াছে যে বাহিরের যে, কোন লোক দেখিলে তাহাদের যে এই প্রথম আলাপ পরিচয় তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। সকলের খাওয়া হইয়া যাইবার পর নমিতা বেলাকে লইয়া বাড়ীর পাশের পুকুরে বেড়াইতে গেল। দুইজনে ঘাটের সিঁড়ির উপর বসিয়া প্রাণের অনেক কথা বলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিবার পর নমিতা বলিল,—"আর বেশীক্ষণ এখানে থাক্‌ব না ভাই—একটু পরেই আবার দাদা আস্‌বে। বেলা প্রায় শেষ হয়ে এল এবার বোধ হয় গাড়ীর সময় হয়েছে।"

নমিতার দাদার আসার কথা শুনিয়াই বেলার মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। একবার ভাবিল যে, তাঁর নামটা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নামের

সন্দেহ দূর করিবে; কিন্তু লজ্জায় জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিতে পারিল না, নিজের আঁচল খানি আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "তোমার দাদা কোথায় থাকেন ভাই?"

নমিতা গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল—"তুমি তাও জান না—দাদা কলিকাতায় থেকে এম, এ পড়েন। তোমার সঙ্গে বিয়ে হবে কিনা সেই জন্যই বাবা আজ দাদাকে আস্‌তে লিখেছেন। আর কিছুদিন বাদেই তুমি আমার বৌদি হবে।" নমিতা ঘাড় বাঁকাইয়া বেলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "শুধু বুঝি দাদার সঙ্গেই একা একা কথা কইবে? আচ্ছা—আমিও দাদাকে সব বলে দিচ্ছি।" নমিতা তাহাকে কোন কথা বলিতে না দিয়া এক ছুটে একেবারে বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঢুকিল, বেলাও পিছন পিছন চলিল।

সন্ধ্যা আগত প্রায়। শেখর বাবু সকলকে লইয়া তাঁহার শয়ন কক্ষে বসিয়া গল্প করিতেছেন। সুবাসিত অম্বুরী তামাকের গন্ধে সমস্ত ঘরখানি আমোদিত। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া শেখর বাবু বৃদ্ধ দরোয়ান রামসিংকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাদাবাবু এসেছে কিনা, একবার বাহির বাড়িতে দেখে আয়তো।" প্রথা অনুসারে রামসিং একটি লম্বা সেলাম ঠুকিয়া জানাইল যে, তাহার দাদাবাবু যথাসময়ে এসেছেন ও উপস্থিত বাহির বাড়ীতেই আছেন। তাহাকে এখনই এখানে পাঠাইয়া দিতে আদেশ দিয়া শেখর বাবু চৌধুরী সাহেবের সহিত পুনরায় গল্পে মনোনিবেশ করিলেন। রাম সিং তাহার দাদা বাবুকে পাঠাইয়া দিতে গেল দেখিয়া বেলা নমিতার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "বেজায় মাথা ধরেছে—চল ভাই একবার ছাদ থেকে বেড়িয়ে আসি।" নমিতা সজোরে তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিল,—"অত ভয় নেই গো—ভয় নেই। আমার দাদা বাঘ নয় যে, তোমায় গপ্ ক'রে একেবারে গিলে খাবে।" বেলার মুখখানি লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। পুত্রকে তখনও আসিতে না দেখিয়া শেখর বাবু বিরক্তিভরে গিন্নীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"খোকার একটুও আক্কেল নেই।" আরও অনেক কথা বলিতে যাইতেছিলেন, অমরনাথকে ঘরে আসিতে দেখিয়া তাঁহার বকাবকি বন্ধ হইয়া গেল। তিনি পুত্রের দিকে চাহিয়া চৌধুরী সাহেবকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "ইনি কলিকাতার বিখ্যাত জমিদার চৌধুরী সাহেব বাল্যকাল হইতেই আমরা বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ—আজ সকালে দয়া ক'রে আমার এখানে বেড়াতে এসেছেন। চৌধুরী সাহেব অমর

নাথকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে শেখর বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"অমর আপনার পুত্র—এতদিন আমি একথা ঘুনাক্ষরেও তো জান্‌তে পারিনি! অমরনাথ ধীরে ধীরে যাইয়া তাহার ভাবী শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই বেলার সহিত চারচোখ এক হইয়া গেল। সকলের অলক্ষ্যে অমরের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়াই লজ্জায় বেলা নমিতার পশ্চাতে সরিয়া বসিল। বেলাকে রাগাইবার জন্য নমিতা বেলার মুখখানি দুই হাত দিয়া ধরিয়া অমরের দিকে চাহিয়া বলিল, "দাদা! এই দেখ তোমার বৌ"—বেলার কাণে কাণে বলিল, "কি ভাই তোমার বেজায় মাথাধরা বোধ হয়, একেবারেই সেরে গেল নয়?" অমর নাথ আস্তে আস্তে মুখ অন্যদিকে ঘুরাইয়া লইল। সেই সময় নিস্তব্ধ বাগানের বৃক্ষশাখা হইতে একটি দুষ্ট পাখী বলিয়া উঠিল, "বৌ—কথা—কও"—

প্রার্থনা

লেখক—শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

তুমি পিতা, তুমি মাতা, জ্ঞান ধর্ম্ম মোক্ষ দাতা
তুমি প্রাণসখা, তুমি চির প্রিয়তম,
হে সৌম্য মধুর শান্ত, প্রাণনাথ প্রাণকান্ত,
তোমাতেই সব সুখ বিজড়িত মম।
এসো নাথ, এসো স্বামী, এস হে অন্তর্য্যামি,
এস হে হৃদয়ে মোর, এসো আজি তুমি,
হৃদে কর অধিষ্ঠান, শান্ত হোক্ ক্লিষ্ট প্রাণ,
তোমার ওই রাতুল পাদপদ্ম চুমি॥
এস মোর অন্তঃপুরে, তাপ ক্লেশ যাক্ দূরে,
এসো হে কাণ্ডারী, তুমি পথের সম্বল;
তুলসী, পুষ্প, চন্দন, শুষ্ক হবে অকারণ,
এত বড় আশা মোর হবে কি বিফল?
সুখ দুঃখ ভরা ভবে, হাসিতে কাঁদিতে হবে,
তাতে কিন্তু, দীনবন্ধু, ক্ষতি কিছু নাই;
দেখো হরি দয়াময়, নামে না কলঙ্ক হয়,
অগরের আঁখিজল সতত মুছাই।

শ্রীমদ্ বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শক্তানন্দ তরঙ্গিণীতে শিষ্যের গুরুর প্রতি কিরূপ কর্ত্তব্য, তাহা বিশদ ভাবে দেওয়া হইয়াছে। মূল শ্লোক না উঠাইয়া উহাদের অর্থ নিম্নে পদ্যে অনুবাদ করিয়া শুনাইতেছি।

গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু শুন ভাই বোন।
সম্বল দেবাদীশ্বর এ গুরুদেব হন॥
সুকৃত দুষ্কৃতের তিনি করেন দরশন।
এ কথা হৃদয়ে সবে রেখো অনুক্ষণ॥
তাঁর আদেশে সর্ব্বকাজ করিবে সম্পাদন।
পূজা জপ ভোজনাদি গমনাগমন॥
গুরু আদেশ যেবা সদা করয়ে পালন।
বিনা জপে মন্ত্র-সিদ্ধি হয় শাস্ত্রের বচন॥
প্রাতঃ মধ্য অথবা সায়হ্নেতে আর।
ধ্যান অর্চ্চনা চিন্তা জপ করিও তাঁহার॥
স্বগুরু ভিন্ন অন্যের পূজা না হয় বিহিত।
গুরুসনে একাসনে বাস করিও রহিত॥
দর্শন মাত্র তাঁরে ভাই! আসন ত্যাগ করো।
দাঁড়াইয়া রবে সবে, আদেশ পাথরো॥
অভিজাত কুলীন পণ্ডিত বা হও ধনবান্।
গুরু দর্শন মাত্র শির করিবে লুণ্ঠন॥
গুরু সাক্ষাতে কদাপি মিথ্যা না কহিবে।
বহুভাষীত্ব পাণ্ডিত্ব গর্ব্ব বর্জ্জন করিবে॥
গুরুসনে ক্রয় বিক্রয় বা ধনের ব্যবহার।
প্রীতিদান ভিন্ন, দান তাঁর করো পরিহার॥
গুরু সমীপে অন্যের পূজা না হয় বিহিত।
ঔদ্ধত্য, দীক্ষা, দানাদি করিবে রহিত॥

আসন যান পাদুকা স্নানোদক আর ছায়া।
কখনও এ সব লঙ্ঘন করিবে না ভায়া॥
গুরু সমীপে শূন্য হস্তে কভু না আসিবে।
একান্ত অক্ষম হলে ফল পুষ্প দিবে॥
গুরুবাক্য লঙ্ঘিয়া, চাও নিজ বাক্য স্থাপন।
(বা) পরাভব করিবে তাঁরে করয়ে মনন॥
শাস্ত্রের আদেশ তার হবে নরকে গমন।
কথাগুলি সদা সবে করিবে স্মরণ॥
গুরু আর ইষ্টদেব একই রূপ হয়।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হতে ভিন্ন নয়॥
এ হেতু পূজাতে শিষ্য করিলে অবস্থান।
সে সময়ে তথায় গুরু করেন আগমন॥
পূজা ত্যজি শিষ্য যেন করে গাত্রোত্থান।
সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে পদে করয়ে লুণ্ঠন॥
গুরু যদি শিষ্যবাসে করেন আগমন।
কাশীধাম বলে সে জন করিবে গণন॥
গুরুর বাস হয় যদি পর্ণ কুঠিরেতে।
কৈলাস সম গণ্য তাহা শিষ্যের নিকটেতে॥
গুরু প্রসাদ ভক্ষণ বিনা শাস্ত্রে ইহা কয়।
ইষ্টমন্ত্র জপ কীর্ত্তন বিফল হয়ে যায়॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করো সহিত ভকতি॥
গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ করিবে চিন্তন।
কায়মন বাক্যে তাঁর করিবে তোষণ॥
গুরু যদি নিকটে করেন অবস্থান।
সক্ষম হ'লে করো তাঁরে দুবেলা দরশন॥
সর্ব্বচিন্তা পরিহরি যদি পার এ সব করিতে।
সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্তি হবে রেখো এ চিতে॥

পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি পাঠ করিয়া কেহ কেহ অন্যরূপ প্রশ্ন করিতেছেন, তাহা বুঝিতেছি তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, পুস্তক পাঠ করিয়া যাহা সহজেই

সকলে জানিতে পারে, তাহাও বহু প্রকারে উদ্ধৃত হইল, ইহার ফলও শুনা গেল। বুঝাও গেল যে, শ্রীগুরুদেবের প্রতি একান্ত ভক্তি ও নির্ভরতা করিতে হইবে। কিন্তু এ ভক্তিলাভ কিরূপে হয়? তাহারও কিছুই শুনিলাম না। এরূপ প্রশ্ন করা আশ্চর্য্য নহে। এজন্য এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিবার ইচ্ছা হইতেছে।

শাণ্ডিল্য সূত্রে এ ভক্তির পরিভাষা এইরূপে দেওয়া হইয়াছে—"ভক্তি পরানুরক্তি ঈশ্বরে।" অর্থাৎ ঈশ্বরে পরানুরক্তিই হইতেছে ভক্তি। নারদ ভক্তি সূত্র পুস্তকে বলা হইয়াছে—"সাত্বস্মিন পরম প্রেমরূপা" অর্থাৎ পরমেশ্বরে পরম প্রেম করাকেই ভক্তি কহে। ইহার স্ফুটন পরে এইভাবে আরও করা হইল। "তদর্পিতাস্মিনাচারতা তদ্বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা" অর্থাৎ এই পরে পরমেশ্বরে সমুদয় আচরণ অর্পণ করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে। যদি সামান্য মাত্র বিস্মরণ হয়, তবে অত্যন্ত ব্যাকুলতা উপস্থিত হইবে।

উপরোক্ত বাক্যগুলি একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, প্রথমতঃ ঈশ্বর জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, আর জ্ঞান করিতে হইবে যে ঈশ্বর সর্ব্ব শক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বপ্রিয়। আমার "আমিত্ব" সেখানে ভক্তি ক্ষুদ্র—কারণ আমি ক্ষুদ্র শক্তি সম্পন্ন, অল্পজ্ঞ ও দেহাদি জ্ঞান লইয়াই, অতি অত্যাশ্রয়। প্রথমতঃ এরূপ জ্ঞানের পর সর্ব্বদাই ঈশ্বরের এ বিরাটত্বকে ঘনীভূত করিয়া, হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি যে এক পরম প্রেমরূপা অনুরক্তি জন্মিবে তাহাই হইল ভক্তি। ইহাকে বুঝান হইল, দুইটী শব্দের দ্বারা—এক "প্রেমরূপা" ও "রাক্তানুরাগ" "প্রী" ধাতু হইতে প্রেম ও "রণজ" ধাতু হইতে অনুরাগ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে উভয় এই বুঝাইল যে উহা চিত্তের এক প্রকার অপূর্ব্ব বিনোদন মাত্র। যেখানে চিত্তের গুঢ়মর্ম্ম স্থানে এরূপ পরমা প্রসন্নতা নাই, সেস্থলে ভক্তি কখনই নাই।

উপরোক্ত বাক্যগুলি বুঝিতে যাইয়া আর ত বড়ই গোলযোগের কথা আসিয়া পড়িল। বুঝিলাম যে, আগে ঈশ্বরের জ্ঞান, তবে ভক্তি। সুতরাং জ্ঞান ভিন্ন যখন ভক্তি হয় না, তখন জ্ঞানই বড়। তবেইত জ্ঞানবাদী ও ভক্তি-বাদীদের যে চিরদিনের বিবাদ তাহাই আসিয়া পড়িল। এ তর্কের সম্পূর্ণ উদ্বোধন এখানে করিবার ইচ্ছা নাই। কারণ এরূপ প্রশ্নের মীমাংসা পরে করা হইবে। তবে কথাটা যখন উঠিয়াছে, তখন অতি সংক্ষেপে ইহা বুঝাইয়া যাইব মাত্র।

এ "জ্ঞান বা "ভক্তি" ইহারা কেহই জন্য পদার্থ নহে। এ জ্ঞান ও ভক্তি সর্ব্বদাই আছে। কেবল আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত আছে মাত্র। এজন্য বেদান্ত শাস্ত্রের যাহা যথার্থ "জ্ঞান" ও ভক্তি শাস্ত্রের যাহা "পরাভক্তি" ইহা শেষ সীমায় যাইয়া প্রায় এক। তবে সচরাচর যাহাকে আমরা জ্ঞান বলি তাহা হইতেছে পরোক্ষ জ্ঞান, আর "বিধি ধ্যানতব্য" রূপ সাধনের পর অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহা পরিস্ফুটনের জন্য প্রথমোক্তটি হইতেছে আবরণ ভঙ্গিরূপ সোপান বা সাধনা মাত্র। সেইরূপ গৌণ ভক্তি হইতেছে পরাভক্তি সাধন মাত্র প্রথম অবস্থায় সামান্য জ্ঞান ভিন্ন যেরূপ গৌনভক্তি সাধনের ইচ্ছা হইবে না, সেই সব পূর্ব্বে গৌন ভক্তির সাধনা না থাকিলেও উক্ত প্রকার পরাভক্তি লাভ হইবে না।

বেদান্ত শাস্ত্রে যাহাকে জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহা কেবল মাত্র জ্ঞানই অর্থাৎ সেখানে "জ্ঞাত" ও "জ্ঞেয়" নাই। সুতরাং উহা যে কিরূপ পরমার্থ জ্ঞান তাহা বুঝাইবার ভাষা নাই। ইহা কিরূপ?—এক অনন্ত সমুদ্রে যাইয়া গঙ্গা সিন্ধু প্রভৃতি নদনদী বিভিন্ন বিভিন্ন নাম ও রূপ লইয়া অতি ভিন্ন পথে যাইয়া মিলিত হইল। যখন যাইয়া একেবারে মিলিল তখন পূর্ব্বের নাম ও রূপ সমুদয় বিলুপ্ত হইল ও সমুদয় একই সমুদ্রবৎ অবস্থিত রহিল। অথবা এক বিশাল চিনির সমুদ্রে যাইয়া ছোট ছোট চিনির স্রোত মিলিল, ও পরে সমুদয় চিনির সমুদ্র হইয়াই উঠিল। এখানে চিনির আস্বাদক কেহ নাই। অথবা আস্বদন রূপ এক আনন্দ আছে।

অপরদিকে ভক্তি পক্ষে হইতেছে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিনির স্রোত "গীতার যুক্ততম" ভাবে যাইয়া চিনির সমুদ্রে মিশিল বটে, তবে এক একটু পর্দ্দা রাখিল। ইহা কিরূপ—না অতি স্বচ্ছ ও ক্ষীণ অভ্র পাত্রে বা অতি ক্ষীণ একটি সোলা নির্ম্মিত গেলাসে চিনি পরিপূর্ণ হইয়া চিনির সমুদ্রে ডুবিয়া রহিল। নিজেকে চিনিময় দেখিতেছে, চিনির আস্বাদন অনবরত করিতেছে। অথচ বুঝিতেছে যে, অনন্ত চিনি সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়াও তাহার একটু ব্যবচ্ছেদ আছে। আর এ ব্যবচ্ছেদ আছে বলিয়া সে বলিতেছে যে, অপর চিনি সমুদ্রে ডুবিয়া আছি ও চিনি খাইতেছি। আর প্রথমোক্ত স্থলে বলিবেন যে, আমরা কি ভাবে আছি—তাহা প্রকাশের উপায় নাই। এজন্য ভক্তরাম প্রসাদ গাহিয়াছেন—চিনি হইতে চাহিনা মা! আমি চিনি খেতে ভালবাসি।" পরাভক্তিতে যাইয়া কিন্তু কেবল আনন্দই।

দেহান্তে এই ভক্তি বাদীর ভ্রমর কীটের ন্যায় হইয়া, শ্রীভগবানের সহিত বৈকুণ্ঠে বা গোলকে সারুপ্য, সামিপ্য বা সামুজ্য রূপ মুক্তিলাভ করিয়া উক্ত আনন্দে বিভোর থাকিতে ইচ্ছা করে না আর প্রথমোক্ত "জ্ঞানীরা"—জ্ঞানী আত্মৈব যে মতং হইয়া দেহ ধারী হইয়া বিদেহ মুক্তি জীবন্মুক্ত অবস্থার পর বা কৈবল্য মুক্তি লাভ করেন। অর্থাৎ ভক্তি বাদীরা যাহাকে পাইয়া আনন্দ বোধ করেন জ্ঞানীরা সেই আনন্দ মাত্র হ'ন। ইহার অধিক আর এক্ষণে আলোচনা না করাই ভাল। একটি সাম্বতের সার অপরটি রসের সার।

যখন গুরুভক্তি লইয়াই এ প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তখন ভক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহাই বলিতে হইবে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এ ভক্তির বীজ সকল হৃদয়েই লুক্কায়িত আছে। ইহা নিজের সিদ্ধ বস্তু, তবে গৌণ ভক্তির সাধনা দ্বারা যেন ইহা সাধ্য বলিয়া বোধ হয়। শ্রীগুরু মুখে শুনিয়াছি যে, এ ভক্তির বীজ মোহ, স্নেহ ও প্রীতির রূপে নিম্নগামী হইয়া আছে। অর্থাৎ ইহা নিম্নাভিমুখী হইয়া অর্থ পুত্র ও স্ত্রীর প্রতি প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীশ্রীগুরুর কৃপায়ও তৎ প্রদর্শিত সাধনা বলে. ইহাতে যদি জ্ঞানবারি সিঞ্চন করা যায় ও পরে নিম্নগামী স্রোত বন্ধ করিতে পারা যায়, তবে উহা উদ্বাভিমুখী হইয়া সেই "উর্দ্ধং মূলং অধোপামং" রূপে যাইয়া মিলিত হয়, তখন ইহা ভক্তি রূপে প্রেমরূপা হয়।

যদি প্রশ্ন করেন উহা কিরূপে বন্ধ করিব? হাঁ ইহা বন্ধ করিবার কতক-গুলি উপায় আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন। যথা—

শ্রবণং কার্ত্তনং বিধেতাঃ স্মরণং পাদ সেবনং।
অর্চ্চণং বন্ধনং দাস্যং সাম্যং সখ্য-মাত্মনিবেদনম্॥"

আর জ্ঞান বাদীরা বলিলেন সাধন চতুষ্টয়ের সাধনা। প্রথমোক্তটি হইতেছে সগুন ঈশ্বর ধ্যান বা সর্ব্ব সন্নিদং ব্রহ্ম। আর দ্বিতীয়টি হইতেছে আত্ম জ্ঞান বা নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান—বা সত্যং জ্ঞান মনন্তং।

আইস ভাইগণ! এ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করা যাউক। ভাবিয়া দেখ, স্ত্রী পুত্র পরিজনের প্রতি আমরা উপরোক্ত ক্রিয়াগুলি করিয়া আনন্দ লাভ করি কি না? স্ত্রী, পুত্র, বন্ধুজনের সহিত আলাপ সম্ভাষণ, তাহাদের গুণ-গান অপরের নিকট কীর্ত্তন, তাহাদের বাক্যালাপ শ্রবণ, যদি একটু তাহাতে থাকি তবে তাহাদের স্মরণ এরূপ করিয়া প্রসন্নতালাভ করি কি না? আবার আরও

দেখ, কত সময়ে কাহারও প্রতি অর্চ্চনা, বন্দনা, সখ্যতা বা দাস্যতা ভাবে দেখাইয়া অথবা যদি একটু স্নেহভাবে থাকে, তবে শ্রীমতীর প্রতি নিজের যাহা আছে সমুদয় নিবেদন করিয়া নিজের সুখানুভব করি কি না? এখন ভাবিয়া দেখ যে, এরূপ ভাবে উক্ত ক্রিয়াগুলি করিলেও কখনই উহারা স্থায়ীভাবে থাকে না। সময়ে হয় এবং সময়ে চলিয়া যায়। জীবনে কত বন্ধু হইল, আবার তাহার স্থানে অপরে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্ত্রী বিয়োগ হইল তাহার স্থানে নূতন স্ত্রী আসিলেই, প্রথমের স্মৃতি প্রায় চলিয়া গেল। পুত্রের প্রতি স্নেহভাব যাইয়া কখনও বা পুত্রভাবে উপস্থিত হইল মাতা পিতার স্মরণ, নিজের পুত্রাদি প্রাপ্তির সহিতই বিস্মরণে যাইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং এ সমুদয়ের পরিবর্ত্তে যদি এমন বস্তু পাই যে, তাঁহার সম্বন্ধে আসিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা একভাবে নিজের নিকট অভ্যাস দেখিতে পাই ও তাঁহার সহিত পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধের ভাবগুলি সর্ব্বদাই আস্বাদন করি তবে কি মহান্ আনন্দের উৎপত্তি হইবে না? কারণ সে সময়ে তিনি হইবেন—

"ত্বমেব মাতাচ পিতাত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখাত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিনং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং ময় দেব দেব"

তবে আইস আমরা উপরোক্ত বস্তুটি খুঁজিয়া বাহির করি ও আমাদের উপরোক্ত কার্য্যাবলী তাঁহার উপর ন্যস্ত করি। এ মূর্ত্তি তোমার কে? না ইহাই তোমার অভিষ্ট মূর্ত্তি। আর এ অভিষ্ট মূর্ত্তি কি তুমি কোথায় দেখিতেছ। হাঁ ঐ তোমার সম্মুখে বিরাজিত, আকার, সজীব মনুষ্য দেহধারী গুরুমূর্ত্তি। দেবতা ত তুমি এখনও দেখ নাই। যাজ্ঞে ও মহাজন মুখে কেবল বর্ণনা মাত্র শুনিয়াছ? যদি দেখিতে পাও সেই মূর্ত্তির স্বরূপ তোমার সম্মুখে। তবে আর তোমার অর্চ্চনা, বন্দনা, সেবা, দাসত্ব, স্মরণ, তাঁহার রূপেরও গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার যাহা আছে সমুদয় কেন সে শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন না করিতেছ? বাহিরের এই মূর্ত্তি, তুমি ফটো আকারে নিজের হৃদয়ে লও। দেখিবে, ইহার অভাব কোন সময়েই বোধ করিবে না। আর এরূপ যদি করিতে পার তবে তাঁহার স্থূল ব্যবহারিক শরীর হইতে যদি বা কখনও একটু তফাৎ হও, তথাপি অন্তরে তাঁহার মূর্ত্তি সদা শান্তি দান করিবে। তাঁহার সহিত হাসিবে, বসিবে, উঠিবে, বাক্যালাপ করিবে, অথবা কখনও বা মান অভিমানও করিবে। ভাই! পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যে, সৎ, চিৎ আনন্দ, দয়া, সন্তোষ সরলতা, ত্যাগ, বৈরাগ্য বা বদান্যতা—এগুলি ত কেবল এক এক

বিশেষণ বিশিষ্ট শব্দ মাত্র। ইহা শুনিয়া ইহাদের যথার্থ বোধ কখনই ত হইবে না। কিন্তু কখনও যদি এ গুলির যথার্থ উপলব্ধি করিবার ইচ্ছা হয়, তবে কোন বিশিষ্ট পদার্থে, এ গুলিকে সমাবিষ্ট কর। পরমাত্মা দেবের বিষয়ে শাস্ত্রে অনেক শুনিয়াছ, যদি এখন যথার্থই উহা সম্মুখে দেখিতে চাও, তবে দেখিতে পাইবে তোমার শ্রীগুরুদেবের সাকার মূর্ত্তিতে। যদি তোমার ভক্তি সাধনার ইচ্ছা হয়, তবে এ সাকার মূর্ত্তির বাক্য শ্রবণ করিও। তাঁহার গুণাবলীর কীর্ত্তন করিও, তাঁহার কার্য্যাবলীর স্মরণ করিও। যখন সুবিধা পাইবে তখনই বন্দন, পাদ সেবন করিও। বলিয়াছি যে এ মূর্ত্তি তোমার সর্ব্বদেশ ব্যাপী ও চিরস্থায়ী অভিষ্টদেবের। এজন্য উক্ত হইয়াছে—"কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা ধারয়েৎ গুরুং।" তুমি ক্রমাগত এইরূপ করিতে থাকিবে। এরূপ ক্রমাগয়ে করিতে করিতে দেখিবে, যে তোমার আর "তুমিত্ব" নাই। তোমার আত্ম নিবেদন হইয়া গিয়াছে। আমার "তোমার" বলিয়া "অমিত্বের" এক মোহ ধারা ছিল, তাহা উল্টিয়া গিয়াছে। ইহার পর একটি অপূর্ব্ব রস তুমি সেবন করিতে থাকিবে। ইহাই হইল "ভক্তিরস"। বা রাগানুরাগ ভক্তি। ইহা অপরকে জানাইতে পারিবে না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে ইহা কি? কেবল বলিও, তিনি চিনিরই মত, মধু, মধুরই মত।

ভাই! এ যে, কেবল আমি বলিতেছি, ইহা কদাচ মনে করিও না। গীতা শাস্ত্রে শ্রীভগবান ইহা পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন।

"(১) শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং সমে যুক্ত তত মো মতঃ
(২) যো যো যাং যাং তনুং ভক্ত শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি
লভতে চ ততঃ কামান ময়ৈব বিহিতান হিতান
(৩) সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ
ভক্ত্যা নিত্য যুক্তা উপাসতে।
(৪) অনন্যাদিয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুবাসতে
যোগক্ষেমং বহাম্যহং।
(৫) "পত্রং পুষ্পং যানং তোয়ং.....প্রযতাত্মনঃ
যৎ করোষি.....তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং।"
(৬) "অপি চেৎ সুদুরাচাতে ভজতে মাং অনন্যভাক
সব্যাব্যয় সিতো হি সঃ।"

(৭) য মচ্চিত্তোঃ মদগত প্রাণা……ভুস্যন্তি চ রমন্তি চ ॥”
তেষাং সতত যুক্তানাং যোগেন মামু পযান্তিতে।

(৮) “ময্যোবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে
তে যুক্ততমা মতাঃ।”

(৯) “মার্থজ্ঞ যেই ব্যভিচারেণ ভক্তি যোগেন সেবতে
ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥”

(১০) “মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুত
অহং তাং সর্ব্ব পাদপত্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।”

সকলকে ইহার অর্থ ধারণা করাইবার জন্য এ গুলির পদ্যে অনুবাদ শুনাইতেছি।

(১) একান্ত অনুরাগ ভরে দিয়া মন প্রাণ,
শ্রদ্ধাবান হয়ে, কেহ করেন ভজন।
যোগীকুলে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলে গনে,
ইহাই আমার মত রেখ সদা মনে।

(২) যে জন যে দেবমূর্ত্তি শ্রদ্ধা সহকারে,
পূজা করে, কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি দিনু তারে।
অচলা ভকতি, সে সব দেব অর্চ্চনার,
সকল মনের কাম, হয় পূর্ণ তার।

(৩) কীর্ত্তন, অর্চ্চন বা করিয়া বন্দন,
করিবে মোর সদা পূজা, ভক্তিতে মগন।

(৪) একান্ত অন্তরে চিন্তা করে যে আমার,
আমিই বহন করি যোগক্ষেম তার।

(৫) ভক্তি ভরে যেবা দেয় পত্র পুষ্প জল,
আনন্দে গ্রহণ করি তার আমি সে সকল।
এ হেতু হোমাদি কর্ম্ম, যাহা কর ভক্ষণ,
সমস্ত আমারে তুমি করো নিবেদন।

(৬) দুরবাড়ী হয়ে যেবা করয়ে ভজন,
সাধু বলে সবে তারে করয়ে গণন।
পাণ্ডুসুত এ কথা তুমি, জানিবে নিশ্চয়,
আমার ভক্ত কভু বিনষ্ট না হয় ॥
পাপ বংশে জন্মে কিবা হয় শূদ্রাচারী,
মুক্তিলাভ করে সব মোরে ভক্তি করি।

(৭) মন প্রাণ যারা মোরে করে সমর্পণ,
অথবা আমার গুণ, করয়ে কীর্ত্তন।
অথবা মোর তত্ত্বকথা করয়ে প্রচার,
পরম তৃপ্তি লভে সে হৃদে বলি বার বার।
হেতু তার ভক্তসনে করিয়া অবস্থান,
জ্ঞান দান করি তারে পাইতে পরিত্রাণ।

(৮) মোতে নিত্যযুক্ত বা নিবিষ্ট চিত্ত যারা,
(৯) করয়ে সতত ধ্যান, যোগী শ্রেষ্ঠ তারা ॥
একান্ত ভক্তির ডোরে সেবয়ে যে মোর,
সর্ব্বগুণ অতিক্রমী, হয় ব্রহ্মভাবে ভোর।

(১০) আমাতে প্রাণমন করো সমর্পণ!
সর্ব্বত্যাগী হয়ে হইও ভক্তিতে মগন ॥
আমাকে অর্চ্চনা করো, আর করো নমস্কার,
পাইবে নিশ্চয় মোরে এই জেনো সার ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম আছে যত করে পরিহার,
একান্ত হৃদয়ে লও স্মরণ আমার ॥
সর্ব্ব পাপ হতে মুই করিব পরিত্রাণ,
সর্ব্ব দুঃখ নাশিব তার বুঝ পার্থধন ॥

এতক্ষণ ধরিয়া সর্ব্বসাধারণের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা লইয়াই আলোচনা করিলাম। কিন্তু এ বৈদ্যনাথ ধামে অবস্থান করিয়া আমার যে তৃতীয় আনন্দটী কি, ইহা এখনও পর্য্যন্ত বলি নাই। এক্ষণে গুরু ভ্রাতৃ বর্গকে আলিঙ্গন করিয়া সম্বোধন করিয়া এবার তাহা বলিতে আরম্ভ করিলাম।

স্বর্গীয় পীতাম্বর বন্দোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

লেখক—শ্রীকৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়,
এড্‌ভোকেট হাইকোর্ট, কলিকাতা।

কলিকাতা মহানগরী সিম্‌লা পাড়ার বাড়ুয্যে পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীঃ ১৭৮৫ সালের নবেম্বর মাসে হুগলী জেলা জগৎ বল্লভপুর থানার অন্তর্গত বাগাণ্ডা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি তারকনাথ পরামাণিক, সাধু গোকুল চন্দ্র মিত্র প্রভৃতির ন্যায় একজন বিশ্ববিখ্যাত দানশীল লোক ছিলেন। তাঁহাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘটক অধ্যাপকগণ "রাজা পীতাম্বর" আখ্যা দিয়াছিলেন। আধুনিক পাঠক ঘটকের নাম শুনিয়াই অবাক্ হইতে পারেন। সেকালে ঘটকেরা বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদের ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট বিদ্বানকে "ঘটক চুড়ামণি" ডাকা হইত। ব্রাহ্মণ বংশের কুলীনের নামধেয়, বংশ পরিচয় সংস্কৃত কবিতা করিয়া মুখস্থ বলিতেন। ব্রাহ্মণের বিবাহে তাঁহাদের বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যাইত।

পিতাম্বরের পিতা মাতা অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। পীতাম্বর অনাথা হইলে তাঁহার দূরসম্পর্কের একজন মাসী—(যিনি কলিকাতার রাম-নারায়ণমিশ্রের স্ত্রী ছিলেন) তাঁহাকে কলিকাতা এক্ষণে ৬৭নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট মোকামে আনায়ন করেন। এই রামনারায়ণ মিশ্রের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইনি কলিকাতা সমাজে নারায়ণমিশ্র নামে অভিহিত। ইনি Supreme court অর্থাৎ কলিকাতার সর্ব্বোচ্চ আদালতের সরকারী এটর্নির (Messrs. Cllier Bird & Co. মেসার্স কলিয়ার বার্ড এণ্ড কোম্পানি) প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনি শুদ্ধ শ্রত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কুলীন পোষক-ছিলেন। সেকালে ইংরাজ এটর্নিগণ এদেশী মক্কেলের সহিত একেবারে কথা কহিতেন না। তাঁহারা প্রথমে এই সকল প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত কথা-বার্ত্তা হইলে পরে প্রয়োজন হইলে কথাবার্ত্তা করিতেন। নারায়ণ মিশ্র একজন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি ছিলেন। ইহাঁর আশ্রয়ে পীতাম্বর শশী কলার ন্যায় বর্দ্ধিত

হইতে লাগিলেন। পীতাম্বরের বিদ্যানুরাগ অতিশয় প্রবল ছিল। সেকালে উর্দ্দু পার্শী ও ইংরাজী ভাষা না শিখিলে রাজদরবারে কাহারও কোন উচ্চপদ পাইবার আশা ছিল না। পীতাম্বরের সময়ে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় নাই। তিনি ইংরাজী শিখিবার জন্য গণ্যমান্য ব্যক্তি যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাটী যাইয়া তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতেন। ঐরূপে মৌলবীর বাটী যাইয়া তিনি উর্দ্দু পার্শী ভাষা আয়ত্ত করেন। এই সকল জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তি যথার্থ পরে জ্ঞানলাভ করে। বিদ্যাশিক্ষা তাঁহার পক্ষে এক প্রকার তপস্যার ন্যায় ছিল। "যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী"। পীতাম্বর ভবিষ্যতে একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজী নবীশ হইয়া ছিলেন।

তিনি ২৫ বৎসর বয়সে জমিদার চৌধুরী পরিবারে প্রথম বিবাহ করেন।

তিনি ইংরাজী উর্দ্দু লেখাপড়া শিখিয়া নূতন বাজারে উমাচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের বাটীতে বালকগণের Private Tuter (অর্থাৎ বাটীর শিক্ষকতা) পদে নিযুক্ত হন। পীতাম্বর তাঁহার ছাত্র দিগকে অতি যত্ন সহকারে পাঠ করাইতেন। সন্ধ্যার পর নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিয়া তিনি পড়াইতেন। তাহাতে তিনি একদিন বলিলেন, "আমি যে বাটীতে বাস করি, রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেলে সদর দরজা বন্ধ হইয়া যায়। প্রবেশ করিতে অনেক কষ্ট হয়, এবং তাঁহার খাবার শীতল হইয়া যায়।" এই কথা শুনিয়া ছাত্রগণ তাহাদের পিতাকে এ বিষয় জ্ঞাপন করেন। তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিখ্যাত বদান্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এইসব বিষয় শুনিয়া ২৮নং (এক্ষণে ১৬নং) নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটস্থ বাটী পীতাম্বরকে দানপত্র দ্বারা খাস দখল দেন। পীতাম্বর উক্ত বাটী পাইয়া পরম আনন্দে বসবাস করিতে লাগিলেন। তিনি তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত সম্পত্তি বলিয়া তাঁহার নামে একটী প্রস্তরময় Tablet. এ তারাচরণ প্রসাদাৎ এই কয়েকটী কথা খোদিত করিয়া সদর দরজার নিকট দেওয়ালে স্থাপিত করিলেন।

পীতাম্বরের প্রথমা পত্নী মৃতবৎসা ছিলেন। তাহাতে পীতাম্বর অতিশয় মনকষ্টে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। একদা একটী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ নারায়ণ মিশ্রের নিকট আসিয়া তাহার কন্যার পাত্রের জন্য অনুরোধ করেন। নারায়ণ মিশ্র পীতাম্বরকে ডাকিয়া উক্ত ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিতে উপদেশ দেন। পীতাম্বর উত্তর দেন, "আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁহার পত্নীর অনুমতি লওয়া আবশ্যক।" উক্ত সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ পীতাম্বরের পত্নীকে আশ্বাস দিলেন,

যে, তিনি যজ্ঞ বলে তাঁহার মৃত বংস হইবে না, এবং তাঁহার সপত্নী তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না এবং তাহার সহচরী হইবেন। কিছুদিন পরে নববধু একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন, তাঁহার নাম হইল গিরীশচন্দ্র। পীতাম্বরের জ্যেষ্ঠা পত্নীর পুত্র হইল, তাঁহার নাম শম্ভুচন্দ্র। ইনি বর্ত্তমান লেখকের পিতা।

কয়েক বৎসর পরে নারায়ণ মিশ্র পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। তাহাতে নারায়ণ মিশ্রের আত্মীয় কুটুম্ব নানাস্থান হইতে আগত হইয়া ছিলেন। এক বিবাহ যোগ্যা কন্যা উক্ত যজ্ঞ নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন। যখন পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইলে হোতা ঈষৎ হাস্য করেন। তাঁহাকে প্রশ্ন করায় তিনি মিশ্র মহাশয়কে বলেন, "যে উঠানে যে বিবাহ যোগ্যা কন্যা দণ্ডায়মান ছিল, তাঁহার গর্ভ হ'ইতে পুত্র মিশ্র বংশ রক্ষা করিবে। পরে নারায়ণ মিশ্র মাষ্টার মহাশয় অর্থাৎ পীতাম্বরকে বলেন, তাঁহাকে প্রাগুক্তা কন্যাটিকে বিবাহ করিতে হইবে। পীতাম্বর বলিলেন, "আমার ত বিবাহ করা ব্যবসা দাঁড়াইয়াছে। আমার দুই পত্নী আছে, যদ্যপি তাহাদের কোন আপত্তি না থাকে, আমি বিবাহ করিতে পারি।" উক্ত কন্যার পিতা পীতাম্বরের জ্যেষ্ঠ পত্নীকে উক্ত বিবাহের কথা বলিলে তিনি বলেন যে, "আমার কনিষ্ঠা সপত্নী আছে। কিন্তু মধ্যমা সপত্নীর মতামত অগ্রে জিজ্ঞাসা করুন। মধ্যমা পত্নীর মত লইয়া পীতাম্বর পুনরায় দার পরিগ্রহ করিলেন। মধ্যমা পত্নীর গর্ভে এক পুত্র ও পাঁচ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠা পত্নী দুই পুত্র ও এক কন্যা হয়। কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে পাঁচপুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

গিরিশচন্দ্রের পুত্র উমেশচন্দ্র যিনি কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি এবং W, C Bonnerjie. নামে অভিহিত হইয়া ছিলেন। কনিষ্ঠপুত্র সত্যধন বিদ্যাভূষণ ইনি সংস্কৃত কলেজের M. A. ছিলেন।

শম্ভুচন্দ্রের সাতপুত্র ও চারি কন্যা। শম্ভুচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে পণ্ডিত। ইনি "কাব্যমঞ্জরী" প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা। শম্ভু চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমান লেখক।

পীতাম্বরের তৃতীয় পুত্র তৃতীয় পত্নীর গর্ভ সম্ভূত। তাঁহার নাম শিবচন্দ্র। তাঁহার একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি বাল্যকাল হইতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পরমার্থ চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। নূতন বাজারের উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একদা পীতাম্বরের সকল পুত্রগণকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "শিবুটী ভবিষ্যতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইবেন"। শিবচন্দ্র হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি ডাক্তার

(Duff) ডফ্ সাহেবের খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া খ্রীষ্টিয়ান হন। ইনি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; জয়গোপাল সোম, লালবিহারি দে প্রভৃতি ব্যক্তির অন্তররঙ্গ ছিলেন। ইনি ভারত গভর্ণমেণ্টের Financeale Department এ উচ্চ বেতন ভোগী কর্ম্মচারী হইয়া পেন্‌সন লইয়া ৭২ বৎসর জীবিত থাকিয়া ১৮৯৭ খ্রীঃ খিদির পুরে পরলোক গমন করেন। ইহার দুইপুত্র ইংলণ্ডে Oakeleagh, নামক স্থানে ধর্ম্ম-যাজক (Clergyman) এর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

পীতাম্বরের চতুর্থ পুত্র মহেশ চন্দ্র। ইনি Senior Scholar. ছিলেন। ওরিএণ্ট্যল সেমিনারীর কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। ইনি উহার Sceretary. বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের একজন অন্তররঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ইনি এটর্ণি G. C. bhanber & Co. ফারমের প্রধান কার্য্যকারক ছিলেন। ইনি পীতাম্বরের প্রথমা পত্নীর গর্ভ সম্ভূত।

পীতাম্বরের পঞ্চম পুত্র ছিলেন, রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি হেরম্ব মিশ্রের দত্তক পুত্র হইয়া ছিলেন। ইনি সুপণ্ডিত ও একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি Calcutta Reading room নামক লাইব্রেরী ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করেন। ইনি Calcutta press এর প্রতিষ্ঠাতা।

পীতাম্বরের ষষ্ঠ পুত্র ভৈরবচন্দ্র। ইনি উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দত্তক পুত্র হইয়া ছিলেন। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। ও বেথুন কলেজের ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

পীতাম্বরের সপ্তম পুত্র বটুবিহারী। ইনি অতি সুপুরুষ ছিলেন। ইনি বাঙ্গালা দেশে সাধারণ নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ইনিRoyal Bengal Theatreএর অধ্যক্ষ ছিলেন ও এটর্ণি শ্যামলধন দত্তের ম্যানেজিং ক্লার্ক ছিলেন।

পীতাম্বরের অষ্টম পুত্র কালীচরণ। ইনি একাউণ্টেণ্ট জেনারেল বেঙ্গল আফিসের একজন কর্ম্মচারি ছিলেন। ইহাকে চিপ্ সুপারিণ্টেণ্ট প্রাতঃস্মরণীয় ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতিশয় ভালবাসিতেন।

পীতাম্বরের একজন দৌহিত্র খুলনা জেলার District Board. এর Engineer ছিলেন। তাহার নাম হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। তিনি এখনও জীবিত আছেন; পীতাম্বরের দৌহিত্র পুত্র পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুলনার সবজজ্ হইয়া পরলোক গমন করেন।

পীতাম্বর।

পরের দুঃখ দেখিয়া এতই সহানুভূতি করিতেন যে, তিনি নিজের ওজন না বুঝিয়া দান করিতেন। তিনি যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন ও যথেষ্ট খরচ করিয়া ছিলেন। পরে মৃত্যুকালে ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা দেনা রাখিয়া গতাসু হন। তাঁহার পুত্রেরা বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্র কড়া ক্রান্তি পিতৃঋণ শোধ করেন।

তিনি দান করিতে পাত্র অপাত্র ভেদাভেদ জ্ঞান করিতেন না। ইংরাজী কবি Gold smith, লিখিয়া ছিলেন, His pity goniene charity begani gold smith এর ধর্ম্ম যাজকের উচ্চ প্রাণ দয়ায় এতই আর্দ্র হইত যে, তিনি দানে যুক্তি করিতেন না। পীতাম্বর ঠিক গোল্ড স্মিথের ধর্ম্ম যাজকের ন্যায় ছিলেন। পীতাম্বর তৎকালে এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। সে রকম ধরণের লোক এখন দেখা যায় না। দানে তাঁহাকে রাজা পীতাম্বর জনসাধারণেরা এই আখ্যা দিলেন। পিতৃ-মাতৃহীন শিশু নিজের চেষ্টায় কিরূপ বড় হইতে পারে এবং সমাজের উপকার করিতে পারে, তাহা পীতাম্বরের জীবনী পড়িলে শিক্ষালাভ করিতে পারা যায়।

গান

লেখিকা—শ্রীমতী সরসী বালা রায়।

খাম্বাজ—একতালা

স্বপনের মাঝে, কুড়ায়ে পেয়েছি,
স্বপনের মাঝে, সঁপেছি গো প্রাণ,
কুলু কুল্ স্বরে, ধায় প্রবাহিণী
জুড়াতে মানব প্রাণ ॥ ১

আসে ঐ শশী,
চির সে মাধুরি,
জ্বলে গো নিশীথে,
তারকার প্রাণ ॥ ২

সাগরের মাঝে,
তরঙ্গের লীলা,
বলে গো আমারে
আছে গো রে ভেলা ॥ ৩

রেখো গো আমারে,
মরণের পারে,
দিও না যাতনা,
বধিতে এ প্রাণ ॥ ৪

পক্ষপাতের দোষ।

(পৌরাণিক নিবন্ধ)

লেখক—শ্রীরাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর।

পূর্ব্বকালে চন্দ্র-বংশীয় কৃতি রাজপুত্র বিষ্ণুভক্ত উপরিচর বসু ইন্দ্রের প্রিয় কর্ম্ম করতঃ ইন্দ্রের সখা হন। এবং ইন্দ্রের আদেশে চেদি রাজ্যের অধিপতি হন। ইন্দ্র তাঁহাকে আকাশে ভ্রমণ করিবার জন্য একখানি বিমান প্রদান করেন। উপরে ভ্রমণ করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম উপরিচর বসু।

বনবাসী ঋষিগণ ব্রীহি, যব, তিলাদি দ্বারা যজ্ঞ করেন। দেবগণ পশু দ্বারা যজ্ঞ করেন। কিন্তু "যজ্ঞার্থে পশু বধ" শাস্ত্রীয় বচন। "অগ্নিষোমীয় পশু মালভেত" এবং "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা" ইত্যাদি পৌরাণিক বচনে যজ্ঞের জন্যই পশু বধ করিতে বলা হইয়াছে। ১

একদা ঋষিগণ ও দেবগণ "কি দ্বারা যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য" এই লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে উপরিচরকে তৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। রাজা দেবগণের (বিশেষ ইন্দ্রের মনস্তুষ্টির জন্য) পক্ষ লইয়া বলেন, "পশু দ্বারাই যজ্ঞ বিহিত।" এই কথা বলিলে, ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিবার কালে বলিলেন, "তুমি যথা শাস্ত্র বাক্য না বলিয়া দেবের পক্ষ লইয়া কথা বলিলে এইজন্য তোমার আকাশ গমনের শক্তি লুপ্ত হউক, তুমি অধঃ গমন কর। ২

এইরূপে ঋষিগণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত রাজা তৎক্ষণাৎ ভূবিবরে প্রবিষ্ট হইলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁহার আহারের জন্য নান্দী শ্রাদ্ধাদিতে গৃহভিত্তিতে প্রদত্ত ঘৃত ধারা বিহিত করিলেন।

---

(১) পশু হনন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে জীবিত করিবার ক্ষমতা ঋষিদের ছিল। কেবল উদর পূর্ণের জন্য তাঁহারা পশু বধ করিতেন না। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে যজ্ঞ ত্রিবিধ। ঔষধি দ্বারা যজ্ঞ সাত্বিক। মাংস দ্বারা যজ্ঞ রাজসিক। মদ্যাদি দ্বারা যজ্ঞ তামসিক।

(২) গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্প দন্তের ও উপরে ভ্রমণ করিবার শক্তি ছিল। শিব-নির্ম্মাল্য উল্লঙ্ঘনাপরাধে উক্ত শক্তির লোপ হয়। শেষে "মহিম্ন স্তব" করিয়া পূর্ব্বশক্তি ফিরিয়া পান।

প্রাগুক্ত প্রবন্ধে আমরা বুঝিতে পারি যে, নিরামিষ যজ্ঞই প্রশস্ত। উপরিচর বসু হয়ত তাহা জানিতেন কিন্তু দেবগণের মনোরঞ্জন জন্য পশু বধেরই সমর্থন করায় তাঁহার পক্ষপাত দোষ জন্মে। তাহার ফলে ঐ প্রকার দণ্ডভোগ করিতে হইল, ঋষিগণের অভিশাপ দেবগণ ত ব্যর্থ করিতে পারিলেন না। সত্যের জয় চিরদিন। মিথ্যা কতদিন সত্যের মুখস পরিধান করিয়া থাকিবে?

সভাজন মধ্যে বিদিত বৃত্তান্ত সভ্যের পক্ষপাত অকর্ত্তব্য। পক্ষপাতিত্ব দোষে তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয়। কৌরব রাজসভায় দুর্ম্মতি দুঃশাসন মনস্বিণী যাজ্ঞসেনীর কেশাকর্ষণ করিয়া আকর্ষণ করিতে থাকিলে দ্রৌপদী কাতর ভাবে কুরুরাজের নিকট বিচার প্রার্থনা করিলেন। অন্ধরাজ পুত্রের দোষ জানিয়াও মৌন হইয়া রহিলেন। সেই সভায় কৌরবান্ন ভোজী মহামতী ভীষ্ম বিদূর সঞ্জয়, কৃপাচার্য্য, দ্রোণ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি বহু মান্যগন্য ব্যক্তিই উপবিষ্ট ছিলেন। উচিত কথা বলিতে কাহারও সাহস হইল না। শেষে ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্রই উচিত কথা বলিয়া পিতা ও ভ্রাতৃগণের বিরক্তি ভাজন হইয়াছিলেন। পক্ষপাত দোষে দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রহীনাবস্থায় পশুর ন্যায় মৃত্যু হইয়াছিল। ভীষ্ম বাঁচিতে ইচ্ছা করেন নাই। অশ্বত্থামার দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল।

এই জন্যই বিবেকবান ব্যক্তি অর্থ লোভে কদাচ পক্ষপাত করেন না। পক্ষপাতীর অন্তঃকরণ অতিশয় সংকীর্ণ। বিশ্ব-প্রেমের বিমল গঙ্গানীরে অবগাহন না করিয়া সেই নরাধম আত্মীয় জনের সমুল কূপোদকে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হয়। "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই মন্ত্রের উপাসনা না করিয়া "এই আমার" "এই পর" এই মন্ত্রের সাধন করিয়া থাকে। ঈদৃশ মানব "মানব" নামের অযোগ্য। শ্রীভগবান তাঁহাদের শাস্তির নিমিত্ত ভয়ঙ্কর নরকের সৃষ্টি করিয়াছেন।

দুটি ভাব।

একদিকে দেবদত্ত হংসটিরে দাবী করে, হায়!
অন্যদিকে শাক্যসিংহ হংসটির বেদনা ঘুচায়।
দেবদত্ত বলে "হংস আমার শিকার ছাড় তা'রে।
শাক্যসিংহ বলে "এতে আমার কি দাবী নাই হাঁরে।"
যে প্রাণী বিনাশে সেকি জীবিত প্রাণীর অধিকারী?
এ হংস আমার, আমি দিবনা তোমায় ধনুর্দ্ধারি!

শ্রীরাজেন্দ্র।

জন্মভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৬শ বর্ষ | ১৩৩৭ সাল, জ্যৈষ্ঠ। | ২য় সংখ্যা।

শ্রীরাধার প্রেম

লেখক—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী।

শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা প্রেমের মূর্ত্তি। মাধুর্য্য-রসে রসময়ী শ্রীরাধার প্রেমই প্রকৃত প্রেম। শ্রীভগবানই একমাত্র পুরুষ। ভক্ত সেবক সেবিকারা সকলেই নারী, সেই নারীদের সমস্ত প্রেম এক হইয়া শ্রীরাধায় আশ্রয় করিয়াছেন। অথবা শ্রীরাধার প্রেমই সমস্ত নর-নারীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গোলকেও বৃন্দাবন আছে, শ্রীরাধা আছে। মর্ত্তে ভৌম বৃন্দাবনে প্রেমের স্বরূপ দেখাইবার জন্য শ্রীরাধার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাই পৌরাণিক বার্ত্তা।

শ্রীরাধা যমুনাকূলে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীর রব শুনিলেন। বাঁশরীর ঝঙ্কার একেবারে তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রীতে যাইয়া আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে মুখের বাঁশরীও বাজিয়া উঠিল। বহির্জগতের ধ্বনি অন্তরে আসিয়া লুপ্ত হইয়া গেল। শ্রীরাধা সেই ধ্বনি শুনিয়া ছুটিলেন। ত্রস্ত বেশে আলুথালু কেশে ছুটিলেন, সে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। অভিসারিকা ছুটে না, কামুকী ছুটে না, পতিপ্রাণা সাধ্বীর লজ্জা হয়, সে ছুটিতে পারে না। শব্দ লক্ষে শ্রীবিপিন কুঞ্জে আসিয়া শ্রীরাধা

দেখিলেন সম্মুখে নব নটবর বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি। শ্রীরাধা নয়ন ভরিয়া সেই অপরূপ রূপ দেখিলেন। মনে হইল, সমস্ত ইন্দ্রিয় কেন নয়ন হইয়াই দেখিল না, শ্রীকৃষ্ণ মিলনে শ্রীরাধা আত্মহারা হইয়া সব ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণে মন প্রাণ নিবেদন করিয়া বসিলেন।

শ্রীরাধা তরুণী, তরুণী ব্যতীত প্রেমের স্বাদ বুঝিবে না। তাই শ্রীরাধা তরুণী। শ্রীকৃষ্ণ আশ্চার্য্য হইবেন, তিনি ছয় কোনমতে আট বৎসরের বালক, ছয় বা আট বৎসরের শিশুর উপর তরুণীর প্রেম কাম গন্ধ বর্জ্জিত ও পবিত্রই হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ মিলনে বিহ্বলা শ্রীরাধা অন্য জীব হইয়া গৃহে ফিরিলেন। রাত্রে চমকিয়া উঠেন, ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, বনমাঝে কি মনমাঝে, ঐ বুঝি বাঁশী বাজে সখি! বাঁশরী বাজিতে বাজিতে বাঁশরী বাজিল কই, বলিয়া শ্রীরাধা সখীদের ক্রোড়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলে সখীরা জানিতে পারিল, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী হইয়াছেন। দূর হইতে যেন বাঁশরীর সুর বাজিল, আমি যাই, বলিয়া শ্রীরাধা উঠিতে চাহিলেন। সখীরা উন্মাদাবস্থায় ভাবিয়া শ্রীরাধাকে উঠিতে দিল না, শ্রীরাধা যেদিকেই চাহেন, সবই কৃষ্ণময়। শ্বেত রক্ত প্রভৃতি সমস্ত বর্ণই তখন কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আপনার গৌরক তনু খানিও যেন কালায় কালায় কাল হইয়া উঠিয়াছে। এ এক অপরূপ প্রেম, এ এক প্রাকৃত আকর্ষণ। গভীর রাত্রি—আঁধারে প্রকৃতির সারা অঙ্গ ছাইয়া আছে, বৃষ্টি মুসলধারে হইতেছে, হয়ত মাথার উপর বজ্র গর্জ্জিতেছে শ্রীরাধার সে সব দিকে হুঁস নাই। গুরু জনের তিরস্কার, সমাজের নিন্দা লোকের ঘৃণা, সে সকল কোন চিন্তাই নাই।

মিলনের পর বিরহ, বিরহের পর মিলন, মিলনের পর চির বিরহ, অথবা চির-মিলন, শ্রীরাধা মিলনে আত্মহারা আপনাকে ভুলে, জগৎ সংসার ভুলে। আবার বিরহেও আপনা হারা, তন্ময় সাগরে ডুবিয়া যান; তখন কোথা থাকে আপনি নারী, কুলবধূ, এ সব ভাবনা। "বিরহে তন্ময়ং জগৎ" হইয়া যায়।

বিরহ আইসে মিলনের জন্য। বিরহই মিলনের পরিপুষ্টি করে। বিরহ না থাকিলে মিলন বেশীদিন মধুর লাগে না। মিলনের মাদকতাও তেমন থাকে না। বহুদিন ব্যাপী মিলন শেষে বৈচিত্র্যশূন্য হয়, শেষে একঘেয়ে হইয়া দাঁড়ায়।

দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিবা, আবার রাত্রি, আবার দিবা। মিলনে

প্রেমের মধুর আস্বাদ মর্ত্তের সকল নরনারী পাইয়া থাকেন। বিরহেও ঐ আস্বাদ থাকে, তবে সে আস্বাদ প্রকৃত প্রেমিক প্রেমিকারাই ব্যতীত সকলে পাইতে পারে না। মিলনের পর যে বিরহ, সে বিরহের প্রথমাবস্থায় ঐ আস্বাদ নাই, কেননা তখন মিলনের আকাঙ্খা তখন প্রবল রহিয়াছে। স্পৃহা বলবতী আছে। সে সময়ে উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা রোমাঞ্চ দেখা যায়।

হা হুতাস, ক্রন্দন শেষে মূর্চ্ছা ঐ অবস্থাতেই দেখা যায়। "বিরহে তন্ময়ং জগৎ" প্রেমের পরিপক্কাবস্থাতেই হইয়া থাকে, তখন দেহ পড়িয়া থাকে, মন প্রেমময়ে মিশিয়া যায়। সে এক নূতন সমাধির অবস্থা রস ঘন নিবিড় দশা। সে তন্ময়তায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ এক হইয়া যায়। এ বিরহ প্রেমেরই অপার মূর্ত্তি। মিলনের মধ্যে যেমন প্রেমের মূর্ত্তি, বিরহের মধ্যেও তেমনই প্রেমের মূর্ত্তি। মিলন ও বিরহে যে প্রেমের স্বরূপ একই থাকে, সেই প্রেমই প্রকৃত প্রেম। উহা চন্দ্রকরের মত মধুর, অমৃতের মত সুস্বাদু, জলের মত স্বচ্ছ, ইন্দ্রনীলের মত শীতল ও গঙ্গোদকের মত পবিত্র। এ সমস্বেই ভেদের মধ্যে অভেদ, দ্যোতের মধ্যে অদ্বৈত। ইহার আস্বাদন এবং আস্বাদ্য, উপায় এবং উপেয়, ভাব এবং ভাবময়, এই প্রেমেই শ্রীকৃষ্ণ লাভের কারণ, এই প্রেমই কৃষ্ণময়, প্রেম যে প্রেমময়ের স্বরূপ হয়, তাহা সংসারে মাতৃ স্নেহের মধ্যে সতী রমণীর পতি ভক্তির মধ্যে এবং বন্ধুর নিঃস্বার্থ আত্ম ত্যাগের মধ্যেও কখন কখন ফুটিয়া উঠে। আত্ম বিলোপ সংপূর্ণ না হউক, কতকটা যে হইয়া থাকে, তাহা সংসারে যে একেবারেই মিলে না তাহা নহে।

এই প্রকৃত প্রেমে পৌঁছিবার পূর্ব্বে মিলন ও বিরহ, শেষে মিলন পুনর্ব্বার আবার ঐ মিলনান্তে বড় রকমের বিরহ আবশ্যক হয়। মিলন দুইটি, বিরহও দুইটি। বিরহ দুইটির মধ্যে প্রথমটিকে ছোট বিরহ, দ্বিতীয়টিকে বড় বিরহ বুঝিবার সুবিধার জন্য এই নাম করণ করিলাম।

বড় বিরহটি না বুঝিলে শ্রীরাধার প্রকৃত প্রেমের স্বরূপই বুঝা যায় না। বড় বিরহের ভিতরই শ্রীরাধার শ্রীরাধাত্ব। বড় বিরহটি কিরূপ তাহা ভাল-রূপে বুঝিতে হয়। বড় বিরহটি বুঝিবার জন্য মিলন ও ছোট বিরহ বোঝা আবশ্যক। হা হুতাশ, কৃষ্ণকে এনে দাও, বলিয়া সখীদের নিকট অনুনয় বিনয়, অশ্রুপাত ক্রন্দন ঐ সমস্ত প্রভৃতি ছোট বিরহেই দেখা যায়। শ্রীরাধার ছোট

বিরহও সংসারীর সাধারণ বিরহ অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের। শ্রীরাধার বড় বিরহের তুলনা বিশ্বে নাই। শ্রীকৃষ্ণ বক্ষঃস্থল বিহারিণী গোলোকেশ্বরী শ্রীরাধাতেই সম্ভব হইয়াছিল, এই বড় বিরহে যে বাহ্য প্রবিলয় থাকে, তাহা জানিয়া সমাধি অবস্থায় বাহ্য প্রবিলয় অপেক্ষাও মধুর। এই বাহ্য প্রবিলয়ে বহির্মুখ বৃত্তির খেলা নাই, স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, এ বোধ তখন লুপ্ত; তখন রসময়ের রস স্বরূপটী আপনার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। তখন হৃদয় সাগরে তরঙ্গ নাই, বাতাস নাই, কল্‌কল্ তর্‌তর্ গতি নাই। ভাব মহাভাবে মিশিয়াছে. প্রাণ মহাপ্রাণে মিলিয়াছে, প্রেম প্রেমময়ে আত্ম নিবেদন করিয়া দুই একাত্ম্যতা লাভ করিয়াছে। তখন অহং বৃত্তিটির কোন স্পন্দনই নাই।

তবে সংসার জাগে, আস্বাদ্যে আস্বাদ্য নাই, ইহা কি অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তটী শ্রীরাধার প্রেমের সার কি এই? এ অদ্বৈতের সহিত শ্রীরাধার একাত্মতার প্রভেদ আছে। প্রেমময়ের প্রেম আস্বাদন করার জন্য রস-সিন্ধুতে আত্মহারা হইয়া সাঁতার দিবার জন্য একটি মূর্খ অহং বৃত্তি এ অবস্থায় থাকে। আস্বাদন করার জন্যই কেবল ঐ অহং বৃত্তি, এই অহং বৃত্তিটি তথায় সুপ্ত হইয়া থাকে, লুপ্ত হয় না! সুখ অহং বৃত্তিটী মাত্র আস্বাদন করে। শ্রীরাধার মান অভিমান যাহা প্রথমাবস্থায় প্রেমের পরিপুষ্টির উপায় ছিল, সে মান অভিমানের খেলা, এই সুখ অহং বৃত্তির মধ্যে নাই। শ্রীরাধার অহং ভাব সংসারীর অহং ভাব এক বস্তু নহে, একই বিষ, বিষ ও ঔষধ একই অর্থ বন্ধনের কারণ, আবার মুক্তির (সাক্ষাৎ হউক পরম্পরা হউক) হেতু। লোক শিক্ষার জন্য জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যের অহং ভাব ছিল। ঐ অহং ভাবের জন্যই রামানুজাচার্য্য জীবন্মুক্তি স্বীকার করিতেন না।

শ্রীরাধার এই মহাভাব বড় বিরহের মধ্যেই পাওয়া যায়। তবে ইহার ছোট বিরহের মধ্যেও অপূর্ব্ব প্রেমের আস্বাদ আছে, তবে সংসারীকে বুঝাইবার জন্য সংসারির মত করিয়াই ইহার বর্ণনা করা হইয়াছে। কবি অলঙ্কার দিয়া শ্রীরাধার মিলন এবং বিরহ, বিরহান্তে মিলন অধিকতর মনোমহন করিয়া ফুটাইয়া দিয়াছেন মাত্র, তাহার ফলেই অভক্তদের সন্দেহেরও অবকাশ জন্মিয়াছে।

মিলন এবং ছোট বিরহের মধ্যে এমন ভাব আছে, যাহা স্থূল রক্ত মাংসময় দেহের সুখ দুঃখ ভরা হৃদয়-সমন্বিত মর্ত্তের নর-নারীর ভিতর নাই। গৌরাঙ্গী কোন্ সতী সাধ্বী স্ত্রী শ্রীরাধার মত আপনার অঙ্গ পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে, এইরূপ ভাবে আপনার সত্ত্বা হারাইয়া থাকেন!

পতি-পদতলে লতার মত সাধ্বী-স্ত্রী পড়িয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু পদতল স্পৃষ্ট ঐ মা হইবার আকাঙ্খা মনে প্রাণে কেহ কি পোষণ করেন? কোন্ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই প্রেমিকময় ভাবিয়া প্রকৃতই তদ্ভাবময় হইয়া থাকেন।

শ্রীরাধার প্রেম এক নূতন মাধুর্য্যময় তত্ত্বজ্ঞানেরই পরিপাকাবস্থা। ঐ প্রেম মিলন বিরহময় ঐ প্রেমের এক কণা পাইলেই বিশ্বের নর-নারী কৃতার্থ হইতে পারেন। প্রেমময় শ্রীভগবানের লীলা কে বুঝিবে?

শ্রীভগবান রসসাগর, রসসাগরের অমৃতবারি পানে কি সুখ, তাহা নিজে নিজে ত আর ভোগ করিতে পারেন না, অথচ ইচ্ছা হয় সে বারি পান করেন। তাই তিনি আপনাকে শ্রীরাধারূপে বিভক্ত করিয়া সেই অমৃত বারির আস্বাদ লইলেন। জীবরূপে যে আস্বাদ করেন, তাহা সিন্ধুর তুলনার বিন্দু পরিমাণ মাত্র। সে বিন্দুতে তিনি তৃপ্ত হইলেন না। আপনি আর একরূপে সম্যক্ তৃপ্তি লাভ করিতে চাহিলেন।

শ্রীরাধার প্রেম আদর্শ করিয়া জীবের বিন্দু পরিমাণও ক্রমে ক্রমশঃ মহৎ পরিমাণে পরিণত হইতে পারে, সে জন্যও শ্রীরাধার আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছিল। শ্রীভগবান্ আপনার গোলকেশ্বরী শ্রীরাধাকে দিয়া আপনার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, ইহা ভক্তের কথা নহে। জীবগণের কল্যাণ কামনা অবশ্য আছে, কিন্তু বড় কামনা তাঁহার নিজেরই আস্বাদন করার ইচ্ছা। তিনি যে এক হইয়াও নানারূপে লীলা করেন, বিহার করেন, তাহা ত কেবল ভোগ করার জন্যই। জীবও ভোগ করিবার জন্য পাগল, শ্রীভগবানও ভোগ করিবার জন্য আকুল। অবশ্য জীবের ভোগ এক, শ্রীভগবানের ভোগ আর জীবের বর্দ্ধন। শ্রীভগবানের লীলা। শ্রীভগবান্ ভোগ না করিলে জীবের ভোগ করার প্রবৃত্তি জন্মিত না। শ্রীরাধার প্রেম আস্বাদন করিয়া শ্রীভগবানের প্রেমের পিপাসা সম্যক্ মিটিয়াছিল, শ্রীরাধার ভিতর দিয়াই তিনি আপনার রসামৃত পান করিবার সুখ পাইয়া ছিলেন। শ্রীরাধা বলিয়াছি ত শ্রীভগবানেরই হ্লাদিনী শক্তি। হ্লাদিনী শক্তি তাঁহারই স্বরূপ। শ্রীরাধা শ্রীভগবানেরই অর্দ্ধাঙ্গ। ইচ্ছারূপা রসময়ী শক্তি-স্বরূপিনী শ্রীরাধার প্রেম শ্রীভগবানেরই প্রেম।

শ্রী শ্রীচণ্ডীমঙ্গল বা কালকেতু।

লেখক—শ্রীযুক্তরাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর।

একাদশ দৃশ্য—ধর্ম্মকেতুর গৃহ।

নিদয়া ও ধর্ম্মকেতু কাশীবাসে যাইতেছেন। নিকটে কালকেতু ও ফুল্লরা।

ধর্ম্মকেতু। (কালকেতুর প্রতি) প্রাণাধিক আর বাধা দিও না বাপ্, সংসারের জটিল জালে আবদ্ধ থেকে একদিনও সুস্থচিত্তে ইষ্ট চিন্তা করিবার অবকাশ পাইনি; মানুষের আশার আকাঙ্খার অবধি নাই। নিয়তই একটির পর একটি, একটির পর একটি আশাবিহ চিত্ত সাগরের উপর ভাসমান হচ্ছে। একটির বিলয় ঘটবা মাত্রই আর একটি উৎপন্ন হয়। যৌবনের শোণিতের ধারা ক্রমেই শীতল হয়ে আস্‌ছে। এখন প্রৌঢ়কালে ইষ্ট চিন্তাই শ্রেয়ঃ। তাই বলি বাপ্, আর ইষ্ট পথে বাধা দিওনা। সন্তুষ্ট মনে বিদায় দাও। (ফুল্লরার প্রতি) মা কুললক্ষ্মী, তোমাকে পুত্রবধু রূপে প্রাপ্ত হ'য়ে আমি স্বর্গ সুখ অনুভব কর্‌ছি। তোমরা একত্রে পরমানন্দে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন কর মা, আমরা পশুপতির শ্রীপাদপদ্মে এখন আত্ম সমর্পণ করিগে!

নিদয়া। বাবা কালু, মা ফুল্লরা, তোমরা সব আমার আঁধার ঘরের মাণিক, আমার নয়নের মণি! যাদুমণি তোমার কচিমুখ খানি দেখে এই চির দরিদ্র ব্যাধ জীবনে রাজার আনন্দ লাভ করেছি। আজ তোমাদিগকে ছেড়ে যেতে মন সরে না। তথাপি আমায় যেতে হ'বে। আমরা বিশ্বনাথের শ্রীচরণে আশ্রয় নিতে কাশীধাম যাত্রা করেছি। আর মায়ার গ্রন্থি দিওনা বাবা! (ফুল্লরার প্রতি) মা পতিই স্ত্রীগণের একমাত্র গতি, তপ জপ যাগ যজ্ঞ না করেও স্ত্রীলোকে একমাত্র পতির সেবা করেই মোক্ষলাভ করে। তুমি ত ঋষি মুনির এবং সাবিত্রী সতীর উপাখ্যান সব জান মা, এইটুকু সর্ব্বদা মনে রেখো যে, পতিই সর্ব্ব দেবময়। পতি সেবায় সকল দেবতারই পূজা হয়।

কালকেতু। মা, মা, আমি তোমা ছাড়া কখনো যে কোথায় একদিনও থাকিনি। এখন এই তোমা শূন্য গৃহে, তোমাদিগকে না দেখে কেমন করে থাক্‌বো মা! (রোদন)

নিদয়া। স্থির হও বাবা (চক্ষু মুছাইয়া দিলেন) যাবার সময় মন খারাপ করো না। যে কুললক্ষ্মী মাকে তোমার চিরদিনের সঙ্গী করে দিয়ে গেলাম, তাকে দেখেই আমাদের বিচ্ছেদ ভুলতে চেষ্টা করো। তুমি ত বাপ্ চির সুশীল; তোমার মাতৃভক্তি পিতৃ সেবা ব্যাধ কুলের আদর্শ।

নিদয়া।। তোমাকে অধিক কি বল্‌বো, মাতা পিতার মোক্ষ পথের সহায় হয়ে, সন্তুষ্ট মনে বিদায় দাও।

ফুল্লরা। (নিদয়ার কোমর ধরিয়া) মা, মা, (রোদন)

নিদয়া। বুঝেছি মা বুঝেছি। এতদিন সংসার সাগরের কর্ণধার হ'য়ে তরণী পরিচালিত করেছি। তুমি কেবল আমার আদেশ মতই মাঝির কাজ করেছ। আজ সকল বোঝাই তোমার মাথায় তুলে দিয়ে চলেছি মা, তোমার একমাত্র আশ্রয় স্বামী। বাল্যে স্ত্রীগণ পিতা মাতার অধীনে থাকে, যৌবনে ও প্রৌঢ়ে স্বামীর অধীনে থাকে, বার্দ্ধক্যে পুত্রাদির অধীনে জীবন যাপন কর্ত্তে হয়। তুমি ভাগ্যবতী। এখন স্বামী সুখে সুখিনী হ'য়ে "চির এয়ো" হও, এই মাত্র আমার আশীর্ব্বাদ। এই সিন্দুর কৌটাটি লও মা! এটি মা মঙ্গলচণ্ডীর প্রসাদী সিন্দুর। এর প্রসাদে তোমাদের সকল বিঘ্ন দূরে যাবে। (সিন্দুর প্রদান)

ধর্ম্মকেতু। চল নিদয়া, দয়া মায়া স্নেহ মমতা সব অন্তরে রেখে দুর্গা দুর্গা বলে বাম পদ বাড়াও। আর পশ্চাতে চেও না, চোখের জল ফেলো না, মায়ার পুতুল দুটিকে আর কাঁদিয়ো না।

(চক্ষু মুছিলেন)

নিদয়া। (ঊর্দ্ধে কর যোড়ে) মা ভবতারিণী, শঙ্করী, দাসীর কথা শুনো মা, তোমার রাঙ্গা চরণে সংসারে অনভিজ্ঞা. নিতান্ত মাতৃগত প্রাণ, এই বালক বালিকা দুটিকে রেখে গেলাম। দেখো মা, কৃপাময়ী! এদের পায়ে যেন কাঁটাটি না ফুটে।

কালকেতু। মা আমি ধনুর্ব্বাণ হস্তে তোমাদিগের যোজন পথ এগিয়ে দিয়ে আসি। এই অনুমতি দাও।

ফুল্লরা। আমিও সঙ্গে যাব মা!

নিদয়া। চল মা' চল বাবা, শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা

[সকলের প্রস্থান।

গান।

(আমি) শ্রীদুর্গা বলিয়ে, আছি পা বাড়ায়ে, শমনের শঙ্কা
যিনি আদ্যাশক্তি মাতা, জগত প্রসূতি, রাখিনা রাখিনা।
তাঁর নামে বিপদ রবেনা রবেনা।
(যখন) প্রলয়ে জগৎ একার্ণবে মগ্ন,
জনার্দ্দন হরি যোগনিদ্রা মগ্ন,
(তখন) নিদ্রারূপা তুমি, রাখিলে নিমগ্ন
নিরন্তর ধরা কিছুই ছিল না।
তোমার কৃপায় শেষে ধাতা হরি
সৃষ্টি কর্ম্ম রত হলেন মুরারী
বিশ্ব প্রায় ধরা উঠিল উপরি জীব সংঘ সৃষ্টি হইল গো নানা॥

দ্বাদশ দৃশ্য—বন মধ্যে।

শ্রীদুর্গার আবির্ভাব।

দুর্গা। পশুগণ! তোমাদের কাতর নিবেদন সকলই শুনতে পেয়েছি। কালকেতু তোমাদের নির্ম্মম ভাবে পীড়ন করছে। পশুগণ! কালকেতু ব্যাধ জাতিতে উৎপন্ন। পশুপক্ষী নিধন করা তার পিতৃ ব্যবসায়, তাই এতদিন ধরে সে পশুপক্ষীই হত্যা করছে। কিন্তু বৎসগণ, আর সে তোমাদিগকে পীড়ন করবে না। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে স্ব স্ব আলয়ে গমন কর।

(পদ্মার আগমন)

পদ্মা! কি মা!

দুর্গা। বনের মধ্যে শীঘ্র ঘন কুজ্ঝটিকা জাল সৃষ্টি কর। কালকেতু অই দেখ, শরাসন করে এইদিকেই আসছে। এস।

(তিরোভাব)।

(ধনুকের কোটিতে স্বর্ণগোধিকা বাঁধা, ডান হাতে একটি শর, কাণে কুণ্ডল, মাথার চুল উচু করিয়া বাঁধা এই অবস্থায় কালকেতুর প্রবেশ।)

কালকেতু। আশ্চর্য্য! বনে একটাও পশু পক্ষী দেখ্ছি না, আরও পরমাশ্চার্য্য ফাল্গুন মাস, বসন্ত কাল, তবু বন-ভূমি কোয়াসায় ঘেরা। সমস্ত কানন যেন নীলাম্বরী পাতলা সাড়ীখানি পরে দাঁড়িয়ে আছে। আস্বার সময় দক্ষিণে গাভীর পাল চলে গেল। ব্রাহ্মণগণ প্রফুল্ল পুষ্প-সাজি ভরে নিয়ে গেলেন। গোয়ালিনী দধির ভাণ্ড মাথায় করে দধি দধি হাঁক্তে লাগ্ল। কিন্তু এসকল শুভ চিহ্ন দেখে কি হবে, পথের মাঝে এই স্বর্ণ-গোধিকাটাই সব মাটী করে দিলে। (সোনা গোধা দেখিয়া) আচ্ছা আচ্ছা তোমাকে শিক পোড়া কর্বো যদি আজ হরিণ না পাই (পরিভ্রমণ) অই যে একটা বরাহ। পল্বলে পড়ে মুস্তার মূল ভক্ষণ কর্ছে! (শরাসনে শর সন্ধান করিয়া) ঠিক্ হ'য়েছে (শরত্যাগ ; দৌড়িয়া গমন, শূন্য হস্তে পুনরাগমন) না না ওটা বরা নয়, আমারই ভুল। শুক্নো গাছের গুঁড়ি! অই যে একটা হরিণ শিশু পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে রয়েছে নয়? ভাল দেখাও যায় না, ঘন কুয়াশা। কাছে গিয়ে দেখ্তে হ'ল। [বেগে প্রস্থান।]

কালকেতুর পুনঃ প্রবেশ।

কালকেতু। হায় কি দৃষ্টি বিভ্রম! অথবা দৃষ্টির ভুলই বা কিসে বলি? প্রত্যক্ষ হরিণ দেখ্লাম। শর সন্ধান করেছি, এমন সময় দেখি একটি ভীল কন্যা। ভীলের কন্যা অতি প্রভাতেই ঝরণায় জল নিতে এসেছে। কি সুন্দর তার চক্ষু দুটি! যেন হরিণ শিশুর চক্ষু! আশ্চর্য্য রূপ! অমন অপূর্ব্ব রূপ মাধুরী মানুষের হয়, এ আমার জানা ছিল না। আজ এই বসন্ত কালের নির্ম্মল প্রভাতে কুয়াশাচ্ছন্ন বনভূমে, ঝরণার পাশে ভীল কন্যার কি অতুলনীয় সৌন্দর্য্যই না দেখ্লাম্। (পরিভ্রমণ) আস্বার সময় আদরিণী ফুল্লরার বিশুষ্ক মুখখানি দেখে বড়ই ব্যথা পেয়েছি। কতদিন প্রেমময়ী ফুল্লরা আমার উপবাসে কাটিয়েছে। আমায় জান্তেও দেয়নি। নীরবে আমার

মুখপানে নীল তারা দুটি প্রসারিত করে স্থির দৃষ্টিতে আমাকেই দেখেছে। আমি হেসে বল্লেম্ "আমাকে দেখে কি পেট ভরবে ফুলি?" পতি প্রেম গরবিণী ফুল্লরা আমায়, একটু হেসে বল্লে—"ওগো তোমার মুখখানি দেখে আমি ক্ষুধা তৃষ্ণা সবই সইতে পারি।" আহা হা প্রেয়সী আমার! তুমি কত আশা করে ব'সে আছ যে, স্বামী কত পশুই আন্‌বে কিন্তু সব বৃথা। কুয়াশাবৃত বনে কু-আশার কি পরিণাম! ক্রমেই সূর্য্যদেব উৰ্দ্ধে উঠ্‌ছেন। বেলা হ'য়েছে, কিন্তু কুয়াসার জন্য তা জানা যায় না। অহো ক্রমেই ক্ষুধানল প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠ্‌লো! আজ কি কুক্ষণেই যাত্রা করেছিলেম, একটি পাখীও মার্‌তে পারলেম না। দিবারাত্রি হিংসা কর্ম্মে লিপ্ত আছি, তাই বুঝি মা মঙ্গলচণ্ডী কুপিত হ'য়েছেন। কি কর্‌বো মা, তুমিত সবই জানো। আমাদের যে কিছুই নাই, মা, পিতা কি করে যে আমাদিগকে প্রতিপালন কত্তেন তাই ভাবি। (করযোড়ে) মা মঙ্গলে! ফুল্লরার এ কষ্ট আর দেখ্‌তে পারিনা। তুমিত জগতের মা, তবে অধম ছাওয়ালকে এত কেন কষ্ট দিচ্ছ মা! ওঃ ক্রমেই পিপাসা বাড়ছে। যাই, কংসা নদীর জল পান করিগে। [প্রস্থান।

(পদ্মার সহিত চণ্ডীর আবির্ভাব)

পদ্মা। কত লীলাই জান মা পাষাণ কন্যা, কালকেতু ব্যাধের ধনুকে তুমি সুবর্ণময়ী গোধিকা রূপ ধারণ ক'রে বদ্ধ আছ, আবার কলিঙ্গ রাজার কন্যা হ'য়ে তাকে বাৎসল্য স্নেহের সাগরে ভাসাচ্ছ! তোমার লীলা তুমি ভিন্ন আর কে বুঝ্‌বে লীলাময়ী! আজ কালকেতুর উপর তোমার এত অকৃপা কেন মা? সে ত তোমারই ভক্ত বানবের পুত্র।

চণ্ডী। তা বটে পদ্মা, সে আমার প্রিয় ভক্ত ইন্দ্র-সন্তান নীলাম্বর এ জন্মে সে কালকেতু হ'য়েছে, কিন্তু স্বর্গীয় বৈভব কিছুমাত্র আন্‌তে পারেনি।

পদ্মা। আন্‌তে না পারা ও তোমারি দয়া! যোগভ্রষ্ট যোগীও পরজন্মে অন্ততঃ পক্ষে জাতি স্মরত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কালকেতু খাঁটি ব্যাধ একটুও দৈবী তাতে নেই।

চণ্ডী। তা সত্য পদ্মা, সভ্যতাভিমানী শিক্ষিত মানব অপেক্ষা এই কালকেতু চরিত্র সম্বন্ধে কত উন্নত কত উত্তম তা তো দেখ্‌ছো, আরও দেখ্‌বে। যাঁরা "অসভ্য ব্যাধ" বলে একে ঘৃণা করে, তাদের কলুষিত দেহের ছায়াও কালকেতুর নিকট দাঁড়াতে পারে না। আজ কালকেতুর বড়ই পরীক্ষার দিন। দেখ্‌বো তার অসাধারণ তেজ, দৈবী জ্যোতিঃ অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল!

পদ্মা। (হাস্য করিয়া) কিন্তু মা, তোমার ঐ যে চারিটি পায়ে শক্ত ক'রে ধনুকে বেঁধেছে, মাথাটি ঝুল্‌ছে, লেজ দুল্‌ছে, এদৃশ্যটি দেখবার বটে। বাবাকে এ দৃশ্যটি দেখাইগে।

চণ্ডী। দোহাই পদ্মা, এ সংবাদটী যেন কাকে বকেও টের না পায়। ভোলানাথ এ দৃশ্যটি দেখ্‌লে দিবারাত্র আমায় ক্ষেপাবেন চল্ তোকে শতেশ্বরী হারগাছি দিইগে।

[উভয়ের তিরোধান।

ত্রয়োদশ দৃশ্য—কংসানদীর তীর।

(ক্ষুধার্ত্ত কালকেতু শয়ান)

কালকেতু। হায় দারিদ্র! তুমি কি কঠিন! কি নির্ম্মম। দরিদ্রের সতত সম্বল চিন্তাই তার সকল উন্নতির অন্তরায়। মনে কতই উচ্চাকাঙ্ক্ষা সাগরের উচ্চ তরঙ্গের মতই উদিত হয়, কিন্তু তারা স্থায়ী হয় না। আবার তারা তরঙ্গের ন্যায়ই জলে বিলীন হ'য়ে যায়। এই বিশাল ভুজদণ্ড কত অদ্ভুত আশা, আকাঙ্খা শক্তি নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা তা নয়; তাই পশু পক্ষীর অমূল্য প্রাণ হরণ করেই কাল কাটলো! হায় দারিদ্র! তুমি বিক্রমশালী শার্দ্দূলকে মূষিকে এবং গরুড় পক্ষীকে পেচকে পরিণত কর। তোমার নির্দ্দয় পেষণে প্রতিভা সম্পন্ন পণ্ডিতও একটা নিতান্ত অজ মূর্খে পরিণত হয়, এবং দৈবীশক্তি যুক্ত কবি দারিদ্রের জ্বালায় মূর্খ ধনবানের স্তাবকের আসন গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট হয়। তাই বলি দারিদ্র! তুমি কি ভীষণ। কি নির্ম্মম! বেলা যায়। সারাদিন

বনে বনে ভ্রমণ করে নিতান্তই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। আর শিকারে ক্ষমতা নাই, ইচ্ছাও নাই। কেননা যাঁর ইচ্ছায় এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটী জীব উদর পূর্ণ করে আহার্য্য প্রাপ্ত হয়, কেউ অভুক্ত থাকে না। তাঁর ইচ্ছায়ই আজ বনভূমি কুয়াসাচ্ছন্ন আর আমার বাহুও শক্তি শূন্য। আর কি করা যায়, সকল অনর্থের মূল এই সোণা গোধাটাকেই শিকপোড়া করিগে। »

[প্রস্থান।]

পদ্মার প্রবেশ।

পদ্মা। ও বাবা, শুধু বাঁধা ধরা নয়, এ যে সর্ব্বনাশ শিক্ পোড়া! কে ঠকাতে এসে নিজেই ঠক্‌ছো বুঝি। শুধুতো শাপ দেওয়া নয়, ঠাকরণ, নিজেও বাপ্ বাপ্ করে পালাতে হয়। মা আমার শতেশ্বরীর লোভ দেখালেন। কিন্তু বাবাকে এ সংবাদ জানিয়ে সুখ পাবো, শত শতেশ্বরী হার পেলেও তেমন সুখ কি হবে। যাই ত্বরা কৈলাসে গিয়ে শুভ সংবাদটা প্রচার করিগে। কি নন্দিন, মা যে এবার শিক্‌পোড়া হ'লো। [প্রস্থান।

কে জান্‌তে পারে?

লেখক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

[রামপ্রসাদী সুর

বল্ মা তোরে কে জান্‌তে পারে।
যে কাতর প্রাণে ডাকে তোরে, তুই কি থাক্‌তে পারিস্ ছেড়ে তারে॥
সে দীনের দীন হয়ে পায়ে ধরে, সব গেলেও ছাড়েনা তোরে॥
বিষয় মদে মত্ত যারা, ঘোরে সদাই ভব ঘোরে:—
তারা বিষের জ্বালায় জ্বলে মরে, দেখ্‌তে পায় না মা তোমারে॥
অনন্ত রূপিণী তুমি, কে তোমারে জান্‌তে পারে:—
সরল শিশুর মতন, ডাকে যে জন, তুমি কোলে তুলে নাও মা তারে।
সংসার যার শ্মশান হয়েছে, ভাই বন্ধু সবাই গিয়েছে,
সে হতাশ হয়ে কাঁদলে পরে, আয় আয় বলে ডাকিস্ তারে॥

সৌভরি ঋষির উপাখ্যান।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর।

এই সংসারে দুষ্পূরনীয়া বাসনার একেবারে ক্ষয় হয় না। মানবগণ ইন্দ্রিয়ের দাস। ইন্দ্রিয়গণই মানবকে পরিচালিত করিয়া দুঃখময় সংসারে পরিভ্রামিত করিতেছে। যোগী ঋষিগণও যে সময় সময় কামনার মোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া বহুদিনের কষ্টোপার্জ্জিত তপস্যার ক্ষয় করেন, তাঁহাদেরও যে চিত্ত বিভ্রম উপস্থিত হইয়া কামিনীর কমনীয় মুখকমলই সংসারের সার বলিয়া মনে হয় এবং কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা যে কামনার নাশ হয় না। পুরাণে এতৎ প্রসঙ্গে মহর্ষি সৌভরির উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

যুবনাশ্ব তনয় মান্ধাতার পঞ্চাশৎ কন্যা বিবাহ যোগ্যা হইয়াছে। রাজা কন্যাগুলিকে কাহাকে সম্প্রদান করিবেন, এই চিন্তায় চিন্তিত আছেন। এদিকে যমুনার জলে সমাধিগ্রস্ত মহর্ষি সৌভরি, একদা দেখিলেন যে, সম্মদ নামক বহু সন্তানবাণ অতি বৃহৎ মৎস্য পুত্র, পৌত্র, কলত্র, দুহিতা ও দৌহিত্রগণ পরিবৃত হইয়া পরমানন্দে খেলা করিতেছে। তাহা দেখিয়া ঋষির মনে হইল, "আমিও বিবাহ করিব। তাহা হইলে আমারও বহু পুত্র কন্যা জন্মিবেক। ঐ সকল পুত্রের বিবাহ দিলে তাহাদেরও বহু সন্তান সন্ততি হইবে। তখন আমি তাহাদের সহিত এই মৎস্য রাজের ন্যায় আনন্দে দিবারাত্রি ক্রীড়া করিব।"

এই প্রকার সুখ চিন্তায় মহর্ষির ধ্যান ভঙ্গ হইল। বহুদিনের সঞ্চিত তপোফল সঙ্গে লইয়া মহর্ষি জল মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া মান্ধাতার নিকটে গমন করিলেন। রাজা পাত্রমিত্র অমাত্যগণসহ সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। মহর্ষি তথায় যাইয়া "জয়োহস্তু" বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

মূর্ত্তিমান তপঃ স্বরূপ তপস্বী সৌভরিকে দর্শন করিয়া স্বগণ পরিবৃত মান্ধাতা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং দূর্ব্বাক্ষত পুষ্প গন্ধাদি সমন্বিত জল গ্রহণ পূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। মহর্ষি আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "রাজন্ ককুস্থে-কুলে তোমার জন্ম, তুমি অতি পুণ্যবান্।

তোমার কুলে কেহ কখনও যাতকগণকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই। আমি কন্যার্থী হইয়া তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি। তোমার পঞ্চাশৎ

কন্যার যে কোনও একটি আমাকে প্রদান কর। আমি বিবাহ করিব।"

সৌভরি ঋষির মুখে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। ঋষির শরীর জরায় জর্জ্জরিত, চর্ম্ম শিথিল, কেশ কলাপ শুভ্রবর্ণ। আবক্ষ বিলম্বিত শ্মশ্রুরাশিও শুক্ল। চক্ষুর পক্ষরাজি চক্ষুকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বদন মণ্ডলে লালিত্য নাই! দেহে শক্তি নাই, মুখ-গহ্বরে দণ্ড নাই। এই প্রকার অতি স্থবির বৃদ্ধ বরে কোন্ পিতা কন্যা সম্প্রদান করিতে পারে? রাজা ভাবিতেছেন হায়! হায়! কাহার মুখ দেখিয়া আজি শয্যা ত্যাগ করিয়াছি। জানিনা আমার ভাগ্যে কি আছে। অবশেষে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "মহর্ষে! আপনি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়া আমার নিকট কন্যা প্রার্থনা করিতেছেন, ইহা আমার সৌভাগ্য, কিন্তু আমাদের বংশে একটি কুলপ্রথা আছে যে, কন্যারাই পাত্র নির্ব্বাচিত করে। যদি তাহাদের অভিমত হয়, তবেই আপনার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে নতুবা নহে।"

মহর্ষি কহিলেন, "অহো বুঝিলাম, ইহা প্রত্যাখ্যানের একটা ছল বটে! আমি বৃদ্ধ জরাতুর দেহ. আমাকে দেখিয়া বৃদ্ধা বা প্রৌঢ়া রমণীই ঘৃণা করে, নব যৌবনদ্ধতা তরুণীরা ত করিতেই পারে। আচ্ছা তবে তাহাই হউক। হে রাজন্ আমাকে একবার কন্যাগণের অন্তঃপুরে প্রবেশের অনুমতি কর। যদি কন্যাগণ ইচ্ছা না করেন, তবে আমি আর দার পরিগ্রহ করিব না।"

রাজা সানন্দে কন্যান্তঃপুরের রক্ষক বর্ষবরকে আজ্ঞা দিলেন, "যাও এই ঋষিকে কন্যাগণের গৃহে লইয়া যাও। বলিও, তোমাদের যাহার ইচ্ছা ইহাঁকে পতিরূপে বরণ করিলে আমার কোনই আপত্তি থাকিবে না। ইনি আমার নিকট কন্যার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন। আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যদি আমার কোনও কন্যা আপনাকে সেচ্ছায় বরণ করে, তাহা হইলে আমি সেই কন্যার প্রতি-কূলাচরণ করিব না।"

বর্ষবর রাজাজ্ঞা প্রাপ্তে মুনিকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজার কথা কন্যাগণকে বিজ্ঞাপিত করিল। কন্যাগণ সবিস্ময়ে দেখিল যে, সাক্ষ্যাৎ মন্মথদেব তাহাদের নিকটে রহিয়াছেন। মহর্ষি কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ কালেই মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। যোগবলে সকলই সম্ভব হয়। কন্যাগণ দেখিল, নব যৌবন সম্পন্ন কুমার সদৃশ রূপবান পতি আগমন করিয়াছেন। তখন সকলে "আমি অগ্রেই ইহাঁকে দেখিয়াছি বলিল।" কেহ বলিল "ইনি আমার প্রতি অনুরক্ত" অপর কেহ বলিল, "ভগিনি তোমরা ক্ষান্ত হও। ইনি যখন

গৃহে প্রবেশ করেন, তখনই আমি ইহাঁকে বরণ করিয়াছি।" অন্যে কহিল, "তোমরা বৃথাই চেষ্টা করিতেছ। ইনি তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতেছেন না। আমাকেই সানুরাগ লক্ষ্য করিতেছেন। তোমরা নিবৃত্তি হও।" এই কথা বলিতে বলিতে ক্রমে ক্রমে মহা বিবাদ উপস্থিত হইল। তখন রূপের বর্ণনা আরম্ভ হইল। কেহ বলিল, "তোর নাক চেপ্টা" কেহ বলিল, "আমার রঙ ফর্সা তুই কালো" কেহ বলিল, "ওলো চিরুণী দাঁতী তোর যে বিয়ে কর্‌বার বড়ই সাধ দেখি, চোখ দুটো যেন পিট্ পিট্ কর্‌ছে। বিড়ালাক্ষি তুই থাম।" এইরূপে মুখোমুখী ঝগড়া আরম্ভ হইয়া হাতাহাতিতে পরিণত হইল। তখন মহর্ষি সহাস্য বদনে কন্যাগণকে বলিলেন, "তোমরা কলহ করিও না। আমি তোমাদের সকলকে গ্রহণ করিলাম।"

কন্যাগণ মহানন্দে ঋষিকে বরণ করিলে, বর্ষবর রাজাকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন, "কি বলহে" "আশ্চর্য্য ব্যাপার যে" "আমি এক্ষণে কি করিব?" এই প্রকারে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। মহর্ষি সৌভরি মহানন্দে কন্যাগণকে আশ্রমে লইয়া গেলেন, রাজার অন্তঃপুর নিস্তব্ধ হইল।

তখন মহর্ষি বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া সেই সুবিস্তীর্ণ কাননে শত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলেন। প্রতি কন্যার জন্যই পৃথক্ পৃথক্ অট্টালিকা, পৃথক্ রন্ধন শালা, গোশালা, অশ্বশালা, হস্তীশালা, নাট্যমন্দির, হরিমন্দির, অতিথি শালা, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, পক্ষীগৃহ, পশ্বালয়, পুষ্করিণী ও গড় নির্ম্মিত হইল।

সুনির্ম্মল জলপূর্ণ সরোবরে কুমুদ কহ্লার শতদল সহস্রদল প্রভৃতি পুষ্প নিকর প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবরের শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। মান্ধাতার কন্যাগণ স্ব স্ব গৃহে পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন। মহর্ষির আজ্ঞায় অনপায়ান্দ (অসীম সুখ দাতা) নামক এক মণি সেই সকল গৃহে বিরাজ করিতে লাগিল। কন্যাগণ সকলেই সর্ব্বক্ষণ স্বামীকে নিকটে পাইয়া পরমানন্দ নীরে নিমগ্ন হইতে লাগিল।

একদা কন্যা স্নেহে অবশচিত্তে রাজা চিন্তা করিতেছেন যে, সেই জরাক্রান্ত ঋষি আমার প্রাণাধিক প্রিয় কন্যাগণকে কুটীরে লইয়া গিয়াছেন। হয়ত তাহারা বন্য কষায় ফল ভোজনে কতই কষ্টে কালাতিপাত করিতেছে। ইহা ভাবিতে ভাবিতে তিনি সৌভরির আশ্রমে উপনীত হইলেন।

রাজা দেখিলেন দিপ্যমান তেজোময় স্ফটিক গঠিত অচলাকার অট্টালিকা সমূহ সেই নিবিড় কাননকে নগরে পরিণত করিয়াছে। তাহাতে মনোহর উপবন, সরোবর, দেবালয় প্রভৃতি বিরাজ করিতেছে। পিতাকে দর্শন করিয়া একটী কন্যা দৌড়িয়া নিকটে আসিল, এবং পায়ের ধূলি মাথায় লইয়া পিতার হস্ত ধারণ করতঃ প্রাসাদে প্রবেশ করিল।

কন্যাকে স্নেহালিঙ্গন করিয়া রাজা আসন গ্রহণ করিলেন। পরে কহিলেন, "তোমাদের সব কুশলত? তোমাদের মনে কোনও অসুখ নাইত মা? মহর্ষি তোমাদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন? তুমি কি জন্মভূমির কথা স্মরণ কর?" এই সকল নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কন্যা উত্তর করিল, "পিতঃ আপনাদের প্রসাদে এখানে সকল প্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য পরিধেয় শয্যা ও যান বাহনাদি পাইয়াছি, কিন্তু জন্মভূমির কথা কে বিস্মৃত হইতে পারে? আপনি এবং জননী আমার স্মৃতিপথে সর্ব্বক্ষণই জাগ্রত রহিয়াছেন। আপনার কথা মনে হইলে এত সুখও অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। আমার মনে আর একটি দুঃখ এই যে, স্বামী আমার গৃহেই সর্ব্বক্ষণ থাকেন, অন্যান্য ভগিনীগণ মনের দুঃখে কাল যাপন করে, ইহাতে আমার বড়ই কষ্ট হয়।"

তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মান্ধাতা অন্য কন্যার নিকটে গিয়াও তাহার সুখ দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেও উক্ত প্রকার বলিয়া শেষে বলিল, "আমার কোনই কষ্ট নাই পিতঃ! কেবল দুঃখ এই যে, স্বামী আমার গৃহেই সর্ব্বদাই অবস্থান করেন, ইহাতে ভগিনীরা দুঃখিতা আছেন, ইহাই আমার দুঃখের কারণ।

রাজা অন্য কন্যার গৃহে গমন করিয়া তাহার সুখ দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেও উক্ত প্রকার কহিলে রাজা অতিশয় বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, "মহর্ষির যোগবলে সকলই সম্ভব। এক দেহ শতধা বিভক্ত করিয়া যিনি সকলেরই মনোরঞ্জন করিতে পারেন, তিনি দেবতা। এতাদৃশ ব্রহ্মর্ষিকে প্রত্যাখ্যান করিলে সর্ব্বনাশ হইত। যাহা হউক কন্যাগণ যে সুখে আছে, ইহাই আমার সান্তনার কারণ।

তৎপরে নরপাল মহর্ষির সমীপে গমন করিলেন। নির্জ্জনে তিনি কুশাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। শ্বশুর মহাশয়কে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান করিলেন। রাজা যথা সঙ্গত উত্তর করিয়া পরে কহিলেন, "আপনার এই সুগ্রহান সিদ্ধি প্রভাব দর্শন করিলাম। অপর কোনও ঋষির এ প্রকার বিলাস বিভব আমি দর্শন

করি নাই। আমার বিশ্বাস আপনার তপোবল ইহা অপেক্ষাও অধিক। ইহা ত সামান্য মাত্র। এই সকল বলিয়া ঋষিকে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তাঁহার নিকট কিছুকাল বিষয় সুখ উপভোগ করিয়া স্বপুরে প্রত্যাবৃত হইলেন।

কালক্রমে সেই সকল রাজকন্যার গর্ভে সৌভরির একশত পঞ্চাশটি পুত্র জন্মিল। সৌভরির প্রতিদিন সেই সকল পুত্রাদির প্রতি স্নেহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি অনুক্ষণ ভাবিতেন, "আহা সন্তানেরা আমার হাঁটিতে পারিবে ইহারা কি যুবা হইবে? ইহাদের বিবাহ কবে দিব? আহা পৌত্র সঙ্গে কি আমি ক্রীড়া করিতে পাইব? এমন দিন আমার কবে হইবে?" এই প্রকারে একটির পর একটি, একটির পর একটি করিয়া চিন্তারাশি আসিতে লাগিল।

ক্রমে সৌভরি সন্তানগণকে যুবা দেখিয়া বিবাহ দিলেন। তাহাদের সন্তান জন্মিল। তাহা দেখিয়া সৌভরির আনন্দের সীমা রহিল না। আবার ভাবিতে লাগিলেন, "ইহারা কবে বড় হইবে? কবে আমাকে 'দাদা মহাশয়' "দাদু" 'ঠাকুরদাদা বলিয়া কোলে উঠিবে? কবে আমি উহাদের সঙ্গে খেলিব। এই সকল নানা চিন্তায় চিন্তার সূত্র বাড়িতেই লাগিল। তখন ঋষি কহিলেন—

"অহো মে মোহস্যাতি বিস্তার,
মনো রথানাং ন সমাপ্তি রস্তি
বর্ষা যুতেনাপি তথাব্দ লক্ষৈঃ
পূর্ণেষু পূর্ণেষু পুনর্ণবানাম্
উৎপত্তয়ঃ সন্তি মনো রথানাম্॥"

বিষ্ণুপুরাণম্।

"অহো! আমার মোহের কি বিস্তার! অযুত অথবা লক্ষ লক্ষ বৎসরেও মনোরথের সমাপ্তি হয় না, কতকগুলি মনোরথ পূর্ণ হইলে আবার নূতন মনোরথ সকল উৎপন্ন হয়।"

আমার পুত্রগণ বড় হইল, বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিল, ইহা ত দেখিলাম। এক্ষণে আমার মনে হইতেছে, পৌত্রগণের সন্তান দেখিব। আবার যদি তাহাদের সন্তান দেখিতে পাই, তবে মনে হইবে, প্রপৌত্রগণের পৌত্র দেখি। এই প্রকার মনোরথ সমূহের অন্ত নাই। হায়! হায়! জলবাস সহচর মৎস্য সঙ্গে আমার সমাধি বিনষ্ট হইল। যাহার চিত্ত মনোরথ সমূহে আসক্ত, তাহার মন কখনই পরমাত্ম-সঙ্গী হইতে পারে না। আমার স্ত্রী গ্রহণ আসক্তির জন্য, একে ত শরীর গ্রহণই এক দুঃখ, আমার সেই

দুঃখ, রাজকন্যাগণের পরিগ্রহে একশত পঞ্চাশটীতে পরিণত এবং বহু সন্তান রূপে তাহা আরও বহুল হইয়াছে। পুত্রের পুত্র সমূহ আবার তাহাদেরও পুত্র সমূহ আবার তাহাদেরও বিবাহ দ্বারা আমার মমতা আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। আমি জলবাস করিয়া যে তপশ্চর্য্যা করিলাম, তাহার প্রসাদে এই সকল সম্পদ। অহো মৎস্য সঙ্গে তপস্যার বিঘ্ন স্বরূপ আমার যে পুত্রাদির প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হইল তাহাতেই আমি বঞ্চিত হইলাম। নিঃসঙ্গতাই যতিগণের মুক্তির কারণ। সঙ্গ হইতে অশেষ বিধ দোষ উৎপন্ন হয়। যাহার যোগ পূর্ণ হইয়াছে, সে ব্যক্তিও সঙ্গ দোষে অধঃপাতে যায়। যাহার সিদ্ধি অল্প তাহার ত কথাই নাই।

পরিগ্রহ রূপাগ্রাহে আমার বুদ্ধি আক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমি সেই দোষ হীন হইয়া যে, প্রকারে পুনর্ব্বার পরিজনের দুঃখে আর দুঃখী না হই। সে প্রকারে আত্মোদ্ধারের আচরণ করিব। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি শ্রীহরির স্মরণ লইলেন। পুত্র কলত্র গৃহাসন অট্টালিকা পরিচ্ছদ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া বন গমন করিলেন।

রৌদ্র সেবনের উপকারিতা।

আমাদের দেশে শীতকালে রোদ পোহান একটি সাধারণ প্রথা। এই রৌদ্র সেবনে যে শুধুই শীত নিবারণ হয় তাহা নহে, ইহা দ্বারা শরীরের নানাবিধ ব্যাধিরও উপশম হইয়া থাকে। ইউরোপে রৌদ্র বিরল বলিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইলেক্‌ট্রিক্ আর্ক ল্যাম্প, মার্কারি ভেপার ল্যাম্প, টঙ্গষ্টেন আর্কল্যাম্প, প্রভৃতির সাহায্যে কৃত্রিম রৌদ্র উৎপাদন করিয়া রোগীগণকে সেবন করানো হইয়া থাকে। আজ কাল ক্ষত চিকিৎসাদিতে যে অলট্রা-ভায়লেট্ রশ্মির প্রয়োগ করা হইতেছে, তাহা রৌদ্রের মধ্যে বিদ্যমান আছে। প্রভাতের বাল-সূর্য্যের কিরণে এই অলট্রা-ভায়লেট্ রশ্মি বহুল পরিমাণে থাকে। সমুদ্রোপকূলে ও পর্ব্বত শিখরে এই অলট্রা-ভায়লেট্ রশ্মির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সূর্য্য কিরণে এই অদ্ভুত শক্তি-সম্পন্ন রশ্মি আছে বলিয়াই সূর্য্যের এত আদর। বাস্তবিক একদিন এই সূর্য্যের প্রকাশ না হইলে জগতের যে কি অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন; আঁধার আর্দ্র ভূমিতে প্রতিক্ষণে যে সকল জীবাণুর উদ্ভব হইতেছে, তাহা একমাত্র এই সূর্য্য-কিরণেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। রাত্রের অন্ধকারে যে সকল জীবাণুর উৎপত্তি

হয়, প্রভাতের সূর্য্য-কিরণ সম্পাতে তাহাদের বিনাশ ঘটিয়া থাকে, এবং প্রাভাতিক কিরণে তাহাদের কতকাংশ ধ্বংস প্রাপ্ত না হইলেও সারা দিবসের প্রখর কিরণে তাহারা আর জীবিত থাকিতে পারে না। এমন কি যক্ষ্মার বীজাণুও সূর্য্যালোকে ও বাতাসের নিকট তিষ্ঠিতে পারে না। সূর্য্যোদয় না হইলে এই সকল জীবাণুর ধ্বংস হইত না এবং লোকের জীবন ধারণ করাও সঙ্কট হইয়া উঠিত। আমাদের দেশে প্রত্যহ কাপড় চোপড় এবং লেপ, কাঁথা, বালিশ প্রভৃতি শয্যা দ্রব্য যে রৌদ্রে শুকান হয়, তাহার উদ্দেশ্য সেগুলিকে সহজে এবং সুন্দররূপে বীজাণু হইতে মুক্ত করা মাত্র। এ বিষয় সাধারণে অবগত না হইলেও প্রচলিত রীতি অনুসারেই করিয়া থাকে।

সূর্য্যোদয়ের সহিত প্রকৃতির প্রফুল্ল ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে সূর্য্যের প্রকাশ হয় না বলিয়াই এই সময়ে যকৃৎ ও প্লীহার ক্রিয়ার বিশেষ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। বর্ষাকলে যে মানসিক অবসাদ ও আত্মহত্যার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহার মূলে এই সূর্য্যালোক। সূর্য্যের সহিত মানসিক প্রফুল্লতার অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। রৌদ্র চিকিৎসার হাঁসপাতাল সমূহে দেখা গিয়াছে যে, বিশেষরূপে পীড়িত রোগীগণকে কিয়ৎকাল রৌদ্র সেবন করাইলে তাহাদের মানসিক ক্রিয়ার উৎকর্ষ হইয়া থাকে। তাহাদের মস্তিষ্কের জড়তার অপলাপ ঘটে এবং তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয়।

প্রতীচ্যে রৌদ্রের আদর থাকিলেও সাধারণের মধ্যে রৌদ্রের রোগোপশমক ক্রিয়ার বিষয় বোধ হয় বিশেষ কিছু গোচর ছিল না। সর্ব্ব প্রথম বৈজ্ঞানিক ফিন্‌সেন্ ইহার বিষয় বিজ্ঞান জগতে প্রকাশ করিয়া দেন। সম্প্রতি রোলিয়ার সাহেব বহু পরীক্ষা ও গবেষণার পর রৌদ্রের বিশেষ বিশেষ ব্যাধি নিরাময়ের ক্ষমতা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আশ্চার্য্যের বিষয়, প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরা রৌদ্রের গুণের বিষয় অবগত ছিলেন। প্রাচীন গ্রীসের চিকিৎসক হিপ্পোক্রেটস্ রোগীর কম্পন নিবারণের নিমিত্ত আতপ সেবনের ব্যবস্থা করিতেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক বাগ্মী ও দার্শনিক ডায়োজিনিস্ বৃদ্ধ বয়সে টবের মধ্যে বসিয়া নিয়মিত ভাবে রৌদ্র সেবনে করিতেন। গ্রীক্ সম্রাট অ্যালেকজাণ্ডার তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে, তিনি তাহাকে কি উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সম্রাটের সাক্ষ্যাৎকালে ডায়োজিনিস আতপ স্নান করিতে ছিলেন। সুতরাং গ্রীক্ সম্রাট তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া সূর্য্যরশ্মি অবরোধ করায় ডায়োজিনিস তাঁহাকে সরিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। প্রাচীন

রোমের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ প্লিনি উভয়েই আহারের পর প্রত্যহ এক ঘণ্টাকাল আতপ সেবন করিতেন।

সূর্য্য-কিরণের অন্তর্বর্ত্তী তাপোৎপাদক রশ্মি আলোকরশ্মি ও অলট্রা-ভায়লেট রশ্মির নিমিত্তই আতপস্নান বা রৌদ্র সেবনের এত গুণ; এই রশ্মিত্রয়ের মধ্যে অল্ট্রা-ভায়লেট রশ্মিই রৌদ্রের ব্যাধি প্রশমক শক্তির মূলীভূত কারণ। উল্লিখিত রশ্মিত্রয়ের মধ্যে কেবল মাত্র তাপময় রশ্মিকে গ্রহণ করিতে হইলে, রৌদ্রকে লোহিত কাঁচের মধ্য দিয়া দেহের উপর ফেলিতে হয়, এবং রৌদ্রের তাপ বাদ দিয়া উহার উপকারিতা লাভ করিতে হইলে, নীল কাঁচের মধ্য দিয়া রৌদ্র সেবন করিতে হয়। রৌদ্র সেবনের নিমিত্ত ছাদের উপর একটী কাঁচের ঘর নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন, এবং তাহাতে প্রয়োজনানুসারে অতি স্বচ্ছ কাঁচের সার্সি বসান উচিত। যাহাতে সূর্য্যকিরণ কোনওরূপে বাধা না পায়, তজ্জন্য ঘরের ছাদ যথাসাধ্য হেলাইয়া দেওয়া আবশ্যক। বিলাতে অলট্রা-ভায়লেট রশ্মির উপকারিতা পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আজ কাল কোয়ার্টজ কাঁচ এবং কোয়ার্টজের আলো ব্যবহৃত হইতেছে। সাধারণ কাঁচ অল্ট্রা-ভায়লেট রশ্মি প্রবেশের অন্তরায় ঘটাইয়া থাকে বলিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বিদ্যালয় সমূহের জানালার সার্সিতে কোয়ায়ার্টজ কাঁচ বসান হইয়াছে। এমন কি লণ্ডনের পশুশালায় শীতকালে নিস্তেজ পশু পক্ষীকে প্রফুল্ল করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের ঘরে কোয়ার্টজ আলোক দেওয়া হইয়াছে। রৌদ্র সেবনে পশুপক্ষী যেমন প্রফুল্লিত হয়, এই আলোক সেবনেও উহারা তদ্রূপ সজীবতা লাভ করে। রৌদ্রের এই গুণ দেখিয়া সে দেশে এখনও রেডিওথিরাপি বা রঞ্জনরশ্মি চিকিৎসার মত এক্‌টিনোথিরাপি বা অল্ট্রা-ভায়লেট রশ্মি চিকিৎসার খুবই প্রচলন হইতেছে।

বিগত মহাযুদ্ধে আহত সৈনিকদিগের ক্ষত চিকিৎসায় রৌদ্রের প্রয়োগ করা হইয়াছিল, এবং তাহাতে সুফলও পাওয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে বিলাতের ফ্যাক্টরিগুলিতে যে সকল বালিকা ও যুবতী কর্ম্ম করিত, তাহাদের অনেকেই সূর্য্যালোক বিহীন আবদ্ধ কক্ষে বসিয়া অবিরত কর্ম্ম করার নিমিত্ত অসুস্থ হইয়া পড়িত। এক্ষণে ফ্যাক্টরীর মধ্যে সূর্য্যলোক সেবনের ব্যবস্থা হওয়ায় এবং রৌদ্র সেবনের উপযোগী হাতকাটা, গলা খোলা, ঢিলা ঘাগ্‌রা পরিধান করার নিমিত্ত তাহারা আর পাণ্ডুরোগ, হৃদ্রোগপীড়া, রক্তহীনতা, প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয় না।

রৌদ্র চিকিৎসা করিতে হইলে দেহকে রৌদ্র সেবনোপযোগী করিতে হয়, এবং তজ্জন্য ধীরে ধীরে রৌদ্র সেবনের কাল বর্দ্ধিত করিতে হয়। পা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেহ নগ্ন করিয়া রৌদ্রে বসিতে হয়। রৌদ্রের তেজ অধিক হইলে প্রথম প্রথম পাঁচ মিনিট কালই রৌদ্র সেবনের পক্ষে যথেষ্ট। রৌদ্র মৃদু হইলে এবং আতপ সেবনের ক্ষমতা হইলে, অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে ৪৫ মিনিট অবধি রৌদ্র সেবন করিতে হয়। রৌদ্র সেবনের কালে উত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মস্তক ও চক্ষু আবৃত রাখা উচিত। ইহার জন্য সান্-প্রুফ সোলার টুপি ও এক জোড়া কাল কাঁচের চশমা হইলেই চলিতে পারে। সর্ব্ব দেহে রৌদ্র লাগান সম্ভবপর না হইলেও দেহের কোনও এক স্থানে রৌদ্র লাগানোর উপকারিতাও বড় কম নয়। সূর্য্য কিরণের কতকাংশ চর্ম্ম ভেদ করিয়া রক্তের সংস্পর্শে আসিয়া মিশে, এবং তাপে পরিবর্ত্তিত হইয়া শোণিত স্রোতের সহিত দেহের শীতলাংশে চলিয়া যায়। এইরূপে দেহের একাংশে রৌদ্র লাগাইলে দেহের অপরাংশও উষ্ণ হইয়া উঠে। রৌদ্রের লোহিত রশ্মিগুলিই আমাদের দেহের অন্তর্নিহিত টিসুগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। রৌদ্র সেবনে দেহের বাহ্যিক কোষ ও টিসুগুলির ক্রিয়া, রক্ত চলাচলের গতি, হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এবং প্রচুর ঘর্ম্ম নিঃসারিত হইয়া লোমকূপ সকল পরিষ্কার করিয়া দেয়। উপযুক্ত পরিমাণে রৌদ্র সেবন করিলে জীবনী শক্তির ক্রিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

গান।

লেখিকা—শ্রীমতী সরসী বালা রায়।

ভৈরবী—একতালা।

আজি কাহার সে হাসি
দীপ্ত করে গো,
আমার প্রাণের মাঝে।
হিল্লোলে হিল্লোলে

পল্লবে পল্লবে,
সে মধুর হাসি গো।
আজি কোন আঁধারের
পথের মাঝারে,
পথিক বেড়ায় ঘুরে,
পথ ঘুরে ঘুরে,
পথশ্রান্ত হ'য়ে ;
কাহারি পানে সে ধায় গো।
আকাশে হাসে চাঁদের কিরণ
দুঃখেতে ভরা ধরণী,
কাহার করুণা বাঞ্ছিত আমার
কাহার পানে, মোরা ধাই গো।
এস প্রিয়তম
এস চির বাঞ্ছিত,
এস গো হৃদয়ে
জুড়াতে জীবন।
তোমারি তরে,
সপেছি পরাণ
তুমি যদি সখা আসো গো।
নিখিল বিশ্ব পুলক ভরা,
জীবন আমার আলোক হারা ;
আঁধার মাঝারে খুজি গো তোমারে,
তুমি যদি প্রিয় আসো গো !
এস গো হৃদয়ে,
এস সখা মোর,
হৃদয়ে জাগাতে
করুণা তোমার।
মুক্তির সাগরে,
ডুবায়ে রাখো হে
আসিতে আমারে,

দিওনা গো আর।
তোমার তরণী
আসিবে বলিয়া,
রয়েছি বসিয়া
সে আশা পানে গো।
লহ গো আমারে,
সাগরের পারে,
দাওগো আলোক,
আঁধার মাঝারে॥

মানভূমের পল্লী শ্রী

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু।

জন্মভূমি কলিকাতাকে An revoir. জানাইয়া, গত ৩রা কার্ত্তিক (১৩৩৫) "গোমো প্যাসেঞ্জার" নামক কম্পীয় দৈত্যের স্কন্ধে চাপিয়া পরদিন প্রাতে আদরাতে গাড়ী বদল করিয়া, পুরুলিয়া ষ্টেশনে পৌঁছি। তথা হইতে "বাসে" উঠিয়া ৭ মাইল দূরবর্ত্তী হুটুমুড়া গ্রামে আসি। গ্রামের জমিদার মাননীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিলাল চৌধুরী বাহাদুরের সহিত পূর্ব্বের পরিচয় ছিল, তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলাম।

স্নানাহারের পর, হুটুমুড়া গ্রাম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল, পরে গ্রামের নাম লইয়া প্রশ্ন উঠিল। শুনিলাম, তাঁহাদের দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বে ঐ স্থান দুর্গম অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল, ক্রমে তাহা সংস্কৃত করিয়া পল্লীতে পরিণত করা হয়। দুইজন সাঁওতাল অগ্রণী হইয়া ঐ বিষয়ে প্রথম হস্তক্ষেপ করায়, তাহাদের উভয়ের নামানুসারে হুটু + মুড়া = হুটুমুড়া নাম করণ হয়।

গ্রামে অন্যূন নব্বই ঘর মুসলমান, চৌদ্দ ঘর ব্রাহ্মণ ও কয়েক ঘর তিলি বাউরি প্রভৃতি আছে। ক্ষুদ্র গ্রাম, পুষ্করিণী ও কূপ একাধিক দেখা যায়। গ্রামের প্রায় সকলেই উপরোক্ত চৌধুরী বংশীয়দের প্রজা। প্রজারা জমিদারকে শ্রদ্ধা ও ভীতির চক্ষে দেখিয়া আসিতেছে। মুসলমানদেরও প্রকৃতি শান্ত নিরীহ, গ্রামের মধ্যে গো-কোরবানি করিবার পরোয়ানা নাই। ব্রাহ্মণ কথিত শাস্ত্র-

বিধি মত গ্রামের সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। গ্রামের অন্তঃস্থলে উচ্চ শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যহ পূজার্চ্চনা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। মন্দির ও জমিদার গৃহ ইষ্টক নির্ম্মিত, তদ্ভিন্ন সমস্তই চালা ঘর।

গ্রামবাসীরা কৃষিজীবী। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে আউস হৈমন্তিক ধান্যের বীজ বপন করিয়া, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে তাহা কাটিয়া গোলাজাত করিয়া রাখে। বৎসরের অবশিষ্ট কাল গয়া বিষ্ণুপুরের মিষ্ট কটু তামাকু সেবনে তন্ময় থাকে, কেহ বড় একটা গা-গতর খাটাতে চাহে না। গ্রামের দুইটা দোষ চোখে পড়ে, বাল্য বিবাহ ও শৈশব-নেশা। বালিকাদের নয় বৎসরে বিবাহ ও বালকদের ৭ বৎসরে তামাকু সেবনের হাতে খড়ি দেওয়া হয়। অনেক তর্ক করিয়াছি, ঐ দুয়ের কোন প্রতীকার নাই।

সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিনদিন যথাবিধি মা দুর্গার পূজা হইল। দশমী দিবসে কাঙালী ভোজন ও ভিখারি বিদায় সাঙ্গ হইল, ত্রি-রাত্রি "তাম্রধ্বজ" নাটকের যাত্রাভিনয় হইয়া গেল। জলাশয়ে প্রথামত মৃন্ময়ী মাতৃমূর্ত্তিকে মন্ত্রসহ বিসর্জ্জনান্তে গ্রামবাসী সকলে "গ্রাম্যদেবতা" স্থলে চলিল। শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বসিয়া নব লেখনী দিয়া নব পত্রে শ্রীদুর্গা নাম দশবার লিখিল; প্রজারা খাজনা-স্বরূপে জমিদারদিগকে কিছু কিছু দিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল; পরে গৃহে ফিরিয়া আহারান্তে নিষুপ্তি প্রলয়ে একে একে নিলীন হইল।

গ্রামের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে "পাৎলোই নদী" নামে গিরিগাত্রবাহী জলরেখা প্রবাহিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড প্রস্তর পড়িয়া দ্বীপের আকার ধারণ করিয়াছে। জল স্বল্প, বালু কাঁকর বেশী। আঁকাবাঁকা গতি, আদি অন্ত অগোচর; নদীর রূপ মাধুরী তত নাই। বক্ষোপরি কোম্পানীর কাঠ-পাথরের পোল্ বা ব্রীজ্ আছে।

গ্রামের প্রান্তে "জয়নগর" গ্রাম স্থাপিত। ৺জয়চাঁদ চৌধুরী ইহার প্রতিষ্ঠাতা। রাস্তা পাকা, চলাচল করিলে বালু কাঁকরের মোলায়েম সুরগুঞ্জন শোনা যায়। আশে পাশের গ্রামের কেন্দ্রস্থল জানগড়, তাই জয়নগরের রাস্তার উপর হুটুমুড়া দাতব্য চিকিৎসালয়, হুটুমুড়া হাট বাজার, হুটুমুড়ায় স্কুল, পাঠশালা ও কাছারি গৃহ স্থাপিত। তবে হুটুমুড়ায় ডাকঘর, গ্রামের এক অন্ধকূপে কোনক্রমে দিন গুজরাণ করিতেছে। সপ্তাহে হয়ত তিনখানি খাম ও পাঁচখানি পোষ্টকার্ড বিক্রয় হয়। শুনিলাম পূর্ব্বে দুর্ব্বিত্তেরা হুটুমুড়া ডাকঘরের গৃহদাহ করে, তখন নাকি উহা আজিকার মত অসূর্য্যম্পশ্য পর্দ্দানসীন ছিল না।

এখন পোষ্টাফিসের নিজ গৃহও নাই, সে নাম-ডাকও তেমননাই! তবে কি হুটুমুড়া পোষ্টাফিস অগ্নি পরীক্ষার পর অঙ্গগ্লানি সংস্কার করিতে না পারিয়া হুটুমুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাম কিঙ্কর ওঝার দোকান ঘরে প্রাণ গুঁজিয়া রহিবে? ডাকঘর মানে দোকানদারি ঠিক নহে, কিন্তু পরিদর্শন করিলে ঠিক অই প্রতীতিই হয়। গ্রামবাসীর একান্ত প্রার্থনা, পাটনা G. P. O. আশু হুটুমুড়া পোষ্টাফিসের অঙ্গ শুদ্ধি করিয়া জয়নগরের সদর রাস্তায় তাহাকে নবগৃহে প্রতিষ্ঠা করুন। উক্ত ওঝা মহাশয় যদি আজই হুটুমুড়া পোষ্টাফিসকে গৃহ ছাড়া করেন, তখন কি উহা "থুসুড়ির ট্যাঁকে" পাড়ি দিবে?

গ্রামের বাহিরে মাইল দুই দক্ষিণে একটী অনতি উচ্চ পাহাড় দেখা যায়। উহার শীর্ষে একটী বৃক্ষের দৃশ্য দূর হইতে অতি সুন্দর দেখায়; চলাচলের কালে পাহাড়টী পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ঐ পাহাড়ে অনেক কষ্টে উঠিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ দৃশ্যাবলী সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে বহুক্ষণ যাবৎ পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলাম। পশ্চাতে একটী প্রকাণ্ড গুহা আছে, শুনিলাম উহাতে নেকড়ে বাঘের আড্ডা। সর্প বৃশ্চিকেরও রেহাই নাই। প্রতি বৎসরে বড় দিনের সময় ঐ পাহাড়ে "চান্দমারি" হইয়া থাকে।

পশ্চিম প্রান্তে প্রান্তর মধ্যে "মানভূম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" স্থাপিত। ৬২ বিঘা জমি উহার Area; উহাতে ছাত্রেরা যব, কলাইশুটী, খেসারী, মসুর, ছোলা, ধনে, করলা, তরমুজ, চৈত্রশশা, লাউ, বাদাম, আলু, বেগুন, প্রভৃতি চাষ করিয়া থাকে। কোথাও লছমন ভোগ কালাকার্ত্তিকে ধান পাকিয়া উঠিয়াছে ও হৈমন্তিক ধান্যের ফুল বীজ হইয়াছে। আশ্রম গ্রামের জমিদার উক্ত চৌধুরী মহাশয় নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন, ইটের গাঁথনি, একতালা, জমির অর্দ্ধাংশ জমিদার স্বয়ং ও অপরার্দ্ধ গ্রামবাসী দিগের একত্র দান। ছাত্র আছে মাত্র ৪ জন মফঃস্বলবাসী। আশ্রমের উদ্বোধন হইয়াছে গত মার্চ্চ (১৯২৮) মাসের মাঝামাঝি। আশ্রমের প্রতি আশপাশের গ্রামের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আচার্য্য আছেন দুইজন,—সিলেট নিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার পাল ও খুলনা নিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ঘোষ মহাশয়কে গেরুয়া কাপড় পরিতে দেখিলাম। ছাত্রেরা স্ব-হস্তে সকল কর্ম্ম করিতেই শিখিতেছে, কৃষিকর্ম্ম দ্বারা আত্মরক্ষা, চরকা কাটীয়া অঙ্গ রক্ষা [বস্ত্র বয়ন তন্তুবায় দ্বারা করাইয়া লওয়া হয়, কারণ আশ্রম নাকি "তাঁতির ভাত" মারিতে চাহেন না,] ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। এখানে "শিক্ষা" বলিলে অনেক

কিছু বুঝায়, যথা, ধর্ম্মোপদেশ, জ্ঞানোপদেশ, নৈতিক চরিত্র গঠন কৃষিবিদ্যা, চরকায় সূত্র প্রস্তুত, গীতবাদ্যালাপ, ব্যায়াম চর্চ্চা ও মোটামুটী স্বাস্থ্যতত্ত্ব। প্রত্যহ প্রাতে আশ্রম হইতে রোগীকে ঔষধ বিতরণ করা হয়। রোগী দূরস্থ গ্রামবাসী হওয়া বিধেয়। প্রতি সপ্তাহে বহু সাময়িক সংবাদ পত্র আশ্রমে আসিয়া থাকে, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনাও তৎসঙ্গে দেশ কাল সমাজের প্রকৃত চিত্র প্রত্যক্ষ করাইয়া ভবিষ্যতে কে কিরূপ পথ অবলম্বন করিয়া তাহার প্রতিকার করিতে প্রয়াসী হইবে, তাহার খসড়া। নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ ও নিঃস্বার্থ দেশ প্রেমিকের আদর্শ প্রতি ছাত্রের জীবনে বদ্ধমূল করিতে আশ্রম আন্তরিক আয়াস-স্বীকারের ত্রুটী করিবেন না। শুনিলেও অনেকটা আশা হয়। বেদ উপনিষদের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের কাছে আর আমার চর্ব্বিত চর্ব্বণ উপস্থিত করিতে আদৌ ইচ্ছা করে না,—তাই এখানে নিরস্ত হইলাম। জাতি স্বধর্ম্মের সেবায় তৎপর হইয়া উক্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের একটী মাত্র ছাত্রও যে ভবিষ্যতে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে না, এমন কথা কে না অস্বীকার করিবে?

'জ্যোৎস্না পুলকিত নিশি'তে পশ্চিম দিকস্থ "জোড়াবাঁধ" নামধেয় জলাশয়ের শোভা অতি চমৎকার। একদিন সন্ধ্যায় জ্যোতি চৌধুরী মহাশয়ের জামাতার সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে এই পথে আসায়, আমি বলিয়াছিলাম, "জলের তালুকে এত বেশী শালুক ফুল শোভা ক'রে আছে যে, যে যাই বলুক, আমার কিন্তু এই মুলুক ছেড়ে কোথাও নড়্‌তে ইচ্ছে করে না।" তিনি আমার প্রলাপ বাক্যে হাস্য সংবরণ করিতে অক্ষম হইয়া ছিলেন।

গ্রামের পথে যখন যেদিকে ফিরিয়াছি, দুইধারে ক্ষুদ্র দীর্ঘ ধান্য ক্ষেত্র বই আর কিছুই চোখে পড়ে নাই। পুষ্করিণী আছে, জল স্বচ্ছ শুভ্র, মানে পরমানন্দ, শৈবাল মশকের কোপে উপদ্রব নাই। প্রচুর মাছ আছে, অতি সুস্বাদু। তরিতরকারি, ফল-ফুলরি জিনিষ এক হইলেও স্বাদের তারতম্য আছে।" "মায়ের দেওয়া মোটা ভাত কাপড়ে" গ্রামের লোক পরিতৃপ্ত, এমনকি জমিদার-মহলেও কোনও বাবুয়ানা হাল-ফ্যাসান বা সৌখিন জিনিষ পত্রের রেওয়াজ নাই। গ্রামবাসী সকলেই প্রায় কৃষিজীবি হওয়ায়, কেহ আপনাপন ভাত-কাপড়ের জন্য কাহারও তোয়াক্কা রাখে না। শান্তি শৃঙ্খলা ও স্বাভাবিক বিনয়ানম্র দেখিয়া মনে মনে লোভ হইতে লাগিল।

শ্রীমদ্ বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাজের মাতৃদেবী সম্বন্ধে কিছু বিবরণ ঃ—

পূর্ব্বে নিবেদিত হইয়াছে যে, মহারাজের বাল্যাবস্থায় গৃহস্থ জীবন সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু জানাইবার নাই। বাস্তবিক ইহাতে জানিবারই বা কি থাকিতে পারে? যিনি নবম বৎসর সময়ে গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার সেই দীর্ঘকাল স্থায়ী গৃহে তাঁহার বালক সুলভ চঞ্চলতা, সমবয়স্ক বালকগণের সহিত ক্রীড়া ও তৎসহ উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠাভ্যাসে অমনোযোগিতা ও তৎসহ তাড়নাই ছিল নিত্য ঘটনা। তাঁহার গৃহ ত্যাগের সময় তাঁহার পিতৃদেব পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। পিতৃকুলে তাঁহার মাতা ভিন্ন অপর কেহ অভিভাবক ছিলেন না। তাঁহার মাতুল কুলেও তাঁহার মাতামহ (লালা) ব্যতীত অপর কেহ ছিলেন না। এ উভয়ই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার, সুতরাং এ উভয় কুলের আশা ভরসা একমাত্র মহারাজের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ উভয় সংসারের প্রদীপও গৃহত্যাগ করিলেন। ভাবিয়া দেখুন, এরূপ অবস্থায় মায়ের হৃদয় কিরূপ শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিল, এই মাতৃদেবী সম্বন্ধে আমরা এখন কিছু নিবেদন করিব।

আমাদের গুরু মহারাজের মাতৃদেবী বা আমাদের পরম পূজনীয়া ঠাকুরমা বুড়ী নর্ম্মদা বাই নামে পরিচিতা ছিলেন। নবম বৎসরে গৃহ হইতে পলায়ণ করিবার পর, বহুবৎসর পরে, যখন শ্রীগুরুদেব প্রথম প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইয়া এই বৈদ্যনাথস্থ তপোবনের পাহাড়ে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন মাতা পুত্রে মিলন হইয়াছিল। ইহা আজ ৩৭ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। ৯ম বৎসর হইতে এ সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এ মাতা ও পুত্র কেহ কাহারও সংবাদ অবগত ছিলেন না। আমাদের বৃদ্ধ মাতাজী বহু প্রকারে পুত্রের সন্ধান লইয়া ছিলেন। পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে অবন্তীক নগরীতে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। ইহা ভারতের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এইস্থানে নানাদেশ হইতে সর্ব্ব সময়ে বিশেষতঃ কুম্ভমেলা উপলক্ষে বহু সাধু ও তীর্থ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। ইহাঁদের অনেকের নিকট হইতে সন্ধান লওয়া হইয়াছিল। পুত্রের সন্ধান পাইবেন বলিয়া মাতাজী এ ভারতের বহু তীর্থ দর্শন করিয়া ছিলেন। কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।

এ বৃদ্ধা মাতাজী নর্ম্মদা বাই নামে যে সাক্ষ্যাৎ নর্ম্মদা দেবী ছিলেন, সে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এরূপ না হইলে কি আর এই নর্ম্মদা দেবীর সাক্ষ্যাৎ বর পুত্র-রূপী পরম যোগী পুরুষ অন্য কোন গর্ভে জন্মিতে পারে? এই মাতাজী এক পরমা সাধ্বী ও নিরতিশয়া জপ তপ পরায়ণা স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা এরূপ ছিল যে, প্রাতঃকাল হইতে একাসনে বসিয়া বেলা ২।৩ টা পর্য্যন্ত পূজাদিতে ব্যাপৃত থাকিতে পারিতেন। সপ্তাহের মধ্যে ৩।৪ দিন এক এক বেলা অন্নাহার করিতেন। বাকী কয়েক দিন হয় মিছরি না হয় বিল্বপত্র ও সামান্য জলাহার করিয়া দিন কাটাইতেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাদের কয়েক ঘর যজমান ও সামান্য সামান্য ক্ষেত বাড়ী ছিল। এই যজমানেরা ও প্রতিবেশীরা এ তপস্বিনী মাতাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিত।

তিনি নিজে কখনও কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিতেন না। তাঁহাকে পরম তপস্বিনী দেখিয়া সকলেই অযাচিত ভাবে আসিয়া তাঁহার অভাব পূরণ করিত। সুতরাং পুত্রের বিরহ ব্যতীত তাঁহার ভরণ পোষণ বা গ্রাসাচ্ছাদনের কোনরূপ কষ্ট ছিল না।

এরূপ অবস্থায় দিন অতিবাহিত করিতে করিতে তিনি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইলেন, ও নিজেও বুঝিলেন যে, তাঁহার অন্তিম সময় নিকটবর্ত্তী। এ সময়ে তাঁহার প্রগাঢ় ইচ্ছা হইয়াছিল যে, কিরূপে এ অন্তিম সময়ে পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া তাহার সম্মুখে দেহ রক্ষা করিবেন। নানা সন্ধানে বিফল মনোরথ হইয়া এখন তাঁহার ইষ্টদেবের নিকট তাঁহার এই প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ তপস্বিনীর এ প্রার্থনা ভক্ত বৎসল শ্রীভগবান কিরূপে উপেক্ষা করিবেন? ভক্তের আহ্বানে তাঁহাকে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইল। মাতাজী নিজমুখে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যে, একদিন পূজায় বসিয়া তিনি ইষ্টদেবের নিকট কাতরে তাঁহার মনোবাঞ্ছা নিবেদন করিতেছেন, ও কাঁদিতে ছিলেন এমন সময় স্পষ্ট দেখিলেন, যেন সাক্ষাৎ মহাদেব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও বলিয়া দিলেন যে, বৈদ্যনাথের নিকটে যে তপোবন পাহাড় আছে, সেখানে তাঁহার পুত্র "বালানন্দ" এই নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সাধুবেশে তথায় অবস্থান করিতেছেন। অর্থাৎ এই আদেশে তিনি পুত্রের অবস্থানের নাম ও তাঁহার বর্ত্তমান নাম পর্য্যন্ত জানিতে পারিলেন। এ বৈদ্যনাথ ধাম কোথায়? মাতাজী ইহার সন্ধান লইতে লাগিলেন, ও ক্রমে ইহার নির্দ্দেশ জানিতে পারিয়া পরম পরিতুষ্ট

হইলেন। এইরূপ জানিবার পর মাতাজী সংকল্প করিলেন যে, তপোবনে যাইয়া পুত্রের সহিত মিলিতা হইবেন। সংকল্প স্থির হইলে পর, দেশে তাঁহার যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল. তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। এই বিক্রয় লব্ধ অর্থ ও অন্যান্য রূপে প্রাপ্ত আর কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া কয়েকটী তীর্থযাত্রীর সহিত তিনি দেশত্যাগ করিয়া বহির্গতা হইলেন। তীর্থ দর্শন করিতে করিতে ক্রমে প্রয়াগাদি দর্শনের পর কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহার সঙ্গীগণ সঙ্গ পরিত্যাগ করিল, ও মাতাজী একাকীই বৈদ্যনাথ ধাম যাত্রা করিলেন। বৈদ্যনাথে উপস্থিত হইয়া বাবা বৈদ্যনাথের পূজাদির পর তিনি বহু পাণ্ডাকে তপোবন কোথায় ও সেখানে কোন সাধু আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পুত্রের সহিত তাঁহার মিলন হইবে, ইহা বোধহয় বাবা বৈদ্যনাথ পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ভাবে মাতাজী জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বোধ হয় বাবা বৈদ্যনাথ নিজেই এক সুন্দর বেশধারী পাণ্ডারূপে মাতাজীকে বলিয়া দিলেন যে, তপোবনে "বালানন্দ মহারাজ" নামে এক পরম সাধু বাস করেন। এ ব্যক্তি আরও বলিয়া ছিলেন যে, তদানিন্তন সরকারী হাঁসপাতালের ডাক্তার ৺বাণীকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত বালানন্দ মহারাজের শিষ্য। এজন্য উক্ত ডাক্তার বাবুর নিকট যাইলে এখনই তিনি মাতাজীকে তপোবনে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। মাতাজী ডাক্তার বাবুর নিকট যাইতে চাহিলেন। এজন্য উক্ত পাণ্ডাজী একটি বালককে মাতাজীর সহিত ডাক্তার বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মাতাজী নিজের কোনরূপ পরিচয় না দিয়া কেবল তপোবনের সাধু দর্শনে যাইবেন এইমাত্র বলিলেন। ডাক্তার বাণী বাবু এজন্য জানিতে পারেন নাই, যে মাতাজী তাঁহার গুরুদেবের গর্ভধারিণী। তিনি গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছেন, বলিলে মাতাজী পদব্রজেই ৫।৬ মাইল অনায়াসেই যাইতে পারিবেন ও পদব্রজেই যাইতে ইচ্ছা করেন, ইহা জানাইলে ডাক্তার বাবু একটি লোক সঙ্গে দিলেন ও এই অশীতি বর্ষ বয়স্কা বৃদ্ধা মাতাজী পায়ে হাঁটিয়া ৫ মাইল দূরবর্ত্তী তপোবনে যাইয়া পৌঁছিলেন। তপোবনের বর্ত্তমান বাড়ী ও গৃহাদি সে সময়ে ছিল না। এস্থানে তখন কেবল মাত্র তপোবনের মন্দির ও তাহার পার্শ্বস্থ ধুনি মাত্র ছিল। ইহার উত্তরদিকে দয়াবল ব্রহ্মচারীর আশ্রম ছিল। মহারাজ তখন এই আশ্রমে যে একখানি টিনের ঘর উপরে আছে, সেখানেই আসন পরিগ্রহ করিতেন। মাতাজীর আগমন কালে মহারাজ সে ঘরে তখন অবস্থান করিতেছিলেন। মাতাজী পাহাড়ের নিম্নে আসিয়া দয়াবল

প্রাণ নাই কার ?

লেখক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সতত যে ভয়ে রয়, ভোজনে শয়নে ভয়,
জীবিত হইয়া মৃত, প্রাণ নাহি তার।
নিরাশার অন্ধকার, চারিদিকে যে জনার,
প্রাণ নাহি আছে তার চাঞ্চল্য অসার॥
পাষাণ সমান দেহ, নাহি যার প্রেম স্নেহ,
অবশ নিরস মন মরুর সমান।
ভয়াহার নিদ্রা ক্রোধ, আছে মাত্র যার বোধ,
জীব বাচ্য বটে কিন্তু নাহি তার প্রাণ॥
হিংসা দ্বেষ চিন্তানলে, সদা যার দেহ জ্বলে,
আছে প্রাণ কিন্তু তাহা প্রাণ বাচ্য নয়।
সে প্রাণে নাহিক হাসি, সহে সদা দুঃখ রাশি,
অসন্তোষে মৃত প্রায় হ'য়ে সদা রয়॥
পোষ্য পুত্র পরিবার, বশীভূত নহে যার,
সে জন অনল দগ্ধ প্রাণ নাই তার।
খেতে শুতে সুখ নাই, জ্বালাতন সর্ব্বদাই,
আছে দেহ কিন্তু প্রাণ নাহি সে জনার॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুরোধে, কিম্বা কর্ত্তব্যের বোধে,
কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডলে সেই কর্ম্মবান।
দুঃখের উপরে দুঃখ, তার মাঝে লভে সুখ,
উচ্চ হ'ক্ নীচ হ'ক্ তারি আছে প্রাণ॥

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৬শ বর্ষ | ১৩৩৭ সাল, আষাঢ় | ৩য় সংখ্যা

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র

লেখক—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সাংখ্যতীর্থ।

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র বাস্তু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। কিরূপে এই গ্রন্থের আবির্ভাব হইল, তাহা প্রথমে সংক্ষেপে বলিব।

এই গ্রন্থের আদিকাণ্ডের ১ম পটলে উক্ত হইয়াছে—মহা প্রলয়ের সময় যখন পৃথিবী জলমগ্ন হইল, স্থাবর জঙ্গমাত্মক জাগতিক বস্তু কিছুই রহিল না। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি বিধ্বস্ত হইয়া গেল, কেবল সূচিভেদ্য অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হয় না, সমগ্র পৃথিবী একার্ণবীকৃত ঐ অনন্ত অসীম সমুদ্রে ভগবান বিষ্ণু স্বীয় মহিমায় নিখিল জগৎ স্ব-শরীরে সংহৃত করিয়া অনন্ত শয্যাশায়ী হইলেন। তখন তাঁহার অলৌকিক তেজ নাভিদেশ দ্বারা প্রভূত পরিমাণে নির্গত হইতে লাগিল। ক্রমে ঐ তেজ সহস্র সূর্য্য সদৃশ তেজঃ সম্পন্ন সহস্র দল, সহস্র কেশর পদ্মের আকার ধারণ করিল।

অনন্তর বিষ্ণু ঐ তেজঃ হইতেই একটী সুবর্ণময় অণ্ড এবং ঐ অণ্ড মধ্যে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা ঐ অণ্ডের অভ্যন্তরে থাকিয়া অণ্ডটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন, এবং চতুর্ব্বাহু চতুর্মুখ জটা মুকুট মণ্ডিত শরীর পরিগ্রহ করিয়া প্রলয় লুপ্ত অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহ বেদের

আবির্ভাব সাধন পূর্ব্বক ঐ বেদ অভ্যাসে মনোনিবেশ করিলে বেদাভ্যাস জনিত শ্রমে তাহার গাত্রে ঘর্ম্মোদ্গম হইল, ১ ফোঁটা ঘর্ম্ম পদ্ম পত্রের উপর পড়িয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। ঐ বিভক্ত অংশদ্বয় হইতে প্রবল পরাক্রান্ত মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয় উৎপন্ন হইয়া বেদ গুলিকে লইয়া পলায়ন করিল।

ব্রহ্মা তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ঐ অর্ণবশায়ী বিষ্ণুর মুখকমল হইতে এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তাহার মস্তক অশ্বের মত, চতুর্ভুজ, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শত শশাঙ্ক সমুজ্জল রূপ ধারণ করিয়া ঐ হয় শীর্ষরূপী মূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ পাতালে গমন পূর্ব্বক মধু ও কৈটভের নিধন সাধন করিয়া দৈত্যাপহৃত বেদের পুনরুদ্ধার করিলেন, ও ঐ বেদ ব্রহ্মার নিকট উপস্থাপিত করিলেন। ঐ মূর্ত্তির শীর্ষদেশ অশ্ব মস্তক সদৃশ বলিয়া উহার নাম হইল হয়শীর্ষ মূর্ত্তি। ইহাই হয়শীর্ষাবতারের ঘটনা ও হয়শীর্ষ নামের কারণ।

এই হয়শীর্ষাবতারে মধুকৈটভ বধ ও বেদাপহরণ শ্রীমদ্ ভাগবতেও উল্লিখিত হইয়াছে যথা—

"বিষ্ণুঃ শিবায় জগতাং কলয়াবতীর্ণ
স্তেনাহৃতা মধুভিদা শ্রুতয়োহয়াস্যে।" ১১।৪।১৭

অর্থ—বিষ্ণু জগতের মঙ্গলের জন্য হয়শীর্ষ রূপ অংশাবতার গ্রহণ পূর্ব্বক মধুকৈটভ বধ ও দৈত্যাপহৃত বেদ আহরণ করিয়া ছিলেন। আরও দেখিতে পাওয়া যায়—

"সত্রে মমাস ভগবান্ হয়শীর সাখো
সাক্ষ্যাৎ স যজ্ঞ পুরুষ স্তপনীয় বর্ণঃ।"

অর্থ—এই হয়শীর্ষ রূপী বিষ্ণু দৈত্য দলাহৃত বেদ যে সময় ব্রহ্মার নিকট উপস্থাপিত করিলেন, তখন ব্রহ্মা ঐ হয়শীর্ষ সন্নিধানে কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন।

কিয়ন্তি পঞ্চ রাত্রাণি ত্বয়া প্রোক্তাণি বৈ পুরা।
কথংতে স্থাপনং দেব ক্রিয়তে মুক্তি কাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ইত্যাদি।

অর্থঃ—হে বিষ্ণো কয়খানি পঞ্চরাত্র গ্রন্থ তুমি পুরাকালে বর্ণনা করিয়াছ। মুমুক্ষুগণ কি প্রকারে তোমায় স্থাপন করিবে, ইত্যাদি।

তাহার উত্তরে হয়শীর্ষ ২৫ খানি পঞ্চরাত্রের উল্লেখ করিয়া এই হয়শীর্ষ

পঞ্চরাত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন, অতএব এই পঞ্চরাত্র গ্রন্থ খানি হয়শীর্ষ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র।

হয়শীর্ষ শব্দটীর অর্থ আলোচিত হইল। পঞ্চরাত্র শব্দটীর অর্থ কি তাহারই এখন আলোচনা করিব। নারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—

রাত্রস্তু জ্ঞান বচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ১ম রাত্র ১ম অঃ। ৪৪

অর্থঃ—রাত্র শব্দ জ্ঞান বাচক ঐ জ্ঞান পাঁচ প্রকার, অতএব পঞ্চবিধ রাত্র অর্থাৎ জ্ঞান যে শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার নাম পঞ্চরাত্র। পঞ্চবিধ জ্ঞানের স্বরূপ কি তাহাও ঐ গ্রন্থেই উক্ত হইয়াছে—

১। জন্ম মৃত্যু জরানিবারক পরতত্ত্ব বিষয়ক যে জ্ঞান তাহা প্রথম জ্ঞান।
২। যে জ্ঞান মুমুক্ষুগণের অভীপ্সিত মুক্তির কারণীভূত তাহা দ্বিতীয় জ্ঞান।
৩। যে জ্ঞান হইতে ভগবদ্দাস্য লাভ করা যায়, তাহা তৃতীয় জ্ঞান।
৪। যোগ বিষয়ক জ্ঞান চতুর্থ জ্ঞান।
৫। অনিমাদ্যষ্টা সিদ্ধি, সার্ব্বজ্ঞ, দূরশব্দ শ্রবণ, পরকায় প্রবেশাদি বিষয়ক জ্ঞান পঞ্চমজ্ঞান।

এই পঞ্চবিধ জ্ঞান যাহাতে প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহার নাম পঞ্চরাত্র। ইহাই হইল পঞ্চরাত্র শব্দার্থ সম্বন্ধে নারদ পঞ্চরাত্রের সিদ্ধান্ত।

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে এ বিষয়ে অন্যরূপ উপনীত হইয়াছেন। ইহার সিদ্ধান্ত রাত্র পদটী রাত্রি শব্দ হইতে উৎপন্ন। হয়শীর্ষের ৪র্থ আচার্য্য লক্ষণ পটলে উক্ত হইয়াছে—

"আকাশ রায়ুতেজাংসি পানীয়ং বসুধা তথা।
এতাবৈ রাত্রয়ঃ প্রোক্তা হ্য চৈতন্যাস্তমোৎ কটাঃ॥"

অর্থঃ—আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূত রাত্রি সংজ্ঞায় অভিহিত, যেহেতু এই পঞ্চভূত অচৈতন্যাঃ অর্থাৎ চৈতন্য শূন্য জড় পদার্থ, এবং 'তমোৎকটাঃ' অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কারের তমঃ প্রধান অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তমঃ প্রধান পদার্থ অতএ রাত্রির সহিত পঞ্চভূতের জড়ত্ব ও আবরকত্ব রূপ সাদৃশ্য থাকায় রাত্রি শব্দে সাদৃশ্য মূলক লক্ষণ দ্বারা ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত বুঝিতে হইবে।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি—

রাত্রি বা রজনী প্রতিদিন সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন, তাহার যেরূপ জ্ঞান নাই, ইচ্ছা নাই কার্য্যকারিতার শক্তি নাই, মৃত্তিকা জল, বায়ু, প্রভৃতিও সেরূপ জ্ঞান শূন্য, ইচ্ছা শূন্য, কার্য্য কারিতা শক্তি শূন্য সুতরাং আমরা রাত্রির সহিত পঞ্চভূতের এই অংশে সাম্য অনুভব করিয়া থাকি। "রাত্রির সহিত ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতের সাদৃশ্যে অপর একটী কারণ আমরা দেখিতে পাই, 'তমোৎকটাঃ' রাত্রি যেরূপ তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার দ্বারা সমস্ত বস্তুকে আবরণ করিয়া রাখে, কোন পদার্থেরই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে দেয় না, পঞ্চমহাভূতও সেইরূপ তমোৎকট ও মোৎকটঅর্থাৎ তমঃ প্রধান পদার্থ।

(সাংখ্যকার বলিয়াছেন, "গুরু বরণকমেব তমঃ" যে সমস্ত বস্তু তমঃ প্রধান তাহা গুরুঃ অর্থাৎ ভার এবং আবরক সে অন্য বস্তুকে আবরণ করিয়া রাখে,) সুতরাং আবরকতা রাত্রি ও পঞ্চ মহাভূতের তুল্য বলিয়া রাত্রির সহিত পঞ্চ মহাভূতের সাম্য রহিয়াছে। এইরূপ সাম্য থাকায় সাদৃশ্য মূলক লক্ষণ দ্বারা গ্রন্থে পঞ্চ মহাভূত অর্থে রাত্রি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার পর উক্ত হইয়াছে—

রাত্রীণামস্পথৈতাশাং ব্যতিরিক্তং নিরঞ্জনম্।
স যদা বুধ্যতে তত্ত্বং তদামুক্ত্যে হনুকীর্ত্ত্যতে।
তদাসৌ ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরমাত্মান সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ সাধক যখন এই রাত্রি শব্দ প্রতিপাদ্য পঞ্চ মহাভূত (বাতস্কন্ধ) হইতে নিরঞ্জন পরমেশ্বরকে অতিরিক্ত নিত্য নির্দ্দোষ স্বরূপে উপলব্ধি করেন, তখন ঐ সাধক পরমাত্মা বিষ্ণু স্বরূপ হন। ভগবানের কোনও উপাধি নাই, অনুপহিত ভগবান্ কখনও অনিত্যত্বাদি দোষ দুষ্ট পঞ্চভূতের সহিত সংসৃষ্ট হইতে পারেন না। এবং এই পঞ্চভূত রূপ রাত্রির সহিত অসংসৃষ্ট নিরুপাধিক চৈতন্যই পরমাত্মা।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ না থাকিলেও যিনি বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি ভৌতিক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, ঐ গৃহীত মূর্ত্তিক জীব ব্রহ্মই উপাসনার অনুকূল বলিয়া এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। এই গ্রন্থে বাসুদেবাদি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও তাহার প্রতিষ্ঠা পূজাদি অভিহিত হইয়াছে, পরমাত্মা এই গ্রন্থে সাক্ষাৎ রূপে বাচ্য নহে। সুতরাং পঞ্চরাত্রি অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূতাত্মক বাসুদেবাদি বিষয়ক বিবরণ সন্নিবেশিত হওয়ায় এই

গ্রন্থের নাম পঞ্চরাত্র হইয়াছে। এবং এই পঞ্চরাত্র হইয়াছে। এবং এই পঞ্চরাত্র খানি হয়শীর্ষ মুখবিনিঃসৃত হওয়ায় ইহার নাম হইল। "হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রম্"

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পটলে প্রধাণতঃ ২৫ খানি পঞ্চরাত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে যথা—

১।	হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র	১৪।	শৌনক পঞ্চরাত্র
২।	ত্রৈলোক্য মোহন	১৫।	নারায়ণীয় ,,
৩।	বৈভব ,,	১৬।	জ্ঞানার্ণব ,,
৪।	পৌষ্কর ,,	১৭।	স্বায়ম্ভুব ,,
৫।	নারদ ,,	১৮।	কাপিল ,,
৬।	প্রহ্লাদ ,,	১৯।	গারুড় ,,
৭।	গার্গ ,,	২০।	আত্রেয় ,,
৮।	গালব ,,	২১।	নারসিংহ ,,
৯।	শ্রীপ্রশ্ন ,,	২২।	আনন্দ ,,
১০।	শাণ্ডিল্য ,,	২৩।	আরুণ ,,
১১।	ঈশ্বর সংহিতা	২৪।	বৌধায়ন ,,
১২।	সত্যোক্ত ,,	২৫।	বৈশ্বদেব ,,
১৩।	বাশিষ্ঠ ,,		

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে পঞ্চরাত্রের এইরূপ পঞ্চবিংশতি সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, শিবোক্ত তন্ত্র, বিষ্ণুভাষিত ভাগবত, পদ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ ব্যাসসংহিতা, ও "যদন্যন্মুনিভির্গীতমেতেষ্বেবাশ্রিতং হি তৎ" অর্থাৎ মুনিগণ এতৎ সজাতীয় যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রেরই অন্তর্গত।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রে অধিকারী ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মোপাসনা কির্ত্তিত হইয়াছে, স্বগুণ উপাসনা ও নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা এই দ্বিবিধ ব্রহ্মোপাসনার মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা। যে শ্রেষ্ঠ তাহা উপনিষদাদি শাস্ত্র দুন্দুভি নিনাদে সমর্থন করিয়াছে। পরন্তু নিম্নাধিকারী সগুণ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা যতক্ষণ চিত্তমল ক্ষালন না করিবে, ততক্ষণ সে নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে না, ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। ঐ নিম্নাধিকারী কর্ম্মোপাসকগণের নির্গুণ ব্রহ্মাবতারের কারণীভূত ভগবদুপাসনা যে শাস্ত্রে

অভিহিত হইয়াছে, তাহাই পঞ্চরাত্র। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের মতে ইহাই পঞ্চরাত্র শব্দের অর্থ।

গ্রন্থকার যে ২৫ খানি পঞ্চরাত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে প্রধানতঃ ভগবদ্ ভক্তি ভগবদুপাসনা এবং ভগবন্মূর্ত্তি ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ কীর্ত্তিত হইয়াছে, এইজন্য উহারা পঞ্চরাত্র নামে অভিহিত।

আর শ্রীমদ্ ভাগবত পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে নানাবিধ উপাখ্যানের সাহায্যে ভগবদুপাসনা ক্রমে প্রতিপাদিত হইয়াছে, বলিয়া (মুখ্যত উপাসনা শাস্ত্র নয় বলিয়া) উহারা ঐ পঞ্চবিংশতি সংখ্যক পঞ্চরাত্রের মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। পরন্তু গৌণভাবে উহারাও পঞ্চরাত্রেরই অন্তর্গত। তাই গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

"যদন্যন্মুক্তিনিভির্গীত মেতেষ্বেরাশ্রিতং হি তৎ।"

এইরূপে পঞ্চরাত্র গ্রন্থের সংখ্যা বাহুল্য থাকিলেও আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধে "হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র" সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় প্রতিমা শিল্প ও প্রাসাদ শিল্প। এই গ্রন্থখানি খণ্ড বা পাদে বিভক্ত। এ যাবৎ ইহা কোথাও মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। ইহার হস্ত লিখিতে পুস্তকও অতি দুর্লভ।

রাজসাহী বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি দিঘাপতিয়ার মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুরের স্বীয় গ্রন্থাগারে ইহার ২ কাণ্ডের অর্থাৎ আদিও সঙ্কর্ষণ কাণ্ডের ২খানি করিয়া হস্ত লিখিত পুস্তক আছে, তাহার মধ্যে ১ খানি প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, অপর খানির হস্তাক্ষর আধুনিক। বেঙ্গল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর গ্রন্থাগারে ঐ দুই কাণ্ডের একখানি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার হস্তাক্ষর অনুমান ২০০ বৎসর পূর্ব্বের। তৃতীয় সৌর কাণ্ডের ১ খানি পুঁথি রাজসাহী বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুর এসিয়াটিক্ সোসাইটী ও বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটীর পুস্তক ২ খানি সংগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ সমাবেশ করিয়া টীকা টিপ্পনী সহ সাধারণ বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের গোচরী করণার্থ ঐ অপ্রকাশিত দুর্লভ গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। অবিলম্বেই উহার সম্পাদন ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। আশা করি অবিলম্বেই আপনাদের গোচরীভূত হইবে।

এই গ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত আদি সঙ্কর্ষণ ও সৌর এই ৩ কাণ্ড ব্যতীত চতুর্থ খণ্ডের অস্তিত্বে কোনরূপ বিশিষ্ট প্রমাণ এ যাবৎ সংগৃহীত না হইলেও হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের আদিকাণ্ডের চতুর্থ আচার্য্য লক্ষণ পটলে—

"চতুষ্পাৎ সংহিতাং চেমাং যো বেত্তি দ্বিজ সত্তমঃ।
সর্ব্ব লক্ষণ হীনোঽপি স যজ্ঞং কর্ত্তু মর্হতি॥"

এই শ্লোকে "চতুষ্পাৎ" "সংহিতাং ইমাং" এই উক্তি দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, এই গ্রন্থখানি ৪ পাদে বিভক্ত। এ বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বচনটিকেই প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করা বোধহয় অযৌক্তিক হইবে না।

এই হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র বাস্তু শাস্ত্রের ১ খানি অন্যতম উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বাস্তু পদটী বস্ ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচ্যে ডুণ প্রত্যয় নিষ্পন্ন। বসত্যাস্মিন্নিতি বাস্তু, অর্থাৎ বসতি যোগ্য স্থান। এই গ্রন্থে দেবতা বসতি যোগ্য প্রাসাদাদি শিল্প কীর্ত্তিত হইয়াছে, এজন্য এগ্রন্থ বাস্তু শাস্ত্রের অন্তর্গত।

এইরূপ দেবমূর্ত্তিও মানবগণের বাস যোগ্য বাস্তুর কতকাল পূর্ব্বে প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইলেও সমালোচকগণ নানাবিধ সমালোচনা করিয়াছেন। তবে বাস্তু যে বহুকালীন তাহাতে কোনও সংশয় নাই। ক্রমে বাস্তু সম্বন্ধীয় নানা বৈচিত্র যখন পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তখন ঐ বাস্তু শিল্প ব্যবস্থা রক্ষার জন্য ও বৈচিত্র সম্পাদনের জন্য ঋষিগণ বাস্তু শিল্পশাস্ত্র নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিলেন। মৎস্য পুরাণের ২২৬ অধ্যায়ে ১৮ জন বাস্তুশাস্ত্রকারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে যথা—

"ভৃগুরত্রির্বশিষ্ঠশ্চ বিশ্বকর্ম্মা যমস্তথা।
নারদো নগ্নজিচ্ছৈব বিশালাক্ষঃ পুরন্দরঃ॥
ব্রহ্মা কুমারো নন্দীশ শৌনকো গর্গএব চ।
বাসুদেব্যো হনিরুদ্ধশ্চ তথা শুক্র বৃহস্পতী॥
অষ্টাদশৈতে বিখ্যাতা বাস্তু শাস্ত্রোপদেশকা॥"

ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বকর্ম্মা, যম, নারদ, নগ্নজিৎ, বিশালাক্ষ, পুরন্দর, ব্রহ্মা, কুমার, নন্দীশ, শৌনক, গর্গ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতি এই ১৮শ সংখ্যক বাস্তু শাস্ত্র প্রণেতা বিশিষ্টভাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই মৎস্য পুরাণের উক্তি দ্বারা মনে হয় মৎস্য পুরাণ প্রাদুর্ভাবের বহু পূর্ব্বেও ভারতে বাস্তু শাস্ত্রের প্রসার বহুল পরিমাণে ছিল। গ্রন্থকার কখনও অল্প সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে না! যখন গ্রন্থকারের মত নিবন্ধকার ও

অন্যান্য বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তখনই তাহাদের প্রসিদ্ধি লাভ সম্ভবপর হইয়া উঠে। পূর্ব্বে বিখ্যাতাঃ এই পদটী সন্নিবেশিত হইয়াছে, এবং বি+খ্যা ধাতুর উত্তর অতীত বোধক ও প্রত্যয় ব্যবহৃত হওয়ায় মৎস্য পুরাণের বহু পূর্ব্বেও ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠাদি বাস্তু শিল্প প্রবর্ত্তকগণ বিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে হইবে। সুতরাং বাস্তু শাস্ত্র যে বহু প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

পূর্ব্বে যে সকল বাস্তু শাস্ত্রোপদেশক গণের নাম উল্লিখিত হইল, তাহাদের মধ্যে অনেকের গ্রন্থই এখন দুর্লভ। উহাদের মধ্যে বিশ্ব কর্ম্মকৃত বিশ্ব কর্ম্ম প্রকাশ ও কুমার কৃত শিল্পরত্ন প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্চ রাত্রের মধ্যে মহাকপিল পঞ্চরাত্র অনেক ক্ষেত্রে বাস্তু বিষয়ে নিবন্ধকারগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও দুর্লভ হইয়াছে। যাহা হউক ঐ প্রমাণ দ্বারা পুরাকালে যে বাস্তু শাস্ত্রের বহুল পরিমাণে আলোচনাছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত ১৮শ সংখ্যক বাস্তু শাস্ত্রকার ব্যতীত পরবর্ত্তী বহু শাস্ত্রকার এ বাস্তু সম্বন্ধে নানাবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সমমত একখানি বাস্তু শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মহারাজাধিরাজ ভোজদেব কৃত সমরাঙ্গন সূত্রধার নামক গ্রন্থে বাস্তু শিল্পের যেরূপ বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, অন্যান্য বাস্তু শিল্প শাস্ত্রে প্রায় সেরূপ বৈশদ্য দেখা যায় না। কিন্তু ঐ গ্রন্থে মানব বাসগৃহ শিল্পইপ্রধানতঃ উক্ত হইয়াছে. দেবালয় শিল্প বিশেষ রূপে আলোচিত হয় নাই। ঐ সকল গ্রন্থেই স্থানে স্থানে দেবালয় শিল্প সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা থাকিলেও উহা দ্বারা রাজভবন বা সাধারণ মানবগণের বাস যোগ্য ভবন সম্বন্ধে যেরূপ পরিপূর্ণ ধারণা হয়, দেবগৃহ সম্বন্ধে সেইরূপ পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় না।

কশ্যপ সংহিতায় প্রধানতঃ দেবগৃহ শিল্প আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে দেবগৃহ সম্বন্ধে যেরূপ সুবিস্তৃত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা দৃষ্ট হয়, সেরূপ দেবালয় শিল্পের আলোচনা অন্যত্র কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না।

এই গ্রন্থে প্রাসাদ নির্ম্মাণের উপযোগী ভূমির পরীক্ষার নিয়ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভূমি দৃঢ় কি না? ভূমির নিম্নভাগে শল্য রহিয়াছে কি না? তাহা নিরূপনের উপায় কি? শল্য থাকিলে তাহা কি উপায়ে অপসারিত করা যায়। প্রাসাদ ভিত্তির নিম্ন ভূমির দৃঢ়তা সম্পাদনের নিয়ম। প্রাসাদের বিস্তার ও উন্নত্যের তারতম্যে ভিত্তির বিস্তৃতি ও উন্নত্যের তারতম্য। ইষ্টকের পরিমাণ, দগ্ধ ইষ্টকের বর্ণাদি দর্শনে তাহার উৎকর্ষাপকর্ষজ্ঞান, বর্দ্ধনীয় ইষ্টকের

স্বরূপ, প্রাসাদের পরিমাণ ভেদে আয়, জঙ্ঘা, মঞ্জরী, প্রদক্ষিণা, নিগম, শিখর প্রভৃতি প্রাসাদাঙ্গের পরিমাণ ভেদ, যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার পরিমাণের সহিত গৃহ পরিমাণের সামঞ্জস্য প্রভৃতি যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অভিহিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অতএব বাস্তু-শিল্পের এক দেশ দেবালয় বা প্রাসাদ শিল্পের হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

এখন দেখা যাউক হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের রচয়িতা কে? পঞ্চরাত্রের সংখ্যা ও নাম নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নারদ পঞ্চরাত্রে ৭ খানি পঞ্চরাত্রের উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

পঞ্চরাত্রং সপ্তবিধং জ্ঞানিনাং জ্ঞানদং পরম্।
ব্রাহ্ম্যং শৈবঞ্চ কৌমারং বশিষ্ঠং কাপিলং পরম্।
গৌতমীয়ং নারদীয় মিদং সপ্তবিধং স্মৃতম্॥

নারদীয়—১ম রাত্র ১ম অঃ, ৫৬—৫৭

১। ব্রাহ্মপঞ্চরাত্র। ২। শৈব পঞ্চরাত্র। ৩। কৌমার পঞ্চরাত্র।
৪। বশিষ্ঠ পঞ্চরাত্র। ৫। কাপিল পঞ্চরাত্র। ৬। গৌতমীয় পঞ্চরাত্র
৭। নারদীয় পঞ্চরাত্র।

এই নারদ পঞ্চরাত্রে যে ৭ খানি পঞ্চরাত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গৌতমীয় ও কৌমার এই দুইখানি পঞ্চরাত্রের নাম হয়শীর্ষে উক্ত হয় নাই। তদবশিষ্ট ৪ খানি পঞ্চরাত্রের নামই হয়শীর্ষে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং নারদ পঞ্চরাত্রোক্ত কোন পঞ্চরাত্রকার হয়শীর্ষের রচয়িতা হইতে পারিলেন না। বিশেষতঃ হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র নারদ পঞ্চরাত্রের পরবর্ত্তী গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়, কারণ নারদ পঞ্চরাত্রে হয়শীর্ষের নাম উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু হয়শীর্ষে নারদ পঞ্চরাত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকার যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা পরবর্ত্তী গ্রন্থের রচয়িতা হইবেন কিরূপে?

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে যে ২৫ খানি পঞ্চরাত্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, হয়শীর্ষও তাহাদের ঐ পঞ্চবিংশতি সংখ্যার অন্তঃপাতী, সুতরাং তদুক্ত কোন গ্রন্থকারই তাহার রচয়িতা হইতে পারে না। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাই এখন বলিব।

এ গ্রন্থের ১ম অবতরণিকা পটলে উক্ত হইয়াছে—

মার্কণ্ডেয় ভৃগুর নিকট হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র শ্রবণ করিতে চাহিলে ভৃগুই ব্রহ্ম

মহেশ্বর সংবাদ পরিব্যক্ত হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র মার্কণ্ডেয়ের নিকট বলিতেছেন; সুতরাং মার্কণ্ডেয়ের আগ্রহে ভৃগু এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত বোধহয় অসঙ্গত হইবে না।

আমার এই উক্তির সমর্থক আর একটি যুক্তি এই যে—এই প্রবন্ধে পূর্ব্বে যে ১৮ জন বাস্তু শাস্ত্রোপদেশকের নাম মৎস্য পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে প্রথমেই ভৃগুর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ ভৃগু একজন বাস্তু শাস্ত্রকার, এই হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রও বাস্তুশাস্ত্র। অতএব হয়শীর্ষোক্ত ভৃগু ও মৎস্য পুরাণোক্ত ভৃগু যে এক তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের রচয়িতা ভৃগু ইহাই সমাচীন সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়।

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য—এই হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র বহু প্রামাণিক ও প্রসিদ্ধ নিবন্ধকার স্ব স্ব নিবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দ ভট্টাচার্য্য বাস্তুযাগ তত্ত্বে ইহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া নির্ণয় সিন্ধু হরিভক্তি বিলাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বহুল পরিমাণে হয়শীর্ষের বচন দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরবর্ত্তী কালেও প্রাণতোষিনী, ও বৈদিক সর্ব্বস্বকার প্রভৃতি নিবন্ধকার হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। বৈদিক সর্ব্বস্বকার গ্রন্থের প্রথমেই বলিয়াছেন।

হয়শীর্ষাদিকং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণানন্দ শর্ম্মণা ইত্যাদি—

সুতরাং হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের অব্যভিচরিত প্রামাণ্য বিষয়ে ধারা না থাকিলে ঐ গ্রন্থের প্রমাণ প্রামাণিক গ্রন্থকারগণ গ্রহণ করিতেন না।

এই গ্রন্থের প্রথম বা আদিকাণ্ডে প্রাসাদ বা দেবালয় শিল্প ও প্রতিমা শিল্প উক্ত হইয়াছে। ঐ প্রতিমা শিল্পে, কি কি উপাদানে প্রতিমা গঠিত হইবে, সাধারণ প্রতিমা লক্ষণ, পিণ্ডিকা বা পীঠ লক্ষণ চতুর্ব্যূহ নবব্যূহ ও কেশবাদি দ্বাদশ মূর্ত্তি মৎস্যাদি অবতার মূর্ত্তি মাতৃকা, দিক্‌পাল, চন্দ্রগৌরী প্রভৃতি বহু মূর্ত্তির নির্ম্মাণের নিয়ম প্রতিপালিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় সঙ্কর্ষ কাণ্ডে ঐ সকল ও অন্যান্য মূর্ত্তির স্থাপন ক্রম বিশিষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় সৌর কাণ্ডে প্রধান ও সূর্য্য মূর্ত্তি শিল্প এ কাণ্ডে ও প্রাসাদ লক্ষণ অতি বিস্তার লাভ করিয়াছে।

যে যে স্থানে গ্রন্থকার প্রতিমা শিল্প বিবৃত করিয়াছেন, সে স্থানে প্রতিমার

হস্ত, পদ, নখ, কেশাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাণ এরূপ বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই গ্রন্থের সাহায্যে অনায়াসে প্রতিমা নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হইতে পারে।

বর্ত্তমানকালে আমাদেশে প্রতিমা নির্ম্মাণ কুম্ভকারের প্রতিভাকেই অপেক্ষা করে, প্রাচীন শিল্প কলার অপেক্ষা করে না। শিল্প শাস্ত্রের প্রচারের অভাব বোধহয় ইহার অন্যতম কারণ। যাহাহউক, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশিষ্ট আলোচনা সম্ভবপর নহে। বিশেষতং শিল্প কলার ব্যাখ্যা আমার প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। সাধারণ্যে অপ্রকাশিত হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের জন্যই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

মানভূমের পল্লীশ্রী

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু।

(২)

মানভূঁইয়ারা পানে চূণ দিয়া খাইতে জানে না, তাই উহারা ছড়া কাটে,—

"গালে পান হাতে চূণ,
তবে জান্‌বে মানভূম।"

গত ১২ই কার্ত্তিক হুটুমুড়া ও পার্শ্ববর্ত্তীগ্রাম সকলকে বিদায় জানাইয়া, পুরুলিয়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী মানভূম জেলার এলাকাধীন রামকাপলি ষ্টেশনে পৌঁছি। তথা হইতে রামপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। ষ্টেশনে রামপুর নিবাসী শ্রীনগেন্দ্রনাথ গরাই মহাশয়ের মজুর-সহ উপস্থিত থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁহাদের কাহারও কোন ঠিকানা নিশানা না পাইয়া, পদব্রজে অগ্রসর হইলাম। পথে সন্ধান লইলাম, রামপুর গ্রামষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দূরে। প্রাতে চা ও জলযোগ করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু রামকালালি পৌঁছিতেই বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছিল। তখন পুনরায় স্নানাহারের সময়। এদিকে যান শকট কিছু নাই, মুটে মজুর মিলিল না। অজানা ৪ মাইল পথ কিরূপে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে সুটকেশ হস্তে অতিক্রম করিব, ভাবিতে লাগিলাম। গ্রামবাসী অনেকে রাস্তা নির্দ্দেশ করিয়া দিল, কিন্তু ছোট ছেলে ছোক্‌রাটীও

আমার সুট্‌কেশ বহণ করিয়া আমাকে পৌঁছাইয়া দিল না, পয়সার লোভ তাহাদের নাই। গ্রামবাসী চাষী, তখন সকলে কৃষিকর্ম্মে ব্যস্ত ব্যাপৃত। আমি ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম, যদি পথে কাহাকেও পাকড়াও করিতে পারি, কিন্তু ক্রমে সে আশায় আমার ছাই পড়িল। আমি রৌদ্র মাথায় করিয়া, সুট্‌কেশ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গ্রামের চড়াই-উৎরাই পথ বাহিয়া চলিলাম। কেহ কেহ আমার দীর্ঘকেশ ও চশমাধারী সুশ্রী দেহাকৃতি দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। কেহ বা আমার গন্তব্য স্থলের পরিচয় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমার অবস্থা দেখিয়া আমি মনে মনে হাসিতে ছিলাম। আমার পল্লীগ্রাম বিহারের অন্যতম উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুভব।

পূর্ব্বদিকে পঞ্চকোট পর্ব্বত ষ্টেশনের প্রান্ত হইতে অন্যূন ৮ মাইল বিস্তারিত। তখন মধ্যাহ্ন রৌদ্র করে পাহাড়ের শোভা অপরূপ। সর্ব্বাঙ্গ যেন বাষ্পধূমে ধূমায়িত, তদুপরি শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষবিটপী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। বোধহয় ১৫ মাইল উচ্চ তাহার চূড়া, ক্রমোন্নত হইয়া অসীম আকাশ পটে তরঙ্গায়িত হইয়াছে। পাহাড়ের নিম্নে বিবিধ মাংসাশী সাঁওতাল কাহারদের গ্রাম, পাশাপাশি ক'একখানি চালাঘর হস্তাঙ্গুলিতে গণনা করা যায়। আরো নিম্নে কোথাও গিরিধারা নদীরূপে প্রবাহিত, কোথাও নাতিদীর্ঘ জলাশয়, কোথাও হরিৎ ধান্যক্ষেত্র, আবার কোথাও শূন্য ধূ ধূ প্রান্তর, অনুর্ব্বর উষর-ভূমি। কখনও বটবৃক্ষের, কখনও নারিকেলের, কখনও নিমের, কখনও অজানা কোনও গাছের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া বসিয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিলাম। কোন নদীতে, কোন পুকুরে, অথবা কোন জলাশয়ে জলপানে তৃষ্ণাদূর করিয়া আবার অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রকৃতির চিত্রপটে কোথাও দেখিলাম, মাঠের মাটীর মঠে, মঞ্জীরীর জটাজুটে, নিমীলিত নয়নপটে ধান্যেরা ধ্যান নিরত; মনোহর হেমন্ত বায়ু তাহাদের ভাববিভোর বরাঙ্গ অহর্নিশ ডুলাইয়া যাইতেছে। কোথাও রাখালেরা 'বেউড় বাঁশের বাঁশী' বাজাইয়া কোঁচড়ে মুড়ি ও হাতে পাচনবাড়ি ও মাথায় টোকা পাতিয়া, কাড়া-গরু চরাইয়া ফিরিতেছে। Milton এর লাইনগুলি মনে পড়িল,—

"Russet lawns, & fallows grey,
Where the nibbling flocks do stray;
Mountains, on whose barren breast
The labouring clouds do often rest."

এইরূপে শুইয়া বসিয়া অগ্রসর হইয়া, অপরাহ্ণ বেলায় রামপুর গ্রামে পৌঁছিলাম! নগেন্দ্র বাবু প্রথমেই মার্জ্জনা চাহিলেন, হাতের কার্ড দেখাইয়া সুর ভাঁজিলেন "পিওন এইমাত্র ডেলিভারি করিয়া গেল।" প্রতি সোমবার ডাক-বিলি হয়, অর্থাৎ সপ্তাহে একদিন মাত্র। আমি বলিলাম, "দোষ আপনারও নহে, পিওনেরও নহে, অতএব আপনার মার্জ্জনা প্রার্থনা বৃথা।"

অবেলায় স্নানাহার সাঙ্গ করিয়া, নিদ্রাতত্ত্বের যথাসাধ্য গবেষণা করিলাম। পরদিন অতি প্রত্যূষে গ্রাম পরিদর্শনে বাহির হইলাম। গ্রাম ক্ষুদ্র, সমস্তই চালাঘর, অন্যূন দুইশত লোকের বাস। নিকটে একাধিক পুষ্করিণী কূপ প্রভৃতি আছে। জল অতি পরিষ্কার, কূপজলে পুরুলিয়ার মত বেশ হজমী গুণ বর্ত্তমান; মানভূম জলের ইহাই বিশেষত্ব; অভিন্ন জল সুস্বাদু। মানভূমের জলাশয় তিন প্রকার;—(১) সায়র—চারিপাশে আলি, (২) বাঁধ—একপাশে আলি, (৩) দীঘি—একপাশে আলি দীর্ঘ-গভীর। গ্রামবাসী শান্ত নিরীহ ও কৃষিজীবী। সকলেই মিষ্টভাষী ও বিনয়াচারী। মানভূম জেলার আবহাওয়া বা জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর। পাহাড়ে দেশ বলিয়া শীত গ্রীষ্ম কিছু বেশী। প্রাকৃতিক দৃশ্য নিত্য নূতন। গ্রামে মুদী-দোকান ও পাঠশালা আছে। তরি-তরকারি সকলেই গৃহোদ্যানে উৎপন্ন করিয়া থাকে, এক পয়সাও কিনিতে হয় না। ঘরে-ঘরে গাভী, দুধ-ঘি-মাখনের অভাব নাই। বাল্য-বিবাহ, শৈশব নেশা, মানভূমের একচেটিয়া ব্যবসার মত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সমাজের ভয় গ্রামবাসী সকলের মনেই আছে, জাতি বিচার ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকলেই মানিয়া চলে। দেশে শান্তি শৃঙ্খলা আছে, অযথা শান্তিভঙ্গ করিতে কেহই প্রস্তুত নহে। পাঠশালা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত, গুরুমহাশয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল; তাঁহার একদিন জ্বর রোগ হওয়ায় আমি গুরুগিরিও করিয়াছিলাম। কথায় বলে, পাঠশালা,—কাণ ঝালাপালা।

গ্রামের বাহিরে এক মাইল দূরে, "উতলা নদীর জোড়" মৃদুমন্দ প্রবাহিত। সূক্ষ্ম জলরাশি বালুকণার পাশ কাটাইয়া লজ্জায় যেন লজ্জাবতী লতার মত আপন পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রায় প্রত্যহই প্রাতর্ভ্রমণের জন্য আমরা এই পথেই আসিতাম। দূরে গিরি-পর্ব্বতের দৃশ্য অতি চমৎকার, তদ্দর্শনে কবিচিত্তে অনেক ভাব খেয়ালেরই উদয় হয়! শালুক, করবী, গাঁদা, জবা, কেয়া, পদ্ম ভিন্ন অন্য ফুলপুষ্প সচরাচর নয়ন গোচর হয় না।

১৫ই কার্ত্তিক প্রত্যূষে জলযোগের পর, পঞ্চকোট পর্ব্বতারোহণে বাহির হইয়াছিলাম। সঙ্গী ছিল,—রামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গরাই ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গরাই. কেৎকা নিবাসী শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী গরাই, আর একটি পাংশু ধূসর বর্ণ পোষা কুকুর। বর্গি-হাঙ্গামার সময়ে পঞ্চকোট-মহারাজার ভাগ্য বিবর্ত্তন ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেরই সুপরিচিত। পঞ্চকোট-মহারাজার প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ ও রাজমহলের ভগ্ন প্রাচীর প্রভৃতি দেখিলাম। একদিকে একটি গভীর কূপ রহিয়াছে, জনশ্রুতি রাজ-রমণীরা বর্গি ভয়ে তজ্জলে আত্মহত্যা করেন। প্রাচীন পুষ্করিণী প্রাচীন দেবালয় একাধিক স্থানে স্থানে চোখে পড়িল। প্রত্যেকটী মন্দিরের কারুকার্য্য ও শিল্পচাতুর্য্য নয়নে মনে বিস্ময়োৎপাদন করিল। "নবরত্ন" দেউলের অন্ধকার ভগ্ন সোপান বাহিয়া আমরা মন্দিরের মস্তকোপরি কোন ক্রমে উঠিয়া ছিলাম; মন্দির দেবতা শূন্য ও দুর্ভেদ্য বন জঙ্গলে লুক্কায়িত, বাদুড় চামচিকা উই তন্মধ্যে আত্ম-গোপন করিয়াছে। আপনার স্মৃতিকল্পে অধুনা লক্ষ্মণপুর নিবাসী পঞ্চকোট-মহারাজা প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে একটি নূতন গড় নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা দুয়ারহীন, ছাদ বিহীন ও জনশূন্য। নিয়তির এমনি ব্যঙ্গ যে, তন্মধ্যে কাড়া-মহিষের পূরীষ পরিপূর্ণ। নূতন গড়ের Area ৩০০ শত বর্গফুট; প্রাচীরের Surrounding Area. ৯০০ শত বর্গফুট্।

দুর্ভেদ্য বনজঙ্গল ভেদ করিয়া আমরা কুকুর সহ ২ মাইল উঠিবার পর, শ্রীশ্রীরঘুবর জীউর প্রকাণ্ড দেবালয়ের ভগ্নশেষ অনিমেষ নেত্রে দেখিতে লাগিলাম; মন্দির মূর্ত্তি পরিশূন্য ও উপেক্ষিত। বহু আগন্তুকের নাম সাক্ষর চোখে পড়িল। প্রাণ উদাস করিল, ভাগ্য-লক্ষ্মীর খেয়াল-খেলা বুঝা দায়। ক্রমে একটি ক্ষুদ্র ঝরণাভি মুখে পৌঁছিলাম। এই ঝরণা এখানে "ধারা" নামে অভিহিত। ইহার গতিপথ প্রস্তর কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল. পূর্ব্বে ইহা রাণীদের অন্দর-মহলে পবিত্র দেহ স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়াছে। পথ স্থানে স্থানে আবর্জ্জনা জঞ্জালে বুজিয়া গেছে, হনূমান মুখের মধ্য দিয়া এই "ধারার" জল নিম্নে নামিয়া যাইত, তাহাও কবে মস্তক চূর্ণ জনিত শিরঃশূল যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। এইরূপে আতুড়ি, পোড়াসি, খয়ের কাঁটা, "ধ", কেঁদ, প্রভৃতি বৃক্ষ বিটপী সজোরে ঠেলিয়া, সাত মাইল উঠিয়া, আমরা ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত, কণ্টক বিদ্ধ দেহে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া দ্বি-প্রহর বেলায় বাটী ফিরিলাম। পরদিবস বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিয়া, ১৭ই কার্ত্তিক সন্ধ্যার ট্রেণে রাঁচি যাত্রা করিলাম।

অর্থ যথার্থ কার? ধন্য কে?

লেখক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

১। পরিধান জীর্ণ বস্ত্র মলিন বদন।
জ্বলিছে জঠরানল ঝরিছে নয়ন॥
অনাথ পতিত রোগে, শীর্ণ কলেবর।
মর্ম্মভেদী ক্ষীণ স্বরে ভিক্ষায় তৎপর॥
হেন অন্ধ খঞ্জ জনে করে যে পালন।
তাহারি যথার্থ অথ ধন্য সেইজন॥

(২) সকল স্বজন গত অনাথ পীড়ায়।
আকুল পরাণে ভাসে নয়ন ধারায়॥
অবিরত শয্যাগত একাকী ভবনে।
ভাবিছে সত্বর মৃত্যু হইবে কেমনে॥
হেন জন নেত্র-নীর করে যে মোচন।
তাহারি যথার্থ অর্থ ধন্য সেইজন॥

(৩) অকালে শৈশবকালে পিতামাতা যার।
কঠিণ কালের বশে ত্যজিলা সংসার॥
ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই, করিতে যতন।
সহায় সম্পদ হীন বিষণ্ণ বদন॥
কাতর নয়ন দ্বয়, কেশ তৈল হীন।
অতি রুগ্ন অন্ন বিনা দুর্ব্বল মলিন॥
হেন শিশু পুত্রবৎ করে যে পালন।
তাহারি যথার্থ অর্থ ধন্য সেইজন॥

(৪) উপযুক্ত পুত্র মাত্র করিয়া সহায়।
দরিদ্র জননী ভুলি সুখ সমুদায়॥
আছিল যাহার মুখ করি নিরীক্ষণ।
সঞ্চিত ধনের পাশে কৃপণ যেমন॥
হা ধিক্ বলিতে কথা বিদরে হৃদয়।
যবে কাল হেন পুত্র যার কাড়ি লয়

যে পারে হইতে তার সন্তান যেমন।
তাহারি যথার্থ অর্থ ধন্য সেই জন। ॥

(৫) অকালেতে কালরাহু হইয়া প্রকাশ।
হৃদয়ের পতি চাঁদে করেছে গরাস ॥
চকোরী রমণী যেই চাহি সুধাকর।
সংসার গগণে হেরে তম ঘোরতর ॥
আঁধারে বিরলে বসি ভাবে দিবানিশি।
আর কি উদিবে তার সুখময় শশী ॥
হেঁট মুখে ক্রোড়স্থিত শিশুর বদন।
নিরখি নয়ন জলে ভিজায়ে বসন ॥
সহায় সম্পদ হীন তিন কুলে যার।
নাহি হেন জন যাহে বলিবে তাহার ॥
যে পারে হইতে তার সোদর যেমন।
তাহারি যথার্থ অথ ধন্য সেইজন ॥

(৬) অধীরা সুশীলা বালা সংসার কাননে।
দাবানল মত দগ্ধ অভাব পীড়নে ॥
অধোমুখে যশস্বিনী থাকিয়া নিয়ত।
পতির পবিত্র মূর্ত্তি ভাবে অবিরত ॥
আকুল কাতর প্রাণে ভাবে নিরন্তর।
কোথা যাবে কে পূরাবে তাহার উদর ॥
বিবর্ণ শরীর কান্তি মলিন বদন।
ঊষাকালে শশিকলা মলিনা যেমন ॥
অকূল সাগরে ভগ্ন তরণীর প্রায়।
শোক তাপ ভয়ে যার দিন রাতি যায় ॥
যে পারে হইতে তার পিতার মতন।
তাহারি যথার্থ অর্থ ধন্য সেইজন ॥

(৭) জগতের জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রীবৃদ্ধি কারণ।
অকাতরে অর্থ যেই করে বিতরণ ॥
দীন হীন গুণিজনে যে করে পালন।
তাহারি যথার্থ অর্থ ধন্য সেইজন ॥

শ্রীমদ্ বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাজের মাতৃদেবী সম্বন্ধে কিছু বিবরণ ও—

এ সময়ের দুইটী বিষয় জানাইবার আছে। মাতাজী এ সময়ে প্রকাশ করেন যে, তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, মহারাজের একটী বিষম ফাঁড়া উপস্থিত হইবে। বাস্তবিক ইহা যথার্থই ঘটিয়াছিল। মাতাজীর আগমনের কিছুদিন পরে মহারাজ বিষম-জ্বরে আক্রান্ত হন। তিনদিন তিনি বেহুঁস অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। এ সময়ে মাতাজী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবা-রাত্র মহারাজের শিয়রে বসিয়া জপে নিমগ্না ছিলেন। পরে মহারাজ ক্রমে ক্রমে সুস্থ হন। মহারাজ বলেন যে, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ যাত্রা তিনি এই স্বামীর কৃপাবলেই রক্ষা পাইয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এ সময়ে অবকাশ মত মাতা পুত্রের বহু বার্ত্তালাপ হইত। মাতাজী একদিন মহারাজকে বলেন যে, যখন তাঁহাদের পিতৃকুল ও মাতৃকুলে অন্য বংশ নাই ও মহারাজের ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন বহুদিন ধরিয়া হইয়াছে ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রমে আসিবার নিয়ম আছে, তখন দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে আসিলেই ভাল হয়। মহারাজ বলিলেন যে, মাতঃ যখন নবম বৎসরের সময় তিনি গৃহে আবদ্ধ রাখিতে পারেন নাই। এখন এরূপ আজ্ঞা করিলে পুনরায় যদি তিনি শৌচাদিতে যাইতেছেন, বলিয়া বাহির হইয়া যান, তবে কি প্রকারে তাঁহাকে আবদ্ধ করিবেন। তিনি যে, নৈষ্ঠীক ব্রহ্মচর্য্য জীবন গ্রহণ করিয়াছেন। মাতাজী ইহা শুনিয়াই বলিলেন যে, তাঁহার ধর্ম্মে তিনি কখনও অন্তরায় হইবেন না। তথাপি মাতার কর্ত্তব্য বোধে একবার তাঁহার মন পরীক্ষা করিলেন মাত্র।

মাতাজী সংকল্প করিয়াছিলেন যে, যদি পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে সওয়া লক্ষ বিল্বপত্র মহাদেবের উপর হুস্ত করিবেন। ইহা জানিতে পারিয়া মহারাজ ইহার আয়োজন করিয়া দিলেন। অতি প্রাতে শয্যা হইতে উঠিবার পর মাতাজী স্নানাদি সম্পন্ন করিতেন, ও পূজায় বসিতেন। প্রত্যহ দশ হাজার বিল্ব-পত্র তপোনাথের মস্তকে নিবেদন করিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে করিতে কোন কোন দিন বেলা ২।৩ টা বাজিয়া যাইত। ইহার পর স্বপাকে আহারাদি প্রস্তুত ও ভোজন শেষ হইতে প্রায় সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইত।

এ বিল্বপত্র নিবেদন যেরূপ ক্রমে ক্রমে শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, আমাদের শ্রীগুরুদেবও দেখিলেন যে, তাঁহার মাতাজীর শরীরও যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, মাতাজীর অন্তিম সময় আগত প্রায়। এরূপ সময়ে তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার ৺কাশীধামে যাইতে ইচ্ছা হয় কি? মাতাজী উত্তর দিলেন যে, কাশী যাইবার প্রয়োজন নাই। এ তপোবনই তাঁহার কাশী। মহারাজের সম্মুখে তিনি দেহত্যাগ করিবেন এই তাঁহার সংকল্প তাহাই ঘটিল। শ্রাবণ মাস ধরিয়া মাতাজি বিল্বপত্র নিবেদন করিলেন। ইহার পরই মাতাজীর অল্প অল্প জ্বর দেখা দিল। কয়েক দিন মাত্র জ্বর ভোগের পর ১২৯৯ সালের কৃষ্ণ পক্ষীয়া তৃতীয়া তিথিতে আমাদের এই পরম পূজনীয়া ও পরমারাধ্যা দেবী আজ বহুকাল বিচ্ছেদের পর দেবালোকে ও নিজের সংকল্প বশে তাঁহার নশ্বর পুতদেহ পুত্র সমীপে তপোবনে রক্ষা করিলেন। এ দেহ ত্যাগের পূর্ব্বে মাতাজীর যথাবিহিত সন্ন্যাস ক্রিয়া ও অন্তিম সময়ের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ও পরে অন্ত্যেষ্টি কার্য্যাদি মহারাজ নিজহস্তে সম্পন্ন করিলেন। এ মাতাজীর সমাধি ক্রিয়া এ তপোবনেই অনুষ্ঠিত হয়, ও যে স্থানের উপর মহারাজ একটী ক্ষুদ্র মন্দির পরে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এ মন্দিরের উপর একখণ্ড প্রস্তর ফলকে লেখা রাছে।

"মাতাজী নর্ম্মদা বাই দেবতা জননী।
সমাধি মন্দিরে সুখে আছেন শায়িনী।

এই পুণ্য দিন স্মরণ করিয়া আমাদের গুরুদেব এখনও এই তিথিতে আজ ৩৭ বৎসরকাল এক ভাণ্ডারা দিয়া আসিতেছেন। এ তপোবন এজন্য মহারাজের ও তাঁহার শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের এক তীর্থ ক্ষেত্র। এ তপোবন সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় পরে নিবেদিত হইবে।

মহারাজ অনেক বার আমাদিগকে শুনাইয়াছেন যে, দুইটী বিষয় তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত ছিল। নবম বৎসর বয়ঃক্রমে গৃহ ত্যাগ করিয়া তিনি যেরূপ পর্য্যটন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে অন্তিম সময়ে তাঁহার গর্ভধারিণী ও অভিষ্ট দেবের সম্মুখে যে তিনি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন, তাহার কিছুমাত্র আশা ছিল না। কিন্তু তাঁহার সুকৃতিবলে এ দুইটীই তিনি লাভ করিয়া ছিলেন। ইহার প্রথমটী বর্ণনা করা হইল। অপরটীর বর্ণনা পর প্রবন্ধে করা হইবে।

আইস ভাই! আমরা একবার এই মাতাজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া "জয় মাতা নর্ম্মদাজীকী জয়" বলিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করি।

মহারাজের বয়স কত?

অনেকেই জানিতে ইচ্ছা করেন যে, মহারাজের বয়স কত? কেহ কেহ তাঁহাকে অসাবধান বশতঃ সরাসরি ভাবে ইহা জানিবার জন্য প্রশ্নও করিতেন; এরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তিনি প্রায় হাঁসিয়াই উত্তর দিয়াছেন যে, তিনিত ইহার হিসাব রাখেন নাই। "ইস্‌কো সটিক হিসাব মিল হামারি মায়ীকা পাস্। কিন্তু এ মায়ীতো বহুৎ রোজ চলা গিয়া।" আর এরূপ বলিয়া পুনরায় শুনাইয়াছেন। যে সাধুরা প্রায় নিজের বয়স বাড়াইয়া ও বেশ্যারা কম কম করিয়া বলিবার ইচ্ছা করে। সুতরাং ইহা জানিয়া ফল কি? মহারাজের বয়স কত ইহা নিজমুখে তিনি কখনও ব্যক্ত করেন নাই। তবে দুইটী বিষয় হইতে আমরা ইহার আন্দাজ করিয়াছি। যখন তিনি স্বাধীনভাবে নর্ম্মদা পরিক্রম করিয়াছেন, তখন তিনি প্রায় যৌবনকালে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই পরিক্রমকালে পল্‌টন বিদ্রোহী হইয়া সৈন্যদিগের সহিত লড়াই করিতেছিল, ইহা শুনিয়াছিলেন। এই পল্‌টন বিদ্রোহ হইতেছে, ভারত প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহ এবং ইহা ঘটিয়াছিল, ইংরাজী ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বা বর্ত্তমান সময়ে ৭২ বৎসর পূর্ব্বে। এ সময়ে যদি গুরুদেবের বয়স ২০ বা ২২ বৎসর ধরা হয়, তবে বর্ত্তমান সময়ে বয়স হইবে ৯১ বা ৯৪ বৎসর অথবা ইহারও কিছু অধিক। অন্য হিসাবেও ইহা আন্দাজ করা যায়। তাঁহার মাতৃদেবী যখন তপোবনে আগমন করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে ২।৪ জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে, তাঁহার বয়স প্রায় অশীতি বৎসর হইয়াছিল। আমরা কম করিয়া ইহা ৭৫ বৎসর ধরিয়া লইতেছি। এই মাতৃদেবীর দেহত্যাগ হইয়াছে আজ ৩৭ বৎসর। সুতরাং এই উভয় মিলাইয়া যে ১১২ বৎসর হয়, তাহা হইতে মাতার ১৬ বৎসর বয়সে যদি মহারাজের জন্ম হইয়া থাকে, তবে ১১২ বৎসর হইতে উহা বাদ দিলে মহারাজের বর্ত্তমান বয়স ৯৬ বৎসর হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত হিসাবের সহিতও অনেকটা মিলিয়া যায়। এজন্য সঠিকভাবে এ বয়সের বিষয়ে কেহ অনু-সন্ধিৎসু হইলে, আমরা ইহাই বলিব যে, তাঁহার বয়স ৯০ বৎসরের উপর ও শত বৎসরের সমীপবর্ত্তী। তবে এইমাত্র বলিব যে, এ পুতদেহ এ ভারতবর্ষের এক প্রাচীন মূর্ত্তি।

শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গল বা কালকেতু

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় । কাব্যরত্নাকর

চতুর্দ্দশ দৃশ্য—কালকেতুর কুটীর।

ফুল্লরা ও কালকেতু।

ফুল্লরা। (বিষণ্ণ বদনে) আমি তোমার আশাপথ চেয়ে আছি। সেই ভোরে গিয়েছ, দিবা শেষ হ'লো তোমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। শিকারে কি পেলে?

কালকেতু। হা ফুল্লরা, দুঃখের কথা কি আর বল্‌বো, আজ কি কুক্ষণেই বেরিয়েছিলাম, বনভূমি ঘোর কুয়াসাচ্ছন্ন থাকায় কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। যখন মধ্যাহ্নকাল, মাথার উপর সূর্য্যদেব, তখনি সূর্য্যের কিরণে দেখ্‌তে পেলাম একটি হরিণ শিশু, কিন্তু এমনি দুর্দ্দৈব ফুল্লরা, সেই মৃগ বোধ হয় মায়ামৃগ, চকিতে দেখা দিয়ে চকিতেই কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আর তারে দেখ্‌তে পেলাম না। এমনি করে বরাহ মহিষ হরিণ প্রভৃতি কত পশুই দেখা দিলে, কিন্তু তারা মোটেই পশু নয়, গাছের ডাল, মাটির ঢিবি আর জঙ্গল। নিতান্তই দেব-মায়া ফুল্লরা! নৈলে আমার অব্যর্থ শর-সন্ধানে একটি ক্ষুদ্র পক্ষীও অব্যাহতি পায় না, হরিণ কোন্ ছার।

ফুল্লরা। হায়! হায়! আজ কত আশা করেই বসে আছি, যে হরিণের মাংস দিয়ে আমার সইকে দুটি খেতে বল্‌বো; তা আর হ'লো না কি আর কর্‌বো? তোমার জন্য যে একটু খুদ কুঁড়াও নাই। দেখি সইএর ঘরে যদি কিছু পাই। আহা শা, সারাদিনটা তোমার আজ বড়ই কষ্টে কেটেছে! আচ্ছা, তুমি হাত মুখ ধোও দেখি, আমি চট্‌করে সইএর কাছ থেকে আসি। [প্রস্থান।

কালকেতু। যার ঘরে তোমার ন্যায় পতিপ্রাণা স্ত্রী আছে, তার আর অভাব কি প্রিয়ে! সমস্ত দিনের অসহ্য ক্লান্তি, তোমার প্রফুল্ল কমলের ন্যায় মুখখানি দেখেই সব জুড়িয়ে গেল। মা মঙ্গলময়ি! আমাকে চিরদিন দরিদ্রই রেখো মা, কিন্তু তোমা চরণ কমলে ব্যাধের এই

কা'র প্রার্থনা, যেন ফুল্লরার চিরফুল্ল কুসুম কমলে কালিমার ছায়া না দেখ্‌তে হয়। ফুল্লরার সঙ্গ হ'তে বিচ্যুত করো না মা!

(জনৈক ভিখারিণীর প্রবেশ)

ভিখারিণী। গান।

আমায় ভিক্ষা দে মা!
আমি যে চির কাঙ্গালী পেটে নাইকো দানা।
সারাদিনটা ঘুরে ঘুরে কিছুই পেলেম না
ঘরে গেলে দেখ্‌বো কি আর স্বামী বাঁচে না
ছেলে দুটি লুটোপুটি কাঁদে
বলে "খেতে দেনা" "খেতে দেনা"॥
তেল বিনে মোর গায়ে উড়ে খড়ি
ক্ষুধার জালায় আঁত পুড়েছে তাইতে লড়ি ধরি
আমার চল্‌তে টলে গা
পিপাসায় ছাতি ফাটে একটু জল দেমা
আমায় একটু ঠাণ্ডা জল দেমা॥

(বসিয়া পড়িলে কালকেতু "হায় হায়" বলিয়া উঠিল)

ভিখারিণী। একটু জল।

কালকেতু॥ সুস্থ হও। শান্ত হও। আমি জল এনে দিচ্ছি। (স্বগত) শুধু জল কি করে দি। বাসি মাংস নিয়ে গোলাহাটে যাই, তাতে যা পাব, এঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'বে। ইনি কি আমার হাতে জল খাবেন? ভিখারিণীর বেশে ইনি কোন্ মহৎ কুলে জন্ম নিয়েছেন কে জানে? (প্রকাশ্যে) মা আমরা নীচ ব্যাধ জাতি! আমার ছোঁয়া জল কি চল্‌বে?

ভিখারিণী। খুব চ'ল্‌বে বাবা! দারুণ পিপাসা। ভক্তি শ্রদ্ধায় আমায় যে যা দেয়, আমি তাই খাই। জল দাও বাবা জল—

কালকেতু। অত্যন্ত ক্ষুধার সময় শুধু জল খেয়ো না মা। আমি গোলাহাট থেকে কিছু খাবার কিনে আনি। মা চণ্ডিকে! ততক্ষণ বৃদ্ধাকে বাঁচিয়ে রেখো মা। দেখো মা দুর্গে! অসময়ের অতিথি যেন বিমুখ না হয়। [মাংসের পসরা লইয়া কালকেতুর প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—বন পথ।

জনৈক কপট সাধু ও তীর্থ যাত্রিনী।

সাধু। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। হরি বল মন! সব অসার। সার কেবল হরিনাম। হরিনামে প্রেম হবে। সেই প্রেমে প্রেম-ময়ের চরণ পাবে। তবে গুরু চাই। গুরু চাই। গুরু নৈলে প্রেম দেবে কে? (মালা জপ)

তীর্থ যাত্রিনী। হরি বল! হরি বল। আমার বহু ভাগ্য যে তোমার মতন সাধুর সঙ্গে দেখা হ'লো। ৺বৃন্দাবন ধাম পর্য্যন্ত যাবা ত ঠাকুর!

সাধু। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামই ত যাবো। ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিয়ে মানব জনম সফল হবে। হরি বল মন হরি বল। তোমার কাছে টাকাকড়ি যা আছে, ভাল করে রাখো। রাস্তাটা তেমন সুবিধে নয়, বুঝেছ?

তীর্থ যাত্রিনী। (আতঙ্কে) সুবিধে নয় কি গা! চোরের ভয় নেই ত? ওমা আমার ধান কোটা আর ঘুঁটে বেচা তিন কুড়ি টাকা যে গেঁজেয় বাঁধা আছে। কি ক'রে রাখ্‌বো?

সাধু। কোনও ভয় নাই। নির্ভয়ে বল হরিবোল হরি! আমি যখন সঙ্গে রয়েছি, তখন ভয় কিসের? বলি তোমার গুরু আছে কি?

তীর্থ যাত্রিনী। না ঠাকুর আমার গুরু দেহ রক্ষা করেছেন।

সাধু। আবার গুরু কাড়। বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দ লালা। আর প্রেম দাতা গুরু। হরিবোল হরিবোল।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—বনপথ।

তীর্থ যাত্রিনী। আবার গুরু কাড়া হয় কি?

সাধু। নিশ্চয় হয়।

"আদ্য গুরু দীক্ষা দেয় পটল গুরু দেখে।
তীর্থ গুরু কড়ি লয়, খাতায় নামটি লেখে॥

এ সব শাস্ত্রের বচন। হরি বল মন। তুমি এখনি গুরু কাড়। গুরু নৈলে ভবার্ণবে কে পার কর্‌বে? সে যে অতি ভয়ঙ্কর। যেমন তরঙ্গ তার তেমনি স্রোত। কে রাখ্‌বে?

তীর্থ যাত্রিনী। তবে বাবা আপনি আমার গুরু হও।

সাধু। বেশ্‌ বেশ্‌। তুমি নিকটে অই যে নদী দেখ্‌ছ, অই নদীতে স্নান করে শুদ্ধ হও। আমি এই গাছতলায় একটু বসি। হরিবল মন হরিবল।

তীর্থযাত্রিনী। বাবা ঠাকুর! আমার যথা সর্ব্বস্ব রইল। আমি তবে স্নান করে আসি।

সাধু। যাও যাও শুভস্য শীঘ্রং। শুভস্য শীঘ্রং।

[পোঁটলা রাখিয়া বৃদ্ধার প্রস্থান।

হা বুড়ি বেটি! তিনকুড়ি। কৈ দেখি তিনকুড়ি!

(পোঁটলা খুলিয়া টাকা দেখিয়া সোল্লাসে)

যা বেটি তুই দরিয়ায়। এদিকে তোর তিনকুড়ি পালায়।

[সাধুর প্রস্থান।

তীর্থ যাত্রিনীর প্রবেশ।

তীর্থ যাত্রিনী। এই সেই অশ্বত্থ গাছ তো? হাঁ এইটেই বটে! তবে সাধু কৈ? তাই তো আমার পুঁটুলিই বা কৈ? তবে কি সাধু—না না অমন হরিভক্ত। তা হতেই পারে না। তাই তো কি হ'ল (উচ্চরবে) বাবা ঠাকুর! বাবা ঠাকুর! কোথায় আপনি? অই যে, অই যে.— (কিয়দ্দুর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) নাঃ সাধুরই কাজ। হা হরি! আমার যথা সর্ব্বস্ব নিলে

(ক্রন্দন ও বিলাপ "ওরে আমার তিনকুড়ি রে ইত্যাদি)

বালক বেশে শ্রীহরির আবির্ভাব।

শ্রীহরি। গান।

বাঁধন্‌ দিয়ে বাঁধিস্‌ না আর ভবের বাঁধন কাটো না।
মিছে কেন কেঁদে মরিস্‌ ধন দৌলত কিছু না॥
আত্মীয় কুটুম্ব গিঁটে, সর্ব্বাঙ্গ বেঁধেছে এঁটে
মায়াজাল কি অমনি কাটে মায়াময়কে ডাকে না।
তখন ঘুচে যাবে মনের দুঃখ ঘুচে যাবে যাতনা॥

বৃদ্ধা। আহা কি মধুর গান। প্রাণ যেন এ সংসারের মায়া কাটিয়ে দিয়ে কোন্ অচিন দেশে উড়ে যাচ্ছে। বাবা তুমি এই বিজন বনে কোথা থেকে উদয় হ'লে? কে তুমি বাবা?

শ্রীহরি। আমি ত তোমাদেরই দেশের গো। তুমি যখন বাড়ী থেকে "হরি হে তুমিই আমার আশ্রয়" বলে পা বাড়ালে আমিও আর থাক্‌তে পারলুম না। বৃন্দাবন আমার অতি প্রিয় ধাম। তাই সঙ্গ নিলুম। এখন চল। বস্‌লে কেন?

বৃদ্ধা। বসলুম কেন? বাবা, আমার যথাসর্ব্বস্ব চুরি গেছে, ধান কুটে আর ঘুঁটে বেচে তিনকুড়ি টাকা করেছিলাম. তা বাবা, এই অরণ্যে এক কপট সাধু চুরি করে নিলে। আমি কেমন করে বৃন্দাবন ধাম যাবো বাবা?

শ্রীহরি। হা বেটি বুড়ি, তোর তিনকুড়ি কে দিয়েছিলো? কে নিয়েছে, তুই যাকে আশ্রয় করে পথে পা দিয়েছিস্, তাকেই সব ভার দেনা, বুড়ি তিনকুড়িতে তোর কাজ কি?

বৃদ্ধা। হাঁ বাবা, তুমি আমার দেশের লোক বল্‌ছ, কিন্তু তোমাকে কখন ত দেখিনি। এমন মধুময় কথা কখনও ত শুনিনি, তুমি কি আমার কাঙ্গালের ঠাকুর সেই বিপদ তারণ হরি! হরি হে! কাঙ্গালের নাথ! আমার চামড়ার চোক্, আর যে তোমায় দেখ্‌তে পাই না? কোথায় তুমি কোথায়? কাঙ্গালিনীকে এত দয়া তোমার?

শ্রীহরি। বৃন্দাবন যাবার একান্ত আকাঙ্খা নিয়ে বেরিয়েছ, তখন বৃন্দাবন বিহারী হরি সর্ব্বক্ষণ তোমার সঙ্গী হ'য়েছেন। অর্থের বাঁধনে যখন তোমার মনটি আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা ছিল, তখন তাঁকে সব মনটি দিয়ে ডাক্‌তে পারনি। তাই সে বাঁধন কেটে দিলুম। এখন নিরাবলম্বন মনটি মন-চোরের চরণে রেখে, তাঁর মনমোহন বেণুবাদন শুন্‌তে শুন্‌তে চলে এস। আর অর্থ চাও ত বল আবার তিনকুড়ি ফিরিয়ে দিই। (বেণুবাদ্য ও তিরোধান)

বৃদ্ধা। হরি হে কোথায় তুমি, কোথা কাঙ্গালের ঠাকুর! আর কেন আমায় অর্থ দিয়ে পরমার্থ ভুলাতে চাও। আমার চোখের মায়াজাল কেটেছে। আঁধার ঘরে বিজলী বাতি জ্বলেছে, অই

অই অই জলধর শ্যামকান্তি দেখ্‌তে পাচ্ছি; অই তাঁর দুটি রাঙ্গা পায়ে সোণার নুপুরের রুণ্‌রুণ্ বাজনা বাজ্‌ছে! বংশীধারী আমায় নিয়ে চল হরি! (ছুটিয়া চলিলেন)।

(কপট সাধুর টাকার পুঁটুলি হস্তে প্রবেশ।)

সাধু। বাপ্‌রে বাপ্ তিনকুড়ি! তিনকুড়ির এত ভার? এ ভার যে আর বইতে পার্‌ছি না। বাপ্‌রে বাপ্ হাত জ্বলে গেল, পা জ্বলে গেল, ঘাড় গর্দ্দান বসে গেল। (উপবেশন) অই কিসের শব্দ হ'চ্ছে নয়? হয়েছে! আর কেন? এ বনে ডাকাত ঢুকেছে। এখনি আমাকে ধর্‌বে, আর তিনকুড়ির লোভে বল্লমের খোঁচা দিয়ে নাড়ী ভুড়ি বের্ করবে। হায়, হায় তিনকুড়ি! হায়রে হায় বুড়ি! কর্‌লি কি? তিনকুড়ি দেখিয়ে মার্‌লি? এখন করি কি? বিপত্তে মধুসূদন! এবার আমায় ক্ষমা কর দয়াল! অই যে এসে পড়্‌লো। হায়, হায় তিনকুড়ি তোমায় আগে দূর করি (থলিয়া জঙ্গলে ফেলিয়া) এইবার চোখ বুজে নীরদ বরণের ধ্যান করি। পালিয়ে কোথায় যাব? (তথাকরণ)

(ডাকাতগণের মার্ মার্ শব্দে প্রবেশ।)

১ম ডাকাত। ঠিক দেখেছি একটা লোক টাকার থলে নিয়ে দৌড়্‌চ্ছে।

২য় ডাকাত। কৈ তবে? আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে যাবে কোথা? এই যে একজন সাধু ধ্যানে বসে আছেন। এঁকে জিজ্ঞেস্ করবো?

১ম ডাকাত। না রে না। দেখছিস্ না সাধু একমনে চোখ বুজে কালীমার চেহারা দেখ্‌ছেন। এখন কথা কবে কেন?

২য় ডাকাত। তবে এঁকে পেন্নাম ক'রে কাজে যাই চল্। ঠাকুর পেন্নাম হই।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

সাধু। কপট গেরুয়াধারী সেজে যদি বংশীধারীর দয়া পাই, বনের মাঝে ডাকাতে না মেরে চরণ ধরে, তা হ'লে সত্যকার সাধুরা তাঁর দয়া পাবে না কেন? হা মূঢ় মন! বৃথায় অর্থ লোভে এতদিন ভবে ঘুরে মলি, মুরলীধরের স্মরণ করলি না। যাও রিপুগণ! মধু রিপুর রাঙ্গা চরণে আশ্রয় লওগে। আমি আজ

থেকে কপট বেশ পরিত্যাগ ক'রে কপটের শিরোমণি চিন্তামণির চরণ চিন্তা করিগে !

[প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

দ্বিতীয় দৃশ্য—বনপথ ।

ধর্ম্মকেতু ও নিদয়া ।

ধর্ম্মকেতু । এক পক্ষ কাল ক্রমাগত হেঁটে হেঁটে শরীর অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে ! নিদয়া আমি একটু বসি, (উপবেশন) এই বনপথ অতিক্রম কর্‌তে পারলেই বাবা বিশ্বনাথের দর্শন পাব । ক্রমেই পিপাসা বাড়ছে নিদয়া !

নিদয়া । পিপাসার দোষ কি ? বেলা ত কম হয়নি । বনের মধ্যে সূর্য্য দেখ্‌তে পাইনি তাই । অই যে নদীর মত দেখ্‌তে পাচ্ছি ; তুমি একটু বস আমি জল আনি ।

ধর্ম্ম । না নিদয়া যেও না । অচেনা পথ কোথায় গিয়ে পড়বে, তখন খুঁজে পাব না । একটু বিশ্রাম করি, পরে একত্রেই জলপান করবো ।

নিদয়া । কিছু ভেবো না, অই যে নদীর জল দেখ্‌তে পাচ্ছি । কমণ্ডলু ভরে জল নিয়ে আসি । এইখানেই থেকো । কোথাও যেওনা যেন । [প্রস্থান ।

ধর্ম্মকেতু ॥ আহা পতিপ্রাণা নিদয়া, তোমার কি স্নেহভরা হৃদয় ! সংসারের চিরানন্দ প্রস্রবণ নন্দনকে গৃহে রেখে আমার অরণ্য সহচরী হ'য়েছ । একবারও আমার সঙ্গ ছাড়া হওনি, তিনদিন কিছু পেটে নাই, কেবল নদীর জল আর বনফল ভোজন । তবু ত আমার জন্য তোমার চিন্তার অন্ত নাই । এই জন্যই সংসার মরুভূমে দয়াময়ী নারী রূপা স্রোতস্বিনীর সৃষ্টি করে, তৃষিত পান্থের পিপাসা নিবারণ কচ্ছেন । ধন্য নারী তোমার হৃদয়, ধন্য তোমার প্রাণ !

(জল ও টাকার থলি লইয়া নিদয়ার প্রবেশ ।)

ধর্ম্মকেতু । নিদয়া, তোমার হাতে ওটা কি ?

নিদয়া । ভগবান শঙ্কর কৃপা ক'রে বনের মাঝে ধন দিলেন । আমি জল নিতে যাচ্ছি । আমার বাম চক্ষু নাচ্‌লো, ভাবলুম এ বিজনে আবার ধন প্রাপ্তির আশা কোথায় ? দেখিনা ধনদাতা শম্ভুনাথ আমাদের জন্য এ বিজন অরণ্যেও ভাণ্ডার খুলে দেছেন ।

ধর্ম্মকেতু । (প্রণাম করিয়া) ভগবান্ তোমার এত দয়া ? নৈলে তোমায় "দারিদ্র দুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়" বল্‌বে কেন ? হে করুণা সাগর শম্ভুনাথ ! দাসের কাতর কণ্ঠের ডাক কি শুন্‌তে পেয়েছ প্রভু ? কিন্তু নাথ ! অসার ধনের মায়ায় ভুলিয়ে রেখে পরম ধন তোমার রাজীব চরণে দাসকে বঞ্চিত করো না । নিদয়া, চল চল সত্বর চল । বারানসীপুর পতিস্থরহরের শ্রীচরণে আশ্রয় নিইগে । জয় শিবশম্ভো ! জয় শিবশম্ভো ।

(উভয়ের নিষ্ক্রমণ) ।

ক্রমশঃ ।

সৎ প্রসঙ্গ ।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ।

ঈশ্বর কি পক্ষপাতী ?

বরাহ নগরে যদুকিশোর চক্রবর্ত্তী নামে এক শূদ্র যাজক ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি বহু সন্তানের জনক এই জন্য দারিদ্র্য তাঁহার চির সহচর হইয়াছিল । তাঁহার সামান্য চারি বিঘা অনুর্ব্বর জমিতে এক মাসের উপযুক্ত শস্যও জন্মিত না । অথচ তাহারই পাশে রামজয় বাগ্দীর পাঁচবিঘা জমিতে যে পরিমাণ ফসল হইত, তাহাতে তাহার ছয়মাস কাল সুখে স্বচ্ছন্দেই চলিয়া যাইত । রামজয় প্রতি মাসের শেষে "হরিরলুট" দিয়া বাগ্দী পাড়ার ছেলেদের হাতে নাড়ু বাতাসা দিত । বাগ্দী বালকগণের মধুর কণ্ঠে মধুর "হরিবোল" শুনিতে শুনিতে রামজয় নাচিতে থাকিত । তাহার চক্ষে অশ্রু বন্যা বহিত । বাগ্দী বুড়া ধুলায় লুঠিয়া গড়াগড়ি দিত । যদুকিশোর নিয়তই তাহার হিংসা করিতেন, এবং যখন তখন গালিও দিতেন । যদুকিশোর রামজয় বাগ্দীকে "দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ" বলিতেন ।

একদিন গ্রামের মধ্যে ভাগবত কথা হইতেছে । গ্রামের ধর্ম্মপরায়ণ নরনারীগণ

তথায় ভাগবত কথামৃত শুনিতেছেন, এবং সুদামা চরিত শ্রবণে শ্রোতৃগণ ভক্তি গদ্‌গদ্ কণ্ঠে "হরিবোল" "হরিবোল" বলিতেছেন। কথার শেষে বটুকিশোর বলিলেন, "ঈশ্বর নিশ্চয় পক্ষপাতী। নতুবা নিজের ভক্তকে অমন ধনী করিলেন কেন?" কথক আচার্য্য মহাশয় একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ তোমার মনের ভাব বুঝেছি, ঈশ্বর তোমাকে দয়া করেন না কেন?" তা বটে। তোষামদে কে তুষ্ট না হয়? কিন্তু তুমি যে দিনান্তেও তাঁর তোষামদ (স্তব) কর না, সেই হেতু তোমার এই দশা।"

একটু চুপ করিয়া আচার্য্য আবার বলিলেন, ও পাড়ার নন্দ বোস ঠাকুরকে ঠিক এই কথাটিই প্রশ্ন করেছিলেন।" "তাঁহার কৃপায় সব হয়" তাহ'লে বুঝতে হয়, যে তিনি কাউকে কৃপা কাউকে অকৃপা করে থাকেন। অতএব অভক্তগণের তিনি নিদয়, ভক্তগণের পক্ষে সদয়।

ঠাকুর বলিলেন, "তিনি নিজেই সব।" শ্রীগীতায় ভগবদ্ বাক্য—

"অথবা বহু নৈতেন কিং জ্ঞানেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"

হে অর্জ্জুন! (আমি কিসে কিসে কোথায় থাকি) এত জ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? আমি একাংশ দ্বারা এই সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি। ইহাই জানিয়া রাখ।

"তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ"

তিনি সেই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। এই জন্যই তিনি "বিষ্ণু"।

শ্রীভগবানের অনন্ত কার্য্য জন্যই অনন্ত রূপ ও অনন্ত নাম। সেই অনন্তের তত্ত্ব যতগুলি ভক্তগণ জানিতে পারেন ততই লাভ।

বিশ ধাতুর অর্থ প্রবেশ। শ্রীভগবান হিরণ্যগর্ভ মূর্ত্তিতে বিশ্বের সর্ব্ব স্থানেই অনুপ্রবিষ্ট আছেন। অথবা তাহাতেই সকল ভুবন প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, এইরূপ বোধ ভাগ্যবতী যশোদা মাতার মনে হইয়াছিল। কথাটি মন দিয়া শ্রবণ কর।

একদা মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ক্রন্দন নিরত দেখিয়া কোলে লইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলেন। যশোদাদুলাল কোলে বসিয়া স্তন পানের জন্য বদন ব্যাদান করিতেই মাতা দেখিলেন যে, সসাগরা সপর্ব্বতা এই চতুর্দ্দশ ভুবন, তাঁহার গোপালের বদন মধ্যেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি গোপালকে ঈশ্বর জ্ঞান

করিলেন। তখন বাৎসল্য রসের তিরোভাব হইল। দাস্যভক্তি হৃদয় অধিকার করিল। তিনি দেখিলেন, অনন্ত কোটি জীবপুঞ্জ কেহ মরিতেছে, কেহ ভূমিষ্ঠ হইতেছে, বাড়িতেছে, বিবাহ করিয়া সংসার পাতিতেছে, আবার কালের আকর্ষণে শেষ শয্যায় শয়ন করিতেছে। ক্ষণিকের খেলা, কেবল ক্ষণিকের সংসার মেলা!

যশোমতী বিস্মিত হইয়া গোপালের পদযুগল ধারণ করিয়া স্তব করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় শ্রীহরি নিজ দৈবী মায়ার বিস্তার করিলেন।

ত্রিগুণাত্মিকা মায়া "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে॥

এই ত্রিগুণযুক্ত মায়া দুরত্যয়া। ত্যাগ করিবার সাধ্য নাই। কিন্তু যিনি ঈশ্বর দর্শন লাভ করিয়াছেন, তিনিই এই মায়াসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীহরির মায়ায় মাতার বাৎসল্য ভাব ফিরিয়া আসিল। তিনি সন্তান বোধে ঈশ্বরকে স্তন্যপান করাইতে এবং ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

এই ঈশ্বর। তাঁহার লীলা একটি নয়, অনন্ত কোটি। লীলাতেই তাঁহার পরমানন্দ! লীলাতে তাঁহার স্ফূর্ত্তি!

"একদিন মায়ের পূজা করিতে গিয়া দেখি, মা আমার সমস্তই হয়েছেন। কোশা, কুশী, আসন, চন্দন, ফুল পর্য্যন্ত। কাহার পূজা কর্‌ব? নিজের মাথায় কতক ফুল চন্দন চড়ালেম।"

"তিনি নিজেই তুমি আমি সমস্ত হ'য়েছেন, যখন পূর্ণ জ্ঞান হবে, তখন ঐ বোধ আস্‌বে। তিনি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মূলপ্রকৃতি; ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম; রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ; বাক্, পানি, পায়ু, পাদ, উপস্থ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব তিনি কার উপর পক্ষপাত কর্‌বেন; তোমার মধ্যেও তিনি, নিধিরামের মধ্যেও তিনি।"

যদুকিশোর বিনীত ভাবে বলিলেন, "তবে আমার এই দশা কেন? হরিকে কত কাকুতি মিনতি করি, বলি "হে ঠাকুর দুবেলা পেটভরে খেতে দাও।" "কিন্তু পেট আমার ভর্‌ল না। আর ভর্‌বেও না। হরির কৃপা পেলেম না ত।"

আচার্য্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন, পরে বলিলেন, "কর্ম্মফল, পূর্ব্বজন্মে যেমন কর্ম্ম করেছি, এ জন্মে সুদসহ তাই ফিরে পাচ্ছি। নৈলে এদশা কেন। পূর্ব্বজন্মে অন্নহীনকে অন্ন দিই নাই, বস্ত্র হীনকে বস্ত্র দিই নাই, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান করিনাই, এজন্মে সেই হেতু হা অন্ন, হা অন্ন, শব্দে আকাশ বিদীর্ণ কচ্ছি। কর্ম্মফল।

কে বলে অক্রূর ! তুমি হে অক্রূর,
ক্রূর-শিরোমণি চোরকানু চোর,
খর আঁখি পাতে আজি হে তোমার,
এ ব্রজ-লীলা ফুরাল ॥

৭। বিফল রোদন সখি ! বিফল সকলি,
পায়ে ঠেলি গেল চলি আজি বনমালী.
আমার আমার বাঁধে, বাঁধি হৃদে অলি,
হরি স্মরি হর কাল হ'বে হরি ময় ॥

রথ-সঙ্কীর্ত্তন।

"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"।

লেখক— শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ।

১। সত্য-সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন, ব্রহ্মময় নারায়ণ।
(তুমি) পতিত পাবন, অধম-তারণ, দুরিতবারণ, দীননাথ
দীনে হইয়ে সদয় ওহে দয়াময়,
আজি বিরাজ হৃদয় রথে জনার্দ্দন ॥

২। লইয়ে মুক্তি-রূপিণী, সতী সুভদ্রা-ভগিনী,
ভ্রাতা বিবেক-রাম সাথে হে—
ব'স' হৃদয়-রথে জগন্নাথ হে—জগবন্ধু হে—

৩। মানস-সারথি হবে বাজি-রিপুগণ,
জ্ঞান-পথে ধাবে রথ শ্রীমধুসূদন !
(মোক্ষ-পুরী পানে) (পরমেশ হে—)

৪। কামাদি কুচক্র-দল, অবশ সদা স্ববশ,
হবে বাধ্য লক্ষ্য-পথে ধাইতে—
(রথের টানে টানে হে—)

৫। বিরাগ-অনিল র'বে অনুরাগে হায়।
উড়িবে শান্তির ধ্বজা রথেরি চূড়ায় হে ॥

৬। প্রাণ মেতে হরি ভাবে, হরি ব'লে হে,
ঐ রথ হ'তে আনন্দেতে হরিনামের লুট ছড়াবে ॥

৭। সদা হরি পদানত, শম,দম, যাত্রি-যত,
প্রেম ভরে গাবে হরি গুণ।
পথে শ্রীনাম শ্রবণে, রথে হরি দরশনে,
সকল হইবে এ জীবন হে।
(শমন দূরে যাবে)

৮। আমি আনন্দে শ্রীধামে ক'র্'ব' গমন ॥

জন্মভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৬শ বর্ষ } ১৩৩৭ সাল, শ্রাবণ। { ৪র্থ সংখ্যা।

মোটর সাইকেলে ১২০ মাইল।

লেখক—শ্রীযুক্ত হরিভূষণ রায়।

গত ৩রা জানুয়ারিতে আমরা বৈদ্যনাথ (দেওঘর) হইতে সকাল ৮টার সময় Motor cycle এ ভাগলপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভাগলপুর ও দেওঘরের দূরত্ব প্রায় ১২০ মাইল। পূর্ব্বে আমাদের এক পাণ্ডার নিকট শুনিয়াছিলাম, ভাগলপুর যাবার নাকি দুইটি রাস্তা আছে, একটির দূরত্ব প্রায় ১২০ মাইল ও অপরটির ৯০ মাইল। যাহা হউক, আমরা সেই ১২০ মাইলের রাস্তাই ধরলাম, এই রাস্তাটি ডুমকা (Dumka) হ'য়ে যেতে হয়। আমরা বেলা প্রায় ৮৷৷০।৯ টার সময় ত্রিকুট পাহাড়ের নিকট পৌঁছিলাম, শুনা যায়, এই পাহাড়টিই নাকি সাওতাল পরগণার (S' P.) মধ্যে সব চেয়ে উঁচু। পাহাড়টি প্রায় ৬ মাইল লম্বা ও উচ্চে প্রায় ২৫০০ ফিট্। এই পাহাড়ে দেওঘর হইতে বহু ভদ্রলোক বেড়াইতে আসেন, ইহাতে দুইটি সাধুর আশ্রয়ও আছে, এবং ঐ কারণে খানিকটা সিঁড়ি গাঁথাও আছে। যাক্ আমরা ত্রিকুট হইতে আরও ১০ মাইল অগ্রগামী হইয়া এক স্থানে Halt কর্লাম। প্রায় কুড়ি মিনিট বিশ্রামের পর আমরা আবার ত্রিচক্র যানে ডুমকা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ডুমকা Town এর নিকটে 45th. Milestone এর বাঁ দিকে একটি Board এ লেখা আছে, "To Bhagalpore 74 Miles", আমরা সেই রাস্তা ধরিলাম, কিছুদূর গিয়া আমাদের গাড়ীর Chain খুলিয়া হওয়ায় আমাদের ২০ মিনিটের

জন্য পুনরায় থামতে হ'ল। ইহার পর প্রায় মাইল ১০ এক অগ্রসর হইয়াই আমরা অতি সুন্দর রাস্তা পাইলাম, এই রাস্তার দুই ধারেই ছোট ছোট পাহাড় ধূম্রদেহ উত্থান করিয়া টানা রাস্তার সঙ্গে দৌড়িয়া চলিতেছে; কি সুন্দর দৃশ্য। এই স্থানটি হইতে আসে, পাশে ৯০ মাইলের মধ্যে যত পাহাড় আছে, সবগুলিই প্রায় দৃষ্ট হয়। আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, দৃশ্য ততই মনোরম বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বেলা প্রায় ১৷৷০ টার সময় আমরা ননীর হাটের (Nanir hat) নিকটবর্ত্তী হ'লাম, এই স্থানের দৃশ্য আমার কাছে পূর্ব্বের দৃশ্য অপেক্ষা আরও সুন্দর বলিয়া মনে হইতেছিল। ননীর হাট একটি ক্ষুদ্র Town বলিলেও চলে। রাস্তার ধারেই একটি সুন্দর ডাক বাংলো, ডাক বাংলোর পাশ দিয়েই একটী চওড়া রাস্তা ননীর হাট Town এর মধ্যে এঁকে বেঁকে চ'লে গেছে। Town টির দৃশ্যই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, ইহা একটী পাহাড়ের ঠিক তলদেশে অবস্থান করিতেছে; দুর হইতে সাদা, সাদা, গৃহগুলি অতীব মনোরম বলিয়া মনে হয়। এই স্থানে Bhagalpore Road প্রস্থে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ইহা প্রায় আমাদের কলিকাতার Red Road এর ৫।৬ গুণ হইবে। এই রাস্তার দুই পার্শ্ব হইতে দুইটি বিশাল বটবৃক্ষ উভয়কে পরস্পর আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া আসিয়াছে, দুর হইতে মনে হয়, যেন একটি প্রকাণ্ড ফটক। আমরা এই স্থানে থামিয়া কিঞ্চিৎ ভোজন কার্য্য সমাধা করিলাম। এই স্থানটী এতই সমতল যে, এখান হইতে প্রায় ৬০।৭০ মাইল দূরে অবস্থিত, ত্রিকুট পাহাড় স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখান হইতে Start করে বেলা প্রায় ৩৷৷০ টার সময় বউসির (Bousi) নিকটবর্ত্তী হইলাম, এই স্থানের লোকজন, চৌকিদার ইত্যাদি আমাদের Suit পরা দেখে বড় Officer জ্ঞানে Salute এর ঠেলায় অস্থির করিয়া তুলল। আমরা কিছুদুর অগ্রসর হইয়া দেখি যে, বিস্তর গরুর গাড়ী জমা হ'য়েছে, আমরা একপাশ দিয়া Cross করিতে গিয়া সামনে কতকগুলি মহিষ দেখিয়া গাড়ী বাঁয়ে করিলাম, কিন্তু সামনেই যে গরুর গাড়ী! আমরা Foot Brake করা সত্ত্বেও গরুর গাড়ীতে গিয়া প্রচণ্ড ভাবে ধাক্কা খাইলাম, ভগবান্ সহায় ছিলেন তাই, নতুবা পার্শ্বস্থিত খাদে পড়িলে আমাদের দুই জনের একজনকেও বাঁচিতে হইত না। গাড়ীর এইরূপ অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, সেই Bhagal pore Road এর ১০ মাইল আসিয়া যে Chain tight দেওয়া হইয়াছিল, সেই কারণে Foot Brake অকেজো হইয়াছে। ইহার পর আমরা সতর্ক হইয়া চালাইতে লাগিলাম। বেলা

প্রায় ৫ টার সময় আমরা ভাগলপুর Town এ পৌঁছিলাম। ভাগলপুর Town টি বেশ সুন্দর; কলিকাতার মত রাস্তায় Electric light ও অধিকাংশ বাড়ীতেই Electric light ও Water Tap লাগান আছে। ভাগলপুর Town এ, এক্কা গাড়ীর প্রচলনটাই অধিক দেখিলাম; আমরা বাজার, Station, ছাড়িয়া মনসুরগঞ্জে (Mansurganj) এ আমাদের এক ভগ্নিপতির বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ ঘোষ মহাশয়ের বাটিতে উঠিলাম। ভদ্রলোক আমাদের সাদরে তাঁর বাটীতে স্থান দিলেন। আমরা তাঁর মোটরে ভাগলপুর Town Water Supply ইত্যাদি দেখিয়া ৫ই জানুয়ারি সকাল ৯ টায় বৈদ্যনাথ (দেওঘর) অভিমুখে রওনা হইলাম।

শ্রীমদ্ বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীমন্মহারাজ গৌরীশঙ্কর ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ :—

পাঠকগণের নিকট একটী বিষয় নিবেদন করিয়া এ প্রবন্ধটী আরম্ভ করিতেছি। এ জীবন চরিত সাধু জীবন লইয়াই আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে অন্যান্য সাধুর জীবন লইয়াই অধিক আলোচনা হইবে। তজ্জন্য এ সমুদয় পড়িয়া তাঁহারা অধৈর্য্য হইবেন না। সাধুরা সাধু সঙ্গই অধিক গ্রহণ করিয়া থাকেন, এ জন্য ইহাতে গৃহস্থ জীবনের ব্যাপার অধিক মিলিবেনা। ইহাতে আনুসঙ্গিক সাধু জীবন আলোচনা করিয়া যে তৃপ্তি পাইবেন, তাহাতেই সন্তোষ লাভ করিতে হইবে। মহাত্মারা বলিয়া থাকেন—

"ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং পুনরপি চন্দনং চারু গন্ধং
ছিন্নং ছিন্নং পুনরপি পুনঃ স্বাদুচৈবেসু কান্তং
দগ্ধং দগ্ধং পুনরপি পুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণং
ন প্রাণাং তে প্রকৃতি-বিকৃতি জায়তে সজ্জনানাং"

অর্থাৎ চন্দন বার বার ঘর্ষণ করিলে তাহা হইতে সুগন্ধ চন্দন সৌরভই বাহির হয়। ইক্ষুদণ্ড টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়াও চর্ব্বণ করিলে মিষ্ট রসই মিলিয়া থাকে। স্বর্ণকে বার বার দগ্ধ করিলে, তাহা হইতে সুবর্ণের উজ্জ্বল রং আরও ফুটিয়া উঠে। যাহাদের প্রকৃতিগত সুস্বভাব তাহা নানারূপে বিকৃত করিলেও প্রাণান্তেও তাহা-

দের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। এইটুকু মনে ধারণা করিয়া এ সকল আলোচনা অনর্থক মনে করিবেন না।

পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে, আমাদের গুরুদেব বর্ত্তমান সময় হইতে ৮০ বৎসরেরও পূর্ব্বে যখন সাধু জীবন গ্রহণ করিয়া নর্ম্মদা তীরে গমন করেন, তখন সেখানে দুই মহান্ সিদ্ধ সাধু অবস্থান করিতেছিলেন, ও তিনি এ উভয়েরই কৃপা-লাভকরেন। এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে প্রথম হইতেছেন তাঁহার দীক্ষাগুরু, শ্রীমন্ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ। তাঁহার বিবরণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। অপর হইতেছেন শ্রীমন্ গৌরী শঙ্কর মহারাজ। পূর্ব্বে আরও উক্ত হইয়াছে যে, ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত মহাত্মা ছিলেন যে সময়ে "গুরু" ও অপরটী ছিলেন "ব্যক্ত" বা প্রকট পুরুষ। কি কারণে এরূপ বলা হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা-দের মধ্যে শেষোক্ত মহাত্মা গৌরী শঙ্কর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিবেদিত হইতেছে।

এ মহাত্মা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আমরা কিছু জানিতে পারি নাই। তবে পূর্ব্বে এইটুকু মাত্র বলা হইয়াছে যে, ইহার নির্দ্দিষ্ট কোন আশ্রম ছিল না। ইনি নর্ম্মদা তীর পরিভ্রম করিয়াই বেড়াইতেন। কোন কোন স্থান বিশেষে অল্পদিন বা অধিক দিন তিনি অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার সাধনা, যোগ বিভূতি প্রভৃতি লোক সমাজে বিস্তৃত হইয়াছিল। এজন্য বহু সাধু ও গৃহস্থ তাঁহার সহিত পরিভ্রমণ বা তিনি যেখানে যাইয়া উপস্থিত হইতেন, সেখানে সমাবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেন। এজন্য সে সকল স্থান "দীয়তাং ভুজ্যতাং" প্রভৃতির দ্বারা মুখরিত হইয়া উহারা কিছু দিনের মত এক একটী ক্ষুদ্র আশ্রমবৎ প্রতীয়মান হইত। তাঁহার মহিমাবলে সহৃদয় সদাব্রত নির্ব্বাহ হইত। তিনি চাতুর্থাস্য কালে গঙ্গোনাথেও একবার অবস্থান করিয়াছেন। এ সময়ে আমাদের পরম গুরুদেব তাঁহাকে সদল অভ্যাগত সহিত যথোচিত ভাবে আতিথ্য সৎকার করিয়াছিলেন।

এ গৌরীশঙ্কর মহারাজও বঙ্গদেশে পরিচিত নহেন। তবে নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট তিনি বহুল ভাবেই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কতিপয় শিষ্য এখনও সিদ্ধ পুরুষ রূপে এদিকে প্রতিষ্ঠিত আছেন। নর্ম্মদা হইতে অনতি-দূরে বিলাস পুরের সন্নিকটে সইরখোলা নামক স্থানে কেশবানন্দ বা "দাদাজী" বলিয়া খ্যাত এক উলঙ্গ সাধু বর্ত্তমান আছেন, তিনি এই গৌরীশঙ্কর মহারাজের শিষ্য। তাঁহার এ উলঙ্গতা বেশের সহিত তিনি প্রায়ই উন্মাদের মত হাবভাব লইয়াই সকলের সহিত ব্যবহার করেন। ইহা শুনিয়াই পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন না। সাধুদিগের এরূপ লক্ষণ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় যথা—

"কশ্চিদুন্মাত্তবেশঃ পিশাচ ইব বনে।"

"নানা ভাবেন বেশেন চরন্তি গত সংপথা॥" (শান্তি গীতা অঃ ৬, ১৮)

আহারাদি কেহ করাইয়া দিলে তবে ইনি গ্রহণ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এই কেশবানন্দজীর একটী যুবক শিষ্য চন্দ্র শেখরানন্দ নামে পরিচয় দিয়া গুরু-দেবের (কেরাণী কাজে) আশ্রমে আসিয়া ছিলেন। এ যুবক শিষ্যটী পরিচয় দেন যে, "বঙ্গবাসী" আফিস হইতে প্রকাশিত "হিন্দী বঙ্গবাসীর" তিনি এক সময়ে সহকারী সম্পাদক ছিলেন। পরে সাধু জীবন গ্রহণ করিয়া ইনি "দাদাজী" বা কেশবানন্দের শিষ্য হইয়াছেন। লেখক ইহাকে দেখিয়াছেন, এ যুবক শিষ্যটী গায়ে একটা আল্‌খেল্লা ধারণ করিয়া উলঙ্গ থাকিতেন। তাঁহার গুরুদেব দাদাজীর ন্যায় আমাদের গুরুদেবও যে গৌরীশঙ্কর মহারাজের এক অতি প্রাচীন ভক্ত ও শিষ্য ইহার পরিচয় হইলে এ যুবকটী গুরুদেবকে গুরুবৎ মান্য করিয়া ছিলেন। এরূপ করিবার পর গুরুদেব চন্দ্রশেখরকে উলঙ্গাবস্থা ত্যাগ করিয়া কৌপীন ধারণ করিতে উপদেশ দেন। তিনি বুঝাইয়া দেন যে, গুরুর ন্যায় উচ্চাধিকারী না হইয়া তাঁহার বাহ্যানুকরণ করা শিষ্যের উচিত নয়। তাঁহার গুরুদেবের বাহ্য বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। কিন্তু তাঁহার যখন আহার বিহার আছে, ও গৃহস্থালয়ে গমন, তাহাদের সহিত সংসর্গ ও অবস্থান আছে, তখন লজ্জা নিবারণ জন্য একখণ্ড কৌপীন বস্ত্র পরিধান করিলে ক্ষতি কি? যুবকটী এই উপদেশ পাইয়া আর উলঙ্গ থাকিতেন না।

এই যুবক সাধুটী তাঁহার গুরুদেব কেশবানন্দ তৎ সহিত গৌরীশঙ্কর মহা-রাজের একখানি ফটো চিত্র গুরুদেবকে অর্পণ করেন। বহুদিন হইতে গৌরী-শঙ্কর মহারাজের একখানি ফটো চিত্র পাইবার জন্য গুরুদেব উৎগ্রীব ছিলেন। সুতরাং এরূপ একজন আগন্তুকের নিকট অযাচিত ভাবে চিত্র দুখানি পাইয়া তিনি বড়ই আনন্দিত হন। মহারাজ এই দুখানি চিত্রই পরে বড় আকারে পরিণত করাইয়াছেন ও উহাদিগকে রামনিবাসের শিব মন্দিরের ভিতরকার বারান্দায় রক্ষা করিয়াছেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, গুরুদেব ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রায় ৭।৮ মাস কাল তাঁহার নিকট গঙ্গোনাথে অবস্থান করেন, ও ইহার পর পুনরায় নর্ম্মদা পরিভ্রমণে বাহির হন। ইহা আরম্ভ করিয়া তিনি গৌরীশঙ্কর মহারাজের সহিত মিলিত হন। তিনি আমাদের গুরুদেব ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শিষ্য, ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে গৌরীশঙ্কর মহারাজ অতি যত্নের সহিত নিজের নিকট রাখেন। এ সময় গুরুদেবের বয়স ১০।১১ বৎসর মাত্র ছিল, এজন্য

তাঁহাকে নিজের সেবা কার্য্যে রাখেন। ইহা এক পরম সুকৃতির ফল বলিতে হইবে, কারণ—

"শ্রুতি স্মৃতি সবিজ্ঞায় কেবলং গুরু সেবয়া
তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তা ইতরে বেশ ধারিণঃ
সর্ব্ব পাপ বিশুদ্ধাত্মা শ্রীগুরোঃ পাদ সেবনাৎ
সর্ব্ব তীর্থাবগাহস্য ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং ॥
গুরোঃ সেবা পরং তীর্থ মন্যৎ তীর্থং নিরর্থকং
সর্ব্ব তীর্থাশ্রয়ং দেবি সদ গুরো শ্চরণাম্বুজং ॥"

বিশেষতঃ ব্রহ্মচারীগণের এই গুরু সেবাই হইতেছে প্রধান ব্রত। এইরূপে সেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার কালে গুরুদেব তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত তিনি ধীরে ধীরে সাধনা ও বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করেন। এজন্য এ গৌরীশঙ্কর মহারাজ গুরুদেবের শিক্ষা গুরু ও আমাদের পরম গুরু। এ মহাত্মার নিকট গুরুদেব ৭ বৎসর কাল অবস্থান করেন।

আমাদের গুরুদেব কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কেশবানন্দজী বা দাদাজীকে গৌরীশঙ্কর মহারাজের সহিত দেখিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ এই আন্দাজ করেন যে, ৭ বৎসরের পর যখন তিনি তাঁহার সঙ্গত্যাগ করেন, সে সময়ে হয় ত তিনি আসিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি যে গৌরীশঙ্কর মহারাজ এক সময়ে কিছু দিনের জন্য বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া ছিলেন। এ মত্ততাবস্থায় তাঁহার অধিক আক্রোশ ছিল নর্ম্মদা দেবীর উপর। সর্ব্বদাই তাঁহাকে মারিবেন, বা কাটিবেন, এরূপ আস্ফালন করিতেন। সকলে এ সময়ে ভয়ে তটস্থ হইয়া তাঁহার নিকট হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিত, ও নানারূপে তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিত। এ অবস্থায় নর্ম্মদা তীরের বহু দেবদেবীর মন্দির মূর্ত্তি তিনি খণ্ডিত করিয়া ছিলেন। তিনি কোন স্থানে আসিতেছেন শুনিলেই সকলে বিশেষ সাবধান হইত। এরূপ অবস্থায় তিনি একবার অমর কণ্টকে উপস্থিত হন। পাণ্ডারা ভয় পাইয়া তাঁহাকে দূরে একটী স্থানের প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া যায়। দিবাভাগ তিনি সেখানে অতিবাহিত করেন, ও পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে পাণ্ডারা তাঁহাকে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। সেখানে ফিরিয়া আসিলে যে স্থানে তাঁহার জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সে স্থানে এক পুঁটলিতে বিভূতি ও মরিচ প্রাপ্ত হন। ইহা পাইয়া তাঁহার বিশ্বাস হয় যে, নর্ম্মদা দেবী কৃপা পূর্ব্বক ইহা তাঁহাকে দিয়াছেন। বাস্তবিক ইহার

কিয়দংশ ব্যবহার করিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হন। এ বিভূতি ও মরিচের অংশ পরে তিনি বহু আধিব্যাধি গ্রস্থ ব্যক্তিকে বিতরণ করিতেন। সকলে ইহা পাইয়া বহুবিধ ক্লেশ হইতে মুক্ত হইত। প্রথমে প্রথমে ইহা তিনি নিজ হস্তে অপরকে বিতরণ করিতেন, পরে ইহা আমাদের গুরুদেবের হস্ত দিয়াই দান করিতেন, ও বলিতেন যে, তাঁহার হস্ত প্রদত্ত এ বিভূতি ও মরিচ সমভাবে কার্য্য করিবে। ইহা পরে আমাদের গুরুদেবকেই তিনি দান করেন। গুরুদেবও ইহা কখন কখন অপরকে দিয়া থাকেন। এ বিভূতি ও মরিচ কম হইয়া আসিলে, ইহার সহিত আরও বিভূতি ও মরিচ মিলাইয়া লয়েন। ইহার যে এক অমোঘ শক্তি আছে, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এ লেখকের পরিচিত পুরুলিয়ার প্রসিদ্ধ মোক্তার বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বহুকাল হইতে এক প্রকার শূল বেদনায় কষ্ট পাইতেন। এজন্য তিনি ডাক্তারী, কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথিক বহুবিধ চিকিৎসা করাইয়াও আরোগ্য লাভ করেন নাই। তিনি আরোগ্য লাভে হতাশ্বাসই হইয়া ছিলেন। এ লেখকের উপদেশ মত তিনি গুরুদেবের নিকট কাতরে তাঁহার অবস্থা জানাইলেন, উক্ত বিভূতি ও মরিচ প্রাপ্ত হন, ও তাঁহার বহুকালের দুঃসাধ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করেন। এ প্রকার বহুশত দৃষ্টান্ত আছে। তবে ইহা কৃপার সহিত প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক।

এ গৌরীশঙ্কর মহারাজ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রকৃতিস্থ হইবার পর পরিশেষে তিনি সদাসর্ব্বদাই জপ পরায়ন হইয়া ভজনানন্দে বিভোর থাকিতেন। গুরুদেব ৭ বৎসরকাল উক্ত মহাত্মার সহিত অবস্থান করিয়া তাঁহার সহিত প্রয়াগ আগমন করেন। সেখানে কয়েক দিন অবস্থানের পর চিত্রকূট দর্শনে যাইবেন, ও কয়েক দিন পরেই ফিরিয়া আসিবেন, জানাইয়া বিদায় প্রার্থনা করেন। চিত্রকূট দর্শনের পর গুরুদেবের মনে অন্যত্র পর্য্যটনের অভিলাষ উদিত হয়, ও কয়েকটী সঙ্গী পাইয়া আর উক্ত মহারাজের নিকট ফিরিয়া যান নাই। ইহার পর নানাস্থান পর্য্যটন আরম্ভ করেন, ও কয়েক বৎসর পরে যাইয়া পুনরায় নর্ম্মদা পরিভ্রমণ আরম্ভ করেন। পুনরায় এরূপ করিবার কালে গুরুদেব শ্রবণ করেন যে, এ মহাত্মা কৈলাস লাভ করিয়াছেন।

পিতৃমাতৃ ভক্তি মাহাত্ম্য।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, কাব্যরত্নাকর।

পুণ্ডরীকাক্ষ নামক জনৈক বিপ্র ভারতবর্ষের কোনও জনপদে বাস করিতেন। তিনি বৃদ্ধ পিতা মাতাকে যত্ন করিতেন না। আধুনিক শিক্ষিত যুবকগণ যেমন পত্নীকেই ভবার্ণবের কর্ণধারিণী জ্ঞানে পূজা করেন, পুণ্ডরীকাক্ষও সেইরূপ ছিলেন। একদা তীর্থ পর্য্যটন বাসনায় পুণ্ডরীক্ষ পিতাকে কহিলেন, "আমরা সপত্নীক তীর্থ পর্য্যটনে যাইব"। পিতা বলিলেন, "তোমার জননীর সহিত আমিও যাইব মনে করিতেছি। তোমার কি মত হয়?" পুণ্ডরীক কহিলেন—"তবে চলুন।"

তারপর অশ্বারূঢ় পুণ্ডরীকাক্ষ স্ত্রীকে অন্য একটী অশ্বে আরোহিত করাইয়া মহানন্দে গমন করিলেন। বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধা মাতা পায়ে হাঁটিয়া অতি কষ্টে তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। কিছুদিন পরে পুণ্ডরীকাক্ষ অনেক দূরে গিয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। তথায় সবিস্ময়ে দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী বালিকা জলপূর্ণ কলসী কক্ষে একটী পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিতেছেন।

কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া পুণ্ডরীকাক্ষ সেই বালিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই কুটীরের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং সবিস্ময়ে কহিলেন, "মা আপনি কে? কি জন্য এই জঘন্য পাতার কুটীরে বাস করিতেছেন? এখানে আপনার কে আছেন?"

বালিকা কহিলেন, "আমি গঙ্গাধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই কুটীরে এক মাতৃ পিতৃ ভক্ত বাস করিতেছে। সে অতি দরিদ্র। সম্প্রতি সে পায়ের ব্যথায় কোথাও এক পা চলিতে পারে না। বৃদ্ধ পিতার সেবা করিতে না পারিয়া বড়ই দুঃখে কাল-যাপন করে। সেই জন্য আমি প্রত্যহ তাঁহাকে জল দিয়া যাই।" পুণ্ডরীকাক্ষ সেই পিতৃভক্তকে দর্শন করিয়া অপূর্ব্বভাবে ভাবিত হইলেন। এবং মনে মনে পূর্ব্বাচরিত কর্ম্মরাশির চিন্তা করিতে করিতে কহিলেন, "হায় কি অপকার্য্যই না করিয়াছি! বৃদ্ধ মাতাপিতাকে এ পর্য্যন্ত পায়ে হাঁটাইয়া আনিয়াছি। আর আমরা দিব্য আরামে অশ্বারোহণে আসিয়াছি।" যুবকের বড়ই অনুতাপ হইল। তিনি তাড়া-তাড়ি পদব্রজে মাতাপিতার নিকট গিয়া সবিনয়ে কহিলেন, "পিতঃ! মাতঃ আপনারা ঘোড়ায় চড়িয়া চলুন। আমরা পদব্রজে যাইতেছি।"

পিতা মাতার আপত্তি না শুনিয়া যুবক বহু যত্নে তাঁহাদিগকে অশ্বে আরোহিত করাইলেন। অনন্তর বহু তীর্থ পর্য্যটনের পর সকলে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পুণ্ডরীকাক্ষ বহু যত্নে মাতাপিতার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

দেবাদিদেব ভগবান শঙ্কর পুণ্ডরীকাক্ষের পিতৃমাতৃ ভক্তির বিষয় জানিতে পারিয়া মহানন্দে পার্ব্বতীকে কহিলেন, "পূর্ব্বে পুণ্ডরীক মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত না, এক্ষণে তাহার মোহাবসান হইয়াছে। এখন আমি একবার তাহাকে দেখিতে যাইব। তুমিও আমার সঙ্গে এস।" পার্ব্বতী মহানন্দে যাইতে স্বীকৃতা হইলে, উভয়ে বৃষভারূঢ় হইয়া মর্ত্ত্যে অবতরণ করিলেন। এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ পূর্ব্বক পুণ্ডরীকের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

ভগবান ও ভগবতী দেখিলেন, পুণ্ডরীকাক্ষ একাগ্রচিত্তে পিতামাতার সেবা করিতেছেন। তখন মহাদেব কহিলেন, "ওহে যুবক! তোমার গৃহে আমরা সস্ত্রীক অতিথি। আমাদের আতিথ্য সৎকার কর।" যুবক কহিলেন, "মহাশয় এখন আমার ত অবসর নাই। একটু বিশ্রাম করুন, আমি মাতাপিতার সেবা-কার্য্য সমাধা করিয়া আসিতেছি।"

কিয়ৎকাল পরে যুবক অতিথি দম্পতীর সম্মুখে আসিয়া সবিনয়ে কহিলেন, "মহাশয় আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনারা কৃপা করিয়া এই পর্ণ-কুটীরে পদার্পণ করায় অনুগৃহীত হইলাম। আপনারা সেবকের সেবা গ্রহণ করুন।"

মহাদেব কহিলেন, "বৎস তুমি প্রতিদিন ভক্তি-সহকারে যাহাদের অর্চ্চনা কর, সেই পার্ব্বতী পরমেশ্বর আমরা তোমার সম্মুখে। তোমার ভক্তিগুণে বাধ্য হইয়া আমরা আসিয়াছি, এক্ষণে মনোগত বর প্রার্থনা কর।"

পুণ্ডরীকাক্ষ ভক্তি ও আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া কহিলেন, "প্রভু! আমি এই শিলাখণ্ড দিলাম, ইহার উপরে দয়া করিয়া উপবেশন করুন, আর এইরূপে আপনারা নিত্য এইস্থানে অবস্থান করুন, যাহাতে নিত্য আপনাদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন পাই।"

মহাদেব কহিলেন, "বৎস! তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম, এই আমরা শিলাপরে উপবিষ্ট হইলাম। তুমিও পিতৃমাতৃ ভক্তির মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিবার জন্য আমাদের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান কর।"

শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ প্রকার মূর্ত্তিদ্বয় ভারতের পশ্চিমভাগে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ভুঁইফোঁড়।

লেখক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

"ভুঁইফোঁড়" কথাটী অনেক দিন যাবৎ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। ইহার সাধারণ অর্থ ভুঁই অর্থাৎ মৃত্তিকা বা মাটী ফোঁড় যাহা ফুঁড়িয়া বাহির হয়। মাটী ফুঁড়িয়া যাহা বাহির হয়, তাহাকেই ভুঁইফোঁড় বলিয়া থাকে। কিন্তু আজ কাল-কার জল হাওয়ার গুণে বা দোষে ইহা মানুষের প্রতিও প্রয়োগ হইয়া থাকে। তাই এই সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করা হইল।

বিনয়পুর গ্রামে বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় বেশ সম্ভ্রান্ত লোক। গ্রামের সকলে এবং নিকটবর্ত্তী ৮।১০ খানি গ্রামের লোক তাঁহাকে বিশেষ মান্য ও খাতির করে। কোন বিষয় মীমাংসা করিতে হইলে তাঁহার পরামর্শ ও যুক্তি সকলে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া থাকে। স্বয়ং প্রচুর সম্পত্তিশালী হইয়াও কিছুমাত্র অহমিকা নাই, যেন মাটীর মানুষ। ছেলে বুড়ো সকলেই বেণীবাবুর প্রশংসা করিয়া থাকে।

বেণীবাবুর ছয়পুত্র, তিন কন্যা। নিজে ও তাঁহার স্ত্রী সংসারে তাঁহারা এগারো জন; এদিকেও একাদশে বৃহস্পতি। এতদ্ব্যতীত অন্য আত্মীয় স্বজন তাঁহার সংসারে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছে। সংসার বেশ সুখের বলিয়া সকলের ধারণা এবং সেই ভাবেই সকলে সমালোচনা করিয়া থাকে, কিন্তু বেণীবাবুকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিয়া যতদূর বুঝা গিয়াছে, তাহাতে সুখের সংসার বলিয়া মনে হয় না। যদিও অপরের সহিত তুলনায় অনেক বিষয়ে সুখের সংসার বলিতে পারা যায়। ঘটনা ক্রমে আমার এক বিশেষ বন্ধুর সহিত বেণীবাবুর হৃদ্যতা আছে, সেই সূত্রে আমিও তাঁহার নিকট কয়েক বার গমন করিয়াছি, ও মাঝে মাঝে যাইয়া থাকি। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বেশ আনন্দ লাভ করিয়াছি, একবার বসিলে আর উঠিতে ইচ্ছা করে না। অতি সরল প্রকৃতির ধার্ম্মিক লোক। এতটা বিষয়ের মালিক হইয়াও মনে কিছুমাত্র তমো ভাব নাই। দাস দাসী অন্যান্য কর্ম্মচারী সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করায় সকলেই বিনয়ী ও বশীভূত। সচরাচর এরূপ দেখা যায় না।

প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধান্তে পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া

বাহিরে আসিয়া বসেন, সেই সময় লোকজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ এবং বৈষয়িক কার্য্য করিয়া থাকেন। মধ্যাহ্নে আহারান্তে একবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বেলা চারি ঘটিকার সময় বাহিরে আসিয়া পুনরায় ঐ ভাবে লোক জনের সহিত দেখা সাক্ষ্যাৎ বিষয় কর্ম্মের কার্য্য করিয়া থাকেন। সন্ধ্যার সময় একবার বাহিরে বেড়াইতে যান, এক ঘণ্টা ঘুরিয়া আসিয়া সন্ধ্যাদি কার্য্য শেষ করিয়া রাত্রি আট ঘটিকার সময় বাহিরে আসেন, এবং রাত্রি ১২ টার সময় আহার করিয়া শয়ন করেন। ইহার মধ্যে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন দুই ঘণ্টা সময় অন্দরে বসিয়া সংসারের সকল অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতিকার ও মীমাংসা করিয়া সকলকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। এই ভাবে তাঁর জীবন অতিবাহিত হইতেছে। ইহার মধ্যে একদিন আমার বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া রাত্রি আট ঘটিকার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষ্যাৎ করিতে গেলাম। তখন তিনি একাকী বসিয়া গম্ভীর ভাবে কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে ছিলেন। আমরা যাইবা-মাত্র অভিবাদন করিলেন, আমরাও প্রতি অভিবাদন দিলাম। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমি বলিলাম, "আজ আপনাকে যেন কিছু চিন্তাযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছে। বলিবামাত্র তিনি স্বীকার করিলেন, হাঁ—ঠিক্ তাই! আপনাদের নিকট কথাটী প্রকাশ করিয়া বলা নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিতেছি, নতুবা ও ভাবের লাঘব হইবে না। এবং হয়তো সমস্ত রাত্রি নিদ্রাও হইবে না। দেখুন, কথাটী আমার পরিবারবর্গের মধ্যে যদিও নিবদ্ধ ও কিছু গোপনীয়, তত্রাপি আপনাদের নিকট প্রকাশ করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমরা বলিলাম, "পারিবারিক সংক্রান্ত কথা আমাদের নিকট না বলাই উচিত।" তাহাতে তিনি বলিলেন, নিশ্চয় বলিব নতুবা প্রাণটা যে আই-ঢাই করিতেছে। আপনাদিগকে আমি যেরূপ চক্ষে দেখি, তাহাতে আপনাদের নিকট সকল গোপনীয় কথা অকপটে বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না। কথা বলিবার পূর্ব্বে অবতরনিকাতে অনেকটা সময় অতিবাহিত হইল।

"দেখুন আমার ছয়টী পুত্র আছে, তাহা আপনারা জানেন। কোনও পুত্রের এ পর্য্যন্ত বিবাহ দেওয়া হয় নাই। গৃহিণী মাঝে মাঝে বিবাহের কথা তোলেন, আমি বলি, ছেলেরা আরও লেখাপড়া শিখুক, যোগ্য হউক, বিবাহ পরে হইবে। মেয়েদের বিবাহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন বটে। দুইটী কন্যার বিবাহ হইয়াছে, একটী কন্যা বিবাহ দিতে বাকি আছে। তাহার বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ছেলেদের বিবাহ দেওয়া যাইবে।" আজ এই কথায় গৃহিণী অসন্তুষ্ট হইয়া

বলিলেন. "ছেলেরা কি বুড়ো হ'লে বিবাহ করিবে? এক এক ছেলের বয়স ২৮ ২৯ হইয়াছে, এখনও কি বিবাহ দিবার সময় হয় নাই, আর কবে হবে? এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় আমার একটী পুত্র হঠাৎ আসিয়া বলিল, "বাবা আমি বিবাহ করিব না," সঙ্গে সঙ্গে অপর একটী পুত্র আসিয়া বলিল, "আমিও বিবাহ করিব না।" আমি তখন গৃহিণীকে বলিলাম, "দেখ্‌লে তোমার ছেলেরা বিবাহ করিব না বলিতেছে, আর তুমি তাদের বিবাহের জন্য পাগল হইয়াছ।" এই কথা বলিবা মাত্র গৃহিণী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও কোপান্বিত হইয়া বলিলেন. "ছেলেরা বুঝি নিজে বিবাহ করিব বলিবে? তাহাদের বিবাহ না দিলে কি আপনি বিবাহ হইবে?" আমি বলিলাম, দেখ, মেয়েটীর বিবাহ দিয়া একবারে নিশ্চিন্ত হইয়া ছেলেদের বিবাহ দেওয়া যাইবে। কথাটা পছন্দ হইল না, তাই রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিলেন, "মেয়ের বিবাহ দিবার বিশেষ কোন চেষ্টা দেখিনা। কবে কোন্ সময় কে উপযাচক হইয়া বিবাহ দিবার জন্য আসিবে. তখন কন্যার বিবাহ দিবেন। তারপর ছেলেদের বিবাহের ব্যবস্থা হইবে, সে অনেক কালের কথা। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে বসিয়া গল্প-গুজব করিয়া কাটালেই বেশ চেষ্টা করা হইবে।" কথাগুলি শুনিয়া প্রাণে বিশেষ কষ্ট হইল। এরূপ ভাবে পত্নী পতির সহিত কথাবার্ত্তা কহিবে, তাহা আমি কোন সময় ভাবি নাই। যাহা হউক, দেশকাল ও পাত্র সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে আসিয়া বাহিরে বসিয়া সেই বিষয় পুনরায় চিন্তা করিতেছি, এমন সময় আপনাদের হঠাৎ শুভাগমন হইল, এখন সকল বৃত্তান্ত আপনাদের সমক্ষে বলিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে সংসারে সকলকে সন্তুষ্ট করা অতীব কঠিন ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের দেশের লোকের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীলোকদের মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গুরু লঘু এখন কাহারও বড় একটা জ্ঞান নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার কথা যখন তুলিলাম, তখন আর একটী ঘটনার উল্লেখ করি, তাহা হইলেই অনেকটা বুঝিবেন, অবস্থা কি ভীষণ দাঁড়াইয়াছে। আমার একটী পুত্র এম, এ, পাস করিয়া 'ল' পড়িতেছে। সেদিন তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আর কতদূর পড়িবার ইচ্ছা তোমার আছে? বলিবামাত্র পুত্র উত্তর করিল, "আপনি এতদিন পড়াইলেন আপনার কর্ত্তব্য বোধে আর যদি পড়াইতে কষ্ট বোধ করেন, আমি তাহার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিব। সে সম্বন্ধে আপনার কোন চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। আপনারা সেকেলে লোক,

তাই প্রাচীন প্রথার আপনারা পক্ষপাতী। দেখুন আপনি কতকগুলি আত্মীয় স্বজনকে প্রতিপালন করিয়া আপনার অর্থের অপচয় করিতেছেন, সেই সঙ্গে তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য অপদার্থ করিয়া কুঁড়েমির প্রশ্রয় দিয়া পাপ সঞ্চয় করিতেছেন। অথচ আপনার নিজ পুত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন।

কথাগুলি পুত্রের মুখে শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। কি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি উত্তর পাইলাম। উঃ! কি দেশকাল পড়িয়াছে, "অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি"। আমি আনন্দ প্রাণে পুত্রকে নিজ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার উত্তর কি এই হলো। সুন্দর পাশ্চাত্য শিক্ষা, সুন্দর যুগ, সুন্দর সভ্যতা, সবই সুন্দর। কেবল কুৎসিৎ কদাকার কর্ত্তব্য জ্ঞান বর্জ্জিত বুড়ো আহাম্মক আমরা। এমন শিক্ষা না হইলে দেশ উন্নত হয়, এমন শিক্ষা না হ'লে কি অর্থের প্রকৃত সার্থকতা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি ধারী সন্তানের কথা শুনিলেন। এখনও বাকী আছে, ক্রমে বলিতেছি শুনুন। পত্নীকে সমস্ত কথা বলিলাম, তিনি বলিলেন, "এখনকার কালের ছেলেদের সহিত কথাবার্ত্তা একটু সাবধান হইয়া বুঝিয়া সুঝিয়া কহিতে হয়! কাল ভাল নয়, নিজের মান নিজের কাছে।" এই কথাগুলি পত্নীর মুখে শুনিয়া আরও দুঃখিত হইলাম, এবং বলিলাম, "প্রকারান্তরে তুমি পুত্রের পোষকতা করিতেছ। আরও প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। বেশ করিতেছ, উত্তম করিতেছ, সংসার যে ক্রমে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, সেদিকে কি লক্ষ্য করিয়াছ? স্ত্রী বলিলেন, "অত শত বুঝিবার দরকার আমার নাই। আজ কালকার ছেলেকে কিছু বলিবার যো নাই। বলিলেই বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। কোথায় যাইবে, কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না। সেজন্য চিন্তায় আহার নিদ্রা ত্যাগ হইবে। অতঃপর সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই আমার মতে যুক্তিযুক্ত।" পত্নীর কথায় বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া নির্ব্বাক্ হইলাম, ও ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। মনে মনে কত কি ভাবিলাম, চিন্তা করিলাম, সংসারের সুন্দর পঙ্কিলময় চিত্রগুলি একে একে চক্ষুর সম্মুখে আসিল, আবার অন্তর্হিত হইল। এই সংসার! এই সুখের সংসার, ইহারই কামনা করে লোকে। আমার কোন অভাব নাই, তত্রাপি আমি সুখী হইতে পারিলাম না। যাহার অভাব আছে, তাহার সুখী হওয়া সুদূর পরাহত। এখানে থাকা আর চিড়িয়াখানায় থাকা সমান কথা। ভগবানকে ডাকিবার সময় এখানে নাই, সদা সর্ব্বদা

চিন্তার বোঝা লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিবার জন্য মোহ পাশে আবদ্ধ সংসার ভগবানের অদ্ভুত সৃষ্টি। এই সংসার আবার শান্তি নিকেতন! সুখের সদন! আনন্দ আশ্রম বলিয়া কত লোক বলিয়া থাকে। যাহার শান্তি, যাহার সুখ, যাহার আনন্দ, তাহার কাছে থাক্ আমার কাছে নয়। আমার মনে মনে একটা আশা ছিল, আমি অনেক লোকের অনেক বিষয়ে সালিশ করিয়া অনেক মীমাংসা করিয়া থাকি। আমার সংসারে অপরকে সনিশ হইয়া কিছু মীমাংসা করিতে হইবে না; আমি স্বয়ং সমস্ত ঠিক করিয়া লইতে পারিব। এখন দেখিতেছি, সে আশা আমার সম্পূর্ণ ভ্রম সঙ্কুল। অপরের সম্বন্ধে সালিশি করা যত সহজ, নিজের সংসারে নিজের সম্বন্ধে সালিশি করা তত কঠিন দেখিতেছি। এই সকল কথাবার্ত্তা শেষ হইলে আমরা উভয়ে বিদায় গ্রহণ করিলাম। বেণীবাবু অনেক অনুরোধ করিয়া কহিলেন, "আপনারা মাঝে মাঝে দয়া করিয়া আমার নিকট আসিলে বিশেষ সুখী হইব। পরস্পরে কথাবার্ত্তা কহিয়া অনেকটা তৃপ্তিলাভ করিব।" আমরা তাঁহার কথায় সম্মতি দান করিয়া প্রস্থান করিলাম।

প্রায় একমাস অতীত হইয়াছে, আমার বন্ধুর সঙ্গে পুনরায় বেণীবাবুর নিকট বেড়াইতে গেলাম। সে দিন প্রাতে গিয়াছিলাম, বেণীবাবু প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া তখনি আসিয়া বসিয়াছেন, আমরা যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরাও তাঁহাকে যথোচিত সৌজন্যতার সহিত সম্মান প্রদর্শন করিলাম। নানা বিষয়ের নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইল, শেষ আমরা উঠিবার জন্য চেষ্টা করায় বেণীবাবু বলিলেন, "এখনও কিছুক্ষণ আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অপেক্ষা করিলে বিশেষ বাধিত হইব। অনেক কথা হইল সত্য, কিন্তু যে কথাটী বলিব, বলিব করিয়া কয়েক দিন হইতে মনে করিয়া আপনাদের আসার অপেক্ষায় আছি, সে কথাটী বলিতে ভুলিয়াছি, কিন্তু আপনারা উঠিব বলায় হঠাৎ সেই কথাটী মনে পড়িল।"

একদিন বৈকালে বাহিরে আসিবার সময় আমার পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আপনার গুণের এম, এ, পাস করা ছেলে আজ বেলা ৯ টার সময় কথায় কথায় যে সকল কথা বলিল, তাহা কখন কোন শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ছেলের মুখে শুনা তো দূরের কথা কোন বুড়োর মুখেও শুনি নাই। বলিলাম, কি বলিয়াছে, গৃহিণী বলিলেন, ছেলে বলে আমরা পিতামাতার আমোদ প্রমোদের ফল স্বরূপ পুত্র কন্যা রূপে যথাক্রমে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি। সুতরাং পিতা-মাতার প্রতি আমাদের যে একটা বিশেষ কর্ত্তব্য আছে, তাহা আমরা স্বীকার

করি না। যতই দিন যাইতেছে, ততই আমরা বেশ বুঝিতেছি, কতিপয় স্বার্থপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক কতকগুলি বিধি নিষেধ ব্যবস্থা সমাজের উপর অর্পিত হইয়াছে, তদনুযায়ী আমরা পূর্ব্বাপর শ্রদ্ধা, ভক্তি, পিতামাতার উপর করিয়া থাকি। তদনুযায়ী তাঁহাদের আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করি। প্রকৃত প্রস্তাবে স্থির ধীর ভাবে চিন্তা পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। কাহারও সহিত কোন বাধ্য বাধকতা নাই। এ সকল আমরা জোর করে করিতেছি, এখন আমাদের সেটা সংসারে পরিণত হইয়াছে। দেখিতে গেলে পিতার সহিত সম্বন্ধ খুবই কম, কারণ তিনি নিজ ভোগ স্পৃহা চরিতার্থের জন্য যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাহারই ফল স্বরূপ যখন আমাদের উদ্ভব, তখন তাঁহার প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব থাকা উচিত। আমার বিচারে কিছুই না, বরং আমাদের তুষ্টির জন্য লালন পালনের জন্য এবং সর্ব্ববিধ কার্য্যের জন্য পিতার কর্ত্তব্য দায়িত্বও যথেষ্ট আছে, ও আবহমান কাল থাকিবে। তাঁহার নিজ কর্ম্মের ফল স্বরূপ যখন আমরা হইয়াছি, তখন তাঁহার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অশেষ-বিধ। যাঁহারা বুদ্ধিমান ও বিবেচক তাঁহারা আমার কথায় নিশ্চয় অনুমোদন করিবেন। আর যাঁহারা স্বার্থপর বিধি নিষেধ প্রণয়ন কারীর দলভুক্ত তাঁহার আমার প্রতি তীব্র সমালোচনা করিয়া অকাল কুষ্মাণ্ড কুলাঙ্গার বলিয়া ঘোষণা করিবে। যিনি মাতা গর্ভধারিণী দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, তারপর শিশুকালে মলমূত্র ঘাঁটিয়া মানুষ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কিছু কর্ত্তব্য থাকা উচিত ও আমি তাহা স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলিয়া অবথা আব্দার করিলে চলিবে না। এ সম্বন্ধে আমরা একটা সমিতি করিয়াছি, ও তাহার বাছা বাছা বার জন সভ্য ঠিক করিয়াছি। ক্রমে সংখ্যা আরও অনেক বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী অর্থাৎ বি, এ, ও এম, এ, তাঁহারা ভিন্ন অপর কেহ সভ্য হইতে পারিবেন না। সভার নিয়ম কানুন বিধি ব্যবস্থা সমস্ত ঠিক হইয়াছে, এখন কার্য্য আরম্ভ করিলেই হয়। সভার সভাপতি হইয়াছেন, একজন বিখ্যাত কলেজের অধ্যাপক তিনি এই মতের সমর্থক। আমার এক বন্ধু একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন যে, এক কলেজের অধ্যাপকের সহিত আমার বিশেষ আলাপ আছে, তিনি একদিন বলিতে ছিলেন, পিতামাতার প্রতি পুত্র কন্যাদের বিশেষ কর্ত্তব্য কিছুই নাই, বরং পুত্র কন্যার উপর পিতা মাতার অশেষ কর্ত্তব্য আছে। পুত্র কন্যার জন্যই পিতা মাতাই

সর্ব্বতোভাবে দায়ী, কারণ তাঁহাদের আমোদ প্রমোদের ফল স্বরূপ পুত্র কন্যারূপ আমাদের উদ্ভব। আমরা যাহা কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছি, তাহা হইতে এই ধারণা আমাদের বদ্ধমূল হইতেছে। আমাদের দেশে কতিপয় স্বার্থপর লোক কতকগুলি কঠোর বিধি নিষেধ নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া পিতামাতার প্রতি সন্তানদের অশেষবিধ কর্ত্তব্য আছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তদনুযায়ী লোক সংস্কার বশতঃ পিতামাতাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা, করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা কুসংস্কারের নামান্তর। এই সভা হইতে বিচার বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা অবধারিত হইবে, তদনুযায়ী ব্যবস্থা মাতার প্রতি করা হইবে। পিতার প্রতি কোন কর্ত্তব্য দায়িত্ব বা ব্যবস্থা নাই, ইহা আমার সাফ্ কথা। ইহাতে কেহ আমার প্রতি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হউক, তাহাতে আমার কিছু আসিয়া যায় না। এক শ্রেণীর দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক আছেন, তাঁহারা সকল কাজে অপরাধ হইবে. বলিয়া ভয় দেখান কিন্তু অপরাধ জিনিষটা কি ও কিসের অপরাধ, তাহা তাঁহারা নিজেই জানেন না। এই শ্রেণীর লোক হইতে পিতামাতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে অজ্ঞ. মূর্খ লোক তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া পিতা মাতাকে একটা কিম্ভূত কিমাকারে দাঁড় করাইয়াছে। আবার কেহ কেহ "পিতামাতাকে জীবন্ত জাগ্রত দেবদেবী" বলিয়া প্রতিদিন পূজা করে ও ভোগ-রাগ দেয়। তাঁহাদের চরণামৃত পান করে। আমি দেখি, শুনি আর হাঁসি, ভাবি লোকগুলা একবারে উন্মাদ হইয়াছে, কাজের বাহির হইয়াছে, ইহাদের কোন বস্তু নাই. একদম্ নিরেট। এইজন্য প্রকৃত উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন। প্রকৃত শিক্ষা না পেলে মানুষ কি প্রকারে উন্নত হবে, ও দশজনকে উন্নতির পথে আকর্ষণ করিবে। যদি আমরা উচ্চশিক্ষা না পাইতাম, আমরাও অপরের ন্যায় আহাম্মক বলিয়া বর্ব্বর হইয়া থাকিতাম। অবশ্য এ সম্বন্ধে পিতাকে প্রশংসা করিতে বাধ্য, কারণ তিনি উচ্চশিক্ষা অকাতরে দিয়াছেন, কিন্তু সেটা তাঁহার নিতান্তই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া যদি না করিতেন, অজস্র গালি বর্ষণ করিয়া তাঁহার সপ্ত পুরুষ উদ্ধার করিতাম। আমি উচিত বক্তা, উচিত কথা বলিব, ইহাতে কেহ রাগ করেন তিনি ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাইবেন। ও আমাকে অকথ্য ভাষায় সমালোচনা করিবেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। আমি বেমালুম সব হজম করিব, দ্বিরুক্তি করিব না।

কথাগুলি শুনিয়া স্তম্ভিত বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম, "গৃহিনী তুমি রত্নগর্ভা আর আমিও মহা ভাগ্যবান নতুবা এমন গুণধর পুত্রের জনক জননী

আমরা হইব কেন? বহু তপস্যার ফলে এমন শিক্ষিত পুত্রের পিতা হইয়াছি। তুমিও জন্মান্তরীণ তপস্যার ফলে এমন পুত্রের মাতা হইয়াছ। আমাদের ভাগ্যের সীমা নাই। আমাদের সুখের অবধি নাই। আমরা মর্ত্তে স্বর্গসুখ উপলব্ধি করিব, তাহার এই প্রথম সোপান। গৃহিণী ধন্য তোমার বরাত, আর সঙ্গে সঙ্গে ধন্য আমারও বরাত! এমন না হইলে মণি-কাঞ্চন যোগ হইবে কিসে? বেশ, বেশ, বেশ, যাহা বলিলে তাহা ছয় পুত্রের মধ্যে একটী পুত্রের মন্তব্য, অপর কয়েকটীর মন্তব্য পরে প্রকাশ পাইবে, কারণ এখনও তাহারা অতটা উচ্চ শিক্ষা পায় নাই। ক্রমে হবে, সময়ে হবে, সেজন্য চিন্তা করিতে হইবে না। আর এক কথা একঝাড়ে বা বংশ হইতে যাহা উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ভাব প্রায়ই একরূপ দাঁড়াবে, তাতে কোন সংশয় নাই।

সেদিন তুমি ছেলের পোষকতা করিতেছ, বলায় রাগ করিয়াছিলে, আজ তুমি স্বয়ং স্বকর্ণে পুত্রের মুখের কথা শুনিয়া তাহারই বিরুদ্ধে অনুযোগ করিবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছ। ভালই করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এখন কি করা কর্ত্তব্য তাহা কিছু ঠাওরেছ। গৃহিণী একদম্ বড় রকমের 'না' বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। আমি বলিলাম, দেখ তুমি আমাকে যে সকল কথা বলিলে, তাহা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, এবং পুত্র যদি জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলেও স্বীকার করিও না, যে আমাকে বলিয়াছ। তারপর তার গন্তব্য পথ ও আচরণ লক্ষ্য করিয়া যাও। উপস্থিত ইহাই তোমার নিকট আমার উপদেশ জানিবে। এখন শুনিলেন আমি কেমন সুখী, আমার সংসার কেমন সুখের। বাহির হইতে না জানিয়া সকলে সকলের উপর সমালোচনা করিয়া থাকে, ইহাই সংসারের রীতি। এখন আপনারা বেশ বুঝিতে পারিলেন, বিকৃত শিক্ষার কি বিষময় ফল আমাদের দেশে ফলিয়াছে ও ফলিতেছে। এই তো আরম্ভ, এখন শেষ কোথায়, কে বলিবে। যতই দেশে এইরূপ "ভুঁইফোঁড়" ছেলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পিতামাতার অস্তিত্ব লোপ করিবার জন্য চেষ্টা করিবে, যতই কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া স্বেচ্ছা চারিতার পথ প্রশস্ত করিবার প্রয়াস পাইবে, ততই ভগবানের বজ্র তাহাদের ধ্বংস পথে নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ সুচূর্ণ করিয়া নূতন সৃষ্টির উদ্ভব হইবে। তখন আবার যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা আদর্শ ভক্তিমান, আদর্শ কর্ত্তব্য পরায়ণ, আদর্শ ভগবদ্ভক্ত, সে সন্তান জগৎকে শিক্ষা দিবে, জগতে যদি কেহ আদর্শ জাগ্রত দেবদেবী থাকেন, তাহা একমাত্র পিতা ও মাতা। পিতামাতা সন্তুষ্ট না হইলে

ভগবান সন্তুষ্ট হন না। যাঁহাদের ঔরসে ও গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া এই দেহ মন, প্রাণ, লাভ করিয়াছি, যাঁহাদের শোণিত শুক্রে বর্দ্ধিত এই দেহ তাঁহারা কেও কি, একবার ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, পিতামাতা যে কত বড়, কত মহান্, কত উচ্চ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। আকাশ অপেক্ষাও উচ্চ। এই পিতা মাতাকে কত লোক উপেক্ষার চক্ষে, অবজ্ঞার চক্ষে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া ঘোরতর পাপের পসরা বৃদ্ধি করিয়া ইহলোকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া অন্তে নিরয়-গামী হইতেছে, কে তাহা নির্ণয় করিবে। অতএব সাবধান—কেউ "ভুঁইফোঁড়" হইও না। অথবা "ভুঁইকোঁড়" সন্তানের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ইহ-পরকাল নষ্ট করিও না। আমরা উভয়ে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সে দিনের মতন বেণীবাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। বারান্তরে বেণীবাবুর অন্য প্রসঙ্গ উল্লেখ করিবার প্রয়াস পাইব।

শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গল বা কালকেতু।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য—কালকেতুর কুটীরের সম্মুখ।

ভগবতী জগন্মোহিনী মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মানা।

চণ্ডী। ক্ষুধায় আকুল তুমি তথাপি কুমার!
দরিদ্র বৃদ্ধার তরে গেলে গোলাহাটে!
পরহিত ব্রত প্রাণ, হে শচী নন্দন!
দিব তোমা অমূল্য রতন
ঘুচিবে দারিদ্র্য তব, পাবে শান্তি মনে।
গুজরাটে বসাব আমি নগর সুন্দর
সেখানে বসাব তোমা; মহামান্য দাতা
হ'য়ে পালিবে প্রজায়। পেয়েছ অনেক
দুঃখ সংসারে আসিয়ে

কিন্তু বৎস। যে হৃদয় নিয়ে আসিয়াছ হেথা
সে হৃদয় দেবতার, দেবতার বরে
পাইবে অনন্ত সুখ সংসার মাঝারে।
অই আসে পতিপ্রাণা সতী,
ক্ষুধায় বিমল মুখে পড়েছে কালিমা।
আহা বৎসে! পতি সেবা তরে
নিজ দুঃখ নাহি মান তুমি।
"ধন্য ধন্য" করিতেছে অমর-মণ্ডলী
হেরি তব আচরণ, করহ গ্রহণ
যোগ্য পুরস্কার তব কুটীর প্রাঙ্গনে।

(ফুল্লরার প্রবেশ এবং চণ্ডীকে দেখিয়া তর্জ্জনি অঙ্গুলি দ্বারাগাল স্পর্শ করিলেন)

ফুল্লরা। (স্বগত) একি একি একি? মানুষের কি এতরূপ? মানুষ নয়। তবে কি দেবী? এই নীচ ব্যাধের কুটীরে দেবী? অসম্ভব। মরি মরি একি রূপ! কোটী কোটী সূর্য্যের কিরণ রাশি অঙ্গে মেখে, নব কাদম্বিনীর কালিমা মণ্ডিত এলোকেশে হীরক খচিত কিরীট মাথে কে তুমি মা?

চণ্ডী। (হাসিয়া) আমি কে? তা আমিই জানি না। আমাকে জান্‌বার জন্য অনেকেই চেষ্টা করে, পারে না। তুমি কি বীরের স্ত্রী ফুল্লরা? তা বেশ, দুজনে বেশ থাকা যাবে।

ফুল্লরা। কেন? আমরা যে নীচ জাতি ব্যাধ।

চণ্ডী। তাতে কি? যে আমাকে ভালবাসে আমি তারই কাছে যাই। কি জান? কুলীন কন্যা আমি। বাপের গলায় লেগে ছিলুম্, পাষাণ বাপ্ এক বুড়ো বরে দিয়ে দিলেন।

ফুল্লরা স্বামী বুড়োই হোক্ আর জুয়ানই হোক্ চিরদিন তাঁরই সেবা করা উচিত। তুমি স্বামীর নিন্দা করো না।

চণ্ডী। তুমি ত জাননা কি জ্বালা! স্বামীর কত গুণ! দিন রাত ত ভাঙ্গ ধুতুরা খেয়ে নেশায় ব্যোম্। গলায় হাড়ের মালা যে সে হাড় নয় মড়ার মাথা। সর্ব্বাঙ্গে গোখুরো সাপ্। বাপ্‌রে বাপ্ মাথায়

একটা প্রকাণ্ড কাল কুচ্‌কুচে আলান্! ছাই ভস্ম গায়ে মেখে শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ান। সঙ্গী যত ভাঙ্গড় ভূত আর প্রেত। এমন স্বামীকে নিয়ে ঘর করা চলে বলত?

ফুল্লরা। একি? অসতী মেয়ের মত অনর্গল স্বামী নিন্দা কর্‌ছে কেন? উদ্দেশ্য ভাল নয়। (প্রকাশ্যে) স্বামী যেমনই হউন তাঁর নিন্দা কর্‌তে নেই। তোমাকে ভাল ঘরের বৌ ঝি মনে হচ্ছে, কিন্তু কথাগুলো ভাল ঘরের মত শোনায় না।

চণ্ডী। তা কি কর্‌বো বল? যা সত্য তাই বল্‌ছি। আমি সে সব কষ্টও গ্রাহ্য কর্‌তুম না, কিন্তু আমার বুড়ো স্বামী রত্নটির আচরণ তুমি জান না। করেছে কি জান? গঙ্গা নামে আমার এক সতীন্‌কে নাই দিয়ে মাথায় করেছে। সে চঞ্চলা সময় সময় যে তরঙ্গ করে, তা আর কি বল্‌বো। অস্থির হ'য়ে পালিয়ে এসেছি।

ফুল্লরা। ভাল কাজ করনি। শুনেছি, কুলীনের অনেক স্ত্রী থাকে। তা সতীনের সঙ্গে ভাব করে স্বামীর ঘর কর্‌তে হয়। আর যদি ভাব রাখ্‌তে নাই পার, তবে দু'কথা বল্‌লে তাকে দশকথা শুনিয়ে দিও। স্বামীর ঘর ছাড়্‌বি কেনে? দেখ্‌ দেখি সারাদিন সে বৃদ্ধ স্বামী আন্‌চান্ কর্‌ছে। তার যদি ভাল মন্দ হয়, তা হ'লে কোথায় দাঁড়াবি? যা আপন ঘরে যা বাছা! আমার স্বামী ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে হয়ত আমায় খুঁজ্‌তে গেছেন, এখনি আস্‌বেন। আমি দুটি খুদ ফুটিয়ে রাখি।

চণ্ডী। খুদ ফুটুবে? বেশ ত রাঁধ। খুদ কোথায় পেলে তুমি?

ফুল্লরা। সইএর কাছে ধার কর্‌তে গেলাম্ তা সই মাথার দিব্যি দিয়ে বল্‌লে, "ধার বল্‌লে দেবো না ভাই, তুই কি আমার পর?" তাই বলে এই কটি খুঁটে বেঁধে দিলে। তা হ'লে তুমি দিনের আলোয় বাড়ী যাও বাছা!

চণ্ডী। কেন, বাড়ী যাব বলে ত আসিনি, থাক্‌বো বলেই এসেছি। তোমার স্বামীর কত গুণ! দয়া, মায়া, ক্ষমা, বীরত্ব এই সব গুণের কথা শুনে অবধি তাকে ভালবেসে ফেলেছি। ভাল কাজ করিনি।

ফুল্লরা। ধিক্ নির্লজ্জা মেয়ে ধিক্ তোকে! কেমন করে তোর মুখ দিয়ে

ঐ সব অসভ্য কথাগুলো বেরুলো? পুরাণে শুনেছি, স্বামী ত্যাগিনীর অনন্ত নরক বাস। তুই বড় ঘরের বৌ, ঝি হ'য়ে কুলটার আচার করিস্। এখনি যা আমার বাড়ী থেকে, আমার স্বামী তেমন নয়।

চণ্ডী। হাঁ হাঁ তোমার স্বামী সাধু! আমার সঙ্গে তার কত ভাব। সে নিজ গুণে আমাকে বেঁধে এনেছে। আমি ত অমনি যেচে সেধে আসিনি? সত্য মিথ্যা বীরকে শুধিয়ে এস।

ফুল্লরা। (স্বগত) মা দুর্গে! তোর খর ধার ত্রিশূল খানা দিয়ে আমার এই কোমল বুকে আঘাত কর মা! আমার কাণে জ্বলন্ত আগুনের তপ্ত গোলা পুরে দেমা! আকাশ! বজ্রাঘাতে হতভাগিনী ফুল্লরার জীবনান্ত কর। আমার স্বামী দেবতুল্য, স্বামী কুলটায় মজেছে! এ কথা শোন্‌বার পূর্ব্বে আমার মরণ হ'লোনা কেন? ওঃ হো হো!

(বসিয়া পড়িলেন)

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য—কালকেতুর কুটীর।

চণ্ডী। আঘতটা কিছু গুরুতরই হ'য়েছে। এ সইতে হবে। ইক্ষুদণ্ড উত্তমরূপ চর্ব্বণ না কর্‌লে সুমিষ্ট রস নির্গত হয় না। এবং চন্দনকে নির্ম্মম ভাবে ঘর্ষণ না কর্‌লে তা হ'তে সুগন্ধ বহির্গত হয় না। ওঠ ফুল্লরা ওঠ।

(ফুল্লরার গাত্রোত্থান)

ফুল্লরা। (কাতর ভাবে) দেখ, আমরা বড়ই গরীব। বৈশাখ মাসের প্রথম ঝড়েই আমাদের মাথা রাখ্‌বার এই একখানি মাত্র কুটীরের ভেরাণ্ডার থাম দুটি ভেঙ্গে যায়। আষাঢ়ের মুষল ধারায় আমরা নিত্য স্নান করি। পশু পক্ষীর মাংস বেচে দিন কাটাই। এ ঘরে কি সুখ পাবে মা!

চণ্ডী। যা বেটি "মা" বলে ফেল্লি? তা বল্! আমি সহজে ছাড়্‌ছি না।

বীর যখন আমায় আমন্ত্রণ করে এনেছে, তখন তার সঙ্গে দেখা না করেই কি যাবো ভাব্‌ছিস্‌? আমাকে দেখ্‌লে বীরেরও মুখ বন্ধ হবে। তা বোধ হয়, এখন বুঝ্‌তে পারছিস্‌! সে যে আমায় খুবই ভালবাসে।

ফুল্লরা। দেখ, আমাদের বড় কষ্টেই দিন কাটে। বর্ষায় বারি ধারায় ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে এক ক্রোশ দূর বাজারে মাংস বেচ্‌তে যাই। শতছিন্ন কাপড় খানার কোনই বল নাই; মশায়, ডাঁশে আর জোঁকে ছিঁড়ে খায়। আশ্বিনে অম্বিকা পূজা, লোকের কতই আনন্দ। ঘরে ঘরে নূতন কাপড় পরে বৌ ঝিরা পূজা দেখে। আর আমি অভাগিনী পেটের চিন্তায় চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে গোলাহাটে মাংস নিয়ে যাই। কিন্তু সে দিন আর কে মাংস কিনে খাবে? দেবীর প্রসাদী মাংস সবাকার ঘরেই মজুত!

চণ্ডী। তা বটে! কিন্তু আমার ত উপায় নাই। কুলে কালি দিয়ে যখন বেরিয়ে পড়েছি, তখন কি করে ঘরে ফিরে যাব বল? আমায় থাক্‌তেই হবে। যাও তোমার স্বামীকে ডেকে আন।

ফুল্লরা। (ক্রোধে) কুলকলঙ্কিনী। তোর কলঙ্কের ভয় নাই, কিন্তু আমার আছে। এই সর্ব্বশান্তি দায়িনী রজনীর অবসানে যখন ব্যাধের পাড়া ছাড়িয়ে যাবি, তখন আবাল বৃদ্ধ বণিতা নামে টিট্‌কারী দেবে। বল্‌বে "স্বৈরিনীকে দেখিস্‌ না।" কিন্তু কি আশ্চার্য্য! অমন চাঁদের মতন মুখে কলঙ্কের ত একটুও ছায়া দেখ্‌তে পাই না। আশ্চর্য্য! [প্রস্থান।]

চণ্ডী। স্বামী-প্রেম গরবিণী তুমি, তোমার শতছিন্ন কুটীরের মহিমময়ী সম্রাজ্ঞী। সরোবর বিলাসিনী রাজহংসীর ন্যায় তোমার স্বামী গৌরব, গর্ব্ব স্ফীত বদন মণ্ডল দেখে, অমরালয়ের বাসব পুত্র-বধূর সেই বদন মণ্ডল মনে পড়ে! যাও সতী, তোমরা উভয়ে মিলিত হ'য়ে পতি-পত্নী প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর।

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য—গ্রাম্য-পথে কালকেতু আসিতেছেন।

কালকেতু। বড়ই বিলম্ব হ'য়ে গেল। এতক্ষণ কি ভিখারিণী বেঁচে আছে? আহা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পীড়িতা বৃদ্ধা, আমার আশাপথ চেয়ে বসে

আছে, অই যে অশ্রু মলিন মুখী ফুল্লরা আমার এই দিকেই ছুটে আস্‌ছে। তবে বুঝি ভিখারিণী বেঁচে নাই। হায় মা চণ্ডী কি কর্‌লি মা!

(ফুল্লরার প্রবেশ)

(সাগ্রহে) ফুলি, ফুলি, আমাদের কুটিরে একটী বৃদ্ধা ভিখারিণী এসেছিল, সে বেঁচে আছে ত?

ফুল্লরা। (অভিমানে) বেঁচে থাকবে না কেন? বাঁচ্‌তে দেবেনা বলেই ত মুখপুড়ী এসেছে। তুমি আর আমাকে ভুলুচ্ছ কেন? সে ত বৃদ্ধা নয়, ও ভিখারিণীও নয়। বেশ তাকে নিয়েই থাকো, আমি চল্লুম।

কালকেতু। একি! তুই কি বল্‌ছিস ফুলি? এক বৃদ্ধা ভিখারিণী ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে আমার কাছে এসেছিল, সে কোথায়?

ফুল্লরা। সে বৃদ্ধা নয়, আর ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতরও নয়। আমি কি কচি খুকি? ছি ছি, তুমি মিথ্যা বল্‌তে শিখ্‌লে? যাকে পরিহাস ছলেও মিথ্যা কইতে দেখিনী, সে কি না মিথ্যাবাদী! হা পোড়া অদৃষ্ট! (কপালে করাঘাত)

কালকেতু। (গায়ে হাত দিয়া সচেতন করাইবার ইচ্ছায়) ফুলি, ফুলি, এ সব কি বল্‌ছিস্‌? তোর মুখে এসব কথা শুনে আমার যে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌ছে। তুই অনেক কেঁদেছিস দেখ্‌ছি। মাথা ঠুকেছিস, কিন্তু কেন? তোর সনে ঝগড়া করবার যে কেউ নেই ফুলি? সত্য বল কি হ'য়েছে।

ফুল্লরা। মর্‌তে চলেছিলুম্‌, কিন্তু আবার সেই দেবমূর্ত্তি দেখ্‌বার ইচ্ছা হ'লো। দেখলুম "ফুলি ফুলি" আদর মাখান ডাক শুনলুম। আর মর্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে না। দেখ সত্য বল্‌ছি, ষোল বছরের যুবতী কন্যা কার ঘর আঁধার করে তোমার নির্ম্মল চিত্তে কলঙ্কের মসীরেখা আঁক্‌তে নিয়ে এলে। তুমি বলছ আমার কোনও শত্রু নাই, কিন্তু তুমিই যে পরম শত্রু। অদৃষ্ট বশে তোমার চরণে স্থান পেয়েছিলুম। অদৃষ্ট দোষে বুঝি হারালুম্‌।

(চক্ষে হাত দিয়া কাঁদিলেন)।

কালকেতু। ফুল্লরা শোন। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে তুই বিধবা হবি। আর মিথ্যা হ'লে তোর নাক কেটে দেব বলছি। চল ঘরে চল। [উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য—কালকেতুর কুটীর।

চণ্ডীর তরুণী বেশে অবস্থান।

কালকেতু ও ফুল্লরার দূরে প্রবেশ।

ফুল্লরা। অই দেখ।

কালকেতু। তাই ত তাই ত! একি দেখালে ফুলি, এ যে সাক্ষাৎ মা দুর্গার মূর্ত্তি!

কিবা রক্ত কমল জিনি চরণ যুগল।
কোটি চন্দ্র ছটা মাখা করে ঝলমল॥
কাঁচা সোণা নিছনিয়া বরণ সুন্দর।
মুখে মৃদু মৃদু হাসি কোটি চন্দ্রকর॥
এলায়িত কেশ পাশ চামর জিনিয়া।
পৃষ্ঠদেশে পড়িয়াছে আঁধার করিয়া॥
সোণার কিরীট শিরে মাণিক্য মণ্ডিত।
অপরূপ একি রূপ? জগৎ মোহিত॥

ফুল্লরা, এরূপ দেখবার জিনিষ। দেখ দেখ ভাল করে দেখ।

(অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন)।

ফুল্লরা। তুমি দেখ, আমি খুব দেখ্‌ছি।

কালকেতু। আহা,

কাঞ্চন বরণী, অরুণ নয়নী,
সদা হাস্যাননী বামা।
গাম্ভীর্য্য মণ্ডিত, গৌরব ভূষিত,
মখ জনু হিমধামা!
কটি কেশরীর, কেশ চমরীর,
লোচন হরিণ বালা।
খঞ্জন নয়নে, চাহে মোর পানে,
দয়াময়ী! একি লীলা?

ফুল্লরা। (ঠেলা দিয়া) খুব হয়েছে! খুব হয়েছে! বীর পুরুষ! তুমি হৃদয় জয় করতে পারলে না, ধিক্ তোমাকে।

কালকেতু। তাইতো, রমণী কে তুমি? এ অসময়ে ব্যাধের ঘরে কেন?

চণ্ডী। দেখ বীর! আমি কে, এবং কেন এসেছি এর উত্তর অনেকক্ষণ দিয়েছি। এখন বলদেখি, তুমি আমায় চাও কিনা? আমি বড় ঘরের বৌ, মনের খেদে এসেছি। তা ত তুমি জান!

কালকেতু। (সবিস্ময়ে) আমি জানি! একি কথা? আমি তোমায় এই প্রথম দেখ্‌লেম্।

চণ্ডী। প্রথম? মিথ্যা কথা। এ সংসারে আমার সঙ্গে তোমার দুই তিন বার সাক্ষ্যাৎ হ'য়েছে, মনে করে দেখ।

কালকেতু। (চিন্তিত ভাবে) তিনবার সাক্ষ্যাৎ হয়েছে? উহুঁ কখনই না। মায়াবিনী, মায়াজাল বিস্তার করো না। তোমার সঙ্গে আমার কোনই সম্বন্ধ নাই।

চণ্ডী। সম্বন্ধ আছে বৈকি বীর! সম্বন্ধ না থাক্‌লে তুমি আমায় নিজের গুণে বাঁধ্‌লে কেন?

কালকেতু। দেখ বেশী চালাকী করো না। আমরা নীচ ব্যাধ জাতি চালাকি বুঝি না। সোজা কথা বল। কি জন্যে আমাদের ন্যায় চণ্ডালের ঘরে তুমি এসেছ। দেখ্‌ছো না, আমাদের আচার ব্যবহার! চাদ্দিকে পশু পক্ষীর হাড় চামড়া পাখা পালক ছড়িয়ে রয়েছে। শুষ্ক প্রায় রক্ত মাংসের দুর্গন্ধে আমাদেরই বমি হয় হয়। তুমি কেন এখানে এলে? এখানে এলে স্নান কর্‌তে হয়। তবে শুদ্ধ।

চণ্ডী। বীরবর! তোমার চোখা বাণেও বুঝি মিষ্টতা আছে। ছিঃ তুমি বড়ই রূঢ়। কোথায় আদর করে আমায় মিষ্ট কথায় তুষ্ট কর্‌বে, তা না হ'য়ে দুর্ব্বাক্য বল্‌তে সুরু কর্‌লে! আমি তোমাদের দুঃখ দূর কর্ত্তেই ত এসেছি। আগে আমাকে স্থান দাও। তারপর আমার মন জানে, আর আমি জানি।

ফুল্লরা। আর জানা জানিতে কাজ নাই বাছা! তুমি ভালই ভালই পথ দেখ।

কালকেতু। ফুল্লরা ঠিক বলেছে, ভালই ভালই পথ দেখ। এখনও রবি কিরণ লুপ্ত হয়নি। দিবালোকে সকলের সাম্‌নে দিয়ে তোমার

পদার্থও ত্রিবিধ। সত্ত্বগুণাধিক লোকের সাত্ত্বিক আহার, রজোগুণাধিক লোকের রাজসিক ও তমোগুণাধিক লোকের তামসিক আহারই প্রিয় হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥"

ভগবদ্‌গীতা।

যে সকল আহারীয় পদার্থ আয়ু, চিত্তের স্থৈর্য্য, বল, আরোগ্য অকৃত্রিম সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধন করে, যাহা সুরস ও সুস্নিগ্ধ, যাহার ক্রিয়া অনেক সময় পর্য্যন্ত শরীরে স্থায়ী হয় এবং যাহা হৃদ্য (কোন প্রকার বিকট বা উগ্র গন্ধযুক্ত নহে) তাদৃশ আহারই সাত্ত্বিক লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। যে সকল দ্রব্য অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণরসযুক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ ও অতি বিদাহী (অত্যন্ত উত্তাপবর্দ্ধক) এবং যে সকল আহার দুঃখ, শোক ও আময়ের (ব্যাধি) বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেই সকল আহারই রাজসিক লোকের প্রিয় হয়। আর যে সকল আহারীয় দ্রব্য অর্দ্ধপক্ক, বিরস (যাহার প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হইয়াছে) পূতি (পচা) পর্য্যুষিত (বাসি) উচ্ছিষ্ট (ভুক্তাবশিষ্ট) ও অমেধ্য (অপবিত্র) তাহার নাম তামসিক আহার এবং তামসপ্রকৃতিক লোকেরই তাহা প্রিয় হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে মৎস্য ও মাংস সাধারণতঃ রাজসিক আহারের পর্য্যায়ে স্থান পাইলেও অবস্থাভেদে তাহা তামসিক আহার ও তামসপ্রকৃতিক লোকেরও প্রিয়। অতএব শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়তঃই প্রতিপন্ন হইল যে, মৎস্য-মাংসপ্রিয় রাজস ও তামস অধিকারীমাত্রই শাস্ত্রানুমোদিত পবিত্র মৎস্য মাংস দ্বারাই ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন, এবং তাঁহাদের জন্যই শাস্ত্রে ব্যবস্থা হইয়াছে,—

"বিনা মৎস্যৈর্ব্বিণা মাংসৈর্নার্চ্চয়েৎ পরদেবতাম্।"

মৎস্যমাংস ব্যতীত দেবতার অর্চ্চনা করিবে না। আবার শাস্ত্রান্তরেও কথিত হইয়াছে,—

"রাজসো বলিরাখ্যাতো মাংস-শোণিত-সংযুতঃ।"

রাজসপ্রকৃতিক লোকেরা মাংসশোণিতযুক্ত বলিই দেবতাকে অর্পণ করিবেন।

কিন্তু যাঁহারা সাত্ত্বিকপ্রকৃতিক, মৎস্য ও মাংস তাঁহাদের পক্ষে একবারেই অপ্রিয়। সুতরাং বলিদানে তাঁহাদের অধিকার নাই। সাত্ত্বিকপ্রকৃতিক দিগের উপচার-দান বিষয়ে শাস্ত্রে নিম্নলিখিত রূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

"সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।"

সাত্ত্বিক সাধকেরা জপ, যজ্ঞাদি ও নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারাই ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। কেন না তাহাই যে তাঁহাদের প্রিয়বস্তু।

সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস অধিকারী কাহাকে বলে ও তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ কি, এক্ষণে তাহাই কথিত হইতেছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥

সত্রাজিৎ ঐ মণিরত্ন কণ্ঠে ধারণ করিয়া দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় যদুর বংশে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বলরাম দ্বারকায় বাস করিতেছেন। ভগবান অচ্যুত কংসকে ধ্বংস করিয়া তাঁহার পিতা উগ্রসেনকে দ্বারকা ও মথুরার রাজা করেন। সত্রাজিতের উজ্জ্বল বপুঃ দর্শনে দ্বারকাবাসী জনগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া কহিতে লাগিল, "আপনি অবনির ভার লাঘব করিবার জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন। মানুষ রূপী অনাদি পুরুষ আপনাকে নমস্কার। ভগবান সূর্য্যদেব বোধহয়, আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন।"

শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ইনি ভগবান সূর্য্যদেব নহেন, সূর্য্যের কণ্ঠমণি স্যমন্তক ধারণ করিয়া নিয়ের পুত্র সত্রাজিৎ আগমন করিতেছেন। সত্রাজিৎ অবশ্য এই দুর্লভ মণিলাভে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। এবং সর্ব্বদা যাহাতে এই মণি স্বীয় কণ্ঠে ধারণ করেন, তাহাতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অন্যান্য যাদবগণ যে প্রকার সস্পৃহ নেত্রে ঐ মণিটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা দেখিয়া সত্রাজিতের মনে আশঙ্কা হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ বলরামও এই মণিটি লইবার চেষ্টায় আছেন; অতএব সাবধানে থাকাই কর্ত্তব্য।

সেই মণিটির আশ্চর্য্য গুণ,—প্রতিদিন আট ভার করিয়া স্বর্ণ প্রসব করে। ইহার অর্থ মণি রত্নের প্রভাবে রাজ্যের মধ্যে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, ভয়, মারাত্মক জন্তুর হিংসা ও চৌরাদির উপদ্রব দূরীভূত হইয়া রাজ্যবাসীর অত্যন্ত ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন যে, এক্ষণে ব্রাহ্মণ আমাদের পরম পূজ্য রাজা উগ্রসেন। ইনি যদি এই রত্ন লাভ করিতেন, তাহা হইলে রাজ্যের অশেষ মঙ্গল হইত। এই বিবেচনায় ঐ মণিটির প্রতি স্পৃহাবান হইলেন।

সত্রাজিৎ দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যে, সে লোক নহেন, গিরি-গোবর্দ্ধনধারী। কংস ঘাতী। ইহাঁর যদি এই মণিতে লোভ জন্মিয়া থাকে, তবে আমার নিকট যাচ ঞা করিবেন, কিংবা কৌশলে হরণ করিবেন। কিন্তু গোত্র ভেদ ভয়ে হরণ করিবেন না মনে হয়। আমার ভ্রাতা প্রসেনকে ঐ রত্ন পরাইয়া দিই, এই বলিয়া সত্রাজিৎ ঐ মণি ভ্রাতাকে প্রদান করিলেন।

ঐ মণির এমনি গুণ ছিল যে শুদ্ধ অবস্থায় ধারণ করিলে সুবর্ণ, মণি, মাণিক্যাদি প্রসব করিত, কিন্তু অশুচি অবস্থায় ধৃত হইলে, ধারণ কর্ত্তার প্রাণনাশ করিত। "আচারে লক্ষ্মী বিচারে পণ্ডিত" এই যে প্রবচন, ইহার অর্থ ঐ; ভুড়া মাড়ুলি, বস্ত্র ধৌত, আচমন, স্নান, পাদ প্রক্ষালন, সন্ধ্যা বন্দন প্রভৃতি শৌচাচার ত্যাগ করিতে নাই।

সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেনজিৎ একদা ঐ রত্ন কণ্ঠে ধরিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ায় গমন করিলেন।

অশুচি অবস্থায় ধারণ হেতু সেই কানন মধ্যে এক সিংহ ঐ প্রসেনজিতের প্রাণনাশ করিল। অশ্বও বিনষ্ট হইল। সিংহ তখন ঐ মণি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছে, এমন সময় কালরূপী এক ভল্লুক তাহার নাম জাম্ববান সিংহকে নিহত করিল। হিংসাকারী সিংহের ভাগ্যেও মণি ধারণ ঘটিল না।

অনন্তর জাম্ববান ঐ মণিটি গ্রহণ করিয়া নিজ গর্ত্তে প্রবেশ পূর্ব্বক সুকুমার নামক বালককে প্রদান করিল।

এদিকে মৃগয়ার্থ প্রস্থিত প্রসেনজিৎ অদ্যাবধি প্রত্যাগমন করিতেছেন না দেখিয়া যাদবগণ চিন্তিত হইলেন। অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকে সন্দেহ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ ঐ মণির প্রতি বরাবর প্রলুব্ধ ছিলেন, নিশ্চয়ই প্রসেনজিৎ তাঁহার দ্বারাই নিহত হইয়াছে।"

এই সকল লোকাপবাদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণ করিলে, তিনি প্রকৃত তথ্য জানিবার উদ্দেশে যদুসৈন্য সমভিব্যাহারে অরণ্য পথে যাত্রা করিলেন, এবং অনতি বিলম্বে সিংহ কর্ত্তৃক নিহত প্রসেনজিৎকে দেখিতে পাইলেন। সিংহের পদাঙ্ক দর্শনে সকলেরই মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, শ্রীকৃষ্ণ হত্যাকারী নহেন। সিংহ কর্ত্তৃকই প্রসেন হত হইয়াছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন সিংহ পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অল্প দূরেই দেখিতে পাইলেন যে, ভল্লুক কর্ত্তৃক সেই সিংহও নিহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তিনি সেই ভল্লুকের পদবীর অনুসরণ করিলেন।

কিছুদূর গিয়া পর্ব্বত পাদদেশে এক বিল মধ্যে ঋক্ষ পদাঙ্ক দেখিতে পাইয়া শ্রীহরি তথায় প্রবেশ করিলেন। তিনি বিলের মধ্যে অর্দ্ধেক প্রবেশ করিয়াই একটি সুন্দর বালকের প্রলোভনার্থে কোনও ধাত্রী মুখোচ্চারিত নিম্নলিখিত বাক্য শ্রবণ করিলেন :—

সিংহ প্রসেন মবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদী স্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥

সিংহ প্রসেনকে মারিয়াছে, জাম্ববানও সেই সিংহকে মারিয়াছেন, হে সুকুমার! তুমি রোদন করিও না। এই স্যমন্তক মণি তোমারই।

এই বাক্য শ্রবণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মণির বার্ত্তা জানিতে পারিয়া গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিলেন, ধাত্রীর হস্তে স্যমন্তক মণি স্বীয় তেজে অতিশয় দীপ্তি পাইতেছে। সুকুমারের ধাত্রী শ্রীহরিকে স্যমন্তকাভিলাষী জানিয়া, ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার আর্ত্তনাদ শ্রবণে জাম্ববান

সকোপে সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন দুইজনে মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল।

এইরূপে যুদ্ধ করিতে করিতে এক-বিংশতি দিবস অতীত হইলেও যখন শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাগমন করিলেন না, তখন যাদবগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। এবং সাত আট দিন পরে দ্বারকায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিধন সংবাদ প্রচার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বান্ধবগণ তৎকালোচিত শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ বান্ধবগণ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধা সহকারে প্রদত্ত অন্ন জলে পুষ্টিলাভ করিয়া জাম্ববানকে পরাজিত করিতে লাগিলেন, জাম্ববান আহারাভাবে সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হইলেন। এবং প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে স্তব করিতে লাগিলেন।

"সুরাসুর যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসাদি সকলে মিলিত হইয়াও ভগবানকে জয় করিতে পারে না, আমাদের ন্যায় অবনীতল বিহারী মনুষ্যদের ক্রীড়ার জিনিষ, অল্পবল, তির্য্যক জন্মানুসারিগণের ত কথাই নাই। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের স্বামী, সকল জগতের গতি, নারায়ণের অংশ, তাহার সন্দেহ নাই।"

জাম্ববান এই কথা বলিলে, ভগবান তাহাকে সমগ্র অবনীভার হরণের জন্য স্বকীয় অবতারের বিষয় বলিলেন, এবং প্রীতির সহিত তদীয় অঙ্গে করস্পর্শ করিয়া তাঁহার যুদ্ধ খেদের অপনয়ন করিলেন।

অনন্তর জাম্ববান ভগবানকে পুনর্ব্বার প্রণাম পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া গৃহে আগমনের অর্ঘ্য স্বরূপ স্বীয় কন্যা জাম্ববতীকে প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতীর পাণিগ্রহণ করিলে, কন্যা দানের দক্ষিণা স্বরূপ জাম্ববান স্যমন্তক মণিটিও শ্রীকৃষ্ণের করে প্রদান করিলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই মণিরত্ন অগ্রহনীয় হইলেও কেবল আত্ম শোধন জন্য গ্রহণ পূর্ব্বক সস্ত্রীক সানন্দে দ্বারকায় আগমন করিলেন।

দ্বারকাবাসী যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের আগমনে যেন নূতন যৌবন প্রাপ্ত হইয়া "বাসুদেবের জয়" বাসুদেবের জয় বলিয়া সম্মানিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন যাদবগণকে সমস্ত কথা বলিয়া সত্রাজিতের হস্তে স্যমন্তক মণি প্রদান করিলেন।

লোকে শ্রীকৃষ্ণের মিথ্যাপবাদ বিস্মৃত হইল। সত্রাজিৎও লজ্জিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, হায় মিথ্যা কলঙ্কে ইহাঁকে কলঙ্কিত করিয়াছি। এই ভাবিয়া ভীত হইয়া স্বীয় কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণ করে সমর্পণ করিলেন।

পূর্ব্বে ঐ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সত্যভামাকে অক্রূর কৃতবর্ম্মা ও শতধন্বা প্রভৃতি যাদবগণ প্রার্থনা করিয়াও পান নাই, এক্ষণে সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণকে ঐ কন্যারত্ন প্রদান করায়, তাঁহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শতধন্বাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। অক্রূর বলিলেন, "ওহে শতধন্বন্ এই সত্রাজিৎ অতি দুরাত্মা। পূর্ব্বে আমরা প্রার্থনা করিলেও এই দুষ্ট আমাদিগকে কন্যা সম্প্রদান করে নাই, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় তনয়া প্রদান করিল। অতএব ইহাকে বধ করাই কর্ত্তব্য। আপনি উহাকে মারিয়া মহারত্ন স্যমন্তক গ্রহণ করুন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণও যদি শ্বশুরের পক্ষ হইয়া সাহায্য করেন, আমরা সকলেই আপনার সাহায্য করিব।

ক্রমশঃ।

অন্তর্ধানে। *

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু।

["তিন দিন মানবের জীবনে প্রধান—
যেই দিন প্রসবিত,
যেই দিন পরিণীত,
সজ্জিত চিতায় হায় যেদিন শয়ান,—
আদি অন্ত দুঃখ মধ্যে সুখের নিদান।"

ঋষি কবি ৺সুরেন্দ্রনাথ]

তার জ্যোতিজাল মেলি' যতকাল সুরয সমুখে ভাসে,
আমরা ক'জন, বন্ধু! তখন ধরা দেই তার পাশে?
ক্রমে তেজোরাশ যত হয় হ্রাস— যত যায় ধীরে ডুবে,
তত মোরা বুঝি— ইতিউতি খুঁজি! পশ্চিম হ'তে পূবে!
আজি সবাকারে ঢাকি আঁধিয়ারে মা মোদের পলাতকা,—
পথের বারতা এবে পাই কোথা? পথ চেনো তুমি সখা?

যে-অনল-শিখা শলভের পাখা নিঃশেষে করে ছাই,
সেই এক-ই তেজে, কনকেরে সে যে উজ্জ্বলি' তুলে ভাই!
যাতে কলেবর করে জরজর, সেই কূট হলাহল
মহামহিমায় আভরণ প্রায় শোভে হরগলতল!
সংসার-দাহে দেহ অবগাহে দেবোপম দেখি যিনি,—
সেই জননীর, পদে নত শির, মোরা তাঁর চির-ঋণী!

সেরা ব্রত তাঁর,— ছিল সবাকার সুখী রাখা সারা হিয়া,
তাই বারে বারে তিনি আপনারে গিয়াছেন পাসরিয়া!
নিজে দুখে রহে' ব্যথা তাপ সহে' আপনাপরের সেবা
যদি আমরাই,— নাহি করি ভাই তাহ'লে করিবে কেবা?
নয়নের আগে নাহি বটে জাগে সে-ছবি পুণ্যময়,—
সারা হিয়াতল ভাসায়ে উছল তাঁহার স্নেহ বয়!

*সুহৃদ্বর কবি হরিধন মিত্রের মাতৃদেবীর মহাপ্রয়াণে। (২৯ শ্রাঃ ১৩৩৭)।

বৈষম্যে বরণ।

লেখক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। এম, বি,

আমি সকুল তটিনী, ছাড়িয়া চলেছি,
অকুল সাগর পানে।
আশার আশ্বাস, চরণে দলিয়া,
নিরাশা বেঁধেছি প্রাণে।
আমি পৃথ্বী ছাড়িয়া, ছুটিয়া চলেছি,
শূন্যেতে ঝুলিব বলে।
অমঙ্গলে বরি, মঙ্গল আপন,
দলেছি চরণ তলে॥
আমি গৃহ তেয়াগিয়া, স্বজন ছাড়িয়া,
চলেছি বিজন বনে।
পথ হারা হয়ে, ধাঁধায় ভ্রমিতে,
ছুটেছি মুগধ প্রাণে॥
আমি এতদিন ধরি, সু-পথে চলিয়া,
লভি নাই কোন ফল।
লভিয়াছি শুধু, হতাশ আক্ষেপ,
উষ্ণ নয়নের জল॥
নিষ্ফল প্রয়াসে, ঘাত প্রতিঘাতে,
অবশ দগধ হৃদি।
বৈষম্যে বরিয়া, পরখি লইব,
ভালে কি লিখিলা বিধি॥

দাঁত ও আঁত।

দাঁতের ব্যথায় আঁতের কাঁপুনি
আঁত বলে দাঁত থাক্।
তুই গেলে আর কে আছে আমার
আমার জীবন রাখ॥

শ্রীরাজেন্দ্র।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৬শ বর্ষ } ১৩৩৭ সাল, ভাদ্র। { ৩য় সংখ্যা।

শ্রী শ্রীমহাপ্রভুর মাতৃ দর্শন।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।
কাব্যরত্নাকর।

কতদিন পরে, আজি শান্তিপুরে,
আসিলা নিমাই নিতাই সাথে।
আচার্য্য শুনিয়া, আনন্দে ভাসিয়া,
আলিঙ্গনে বাঁধে আদেক্ পথে॥
তিনে এক হ'ল, প্রণব সৃজিল,
ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, মিলিত ধারা।
তিনে মিশে গেল, ত্রিবেণী হইল,
আনন্দে সকলে আপন হারা॥
নবদ্বীপ হ'তে, মায়েরে আনিতে,
পাঠাইলা ডুলি নিতাই গোরা।
জননী আসিয়া, পুত্রে নিরখিয়া,
আনন্দে হইলা পাগল পারা॥

অতি ক্ষীণ দেহে, আনন্দ কি সহে ?
পড়িলা জননী ধরণী পরে।
"নিমু নিমু" বাণী, উচ্চারে জননী,
ধীরে ধীরে তাঁর অধর নড়ে ॥
হায় ! হায় ! করি. গৌরগণ ঘেরি,
শীতল ব্যজনী লইলা হাতে।
বারি সুশীতল, মস্তক শীতল,
করিল মায়ের শুশ্রূষাতে ॥
সম্বিৎ পাইয়া, নিমাই এ লইয়া,
কোলে করি বসেন শ্রীশচী মাতা।
মুখে হাত দিলা, মস্তক চুমিলা,
ভিজিল প্রভুর নয়ন পাতা।
কাঁপিতে কাঁপিতে, মার চরণেতে,
পড়িলা নিমাই "মা মা" বলি ॥
ক্ষমা কর মোরে, ত্যজিয়া তোমারে,
কেন আন্ দেশে গেলাম চলি ?
সর্ব্ব-তীর্থ সার, তুমি "মা" আমার,
গয়া, কাশী, পুরী, তোমার পদে।
তোমার বদন, হইলে স্মরণ,
সন্ন্যাস—সাধ রহেনা হৃদে।
কাঁদিতে কাঁদিতে, নিমাই এ বলিতে,
কোনও কথা মাতা পড়িলা ভুঁয়ে ॥
যতনে নিমাই, সহিত নিতাই,
মায়েরে ধরিয়া পড়িলা শুয়ে ॥

শ্রীমদ্ বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাজ বালানন্দের অভিষ্টদেব।

শ্রীমন্মহারাজ ব্রহ্মানন্দের কিঞ্চিৎ বিবরণ ঃ—

যে সমুদয় সাধু মহাত্মাগণ বহুদিন গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানের পর সাধুজীবন গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে গৃহস্থাশ্রমের বহুবিধ বিষয় জানিবার আবশ্যক হয়। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের গুরুদেব সম্বন্ধে সেরূপ অধিক জানিবার কিছুই নাই, কারণ তিনি নবম বৎসরে গৃহত্যাগী, এই বাল্য বয়সেই তিনি নৈষ্ঠীক ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহার কৃপায় তিনি ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ সময় হইতে তিনিই তাঁহার পরমপিতা শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—

"উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রো গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
তস্মান্মন্যেত সততং পিতুরপ্যাধিকং গুরুং ॥

শ্রীগুরুদেবের জন্মদাতা পিতা সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু শুনাইতে পারি নাই। কিন্তু ব্রহ্মদাতা পিতা সম্বন্ধে এক্ষণে কিছু শুনাইব। এ মহাপুরুষের বিবরণ যৎকিঞ্চিৎ যাহা শুনাইব, তাহা হইতে আমাদের গুরুদেবের শিক্ষা ও সম্বন্ধ কিরূপ হইয়াছিল, তাহার আভাস সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। কারণ সাধন মার্গে শ্রীগুরুদেবই হইতেছেন শিষ্যের পথ প্রদর্শক।

পূর্ব্বে আরও শুনাইয়াছি যে, যে সময়ে গুরুদেব নর্ম্মদা তীরে গমন করেন; তখন দুই মহাত্মা তথায় অবস্থান করিতে ছিলেন। ইহার মধ্যে আমাদের পরম গুরুদেব ছিলেন, গুপ্ত ও অপর জন ব্যক্ত সিদ্ধ পুরুষ। এ গুপ্ত ও ব্যক্ত সংজ্ঞা কি কারণে দেওয়া হইল, তাহা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এ দুই মহাত্মাই হইতেছেন, আমাদের গুরুদেবের যথাক্রমে দীক্ষা ও শিক্ষা গুরু। এক্ষণে প্রথমোক্ত গুপ্ত পুরুষের বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

আমাদের পরম পূজনীয় পরম গুরুদেব মহারাজ ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি আমাদের পরাৎপর গুরু শ্রীমন্ নিত্যানন্দ মহারাজের শিষ্য ছিলেন। এ শেষোক্ত মহারাজ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। তবে গঙ্গোনামে একখানি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে তাঁহার দুইখানি পদচিহ্ন মাত্র অঙ্কিত দেখিয়াছি। যাহা নিত্য পুষ্পাদির দ্বারা পূজিত হয়।

আমাদের গুরুদেবের শিষ্য সম্প্রদায় ব্যতীত এ বঙ্গদেশে এ বৃদ্ধ মহারাজ ব্রহ্মানন্দ দাদা ঠাকুর অপরের নিকট বড় পরিচিত নহেন। তবে বোম্বাই, বরদা আহাম্মদাবাদ, গুজরাট, ও ভাটিয়া প্রদেশস্থ প্রাচীন বহু ব্যক্তির নিকট তিনি এক সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন।

এ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আশ্রম ছিল গঙ্গোনাথ। বহু স্থান পর্য্যটন ও বহু স্থানে আসন পরিগ্রহের পর এ মহাত্মা এই গঙ্গোনাথে জীবনের শেষ প্রায় ৫০।৬০ বৎসর কাল অবস্থান করেন। এ গঙ্গোনাথ নর্ম্মদা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। বরদা হইতে যে ব্রাঞ্চ রেল লাইন নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী চান্দোপ ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে, সেখান হইতে নিম্নাভিমুখে প্রায় ২ মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। চান্দোদের সমীপস্থ নর্ম্মদা তীর হইতে গঙ্গোনাথের মন্দির দর্শন করা যায়। ইহা বরদা রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াও বৃটিশ শাসনের অন্তর্গত, যেমন বঙ্গদেশের কুমিল্লা বরদা হইতে দুরত্ব প্রায় ৪৫ মাইল। বরদার ভূতপূর্ব্ব গুঁইকোয়ার ও তাঁহার মহিষী ও রাজমাতা যমুনাবাই প্রভৃতি এ মহাত্মার পরমভক্ত বা কেহ কেহ শিষ্যও ছিলেন।

এ মহাত্মার অবস্থান জন্য এ গঙ্গোনাথ সমূহ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এ স্থানে বহু প্রাচীনকাল হইতে গঙ্গোনাথ নামক প্রসিদ্ধ এক স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বিরাজিত আছেন। অতি পূর্ব্বে এ স্থান কিরূপ ভাবে পরিচিত ছিল, তাহা কাহারও জানা নাই। তবে ব্রহ্মানন্দজীর অবস্থান সময় হইতে ইহা সমধিক প্রসিদ্ধি সম্পন্ন হয়। উক্ত মহাত্মা এ স্থানে অবস্থানের সহিত ব্যক্ততা প্রাপ্ত হইলে ক্রমে ক্রমে তিনি এস্থানে গঙ্গোনাথের মন্দির, সরস্বতী দেবীর মন্দির ও গুহা, সাধু অতিথির অবস্থান জন্য ধর্ম্মশালা, নর্ম্মদাতীর হইতে মন্দির পর্য্যন্ত পাকা সিঁড়ি, গোশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ কার্য্যের দ্বারা এ স্থানটীকে পরম রমণীয় করিয়া তুলিয়া ছিলেন। এ গঙ্গোনাথদেবকে সম্মুখে রাখিয়া ইহার পূর্ব্বদিকে একটী অল্প পরিসর বিশিষ্ট ও সম্মুখে উন্মুক্ত যে বারান্দা ও তাহার সম্মুখে যে একখানি টিনের আচ্ছাদন ছিল, সেখানেই তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহার সম্মুখে এক ধুনী ও তৎপার্শ্বে এক অখণ্ড দীপক অহোরাত্র প্রজ্জ্বলিত থাকিত। এ স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। নর্ম্মদাতীর হইতে দ্বিতল বা ত্রিতল পরিমাণ উচ্চ কিনারার উপর মন্দির প্রতিষ্ঠিত ও তন্নিম্নে নর্ম্মদা নদী প্রবাহিতা। উপর হইতে দক্ষিণ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অতুল ও সুবিস্তৃত বিন্ধ্যগিরি পরিদৃষ্ট হইবে। প্রাতঃকালে যখন নর্ম্মদা গর্ভ হইতে সূর্য্যদেবের উদয় হয়। তাহা বড়ই মনোহর। এ

নর্ম্মদাতীর নানারূপ বৃক্ষাচ্ছাদিত। ইহা গৃহস্থালয় হইতে দূরে অবস্থিত। নর্ম্মদা পরিক্রমকারীগণের এ স্থান এক বিশ্রাম কেন্দ্র। এ স্থানে অন্নদান, বস্ত্রদান, সাধু অতিথি ও অভ্যাগতের যথোপযুক্ত সেবা ও আপ্যায়ন, পরিক্রমাকারীগণের প্রতি সেবা ও যত্ন রীতিমতভাবে অনুষ্ঠিত হইত। ইহা ভিন্ন গো সেবা ও আতুরের সেবা সমাদরের সহিত হইত। মাসের মধ্যে দুই একবার "ভাণ্ডারা" বা উন্মুক্ত ভাবে অন্নদান, বৎসরের মধ্যে দুই একটী যজ্ঞ, বা রুদ্রযজ্ঞ, মহারুদ্র যজ্ঞ, বিষ্ণুযজ্ঞ, প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বিধানমত অনুষ্ঠিত হইত। অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষের সময় এ মহাত্মার এ অন্নভাণ্ডার অবারিত ভাবে উন্মুক্ত হইত। এরূপ সময়ে যজ্ঞ কিরূপে তিনি ইহার নির্ব্বাহ করিতেন, ইহা কেহই বুঝিতে পারিত না। এজন্য সকলে তাঁহাকে অন্নপূর্ণাদেবীর বরপুত্র বলিয়াই বিশ্বাস করিত। এ অন্নদান সময়ে খিচুড়ী অন্নই এক একটী পিণ্ড করিয়া বিতরিত হইত। তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি এই আদেশ ছিল যে, এ অন্ন যেন একজনকে পুরাপুরি ভাবে বিতরিত হয়, অর্থাৎ একটী গোলা পাইলে যেন সে ব্যক্তি তৃপ্তিলাভ করে। এ খিচুড়ীর গোলা সম্বন্ধে একটী হাসির গল্প আমোদের গুরুদেব একবার শুনাইয়া ছিলেন। বৃদ্ধ মহারাজ একবার বরদার রাজধানীতে গমন করেন, ও তাঁহার সহিত আমাদের গুরুদেবও গমন করেন। এ বুড়ো মহারাজ সর্ব্বদাই বালকোচিত রঙ্গরস লইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। এইরূপ রঙ্গরস ভাবে কথা কহিতে কহিতে তিনি শিওজীরাওকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার নাকি এক চাঁদীর (রূপা) তোপ আছে। বাস্তবিকই ইহা আছে। বরদায় যাইলে অনেকে ইহা দেখিতে যান। বরদা মহারাজ আছেন, বলিয়া স্বীকার করিলে আমাদের বুড়ো মহাত্মা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা হইতে গোলা কতদূর যায়, বরোদারাজ উত্তর দিলেন যে, প্রায় ১ মাইল যাইয়া থাকে। ইহা শুনিয়া বুড়ো ঠাকুর বলিলেন যে, "আপ্‌কোই তোপ্ কুছ নাহি হ্যায়" "হামারি গোলা চারিখুঁটমে দশ দশ ক্রোশ তক্ ঘুমতা হ্যায়।" বরদারাজ বুঝিতে পারিতেছেন না, বুঝিয়া তখন বলিলেন, "হ হামারী খিচুড়ী কা গোলা।" তখন বরদারাজ বলিলেন, "সাধুকো গোলাকা সাৎ হামারি গোলা কেসা সেক্‌তা হ্যায়।" বাস্তবিকই অন্নকষ্টের সময় গঙ্গোনাথের চতুষ্পার্শ্বস্থ দশ দশ ক্রোশ দুরবর্ত্তী স্থান হইতে বহুলোক আসিয়া এ মহাত্মা প্রদত্ত প্রসাদ পাইয়া যাইত। আমাদের বাবাজী মহারাজ পৃথ্যানন্দ (গুরুদেবের গুরু ভ্রাতা) পরম গুরুদেবের শেষ শিষ্য। তিনি নেপাল রাজধানী কাটমুণ্ড হইতে আসিয়া ছিলেন বলিয়া

তাঁহাকে তিনি "পাহাড়ী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। গঙ্গোনাথের ভাণ্ডার অনেক সময় তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিত, বলিয়া তাঁহাকে সাধারণতঃ "কুঠারী" বাবাও বলিত। এই অন্নদান সম্বন্ধে তাঁহার নিকট একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। একদিন ভাণ্ডারা প্রায় শেষ শেষ হইয়াছে, এমন সময় বহুলোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ভাণ্ডারে অন্ন কম দেখিয়া যাহাতে সকলের কুলান হয়, এজন্য অন্নের গোলা ছোট ছোট করিয়া বিতরণ করিতে ছিলেন। ইহা যেমন বড় মহারাজের নজরে পড়িয়াছিল, অমনি বলিয়া উঠিলেন, "পাহাড়ী তোম্ কাঙ্গালকা লেড়কা মালুম হোতা হ্যায়। কাহে অন্ন কম দেতা হ্যায়। তোম পুরা পুরা দেও! তোমারি কুছ্ চিন্তা নহি।" ইহা বলিয়াই এক একজনকে কিরূপ দিতে হইবে, এরূপ ২।৪ টী গোলা নিজ হস্তে বাঁধিয়া দিলেন। সকলেই পুরা-পুরি রূপে পাইয়াও ভাণ্ডারে অন্ন মজুত থাকিতে দেখিয়াছিল। এ প্রকার বহু বার হইয়াছে। ভাণ্ডারে অন্ন কম আছে, অথচ বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। যেমন বড় মহারাজের দৃষ্টি ইহাতে আকর্ষিত হইত, অমনি সকলে দেখিয়াছে যে, পর্য্যাপ্তরূপে বিতরিত হইয়াও অন্ন ভাণ্ডারে মজুত আছে। এ মহাত্মার এরূপ যোগ্য বিভূতির বিবরণ বহুল ভাবেই প্রচলিত আছে। এ আশ্রমে প্রায় ১০০ ১৫০ গো ও বহু সংখ্যক কুকুর থাকিত। এ মহাত্মা অনেক সময়ে নিজ হস্তে ইহাদের আহারের পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। পূর্ব্বোক্ত বাবাজী বলেন যে, তাঁহার বিদ্যা নাই, এজন্য কিছু শিখিতে পারিতেছেন না, এরূপ ভাবে জ্ঞাপন করিলে পরম গুরুদেব তাঁহাকে ভক্তিভাবে গো সেবা করিতে বলেন, ও জ্ঞাপন করেন, ইহা করিলেই তাঁহার স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে। এ আশ্রমে এরূপ নিয়ম ছিল যে, কোন ভাণ্ডারার সময় বা প্রতিদিন ভোজনের সময় সকলের ভোজনান্তে একবার ঘণ্টা বাজান হইত, ও উচ্চৈস্বরে আর কেহ অভুক্ত আছে কিনা, ডাকিয়া হাজির হইতে বলা হইত। যখন আর কেহই আসিতনা, তখন এ মহাত্মা তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট যে খিঁচুড়ী অন্ন ধুণীর উপর বসান থাকিত, তখন তাহা উঠাইয়া লইয়া আহার করিতেন। এরূপ আহার শেষ হইলেই দেখা যাইত যে, ডাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়াছে।

আমাদের এ বুড়ো মহারাজের বয়স কত হইয়াছিল, ইহা জানিবার জন্য অনেকেই উদগ্রীব হইয়া থাকেন, যে বাঙ্গালী জীবন আজকাল পঞ্চাশ না হইতেই বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহাদের পক্ষে ইহা জানাইলেও উপকার আছে। আমরা নাতি হিসাবে ইহা জানিবার জন্য এক সময়ে প্রশ্নও করিয়াছি। তিনি ত

রসিক চূড়ামণি, এজন্য তাঁহার নাতিদিগকে উত্তর দিয়াছেন, "হাম্তো লেড়কা হ্যায়" হামারি উমোর এককুড়ি না হয়, ধর্লেও ছকুড়ি।" আমরা ত হাসিয়াই আকুল হইয়াছি। এ মূর্ত্তি যে অতি প্রাচীন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সরাসর ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কেহ পূর্ব্বোক্ত উত্তর ভিন্ন অন্য উত্তর পায় নাই। তবে জানা গিয়াছে যে, গঙ্গোনাথে দেহ রক্ষার শেষ প্রায় ৫০।৬০ বৎসরের পূর্ব্বে। তিনি দ্বারকা, উজ্জয়িনী, ওঁকারনাথ নির্ণার, কুরুক্ষেত্র, সিদ্ধপুর, আবু, প্রয়াগ, প্রভৃতি স্থানে বহু বৎসর ধরিয়া অবস্থানের পর ও নানা তীর্থ পর্য্যটনের পর তবে গঙ্গোনাথে আসিয়া আসন গ্রহণ করেন। এ হিসাবে কেহ কেহ তাঁহার বয়ঃক্রম ১৪০ হইতে ১৫০ বৎসর সাব্যস্ত করেন। তবে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, ইংরাজেরা যখন মুর্শিদাবাদের কাশীম বাজার অঞ্চলে কুঠী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ব্যবসাদি করিতে ছিলেন, ও নবাব সিরাজদ্দৌলার সহিত হাঙ্গামা চলিতে ছিল, তখন তিনি যুবা বয়স্ক ছিলেন। এ সময়ে গঙ্গাসাগর যাইবার কালীন তাঁহাদের একদল সাধু বিখ্যাত ধনী জগৎশেঠের ধর্ম্মশালায় কয়েক দিনের জন্য অবস্থান করেন। তাঁহারা শুনিতে পান যে, সে দেশে মদ্দা মানুষ আসিয়াছে। ইহা শুনিয়া তাঁহারা ইংরাজদিগকে দেখিতে গিয়াছিলেন। এ ঘটনা পলাশী যুদ্ধের সমসাময়িক অর্থাৎ ১৭৫৭ খৃঃঅব্দে ধরিলে তাঁহার বয়স পূর্ব্বোক্ত হিসাবের নিকটবর্ত্তী হয়। কখন কখন কথা প্রসঙ্গে শিবাজীর শিশুকাল, তাঁহার পিতা সাহুজী শিবাজীর গুরু প্রসিদ্ধ রামদাস বাবাজীর পরিচয় দিয়াও প্রসঙ্গ করিতেন। এ হিসাবে বয়স প্রায় ২০০ শতের নিকটবর্ত্তী হয়। গঙ্গোনাথের নিকটবর্ত্তী কোন কোন প্রাচীন পুরুষ তাঁহাকে গঙ্গোনাথে "ছয়পীড়ি" বা ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত দেখিয়াছে, ও তাহারা প্রকাশ করিয়াছে যে, এ বৃদ্ধ মহারাজকে তাহারা প্রায় সম আকৃতি বিশিষ্টই দেখিয়াছে। বরোদা রাজ্যের ৫ জন নরপতির অভিষেক ক্রিয়া তাঁহার সম্মুখেই হইয়াছিল, ইহাও জানা গিয়াছে। ইহা হইতেই তাঁহার বয়স কত হইয়াছিল আন্দাজ করিয়া লইতে হইবে। তবে ইহার বয়স সম্বন্ধে আরও একটী নির্দ্দেশ জানাইতেছি। গঙ্গোনাথের মন্দিরের সমীপে তিনি নিজ হস্তে যে একটী বটবৃক্ষ রোপন করেন, তাহার গুঁড়ীর বেড় এক্ষণে এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ৪।৫ জন লোক হস্ত দ্বারা ইহাকে বেষ্টন করিতে পারে। এ বটবৃক্ষটী লেখক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

আমাদের এ বৃদ্ধ মহারাজের দেহে অসাধারণ বল ছিল। তাঁহার বাহুদ্বয় অজানুলম্বিত ছিল। গঙ্গোদ্বয় আশ্রমে "রাম" ও "লছমন্" বলিয়া দুইটী তাঁবার

রাশি নিয়ে চির দরিদ্র চণ্ডালের ঘরে কে মা তুমি ? তুমি মানুষ নও। মানুষ হ'লে কালকেতুর চেষ্টা ব্যর্থ হতো না, তুমি কিমা কৈলাস বাসিনী শঙ্কর মোহিনী শ্রীদুর্গা ?

ফুল্লরা। (পদতলে পড়িয়া সকাতরে) মা জগৎ জননী দুর্গে ! অধম ব্যাধের জ্ঞান কতটুকু মা ! নিজ গুণে সন্তানকে ক্ষমা কর ! যে মহিমার দুর্ভেদ্য গহনে হরি-হর ব্রহ্মাদিও সন্ধান পায় না, আমাদের ন্যায় হীন বুদ্ধি ব্যাধের কি সাধ্য যে, আপনার দুর্গম মহিমার পার পাই ? তোমার মহিমা কেবল তুমিই জান।

চণ্ডী। নাও হয়েছে, হয়েছে। তোমাদের প্রতি আমি খুব সন্তুষ্ট হ'য়েছি। বীরবর ! এখন ভাবদেখি কে মিথ্যা কথা বলেছে ?

কালকেতু। সত্যময়ি ! জ্ঞানময়ি ! তোমার সব কথাই সত্য। এখন আমার জ্ঞানের আঁখি ফুটেছে। তোমার কৃপায়ই তোমাকে চিনেছি মা ! কিন্তু বড়ই অসম্ভব যে মা।

চণ্ডী। অসম্ভব কিসে ?

কালকেতু। যে রাঙ্গা চরণ পাবার আশে বিষানধারী শ্মশানচারী শিব একান্ত আগ্রহে মশানে পড়ে আছেন। যে পদের মহিমায় চতুরানন ব্রহ্মা লোক স্রষ্টা, দেবরাজ বাসবের পারিজাত রঞ্জিত কনক কিরীট যে চরণে নিত্য লুণ্ঠিত হয়, সেই দেব আকাঙ্ক্ষিত চরণ দু খানি ব্যাধের ঘরে কোন্ তপস্যায় এলো।

চণ্ডী। তোমার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফলে, বৎস কালকেতু ! তোমার দারিদ্র্য জীবনের সুখ সমৃদ্ধি দেখে, আমি পরমা তৃপ্তিলাভ করেছি। আমার দর্শন বিফল হয় না, তুমি বর প্রার্থনা কর।

কালকেতু। মা গো ! শৈলেন্দ্র নন্দিনি ! যে চরণের বলে ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব শিবের শিবত্ব এবং ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, সেই রাঙ্গা চরণ রেণুর পরশ বিনা আর কোনই প্রার্থনা নাই। তবে একটি সাধ পূর্ণ করতে হবে মা !

চণ্ডী। কি বল ? তোমার সকল সাধই পূর্ণ করবো।

কালকেতু। তুমি যদি মা জগত্তারিণী চণ্ডী, তবে তোমার দশভুজা মহিষ মর্দ্দিনী মূর্ত্তিটি একবার দেখাও।

চণ্ডী। সে মূর্ত্তি যে বড়ই ভয়ঙ্করী বাপ্। কতদিন সে লীলা খেলা শেষ

করেছি। সেই শুম্ভ নিশুম্ভ বধকালে আমি দশভুজা মূর্ত্তি ধারণ করেছিলাম। তবে আমার কৃপায় তুমি সেই মূর্ত্তি দর্শনে সমর্থ হও, এই দেখ সেই মূর্ত্তি। (মায়ের স্বমূর্ত্তি প্রকাশ)

কালকেতু। (গলদশ্রু নয়নে হাঁটু গাড়িয়া বারংবার প্রণাম করতঃ) মা, মা জগৎ জননী ! মা মহিষাসুর মর্দ্দিনী, আমার জ্ঞান যে লুপ্ত হয় দেবি ! একটু সচেতন রাখ মা ! আমি তোমার জগন্মোহিনী ভয়ঙ্কর সুন্দর মূর্ত্তিখানি একবার নয়ন ভরে দেখে নিই।

ফুল্লরা। (কালকেতুর ন্যায় প্রণামান্তে) মা আমি ব্যাধের মেয়ে বুদ্ধি হীনা। তোমার মহিমা বুঝতে পারিনি ! তুমি অহেতুকী কৃপা-নিধি। আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর মা ! আহা মরি মরি রে ! এমন তোমার রূপ ? রূপের যে সীমা নাই মা ! রূপ-সাগরে যে তলিয়ে যাই জননি !

কালকেতু। তাহা কি অপরূপ রূপ। যদি কৃপা করে কৃপাময়ি ! এই অধম সন্তানকে অমরগণের বাঞ্ছিত মূর্ত্তি দেখালে, তবে বাগেশ্বরি ! আমার রসনায় এস। অধিষ্ঠান কর। আমি দেব ভাষায় না হোক্ মানুষের ভাষায় মায়ের কিঞ্চিৎ রূপ বর্ণনা করি। মা অহেতুক কৃপাময়ি ! কিঙ্করকে করুণা কর মা।

(কিবা) রক্ত কোকনদ রাঙ্গা দুটি পদ
কেশরী পৃষ্ঠে শোভিছে রে।
রণৎ নুপুরে গুণ গুণ ক'রে
মধুর স্বরেতে গাইছে রে।
দশ প্রহরণ করে সুশোভন
ত্রিশূল পরিঘ ধনুঃশর।
গলে ফুলমালা করিয়াছে আলা
কাঁচুলি শোভিত মনোহর।
এলো কেশপাশ অম্বুদ প্রকাশ
শোভিছে পৃষ্ঠেতে কিবা।
মুখপদ্ম মার সৌন্দর্য্যের সার
তুলনা কি দিব শোভা॥

ভীষণে সুন্দরে উজ্জ্বলে মধুরে
হাসি রাশি রোষে ঢাকা।
জ্বলে ত্রিনয়ন হুতাশ তপন
বদন মণ্ডল রাকা॥

ফুল্লরা। (কিবা) দক্ষিণে গণেশ শোভে ভানুর প্রকাশ রে, ভানুর প্রকাশ। বামেতে কার্ত্তিক শোভে কণক সঙ্কাশ রে কণক সঙ্কাশ।
দক্ষিণি কমলা মাতা পদ্মফুল লয়ে।
বামেতে ভারতী বাণী আছেন দাঁড়ায়ে॥
বাম করে ধরিয়াছে অসুরের কেশ।
ভীমা ভয়ঙ্করী মাতা মনোহর বেশ॥
বাম রাঙ্গাপদ খানি সিংহের উপরে।
দক্ষিণ চরণ শোভে স্কন্ধেতে অসুরে॥
ধরিয়া ত্রিশূল মাতা নাশিছে অসুর।
রূপে বিশ্ব আলোকিত অন্ধকার দূর॥

কালকেতু। মা মহিষ মর্দ্দিনী, এইবার তোমার অই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি সংবরণ কর মা! মা আজ কৃপা করে অধমকে সেই দেব-দুর্ল্লভ মূর্ত্তি দেখালে। আমার দেহে, মনে, অন্তরে যে সকল অসুর ভাব দিয়েছ মা! এই মূর্ত্তি দর্শনের পর আর যেন তাদের অভ্যুদয় না হয়। নিষ্ঠুর হিংসাবৃত্তি আমায় ভুলিয়ে দে মা! তোর সর্ব্ব কল্যাণকরী রাঙ্গা চরণে কাতর কালকেতুর এই বিনীত নিবেদন।

চণ্ডী। তথাস্তু। (চণ্ডীর অন্তর্দ্ধান এবং পুনরায় তরুণী মূর্ত্তিতে প্রকাশ) বৎস কালকেতু! মা ফুল্লরা! তোমরা সংসারে দারিদ্র্যের ভীষণ যন্ত্রনায় মুহ্যমান হওনি, এখন তার পুরস্কার গ্রহণ কর।

চণ্ডী। অই যে দাড়িম্ব বৃক্ষ, ওর নীচেই সাত ঘড়া সোণার মোহর আছে, তুমি স্ববলে গ্রহণ করে ধন্য হও!

কালকেতু। আমার কি শক্তি মা শক্তিশ্বরী! তুমি আমার সঙ্গে চল।

চণ্ডী। হা সরল! আমায় অবিশ্বাস? চল্।

[সকলের প্রস্থান]।

তৃতীয় অঙ্ক।

ষষ্ঠ দৃশ্য—গ্রাম্য বালিকাগণ।

পথ।

গান।

গ্রাম্যবালিকাগণ।
ওরে ধুলোর ভেতোর সোণার নুড়ি
কে নিবি তো আয়।
দেরি হ'লে লুকিয়ে যাবে পড়বে দরিয়ায়
কে নিবি গো আয়।
গাছে গাছে মাণিক ঝোলে
রবির আভায় ঝিলিক্ মেলে
ধীরে ধীরে আয় পাটি ফেলে
সাড়া দিস্‌নি ভাই,
কে নিবি গো আয়।
পুকুরে পদ্ম ফোটে
ভোমরা বঁধু মধু লোটে
তাতে কি তার ক্ষিদে মেটে
আবার উড়ে যায়॥

[প্রস্থান]।

(কালকেতু ফুল্লরা ও চণ্ডীর প্রবেশ।)

চণ্ডী। আহা হা সরলা গ্রাম্য বালিকারা ঠিক্ কথাই বলে গেল। ধুলোর ভেতর সোণার নুড়ি লুকান আছে বটে তবে সে নুড়ি চেন্‌বার যোগ্য চক্ষু ত সবার নাই, তাই বসুন্ধরাকে দনধান্য হীনা বলে তিরস্কার করে। বৎস কালকেতু! এই সেই স্থান। খনন ক'রে সাত ঘড়া সোণার মোহর গ্রহণ কর। (কালকেতুর ধন প্রাপ্তি)। এই সপ্ত সুবর্ণ কলসী, আর এই সুবর্ণ কলস পূর্ণ সপ্ত কোটি স্বর্ণ মুদ্রা। এই বিপুল ঐশ্বর্য্য আমি তোমারই জন্য রক্ষ্যা করে আস্‌ছি। সর্ব্বশেষ দানের দক্ষিণা স্বরূপ আমার এই স্বর্ণাঙ্গুরীও গ্রহণ কর। দেখ যেন অর্থের অপব্যয় করো না বৎস!

(অন্তর্দ্ধান)।

তৃতীয় অঙ্ক।

সপ্তম দৃশ্য—কালকেতুর কুটীর।

কালকেতু ও ফুল্লরা।

ফুল্লরা। (আহ্লাদে) ওঃ চোক্ ঝল্‌সে গেল। একি গোনা যায়? ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্। এই যা, কেউ শুন্‌লে বা। ওঃ বড় গরম। বড় গরম। কালু একটু বাতাস্ কর্ না? তাইতো এ আমার কি হোল? তৃষ্ণা, তৃষ্ণা,। কালু একটু ঠাণ্ডা পানি।

ফুল্লরার নৃত্য ও গান।

ফুল ফুটেছে নীল আকাশে
বইছে বাতাস ঝির ঝিরে।
সোনার বাটী সোনার থালায়
সোনার নাড়ু ফির্ ফিরে॥
সোনার জলে সোনার কোমল মুখ খানি
সোনায় ব'সে গামছা দিয়ে মুছলো চাঁদমণি
কেউ কেড়ে নেবে না
কেউ ভাগ বসাবে না
দুটি মুখ অনিমিখে হেরবো রাত ভ'রে॥

কালকেতু। এ:কেই বলে ধনের গরম। আশ্চর্য্য! বিরল ভাষিনী লজ্জাশীলা ফুল্লরাও গাইয়ে হ'য়ে উঠলো। ফুলি, ও ফুলি, পাগ্‌লি করচিস্ কি? এখুনি যে লোকে জান্‌তে পারবে। জান্‌তে পারলে রাজার লোকে ধন লুট করে নেবে যে।

ফুল্লরা। ওঃ সাত ঘড়া। সাত কোটি টাকা, আচ্ছা কালু, সাত কোটি কয় পয়সা? পাঁচ গণ্ডা কি সাত গণ্ডা? যাই হোক্ ওতে হাত দিয়ো না। দুঃসময়ে বর্ষা বাদলে নুন কিন্‌বো, তেল কিন্‌বো, এখন কি করি? দেখি দেখি অঙ্গুরী? (অঙ্গুরী দেখিয়া) বেশ হ'য়েছে। এতে কত কড়ি হবে?

কালকেতু। কি ক'রে বল্‌বো বল্। মা যখন এই অঙ্গুরী দিলেন, তখন বলে দিলেন, এর দাম অমূল্য, তবে কি করে এর মূল্য হবে?

ফুল্লরা। হাঁগা অমূল্য কয় গণ্ডা কড়ি? এই পাঁচ গণ্ডা কি সাত গণ্ডা কি লয় গণ্ডা একটা কথা বলে দাওনা। চুপ্ করে দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছো, ভাববার আর কি আছে? নাও এসো আবার মোহর গুলো গুনিগে। (নেপথ্যে 'সই সই' বাড়ীতে আছ? একি আমার সইএর গলা যে! যাও যাও শীঘ্র ওটা ভাঙ্গিয়ে আন। আমার সইকে আজ পেটভরে সন্দেশ খাওয়াব। এস সই! আমার প্রাণের সই! [কালকেতুর প্রস্থান।]

বিমলার প্রবেশ।

বিমলা। হাঁ ভাই সই! সয়া চলে গেল কেন?

ফুল্লরা। সই লো সই সই দুটো মনের কথা কই। আমি যে সই, তাই কত জ্বালা সই।

বিমলা সই তোর মাথা বাঁধা কৈ? তেল চুলো কাঁকুই সিন্দূর এই এনেছি মাথাটা বেঁধে দিই সই।

ফুল্লরা। তা দে সই। বড্ড উকুন। মাথায় কত জট্ দেখেছিস্?

(মাথা বাঁধিতে উপবেশন)

সই ভাই তোর দয়াতেই বেঁচে আছি। তোর ধার কি শোধ দিতে পারবো? কখনো পারবোনা সই।

বিমলা। শুন্‌তে কে বলছে সই! একটা মজার স্বপন দেখেছি শুনবি? ভারি মজার ভাই। হুঁঃ (উকুন মারিল)।

ফুল্লরা। কি?

বিমলা। তুই আর সয়া হাতীতে চড়ে শিকারে গেছিস্। সঙ্গে তো সয়া আর আমি। যেতে যেতে একটা পুকুরের ধারে এসে পড়লেম। সে পুকুরে মেলাই পদ্ম ফুল।
মাথাটা নীচু কর্‌না ভাই। হাঁ অই হয়েছে। বড় করে বাঁধবো না ছোট করে? বড়ই মানায় ভাল।

ফুল্লরা। তারপর?

বিমলা। সেই পদ্মফুল থেকে এক দেবতা বলিলেন, "কালকেতু রাজা হবে। আর তোর সয়া সেনাপতি হবে। ভোর বেলায় এই স্বপন দেখে জেগেছি, আর ঘুমুইনি। সই একি স্বপন ভাই।

ফুল্লরা। (আনন্দে গলা ধরিয়া) সই সই তোর স্বপন স্বার্থক শোন্ শোন্ (কানে কানে বলিল) কাউকে যেন বলিস্‌নি ভাই, আমার মাথা খাস্।

বিমলা। (আশ্চর্য্যে) সত্যি সই সত্যি! এ যে, আমার বিশ্বাস হয়না ভাই। স্বপন তা হ'লে ফল্‌লো দেখছি।

ফুল্লরা। সই আর কত সই ভাই! কথা কইতে মানুষ না পেয়ে পেট্‌টা ফেঁপে উঠেছে। (উদ্গার তুলিয়া) দেখ্‌লি। সই আর আমাদের ভাবনা কি ভাই?

বিমলা। ভাবনা নাই? শিয়রে কলিঙ্গরাজ এ খবর পেলে কি রক্ষে আছে? ধনে প্রাণে যাবে। ধনে প্রাণে যাবে। আমাকে বল্‌লি আমার তেমন আল্‌গা পেট নয়, আর যেন কাক পক্ষীতেও না শোনে।

ফুল্লরা। না না সই! আর এ কথা কারে কই? কিন্তু টাকার বড্ড গরম সই! কেমন ক'রে সই? (মাথা বাঁধা শেষ করিয়া সিন্দুরের টিপ দিলেন)

বিমলা। সই তোর উজল মুখে কাজল চোখে হাঁসি ধরে না। এসে ভোমরা বঁধু লুট্‌বে মধু শুধু ছাড়্‌বে না। সই তোর মুখখানা একবার দেখ্, (আয়না দেখাইল) কেমন? আমারই চুমু খেতে ইচ্ছা কর্‌ছে। (মুখ চুম্বন)।

ফুল্লরা। মর্ মুখপুড়া করছিস্ কি? সত্যি ভাই আমার ভয় কর্‌ছে, কলিঙ্গ রাজার লোকজন শুন্‌তে পেলে ত বড়ই বিপদ।

বিমলা বিপদ কি ভাই? কে তোর দুস্‌মন আছে যে লাগাবে চুপ কর্। এ কথা আর বলিস্‌নি। হ্যাঁ ভাই সই! কাল চাট্টি খুদ আনলি, ওতে তোদের হ'লো? আমি বলি আরও নে। তুই কিছুতেই নিলিনি। তা কি করে হ'লো সই?

ফুল্লরা। কাল ভাই অই সব দেখে আর ক্ষিদে পেলে না। জল খাই, আর বাতাস করি। দেখ ভাই টাকার গরম কথাটা মিথ্যা নয়। আমার মাথায় কাল এক ঘড়া জল ঢেলেছি।

বিমলা। ভাল করিস্‌নি সই, সর্দ্দি লাগ্‌লে কে দেখ্‌বে তোকে। আমারও পাড়া অন্তর ঘর, সব সময় ত খপর নিতে পারি না। তবে বস্ ভাই আসি।

ফুল্লরা। আসি কি সই? তোর সয়া গেল সন্দেশ আন্‌তে কে যাবে ভাই? একটু সবুর কর্, আমি এগিয়ে দেখি।

বিমলা। না ভাই সই? তোর সয়া হাটে গেছে। এখুনি এসে খুঁজ্‌বে আমি যাই। কাল আবার আস্‌বো।

ফুল্লরা। (দুটি হাতে ধরিয়া) একটু বোস ভাই। সই সই সয়ার লেগে একটু হরিণের মাংস নিয়ে যা ভাই। আর দেখ্ কাল একটা সোনা গোধা এনেছিলো তা সেটা কি গোধা? আশ্চর্য্যের কথা ভাই আশ্চর্য্য।

বিমলা। তবে কি?

ফুল্লরা। বল্লে বিশ্বেস কর্‌বি?

বিমলা। তোর কথায় অবিশ্বাস?

ফুল্লরা। সেই সোণার বরণ গোধাটাকে ভাই শিক্ পোড়া করবার হুকুম দিয়ে তোর সয়া চলে গেল। তার পর ভাই সেটা আপনা আপনি বাঁধন ছিঁড়ে দিব্যি পরম সুন্দরী চণ্ডী। বল্‌তে গা শিউরে উঠ্‌ছে সই! মা ভগবতী নিজগুণে আমাদের দেখা দিলেন। কত কথা কইলেন। আমার সে সব ভাই কিছু মনে নাই। আহা অমন রূপ কি পৃথিবীতে আর আছে? মা চণ্ডী রক্ষা করো মা।

(প্রণাম করিলেন)

বিমলা। কি রকম দেখ্‌লি বলনা সই! তোরাই ধন্য। মানুষ হ'য়ে ভগবতীর দর্শন পেলি? আহা হা।

ফুল্লরা। কি দেখ্‌লেম সই! কি করে বলবো? একটি একটি অঙ্গের শোভাই কত। কতই অলঙ্কার। আর কি জ্যোতিঃ প্রথমে একটি ষোলো বছরের মেয়ে হ'য়ে দেখা দিয়ে ছিলেন। তারপর সই, কি বলবো সে মহিষমর্দ্দিনী মহামায়ার মহাভয়ঙ্করী মূর্ত্তি। আমি দেখ্‌তে পারিনি চোক্ বুজে মাটিতে পড়ে গেছলুম।

বিমলা। ধন্য সই তোর মানুষ জন্ম সার্থক।

ফুল্লরা প্রভাত কালে সূর্য্যের বরণ যেমন, তেমনি মায়ের রং। আর দুপুর বেলায় সূর্য্যের যেমন ছটা তেমনি ছটা সর্ব্বাঙ্গে। পা দুখানি রাঙ্গা-পদ্ম। হাত দুখানিও তাই। হাঁসি হাঁসি মুখ, যেমন পূজোর সময় দেখিস্ তেমনিটি। আঠো অঙ্গে কত রকমের

ভারী ভারী গহনা। তেমনি কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী সব এক সঙ্গে।

বিমলা। ধন্য সই, তোর নয়ন ধন্য। তোর জীবন ধন্য।

ফুল্লরা। (হাত ধরিয়া) তোর স্বপন, আর আমাদের চণ্ডী দরশন অন্য কাউকে বলিস্‌নি ভাই। তুই আমার প্রাণের সই তাই তোকে বল্‌লুম।

বিমলা। হ'য়েছে। আর তোকে কাকুতি মিনতি করতে হবেনা, আমি কাউকে এসব বলবোনা। তবে এখন আসি সই। বস্ ভাই।

ফুল্লরা। তাইতো এখনো এলোনা কেন? আচ্ছা খবর নিচ্ছি। আয় ভাই তোকে একটু বাসি মাংস দিইগে। রেতে সয়াকে অম্বল রেঁধে দিবি। একটু বেশী করে মরিচ দিস্ গন্ধ যাবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

ক্রমশঃ।

স্বপ্ন-কথা।

লেখক—শ্রীযুক্ত দেবীপদ চট্টোপাধ্যায়।

নীরব নীথর নিদাঘ রজনী। ঘোরা নিশীথিনী। গ্রীষ্মের প্রবল প্রতাপে দিশাচয় স্তব্ধ মলিনতা মাখা। দূরে বিশালকায় বনস্পতি-কুল বায়ুর অভাবে নিশ্চল দণ্ডায়মান। বিস্তৃত শাখা প্রশাখা মণ্ডলী কি যেন আতঙ্কে সংস্ত। শাল তাল প্রভৃতি দীর্ঘকাণ্ড পাদপশ্রেণী তমস্বিনীর ঘনান্ধকারে বিরাট প্রেত-পুরুষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। উন্মুক্ত বাতায়ন পথে বিনদ্র নয়নে প্রকৃতি রাণীর এই বিভীষণা মূর্ত্তির ভীষণতা দেখিতে দেখিতে বহুবিধ চিন্তায় জর্জ্জরিত জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সমালোচনায় রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। সংসারের চিন্তা-লহরা আমাকে কোন সুদূরে শ্রোতোমুখে ভাসাইয়া দিয়াছে। কত বিষয়িনী আশা হৃৎপটে কতই বিবিধ-চিত্র অঙ্কিত করিতেছে; আবার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বিলীন হইতেছে। আবার আসিতেছে, আবার ভাসিতেছে, আমার সহিত কতই রঙ্গ করিয়া আবার কোথায় মিশিয়া যাইতেছে। ক্রমে

যামিনী দেবী ধীরে ধীরে তাঁর অঞ্চলখানি টানিয়া লইলেন, কিছুই জানিতে পারিলাম [illegible] আমার আত্ম-চিন্তায় অধীর, দেখিতে দেখিতে তৃতীয় প্রহরও [illegible] পূর্ব্ব-গগনে শান্তকর শান্ত মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। প্রাণ তর্পণ শান্তি সমীরণ মৃদুল বহনে প্রবাহিত হইল। শ্রান্ত, ক্লান্ত, চিন্তাকুল অন্তর নিদ্রার বিমল কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

অয়ি নিদ্রে! বিশ্ব-প্রকৃতির প্রিয় সহচরি! ত্রিলোক বিজয়িনী তুমি। তোমার অমিত তেজোময় কুহক প্রভাবে মধুকৈটভজিৎ জগদীশ্বরের শশি সূর্য্যাগ্নি প্রতীম কমলাক্ষিও নিমিলিত হয়, কি ছার নশ্বর জগতের প্রহেলিকাময়ী চিন্তায় উদ্বেলিত চিত্ত ক্ষণ ভঙ্গুর মাদৃশ জন।

আমি নিদ্রিত হইলাম। স্বপ্নে দেখি,—এক পরম রমণীয়, তরুলতা রাজি পরিশোভিত, দিগ্বলয়ে সমলঙ্কৃত, বিশাল প্রান্তর বাহী মনোহর পথের পথিক হইয়াছি। সুদীর্ঘ পথ জন মানব শূন্য! আমিও সঙ্গীহীন। কৈ কাহাকেও আসিতে তো দেখিলাম না। একে চিরদুঃখ আমার চির সহচর, তাহাতে আবার এমন শান্তিময় সুখকর পথ! মনের উল্লাসে প্রাণভরা দুঃখের বোঝা লইয়া সেই মনোরম পথে চলিলাম। কেহ পশ্চাতে নাই বলিয়া পশ্চাৎপদ হইলাম না। বহুদূর দূরান্তরে চলিলাম। কত নদ-নদী, কত মনোহর সরোবর, কত নয়নানন্দকর বিহঙ্গমরাজি, কত তড়াগ, কত মধুময় শান্তিভরা সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে চলিলাম। অবশেষে এ কোথায় আসিলাম? একি দেখি, দূরে বিরাট-কায় গগণ স্পর্শী পর্ব্বতমালা, তবুও চলিলাম। শান্তি নাই, বিরাম নাই, ক্রমে সেই পথ, সেই গগণচুম্বী পর্ব্বতেরই পাদদেশে নিঃশেষ হইয়া গেল। অগ্রসরের আর উপায় নাই, আমি দাঁড়াইলাম। পাদদেশ হইতে শিখর পর্য্যন্ত যতদূর দৃষ্টি যায়, হৃদয় ভরিয়া দেখিলাম। ভয়ও আছে, আমি একাকী নিঃসহায়, মনে মনে কতরূপ জল্পনা কল্পনা করিলাম। কত কি ভাবিলাম, শেষে পর্ব্বতারোহণই স্থির করিলাম। বিরাট গিরিরাজের একাধারে প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি সন্দর্শনে প্রাণে যুগপৎ আনন্দ ভয়ের সঞ্চার হইল। যাহা হউক, আমি গিরিগাত্রে আরোহণ করিলাম।

দিব্যজ্যোতিঃ সমুদ্ভাসিত উপত্যকায় দুই রমণী মূর্ত্তি পরম জ্যোতির্ম্ময়ী শান্ত্র শশি করোজ্জ্বল লাবণ্য স্রোতে সকানন গিরিমালা বিধৌত করিয়া দণ্ডায়মানা। একটী,—শ্বেতাম্বর পরিধানা, আলুলায়িত কুন্তলা, স্থিরা, ধীরা, প্রফুল্লা, বিলাস বিভ্রম হীনা, শান্তিময়ী পরমাসুন্দরী যুবতী, যেন শ্যাম জলধর প্রতিম গিরিপৃষ্ঠে

স্থিরা সৌদামিনী, অপরা, রক্তাম্বর পরিধানা, নিবদ্ধবেণী, সর্ব্বাভরণ পরিশোভিতা চঞ্চল কটাক্ষময়ী, পূর্ণ যৌবনা পরমা সুন্দরী, উভয়েই অপরূপ রূপ লাবণ্যময়ী, উভয়েই সৌন্দর্য্যময়ী, উভয়েই দেব মানব চিত্ত বিনোদিনী। আমি স্তব্ধ নির্নিমেষ নয়নে একবার নিরাভরণা সর্ব্ব সৌন্দর্য্য সম্পন্না শান্তিময়ী ললনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। আবার সর্ব্বালঙ্কার পরিশোভিতা বিভ্রমময়ী নারীকেও দেখিলাম। বাক্য স্ফুরণে রসনা আমার কুণ্ঠীত হইল। আমাকে নীরব দেখিয়া প্রথমে সেই নিরাভরণা, শান্তিময়ী বলিলেন,—"বাছা! অসার সংসারের চিন্তা লহরী তোমায় উদ্বেলিত করিয়াছে। অশান্ত হইয়াছ, আমার সঙ্গে এস, পরম শান্তিলাভ করিবে। কিন্তু বাছা! আমার প্রতি চেয়ে দেখ, আমি আরোপিত বিলাস বিভ্রম হীনা, পার্থিব সুখ দুঃখের অতীত। আপাততঃ মধুরস লিপ্সু জীবের আমার আশ্রয়ে অনেক কষ্ট পাইতে হয়, অনেক দুঃখ দুর্গতি সহ্য করিতে হয়। এমন কি, সময়ে তোমায় স্ত্রী পুত্র পরিবার স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হ'লেও হইতে হইবে। অবশেষে এমন দিনও আসিতে পারে যে, তোমায় দীনহীন পথের কাঙ্গালও হইতে হইবে। কিন্তু যেন, তোমার সেই ত্যাগ, তোমার সেই ধৈর্য্য, পরিণামে তোমার পরম সুখ সন্তোষে পরিণত হইবে।" আমি বলিলাম, "দেবি! সকলই বুঝিলাম, সবই সুন্দর কথা, পরম উপদেশ পূর্ণ বাণী, কিন্তু মা! পরিচয় না জানিয়া কিরূপে আপনার অনুসরণ করি। আর তুমিই যে মা, আমায় প্রকৃত শান্তি প্রদান করিবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?" রমণী উত্তর করিলেন, "বাছা! মনে যদি বল থাকে, তেজ থাকে, প্রকৃত শান্তি যদি চাও, তাহা হইলে আমারই সঙ্গে এস! পরিচয় আপনি পাইবে।"

রমণীর সরল কথায় আমার প্রতীতি হইল। আমি তাঁহারই পদবী অনুসরণে কৃত নিশ্চয় হইয়া যেমন একপদ অগ্রসর হইতেছি, অমনি দ্বিতীয়া জ্যোতির্ম্ময়ী বাধা দিয়া আমায় বলিলেন, "বাছা! স্থির হও। উহার কথায় বিভ্রান্ত হইয়া আত্ম-হারা হও কেন? আমার এই বোনটি সংসার-সুখে পরিতৃপ্ত জনকে ঐরূপ মধুর বাক্যে মুগ্ধ করিয়া বিষম দুঃখ দুর্গতির বিভীষণ গহ্বরে ফেলিয়া দেয়। মানুষ একবার উহার কবলিত হইলে সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অকালে নানাবিধ কষ্টে প্রাণ হারাইতে বাধ্য হয়। তুমি আমার সঙ্গে এস! সংসারের অতুল ধন সম্পদ রাজোচিত ভোগ বিলাস, অমরাবতীর সুখ শান্তি সকলই পাইবে। সর্ব্বদাই প্রফুল্ল চিত্তে নিত্য নব নব আনন্দ রসে পরম সুখে দিন কাটাইয়া চরিতার্থ হইবে! কোন বাধা নাই, কোন বিঘ্ন নাই, অভ্রান্ত সরল পন্থা।"

পর্ব্বতমূলে বিভিন্ন বাদিনী ললনা দ্বয়ের কথোপকথনে চিত্ত পরম সংশয়ে দোলায়মান হইল। কাহার অনুগমন করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। উভয়েই মনোময়ী, বাক্‌চার্য্যময়ী, স্বাভাবিক তেজোময় অঙ্গ শোভায় কাহাকেও হীনা বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। বড়ই বিপাকে পড়িলাম।

এমন সময়ে একি দেখি! কে ওই, জীর্ণ শীর্ণ গলিত দন্ত পক্বকেশ প্রবীণ পুরুষ! কোটী সূর্য্য প্রভায় পর্ব্বত কন্দর বিদীর্ণ করিয়া গুরু গম্ভীর নিনাদে, প্রাঞ্জল ভাষে আমায় বুঝাইয়া দিলেন। "বৎস! আমার নাম বিবেক। আর এই যে নিরাভরণা স্থিরা বিদ্যুল্লতা দেখিতেছ, ইহার নাম সুমতি। আর এই যে সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা রক্তাম্বরা কোটী দীপমালা চঞ্চলবতী দেখিতেছ, ইনি কুমতি। বৎস! সুমতির আশ্রয়ে যাও, নিত্য সত্যের সন্ধান পাবে। পার্থিব জগতে যাহাকে সুখ বলিয়া ধারণা কর, তৎ সমস্তই অনিত্য মৃগ-তৃষ্ণিকা বলিয়া জানিবে। যতই দুঃখ দুর্গতি সহ্য করিতে পারিবে, পরিণামে যে বিমলানন্দময়, তাহার কোন সংশয় নাই। আর এই কুমতির আশ্রয়ে সেই মরিচীকার প্রলোভনে কমল পত্রে বারিবিন্দুবৎ ক্ষণিক সুখ ভোগ তোমায় চির দুঃখ দুর্গতির অতল তলে দলিত করিবে।"

সহসা বিবেক বরের পরম ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রভায় গগন পবন সমুদ্ভাসিত হইল। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল সব মিশিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক মহাজ্যোতিঃ প্রকাশে পরিণত হইল। সেই জ্যোতিঃ সমুদ্রে সুমতি মিশিল কুমতি মিশিল, বিবেক মিশিল, সব মিশিয়া গেল, আমিও মিশিলাম।

বিহগ কুলের মধুর প্রভাতী ললিত বিভাষে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলাম অরুণদেব পূর্ব্বাকাশ লোহিত রাগ রঞ্জিত করিয়া উদয়াচলে অবস্থিত হইয়াছেন।

ডাক্তার, রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর।

আমরা গভীর-শোক- সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতাস্থ সর্ব্বজন সুপরিচিত, ডাক্তার চুণীলাল বসু রায় বাহাদুর, সি, আই, ই, আই, এস, ও এম, বি, এফ, সি, এস, মহাশয় আর ইহলোকে নাই। কয়েক-মাসাবধি তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, স্বাস্থ্যলাভের জন্য বিগত ২রা শ্রাবণ শুক্রবার তারিখে রাঁচিতে গমন করিয়া তাঁহার নব-নির্ম্মিত স্বাস্থ্য নিকেতনে বসবাস করিতেছিলেন।

ভগবানের কৃপায় স্বাস্থ্যেরও কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছিল। যারপর নাই পরিতাপের বিষয় গত ১৬ই শ্রাবণ শুক্রবার রাত্রিকালে সহসা তাঁহার পীড়াবৃদ্ধি হইল, কলিকাতায় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে টেলিগ্রাম করা হয়। টেলিগ্রাম পাইবা মাত্র তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাঁচিতে গমন করেন। ১৭ই শ্রাবণ শনিবার রাঁচিতে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই রায় বাহাদুর ডাক্তার চুণীলালের অমর-আত্মা নশ্বর-দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় বিলীন হইয়াছিল।

ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয় ইংরাজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা শ্যামবাজারে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম পরলোক-গত দীননাথ বসু তিনি তৎকালে একজন সুদক্ষ দালাল বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। মৃত্যুকালে ডাক্তার চুণীলালের বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। তিনি প্রথমে কলিকাতা শ্যামবাজারস্থ জগবন্ধু মোদকের প্রতিষ্ঠিত এ, ভি, স্কুলে প্রবেশ করেন, তৎকালে রসরাজ নাট্যাচার্য্য স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয় উক্ত স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন, ডাক্তার চুণীলাল তাঁহার ছাত্র। বাল্যকালের শিক্ষাগুরু বলিয়া রসরাজ অমৃতলালকে ডাক্তার চুণীলাল যথেষ্ট সম্মান করিতেন, রসরাজ অমৃতলালও তাহাতে গৌরব অনুভব করিতেন; তৎপরে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং জেনারেল এসেম্বিলিজ কলেজ হইতে ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তার চুণীলাল কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। কৃতী ছাত্র হিসাবে তিনি যে, প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই অসাধারণ। প্রায় প্রত্যেক বিষয়ের প্রত্যেক পরীক্ষায় তিনি প্রশংসা পত্র এবং স্বর্ণ পদক পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করিয়া অতি সম্মানের সহিত এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারই নিকট হইতে আমরা শুনিয়া ছিলাম, ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর, তিনি বরাহনগরে একটি ডিস্পেন্সারী স্থাপন করিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা করিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন, দুঃখের বিষয় তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার আশা অল্প বুঝিয়া তিনি এসিষ্টাণ্ট-সার্জ্জন রূপে সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিয়া ছিলেন। কর্ম্মসূত্রে কয়েক বৎসর তাঁহাকে ব্রহ্মদেশে বাস করিতে হইয়াছিল; ব্রহ্মদেশ ইংরাজাধিকার ভুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি উত্তর ব্রহ্মেটাংদিল্‌জি নামক স্থানে কর্ম্মসূত্রে কয়েক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত রসায়ণ পরীক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি কলিকাতায় শুভাগমন করেন। এই কার্য্যে দীর্ঘকাল নিযুক্ত

থাকিয়া তিনি সবিশেষ দক্ষতা ও কার্য্য কুশলতার পরিচয় দিয়া কর্ত্তৃপক্ষের শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয় কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রধান রসায়ণ পরীক্ষক এবং মেডিকেল কলেজে রসায়ণ শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে তিনি যোগ্যতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া ছিলেন। প্রায় ৩৪ বৎসরকাল প্রশংসার সহিত সরকারি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সরকারি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্য কুশলতা এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে— "রায় বাহাদুর" ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সি, আই, এস, ও এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করেন।

সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি জন-সাধারণের কার্য্যে জীবনোৎসর্গ করিয়া ছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয় কলিকাতার সেরিফ মনোনীত হইয়া ছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে ডাক্তারগণের মধ্যে স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সি, আই, ই, কলিকাতার প্রথম সেরিফ নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যে সর্ব্বপ্রথম নিখিল ভারতীয় মেডিকেল কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, ডাক্তার চুণীলাল তাহার সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার উপর মেডিকো-লিগ্যাল সেক্‌সনের ভার অর্পিত হইয়া ছিল, এই অধিবেশনে তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ছিলেন, তাহার প্রভাবে বিষ সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয় লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাটির ফেলো নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে দেশ বিখ্যাত স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের যত্নে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান মন্দিরে রসায়ণ শাস্ত্র সম্বন্ধে ছাত্র দিগকে বক্তৃতা দিয়া আসিতে ছিলেন। তিন বৎসরকাল তিনি "ক্যালকাটা মেডিক্যাল জর্ণাল" সম্পাদন করিয়া ছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যে শিল্প কৃষি বিজ্ঞানের প্রদর্শনী হয়, বিজ্ঞান বিভাগে ডাক্তার চুণীলাল বসুই সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। তিনি বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকেল লিমিটেডের সভাপতি, এবং কলিকাতা সোপ ওয়ার্ক, কলিকাতা কেমিকেলের ডাইরেক্টর ছিলেন।

ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয় আমাদের দেশের একজন প্রকৃত অনাথ বন্ধু ছিলেন। অনাথ অনাথিনীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত, প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার সময় সংবাদ পত্রে নববস্ত্রের জন্য জনসাধারণের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা

করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। তিনি শোভাবাজার বেনেভোলেণ্ট সোসাইটি ও কলিকাতা অনাথাশ্রমের সম্পাদক, এবং কলিকাতা ডিষ্টিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির দেশীয় বিভাগের সভাপতি ছিলেন। অন্ধ বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও মাদক নিবারণী সভার অন্যতম সহকারী সম্পাদক পদে ব্রতী হইয়া সভার উন্নতি কল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া ছিলেন।

আমরা যৌবনের প্রারম্ভেই ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয়ের সহিত সুপরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ছিলাম। ১৩০৬ সালে "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ" স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবন হইতে স্থানান্তরিত হইলে তৎকালে দেশের কতিপয় কৃতবিদ্য, সুশিক্ষিত মহানুভব ব্যক্তিকে লইয়া রাজবাহাদুর নিজেকে অন্তরালে রাখিয়া "সাহিত্য সভা" স্থাপন করেন। সাহিত্য-সভা স্থাপনের অল্পদিন পরেই কি গুণে জানি না, আমি সাহিত্য-সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ও অবৈতনি সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হই, তদবধি অবৈতনিক কর্ম্মসূত্রে সাহিত্য সভায় সর্ব্বদাই আমার গতিবিধি ছিল, ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয় রাজা বাহাদুরের নিকটে সখ্যতা সূত্রে প্রায় প্রত্যহ গমনাগমন করিতেন, এবং সাহিত্য সভার উন্নতি কল্পে আমাকে সুপরামর্শ প্রদান করিতেন।

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ" ও সাহিত্য সভার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অকৃত্রিম যত্নে সাহিত্য-সভার কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে, সেই সময় রাজা বাহাদুরের সবিশেষ অনুরোধে ও উৎসাহে ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সাহায্যে সাহিত্য-সভায় কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতাগুলি এতই সারগর্ভ উপদেশ পূর্ণ ও উপাদেয় হইয়াছিল,যে শ্রোতৃবর্গের সমাগমে সাহিত্য সভায় বসিবার স্থান সংকুলান হইত না। বক্তৃতা গুলির সারমর্ম্ম সাহিত্য সভার মুখপত্র সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশিত হইত, কেবল "জল" ও "বায়ু" দুইটি বক্তৃতা পুস্তকাকারে সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর খাদ্য ও বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকগুলি প্রকৃতই হিতকর। স্যার লায়োনার্ড ডাক্তার রজার্স কুষ্ঠরোগ সংক্রান্ত যে সকল গবেষণা করিয়া ছিলেন, সে পক্ষে ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয় তাঁহাকে অনেক সাহায্য করেন, ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয়ের অনুরোধে ডাক্তার রজার্স সাহেব "সেকোবিষ" সম্বন্ধে সাহিত্য সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া ছিলেন, তাহাও সাহিত্য সভা হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমাদের ধারণা রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের উত্তেজনায় সাহিত্য সভার

সংশ্রবেই ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয়ের বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় তাঁহার সাহিত্যানুরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছিল; বঙ্গদেশে স্বাস্থ্যের দুরাবস্থা উপলব্ধি করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে ছাত্র ও জন সাধারণকে বলবীর্য্য বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত খাদ্য নির্ব্বাচনের উপদেশ প্রদান করিতেন।

সাহিত্য-সভার উন্নতি কল্পে সভায় উপস্থিত হইয়া নানা উপদেশ প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। রাজা বাহাদুরের স্বর্গারোহণের পরেও ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয়ের উৎসাহের কোনরূপ ত্রুটি ছিল না। পরিতাপের বিষয়, সাহিত্য-সভা স্থাপনাবধি যিনি সম্পাদক ছিলেন, সেই পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় স্বর্গারোহণ করিবার পর, ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয় সাহিত্য-সভার অবৈতনিক সম্পাদক পদে ব্রতী হন। সাহিত্য সভাকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় "সাহিত্য-সভা" বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত মিলিত হইয়া যায়।

বর্ত্তমান সমাজ সংস্কার বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের মত ভেদ থাকিলেও আমরা ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয়কে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে ত্রুটি করি নাই তাঁহার ন্যায় মিষ্টভাষী, অমায়িক ও জনপ্রিয় মহানুভব ব্যক্তি সমাজে বড়ই দুর্ল্লভ। তিনি দুই পুত্র এবং দুইটি কন্যা রাখিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। পুত্র দুজনেই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত। একজন ডাক্তার আর একজন ব্যারিষ্টার। আশা করি, পুত্রগণ পিতার সুনাম বজায় রাখিতে কোন মতেই ত্রুটি করিবেন না। আমরা তাঁহাদের শোকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। প্রার্থনা করি, ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয়ের পরলোক-গত পবিত্র আত্মার সদ্গতি হউক।

গীত।

মুলতান—একতালা।

অনেক লইলে, অনেক কাঁদালে, তবু আছি ভুলে,—
মন ফিরিবে না, তোমাকে চাবে না, আরও দুঃখ না পাইলে।
বিপদে কত আশার কথা কহিলে, মায়ায় ভুলে সব দিলাম ফেলে,
আরও যদি দুঃখ পাই, ক্ষতি নাই ফেলে রাখ যদি চরণ তলে॥
সকল দুঃখ যাবে তোমারে পেলে, রাখ রাখ অধম বলে,
যত কাঁদিব, তত পাইব, হাঁসিব তোমায় হেরিলে।
বলিব না আমি কিছু আর, ভিখারী কর ইচ্ছা হয় তোমার,
পথের কাঙ্গাল হইব, তোমারে কেবল ডাকিব,
(এবার) প্রাণ ত্যজিব হরি হরি বলে॥

শ্রীযতীন।

বিষ-বৃক্ষের সূর্য্যমুখী ও কমলমণি

তুলনা মূলক সমালোচনা।

লেখক—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

বিষ-বৃক্ষের দুইটি অমৃতফল ফলিয়াছে। ভগবানের ইচ্ছায় বিষও অমৃত হয়, ইহা মহাকবি কালিদাসেরই উক্তি। বাঙ্গালার কবিতাই বিষবৃক্ষে অমৃতফল উদ্ভব করিয়াছেন। এই দুইটি নারী গঙ্গা ও যমুনার মত দুইদিক দিয়া বহিয়া আসিয়াছে, পাশাপাশি চলিয়াছে, আবার মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়াও গিয়াছে। উভয়ে একও হইয়াছে, পৃথক্‌ও হইয়াছে, যুক্ত ত্রিবেণীতে মিশিয়াছে, মুক্ত ত্রিবেণীতে পৃথক্ হইয়াছে, সরস্বতী অন্তঃসলিলা হইয়া কুন্দনন্দিনী হইয়াছে; মুক্ত ত্রিবেণীতে আসিয়া স্বরূপ প্রকাশও করিয়াছে। মৃত্যুকালে কুন্দ ফুটিয়াছে।

সূর্য্যমুখী গঙ্গার মত পুণ্যোদকা ও গম্ভীরা। কমলমণি যমুনার মত স্বচ্ছ সলিলা ও কল-কল-ময়ী। সূর্য্যমুখী হাসে গঙ্গার তরতর প্রবাহের মত। কমলমণি হাসে যমুনায় থল্‌থল্ তরঙ্গের মত। গঙ্গার গর্ত্তের মত সূর্য্যমুখীর চরিত্র। যমুনার উচ্ছ্বাসের মত কমলমণির চরিত্র।

বাঙ্গালী গৃহের এই দুইটি চিত্র জগতের আলেখ্য গৃহে সমাধানে স্থান পাইবার যোগ্য। ইহারা স্বাভাবিক অথচ যেন অলৌকিক; দেশকাল গণ্ডীর আবেষ্টনে বদ্ধ, অথচ মুক্ত স্বাধীন। দুইটী আদর্শই পতিপ্রাণা সতীসাধ্বী. পতি পদে সমর্পিত প্রাণা এই দুইটি ফুলরাণী একাধারে সৌগন্ধ বিলাইয়াছে। পূজার কার্য্য চালাইয়াছে। সূর্য্যমুখীর প্রণয়িণী ও পূজারিণী দুইটি ভাবই পরিস্ফুট। কমলমণির পূজারিণী ভাবটি গুপ্ত। সূর্য্যমুখীর রঙ্গ রহস্য চাপা, কমলমণির খোলাখুলি। একজন শান্ত ধীর গতিতে চলিয়াছে, অপরজন মধুর উন্মুক্ত গতিতে ছুটিয়াছে। সূর্য্যমুখীও প্রেমের সায়রে ফুলের মত ফুটিয়া আছে। কমলমণি রত্নের মত আলো করিয়া আছে। সূর্য্যমুখী উপাসিকা প্রেমিকা মূর্ত্তি, কমলমণি আমোদিনী প্রণয়িনী মূর্ত্তি। দুইই সুন্দর, দুইই আকাঙ্খিতা, একজন সুখে দুঃখের ভিতর দিয়া তরী বহাইয়া দুঃখ পাইল। অন্যজন সুখের ভিতর দিয়া তরী বহাইয়া দুঃখের মর্ম্ম বুঝিল। শেষে দুইজনেই সুখিনী হইল। সূর্য্যমুখীর মনে কুন্দের করুণ স্মৃতি জাগিয়া রহিল। কমলমণির হৃদয়ে কুন্দের ব্যথা অস্ফুট রহিয়া গেল।

সূর্য্যমুখী ও কমলমণি দুইটি নামেরই বড় সুন্দর অর্থ আছে। সূর্য্যমুখী ফুলের নাম। সূর্য্যমুখী সারাদিনটি সূর্য্যের পানে চাহিয়া আছে; সূর্য্য যেদিক পানে যাইতেছে, সূর্য্যমুখীও সেই দিকে মুখ ফিরাইতেছে। সূর্য্য না উঠিলে যে ফুলটি ফুটে, সূর্য্য মেঘে ঢাকা পড়িলে সে ফুলটীর সৌন্দর্য্য ম্লান হয়, মুখখানিও শুকাইয়া যায়। সূর্য্যকিরণ তাহার অঙ্গে অঙ্গে খেলা করে। ঐ সূর্য্যমুখী ফুলটীর মত সূর্য্যমুখী। তাহার সাত রাজার ধন প্রিয়তম পতি নগেন্দ্রনাথই তাহার নিকট সূর্য্য। নগেন্দ্রনাথের প্রেমই তাহার সূর্য্যকিরণ। নগেন্দ্রনাথের অদর্শনই তাহার অন্ধকার। পতি দেবতার সমর্পিত প্রাণা সূর্য্যমুখীর অন্তরে বাহিরে পতিই বিরাজমান।

কমল-মণি কমলমণি! কমল-হিরকের নামই কমলমণি। কমল-মণির স্বচ্ছতা, ঔজ্জ্বল্য, ও শুভ্রবর্ণ কমল-মণির অন্তঃকরণেরই অনুরূপ। পদ্মরাগমণিকেও কমল-মনি বলা যায়। পদ্মরাগ মনি সূর্য্য উঠিলেই ঝক্‌মক্ করে, সূর্য্য-করস্পর্শেই উহার হাসিখুসি, সূর্য্যাস্তের পর উহার জ্যোতি নিষ্প্রভ হইয়া যায়। কমল-মণির স্বামি শ্রীশরচ্চন্দ্র তাহার সূর্য্য। ঐ সূর্য্যের সহিতই তাহার রঙ্গরস মান অভিমান। স্বামীরূপ মন্ত্রীমহাশয় নিকটে না থাকিলে, কমল-মণির রাজ্যশাসন করা চলে না। মন্ত্রীমহাশয় তাহার সব। অথবা (কমলরূপ মণি) এই রূপক-সমাসেও কমল-মণি পদটি নিষ্পন্ন হইতে পারে। কমলমণির চরিত্রে রূপক-সমাসটিই ভালরূপেই মানায়। কমল ও মণি অভেদ। আমাদের কমল একখানি অমূল্য রত্ন। গৃহসংসারেও ইহা রত্ন। স্ত্রীরূপেও ইহা রত্ন, নারীরূপেও ইহা রত্ন। কমল-মনি রমণীরত্ন। এ কমল শতদল। বর্ণ রক্তকমলের মত প্রফুল্ল, লাবণ্য নীলোৎ-পলের মত ছায়াতরল হৃদয়টি শ্বেতপদ্মের মত স্বচ্ছ। প্রেমের সরসীতে খরসূর্য্য করে এবং স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে ইহা সমানই হাসে; সুখের তরঙ্গে দুঃখের বাতাসেও ইহা নাচে। ভ্রমর প্রভৃতির সাধ্য নাই যে এ কমলকে বিরক্ত বা উদ্ভ্রান্ত করে। হাব ভাব, বিলাস বিভ্রম ভ্রুভঙ্গী ও কটাক্ষ সকল বিদ্যায় এ কমল বিদুষী; বুকখানির ভিতর মধু ভরাই আছে। গন্ধটুকুও বড় মধুর, বড় প্রাণারাম।

যেই তাহার সংস্পর্কে আসিবে, সেই আমোদিত হইবে। কমলে কণ্টক আছে, কমলের বৃন্তে কর্কশতা আছে। কমল-মণিতেও ব্যঙ্গ আছে, তাহার বুদ্ধিতে চাতুর্য্য ও দুষ্টামী আছে। তবে ইহা বিধাতার দান, বড় সুন্দর বড় মনোরম।

সূর্য্যমুখী মুগ্ধা নায়িকা। তবে ত্রিংশৎবর্ষের কাছাকাছি আসিয়া পড়ায় মধ্যা

সসৈন্যে সমরে রাজা গমন করিল।
বাহির হইয়া শ্যামা দেখিবারে পাইল॥
কয় মাতা কৃপা করি করহ উদ্ধার।
তোমার চরণ বিনে গতি নাই আর॥
অসিতা করিলা আজ্ঞা যোগিনী সকলে।
ভোজন করহ সৈন্য সভে ক্ষুতূহলে॥
কাটি কাটি মুণ্ড সভে করয়ে ধারণ।
রুধিরের ধারা পানা সভার ভোজন॥
রাবণ সহস্র বাহু করিয়া ছেদন।
কটী বেড়া কৈল হইল করের ভূষণ॥
সমরে সকলে আশি নাচে সর্ব্বজনা।
আনন্দে করয়ে সভে রুধিরের পানা॥
সৈন্য শেষ হইল তবু নাই করে ক্ষমা।
নাচিলা চীকারি সভে ঘোররূপা শ্যামা॥
ধরাধর নড়ে পড়ে ধরণী অস্থির।
ধরিতে অনন্ত নারে অশক্ত শরীর॥
রঘুপতি পাদপদ্ম করিয়া বন্দনা।
পয়ার প্রবন্ধে রাম গুণের বর্ণনা॥
ব্রহ্মার নিকট ধরা করয়ে আদাস।
রক্ষা কর প্রভু তব সৃষ্ট জায় নাশ॥
দেবগণ লইয়া ব্রহ্মা আইলা তথায়।
দেখেন সমরে নাচি অসিতা বেড়ায়॥
দেখে রঘুনাথ অচেতন রথপরি।
জাইয়া জাগায় বিধি পাদপদ্ম ধরি॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ উঠি না দেখেন সীতা।
চমকিত হইয়া উভয়ে চারি ভিতা॥
রাবণে লইয়া গেল সেই ভয় মনে।
একবার উদ্ধারিল অনেক যতনে॥
এবার লইল উদ্ধারের হেতু নাই।
চিন্তিত দেখিয়া বিধি কন তার ঠাঁই॥

অচেতনে ছিলা প্রভু না জান বারতা।
সম্মুখে দেখহ সীতা হইয়াছে অসিতা॥
করলাবদনা দিগম্বরী মুক্তকেশী।
সহস্র যোগিনী সঙ্গে নাচে কারে হাঁসি॥
পদভরে ডরে ধরা জায় রসাতল।
রক্ষা কর প্রভু সৃষ্ট তোমার সকল॥
শুনি রাম চমকিয়া দেখেন অসিতা।
লক্ষ্মণে কহেন এই না হয় বনিতা॥
সীতারে ভক্ষণ বুঝি করিয়াছে শ্যামা।
নাচি নাচি কারে ধরে নাহি দেখি ক্ষমা॥
সীতা হারাইল ভাই চলো দেশে জাই।
কহিব কি সভে আর জননীর ঠাঁই॥
লক্ষ্মণ কহেন আমি দেশে না জাইবো।
অসিতা চরণে জাইয়া পড়িয়া রহিবো॥
অসিতা সম্মুখে গেলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ধরিয়া দুজনে কৈলা কর্ণের ভূষণ॥
কোন্ মতে ক্ষমা নাই ভাবয়ে বিধাতা।
হেন বেলে শম্ভুনাথ আইলেন তথা॥
বিধি হন কালী ক্ষমা তোমা হইতে হয়।
যে উচিত হয় তাহা কর মহাশয়॥
শুনি শম্ভুনাথ জাইয়া পড়িলা চরণে।
অসিতা চরণ বক্ষে ধরিলা জতনে॥
দক্ষিণ চরণ বক্ষে বাম উরু পরি।
হরে দেখি লজ্জিতা হইলা দিগম্বরী॥
সংবর অসিতা মূর্ত্তি কন ত্রিপুরারি।
ছাড়ি ঘোর মূর্ত্তি সীতা হইলা সুন্দরী॥
কর্ণ হইতে শ্রীরাম লক্ষ্মণে ছাড়ি দিল।
লজ্জায় লজ্জিতা হইয়া ধরায় বসিল॥
নগ্না মগ্না হইয়া কৈল দুষ্টের দমন।
এবে লজ্জা নাই জাবো অযোধ্যা ভুবন॥

দেখা যায় নাই। সুখের মধ্যে থাকিয়া তাহার প্রাণ এত কোমল এত সমবেদনাময়, তাহা কেবল সূর্য্যমুখীর উপর বলিয়া নহে, অশান্তির মূল কুন্দের উপরও দেখা গিয়াছে। নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়া কষ্ট পাইতেছে, জানিয়া কুন্দের উপর সহানুভূতিই করিয়াছে। পরম যত্নে চুল বাঁধিয়া দিয়াছে, তাহার মাথাটী কোলের উপর লইয়া আঁচলে চক্ষু মুছাইয়া দিয়াছে; কমলমণির এতই গুণ। অথচ কমলমণি কোথাও বেশী কথা কহে নাই, দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি করে নাই।

সূর্য্যমুখী ও কমলমণি দুইজনেই পতি সৌভাগ্যে গৌরববতী ছিল। "ঝড়ের সময় নৌকা তীরে বাঁধিও, নৌকায় থাকিও না,"—সূর্য্যমুখীর এই অনুরোধটী নগেন্দ্রনাথ পালনই করিয়াছিল। আর কমলমণির পিত্রালয় যাইবার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া তাহার স্বামী শ্রীশচন্দ্র ঘরের কড়িকাঠ গুণিয়াছিল। পতিগৃহে সূর্য্যমুখী ও কমলমণি দুইজনেরই অপরিসীম সুখ ও অখণ্ড প্রতাপ। একজন নানা অবস্থার মধ্য দিয়া আদর্শ ফুটাইল, অন্যজন একই অবস্থায় থাকিয়া আদর্শ দেখাইল।

সূর্য্যমুখী হিন্দুঘরের আদর্শ গৃহিণীর চিত্র। শ্যামাবিষয়ক গীত শুনিয়া মোহিতা ও প্রীতা হইয়া বৈষ্ণবীকে ভিক্ষা দিল, ইহাতে তাহার ভগবদ্ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। "আমি কেনই বা পদসেবা না করি, মিনতি, হুকুম পাইলেই ছুটি" এই অনুমতি প্রার্থনায় তাহার সেবিকা ভাব ও স্বেচ্ছাগৃহীত—দাসীত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। "একটি বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে? তুমি কোন সামগ্রী পাইলে তাহাতে আমার অধিকার হওয়াই উচিত, এক্ষণে দেখিতেছি, তোমার ভগিনীরই অধিকার" এই রহস্য, প্রণয়াভিমান ও পত্নীত্বের দাবী দাওয়ার ভিতর দিয়া তাহার প্রেয়সী ও অর্দ্ধাঙ্গিনীভাব অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

কমলমণি একাধারে সুরসিকা, স্নেহবাৎসল্য মা, সম দুঃখ সুখী এবং পর বেদনা বেদিনী দয়াময়ী দেবীর চিত্র। তাহার দাম্পত্যভাব ও মাতৃত্বভাবের ভিতর এখন আত্মত্যাগের ভাবটী অন্যত্র বড় কোথাও দেখা যায় না। যুবকজনের আরাধ্যা রঙ্গরসের উৎসরূপা তাহার সুখোদ্দীপ্তা দিক্‌টী সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে যে অপরিচিতা দরিদ্র বালিকার গাত্রটী স্বহস্তে সোপ মাখাইয়া দেয়—আপনার অঙ্গের অলঙ্কার দিয়া তাহাকে সাজাইয়া দেয়। বিতাড়িতা ও উপেক্ষিতাকেও কোলে তুলিয়া লয়—এই সান্ত্বনাময়ী দিকটী সকলের তেমন লক্ষ্য পড়ে না। "ও মাগী যা বলে বলুক আমি উহার একটী কথাও বিশ্বাস করিনা।" কি

সুন্দর মনোভাব। বিষবৃক্ষের বীজ কে পুতিল? নগেন্দ্রনাথ অনাথা বলিয়া দয়ার্দ্র বোধে পথে পতিত কুন্দরূপ বীজটীকে গৃহপ্রাঙ্গণে আহরণ করিয়া আনিলেন। সূর্য্যমুখী কমলমণির সহায়তায় সেই বীজটী দত্তগৃহে পুতিবারও ব্যবস্থা করিলেন। সূর্য্যমুখী যদি নগেন্দ্রের নিকট কুন্দকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য অনুরোধ না করিত, আর কমলমণি যদি সে বিষয়ে সম্মতি না দিত, তাহা হইলে বীজটী দত্তগৃহে আসিত কিনা সন্দেহ। বীজ অঙ্কুরিত হইলে, ক্রমশঃ তরুর আকারে বাড়িয়াও চলিল। তখন সেই লাল পুষ্পময় তরুটীর বিষ চারিদিকেই বিসর্পিত হইতে লাগিল। নগেন্দ্র জর্জ্জরিত হইল, সূর্য্যমুখীও অন্যরূপে জর্জ্জরিতা হইল। কমলমণি জর্জ্জরিতা হইল না, কিন্তু কাঁদিয়া চক্ষু রাঙ্গা করিল। দেবেন্দ্র কদর্য্য রোগগ্রস্ত হইয়া শেষে কণ্টকময় মৃত্যুশয্যায় শুইল, হীরা উন্মাদিনী হইয়া "দেহি পদবল্লব মুদারং" গান করিতে থাকিল, আর কুন্দ নিজে বিষে জরজর হইয়া গরল খাইয়া মরিল। কেন এমন হইল? অমর কবি বলিয়াছেন,—"মনুষ্য চিরান্ধ।" মনুষ্য চিরান্ধ—তবু অভাগী কুন্দ তুমিই সকল দুঃখের মূল হইলে! তোমারই ভাগ্যদেবতা ধরিয়া বাঁধিয়া তোমার মত নিরীহ বীজটীকে বিষবৃক্ষ করিয়া তবে ছাড়িল। কবি আমাদের আশ্বাস দিয়াছেন, "ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলই ফলিবে।" তাই যদি ফলে, তবে কুন্দ! তোমাকে এ লোকে বিষবৃক্ষ যে বলে বলুক, অন্যলোকে তুমি অমৃত-বৃক্ষ হইয়া বিরাজ করিবে।

সূর্য্যমুখী ধীর প্রকৃতি, মৃদুহাসিনী মহিয়সী নারী। কমলমণির পার্শ্বে দাঁড় করাইলে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর প্রকৃতি বলিতে হয়। দত্তগৃহের দাসদাসী ও পরিজনেরা তাঁহাকে ভয়ও করিত, সম্ভ্রমও করিত, আবার ভক্তিও করিত। কমলমণির মত হাসিতে হাসিতে দাসীর অঙ্গে গরম জল ছিটাইয়া দেওয়া তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। সূর্য্যমুখীকে যখন আমরা দেখিলাম, তখন তাঁহার বয়স ষড়্‌বিংশতি। পরিণতদেহা, পরিণত বুদ্ধি, জমিদার গৃহে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী।

আদর্শের দিক্ দিয়া বিচার করিলে আপাত দৃষ্টিতে সূর্য্যমুখী চরিত্রে তিনটী দোষ লক্ষিত হয়। অবশ্য আমরা প্রথমোক্ত দুইটী দোষকে দোষই বলি না, শেষোক্তটাকে মাত্র ত্রুটী বলিতে পারি।

কুন্দ অপরাধিনী কিনা, তাহা ভালরূপ না জানিয়াই তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া সূর্য্যমুখীর প্রথম দোষ। নিজেই উদ্যোগিনী হইয়া পতির অন্যায় আকাঙ্খা চরিতার্থ করার জন্য কুন্দের সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া সূর্য্যমুখীর দ্বিতীয় দোষ; আত্মত্যাগ করিয়া আবার কুলবধূর অনুচিত গৃহত্যাগ করিয়া যাওয়া সূর্য্যমুখীর তৃতীয় দোষ।

প্রথম দোষটী দোষ বলিতে পারিতাম, যদি "স্বামী ভালবাসেন।" কেবল এই ঈর্ষাবশেই সূর্য্যমুখী কুন্দকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিত। হীরার মুখে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া 'কুন্দ পাপিষ্ঠা' এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল বলিয়াই তাহার ক্রোধ উদ্দাপিত হয়, তাহার ফলেই কুন্দের বহিষ্কৃতি ঘটে। ইহা নারী সুলভ অবিমৃষ্যকারিতা মাত্র, চরিত্রগত দোষ নহে।

ক্রমশঃ।

ঝুলন-স্মৃতি।

—গান—

লেখক—শ্রীযুক্ত জহরলাল বিশ্বাস।

ওগো অচিন বালা।
মন্দির মাঝে কেন করিলে খেলা॥
সেই পথেরি মাঝে
ঝুলন সাঁঝে
করিলে আপন মোরে না করি হেলা॥
তাই মরম পাতে
বড় আশাতে
এঁকেছিনু তব ছবি হ'য়ে বিভোলা॥
সেকি মনেরি ভুলে
গেলে গো চ'লে
হৃদয়ে রাখিয়ে মম শতেক জ্বালা॥
বুঝি সরম তরে
তব অধরে
ফুটিল না কোন ভাষা বিদায় বেলা॥
এই ঝুলন স্মৃতি
মরমে গাঁথি
ভাবিবে কি জানিনা গো বসি নিরালা॥
জেনো আমারি প্রাণে
এ স্মৃতি গানে
জাগায়ে তুলিবে আশা সাঁঝ ও সকালা॥

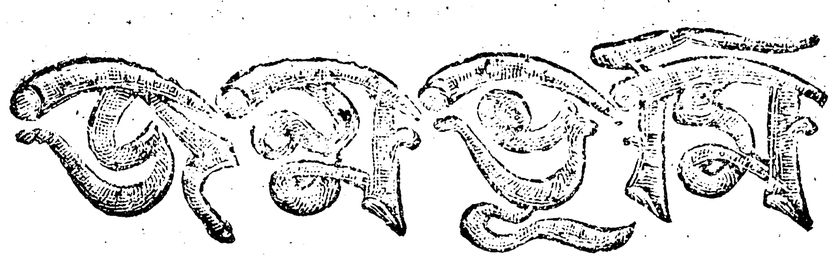

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৬শ বর্ষ } ১৩৩৭ সাল, আশ্বিন। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আগমনী।

মা-মা-মা! আবার সংবৎসর পরে—দীন হীন অবোধ সন্তানের কাতরোক্তি স্মরণ করিয়া, "সংবৎসরে ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ" মনে করিয়া, সন্তানের অন্তরে বাহিরে এস,—মা এস!

মা! তোমার আসা-যাওয়া নাই, তুমি সতত সর্ব্বত্র বিরাজমানা! সর্ব্বভূতে চেতন-অচেতন রূপে শক্তি-অশক্তি রূপে আবার পরমশক্তি রূপে সদা তোমার অধিষ্ঠান—শুনিয়াছি, অনেক বার শুনিয়াছি, ভাবিয়াছি; তবু কিন্তু ডাকি, কোটি-কণ্ঠ মিলাইয়া, কোটি মন একাগ্র করিয়া, কোটি করে অঞ্জলি বাঁধিয়া ডাকি,—মা এস, মা এস, মা এস! মা নামের মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া, মাতৃ প্রকৃতি শরতের মাতৃ ভাবের বিহ্বল হইয়া, আবার ডাকি মা এস, মা এস, মা এস!

মা তাপ নাই, পাপ নাই, আধি নাই, ব্যাধি নাই, আর কিছুই নাই—মা, কেবল মা!

মা! পুত্র নাই, ভৃত্য নাই, মিত্র নাই, কলত্র নাই, মা, কেবল মা! অন্তরে মা, বাহিরে মা, সেই মা তুমি;—এস মা, এস মা, মা এস!

মা! সন্তান-বৎসলে! মা দয়াময়ি! তোমার আগমনের পূর্ব্বপ্রসঙ্গেই জগৎ আনন্দময়; দুঃখে আনন্দ, বিষাদে আনন্দ, শোকে আনন্দ, সুখে আনন্দ,

আনন্দে আনন্দ , হে মহানন্দময়ি। মহানন্দে মাতিয়া মহানন্দ-গদ্গদকণ্ঠে আবার ডাকি,—মা এস, মা এস, মা এস।

কে বলে রে আনন্দময়ীর জগতে নিরানন্দ ! একবার অন্তর ধুইয়া, মনের পারিজাত-মূলে রত্ন-সিংহাসন আনন্দের অমৃত ধারায় প্রক্ষালিত করিয়া, তাহে মাতার আনন্দময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া একবার দেখ রে, আনন্দের হিল্লোলে, মহানন্দের মহাসমুদ্রে মজিয়া মজিয়া দেখ রে , আর কি নিরানন্দ থাকে ! তবে আয়, তুইও আয়, অবোধ ভাই ! তুইও আয়, সবাই মিলিয়া আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া গাইয়া গাইয়া ডাকি,—মা এস, মা এস, মা এস।

ঐ যে, ঐ যে, ঐ যে মা ! ঐ যে, নক্ষত্র-খচিত নীলনভস্তলে মায়ের আমার কুন্তলকান্তি কিরীট ! ঐ যে, রসাতলে পদতল-দলিত কেশরি-কবলিত অসুররাজ ! ঐ যে, দিঙমণ্ডলে অনল-উজ্জ্বল-আয়ুধ-শোভিত দশ বাহু !—ঐ যে বচনে, উদ্যমে, সাহসে, সাধনে, সত্ত্ব-রজ-তমে মা আমার ! কে দেখিবি, কে দেখিবি, কে দেখিবি আয় ! একবার নয়ন নিমীলিত করিয়া দেখ ! আর ভুলিবি না, ভুলিতে পারিবি না।—ঐ দেখ. জ্যোতির্ম্ময়দেহ, —ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ! ঐ দেখ, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ! ঐ দেখ, রবি যম কুবের কৃশানু মা'য়ের জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গে মিশিয়া মিশিয়া, মাতৃসেবায় নিযুক্ত,—মাতৃগুণগানে বিভোর। কে শুনিবি,—কে শুনিবি,—কে শুনিবি রে, সেই জগৎ-ভরা মাতৃনামময় দেব-সঙ্গীত একবার কর্ণ-কুট রুদ্ধ করিয়া, সেই দেব-সঙ্গীত শুনিয়া শুনিয়া, সেই সুরে সুর মিলাইয়া, আমরাও গাই—

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

আবার গাই—

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকাগতির্দ্দেবি নিস্তারনৌকা
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

এস ভ্রাতৃগণ ! মুক্তকণ্ঠে একবার গাই—

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য

ক্ষুধার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ
ত্বমেকাগতির্দ্দেবি নিস্তারকর্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

মা ! অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে-
হনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে
ত্বমেকাগতির্দ্দেবিনিস্তারহেতু-
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

মা ! মা: শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনিমনুজবরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং
ত্বমসিশরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসিদ।

আমরা অবোধ সন্তান,—ভজন-পূজন জানি না, বিধিপদ্ধতি জানি না, মা ! তুমি আসিয়াছ, তোমাকে কি দিয়া সাজাইব মা ? কি দিয়া পূজা করিব মা ? মা ! তোমার পিতা গিরিরাজ তোমার প্রতিমা রত্নালঙ্কারে সাজাইতে গিয়া, একদিন দিশাহারা হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন,—

(গীত।)

উমা ! কি ধন আছে আমার দিতে পারি
দেখিলাম নয়ন মুদে
ব্রহ্মাণ্ডময় সকলই তোমারি !
কি দিব তোয় রত্ন বাস
রত্নাকর তব দাস,
স্বর্ণকাশী মাঝে বাস—অন্নপূর্ণেশ্বরি !
কুবের-ভাণ্ডারী ঘরে,
তোমার ত্রিলোচন ভিখারীর দ্বারে—
ত্রিজগৎ ভিখারী।

মা অন্নপূর্ণা ! কৃপা করিয়া যদি এই বঙ্গ-ভূমে আসিয়াছ -কামনা কিঞ্চিৎ পূর্ণ কর।

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল।
বাঞ্ছা কিঞ্চিৎ পূর্ণ কর হরমহিষি,—

রয় যদি মা শত যুগ এ সুখ সপ্তমী নিশি,—
মনের মানস তবে, ওমা সর্ব্বমঙ্গলে।
পূজি পদ বিল্বদলে
জবা জাহ্নবীর জলে,—
তরি শেষে মোক্ষপদ হয়ে অভিলাষী।
এস তিন দিনের কারণ,
নহে খেদ নিবারণ,—
আশু লয়ে যায় গো মা
আশুতোষ আসি।

শ্রীমদ্ বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাজ বালানন্দের অভিষ্টদেব ?

শ্রীমন্মহারাজ ব্রহ্মানন্দের কিঞ্চিৎ বিবরণ :—

এ বৃদ্ধ মহারাজের আহার ছিল বিচিত্র। তিনি কখনও "খাট্টা" বা টক দ্রব্য, লবণ বা মিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিতেন না। যতদিন দাঁত ছিল, ততদিন হস্তে প্রস্তুত এক এক পোয়া আটার ৪ খানি রুটী ধুনির অগ্নিতে তৈয়ারী হইত, ও ইহা লবণ বর্জ্জিত শাকের বা তরকারির সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তিনি গ্রহণ করিতেন। দুগ্ধ পান পরিমাণ মত ছিল। দাঁত নষ্ট হইয়া গেলে, খিচুড়ী, অন্ন ধুনিতেই প্রস্তুত হইত। এ বৃদ্ধ মহারাজ সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় শুনাইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ ইহাঁর ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতেছি।

আমাদের এই পরম গুরুদেব ও গুরুদেব হইতেছেন, "যোশীমঠ" বা "জ্যোতিঃমঠের" অন্তর্ভূত "আনন্দ" আখ্যা নির্দ্দিষ্ট নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। অনেকেই বোধহয়, অবগত আছেন যে, ভগবান আচার্য্য শঙ্কর এ ভারত বর্ষের চতুষ্কোণে চারিটী সুপ্রসিদ্ধ মঠ স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার চারিজন প্রধান শিষ্যকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম নির্দ্দিষ্ট অদ্বৈততত্ত্ব প্রস্ফুটিত রাখিবার জন্য আজ্ঞা দিয়া যান। তাঁহার রচিত "মঠাম্নায়" নামক আজ্ঞা পত্রে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। তবে এইমাত্র শুনাইতেছি যে, (১) পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা মঠ—

ব্রহ্মচারী স্বরূপ—তত্ত্বমসী মহাবাক্য ও এখানকার সন্ন্যাসীর তীর্থ ও আশ্রম নামে খ্যাত। (২) পূর্ব্বে (পুরীতে) গোবর্দ্ধন মঠ—ব্রহ্মচারী "প্রকাশ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"—মহাবাক্য—ও এখানকার সন্ন্যাসী "বন" ও "অরণ্য" নামে খ্যাত; (৩) উত্তরে (কেদারের নিকট জ্যোতিঃ মঠ বা যোশীমঠ ব্রহ্মচারী—"আনন্দ" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" মহাবাক্য সন্ন্যাসী "গিরি" "পর্ব্বত" ও "সাগর" (৪) দক্ষিণে (সেতুবন্ধে) শৃঙ্গেরি মঠ—ব্রহ্মচারী চৈতন্য, "অহং ব্রহ্মাস্মি" মহাবাক্য, "সরস্বতী" "ভারতী" ও "পুরী"—সন্ন্যাসী। আজকাল বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হইলেও এ সমুদয় মঠে যাঁহারা সন্ন্যাসী হইবেন, তাঁহারা প্রথমে ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব ব্রহ্মচারী রূপে ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর। তবে সন্ন্যাস লইবার অধিকারী হইয়া থাকেন, ও দণ্ডী স্বামী রূপে চিহ্নিত হন। দণ্ডী স্বামী হইতে হইলেই ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভবের সহিত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হওয়া আবশ্যক। আমাদের গুরু সম্প্রদায় এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শ্রেণীভুক্ত। ইহাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে অধিকাংশেই "গিরি" এবং কেহ কেহ "পর্ব্বত" ও "সাগর" রূপে চিহ্নিত হইয়া থাকেন। এক্ষণে নৈষ্ঠিক বলিবার হেতু এই যে, শাস্ত্রে "নৈষ্ঠীক" ও "উপকুর্ব্বাণ" এই দুইরূপ ব্রহ্মচারীর উল্লেখ আছে। যাঁহারা "উপকুর্ব্বাণ" ব্রহ্মচারী তাঁহারা যজ্ঞোপবীত গ্রহণের পর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক গুরুগৃহে কিছুদিন বাস করেন, ও সেখানে বেদাদি অধ্যয়নের পর গুরু আজ্ঞা ক্রমে ও যথাশক্তি গুরু দক্ষিণা প্রদানান্তর গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ও দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক বিধিমত ঋষি-ঋণ, পিতৃঋণ ও মনুষ্য-ঋণ প্রদান করিতে থাকেন। পরে সুকৃতি উপস্থিত হইলে ভার্য্যা সহিত বা ভার্য্যা বিরহিত হইয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিতে পারেন, ও ইহার পর সন্ন্যাস লইবার বিধি আছে। আর "নৈষ্ঠিক" ব্রহ্মচারী গণের গৃহস্থ বা বাণপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে একেবারে দণ্ডীস্বামী রূপে সন্ন্যাস লইতে পারেন। ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এরূপও আজ্ঞা আছে যে, "গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ," যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্বা বনাদ্বা"—অর্থাৎ সম্ভব হইলে বা জ্ঞান প্রাপ্তি হইলে ব্রহ্মচর্য্য হইতে গার্হস্থ হইতে কিম্বা বাণপ্রস্থ হইতেই প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস করিবে।" এ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য এক প্রকার সন্ন্যাস অবস্থাই। তবে ব্রহ্মচারী রূপে শিখাসূত্র থাকে, ও শ্রৌত্র স্মার্ত্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। সন্ন্যাস লইলে শিখাসূত্র ত্যাগের পর শিরোমুণ্ডন পূর্ব্বক আনুষ্ঠানিক শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়। এবং অগ্নি স্পর্শ বা ধাতু দ্রব্য স্পর্শ পরিত্যাগ করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর দুইটী শ্রেণী দেখা

যায়। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ আজীবন ব্রহ্মচারীরূপে অবস্থান পূর্ব্বক দেহ ত্যাগের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে "আতুর" সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অপরে পূর্ব্বোক্ত প্রথানুসারে দণ্ডীস্বামী রূপে চিহ্নিত হন। এবং এই সন্ন্যাসী রূপে কেহ কেহ বরাবর দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করেন, এবং কেহ কেহ কিছুদিন পরে এ দণ্ডও ত্যাগ করেন।

আমাদের পরম গুরুদেব ও গুরুদেব হইতেছেন, আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রতধারী ব্রহ্মচারী। তবে পরম গুরুদেবের বহু শিষ্য ও প্রতি শিষ্য তাঁহার নিকট ব্রহ্মচারীরূপে দীক্ষা লইবার পর সন্ন্যাসী রূপে বিরাজিত আছেন। ইহার একটী উদাহরণ, যথা—অধুনা গোবর্দ্ধন মঠের শঙ্করাচার্য্য কৃষ্ণ ভারতী তীর্থ—তাঁহার গুরু ত্রিবিক্রম স্বামী তীর্থও তাঁহার গুরু বিষ্ণুস্বামীতীর্থ এই শেষোক্ত স্বামী আমাদের বড় মহারাজের ব্রহ্মচারী শিষ্য ও আমাদের গুরুদেবের গুরুভ্রাতা! তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত ও পরে সন্ন্যাস গ্রহণকারী স্বামীগণ উক্ত মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে বড়ই রঙ্গ রসের ব্যাপার উপস্থিত হইত। তাঁহারা বুড়ো মহারাজকে "নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রণামও পাদস্পর্শ করিতে যাইলেই তিনি অমনি পা হটাইয়া লইতেন ও "নমো নারায়ণায়" বলিয়া নিজেই নমস্কার করিতেন, এবং বলিতেন, "আপ্ লোক হাম্‌সে উচু দরজামে চলা গেয়া, আপ্ লোকই হামারি প্রণম্য হ্যায়"।

আমাদের গুরুদেব শুনাইয়াছিলেন যে, এক সময় তাঁহার সন্ন্যাস লইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। পরম গুরুদেব জানিতে পারিয়া নিষেধ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন এ কলিকালে পূর্ণভাবে সন্ন্যাস ধর্ম্ম রক্ষা করা কঠিন। শাস্ত্রেও ইহার নিষেধ দেখা যায়, যথা—

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তীং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

আজকাল ব্রাহ্মণ বা দ্বিজাতী না হইয়া ও পূর্ণভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিয়াও প্রায় সর্ব্বজাতিই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছে। ষট্ সম্পত্তি সাধন না করিলে পূর্ণরূপে জ্ঞানপ্রাপ্তি হওয়া অসম্ভব। তিনি বলিতেন, "নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে অবস্থান করিলে সন্ন্যাসশ্রমে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের অধিক প্রাপ্তি আর কি হইবে? সদাচার, শুদ্ধাচার, গৈরিকবসন পরিধান ও কোপিন ধারণ ও ভিক্ষাটনাদির দ্বারা অনুগ্রহণ উভয় অবস্থায় সমানই আছে। ব্রহ্মচারী আশ্রমে থাকিয়া নিষ্কাম কর্ম্মাদি করিবার বহু সুযোগ আছে। অন্যদিকে শিখাসূত্র ত্যাগের পর ও নানাজাতীয় চিহ্নিত সন্ন্যাসীর সংশ্রবে আসিয়া অশুচিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র অধিক আসিবে ও অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া কর্ম্মত্যাগ করতঃ, যোগ ও জ্ঞান উভয়ই নষ্ট হইবে। যাহা আছে বা করা হইতেছে, তাহাও নষ্ট হইতে পারে। এ মহাত্মার উপদেশ শুনিয়া গুরুদেব সন্ন্যাস লইতে ক্ষান্ত হন। এ বৃদ্ধ মহারাজের এ কয়েকটী বাক্য হইতেই সকলে বুঝিবেন যে, তিনি কত বড় পাকা ঘুঁটী ছিলেন। আজকাল এ সন্ন্যাসেরই ছড়াছড়ি সকলে দেখিতে পাইবেন।

আমি পূর্ব্বে একবার শুনিয়াছি যে, আমাদের এ বৃদ্ধ মহারাজ যদিও বাঙ্গালাদেশে সবিশেষ পরিচিত নহেন, তথাপি ইনি গুজরাট ও বরোদা অঞ্চলে এক মহাসিদ্ধ পুরুষ বলিয়া অনেকের নিকট সুপরিচিত, এ লেখক দুইবার ইহাঁর পরিচয় পাইয়াছিলেন। একবার তিনি ঝরিয়া হইতে ধানবাদ আসিবার কালে সেকেণ্ড ক্লাসে এক দণ্ডী স্বামীর সহিত মিলিত হন। লেখক এ স্বামীজীর সহিত তাঁহার পর্য্যটন বিষয়ে আলাপ করিবার সময়ে গঙ্গোনাথের নাম উল্লেখ করেন। লেখক বাঙ্গালী ও এ গঙ্গোনাথ বহুদূরে বরোদারাজ্যের উপকণ্ঠে। এজন্য এ স্থানের নাম উল্লেখ করিতেই যেন তিনি আশ্চর্য্য হইলেন ও কিরূপে লেখক গঙ্গোনাথ জানেন জিজ্ঞাসা করিলেন। যখন পরিচয় পাইলেন যে, ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহার পরম গুরুদেব, তখন তিনি দণ্ডীস্বামী হইয়াও ভক্তিভরে নমো নারায়ণ" করিয়া মস্তকে হাত দিলেন ও বলিলেন, "যে এ দেশ্‌মে উন্‌কো কোন জান্‌তা হৈ। উন্‌তো হামারি দেশকো এক সিদ্ধ পুরুষ থা"।

অপর ঘটনাটী হইতেছে, মজঃফরপুর জেলার হাজিপুর সহরে। লেখক কর্ম্মোপলক্ষে এ স্থানে যাইলে সেখানকার কতোওলী জমিদারদের ঠাকুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। একবার এরূপ অবস্থান সময়ে তিনি শুনিলেন যে, কয়েকদিন হইতে এক ব্যক্তি শিবমন্দিরের ভিতর অবস্থান করিতেছেন। কেবল মাত্র ঘুঁটের ছাই ও জল খাইয়া আছেন। ইহা শুনিয়া লেখকের তাঁহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা হইল। প্রথমতঃ হিন্দীতে কথাবার্ত্তা হইবার পর লেখককে সরকারী অফিসার জানিয়া পরে উক্তব্যক্তি বেশ, ইংরাজীতে কথা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে পরিচয় দিলেন যে, তিনি জষ্টিশ ৺চন্দভরকারের আত্মীয় নিলগিরিতে তাঁহার রবারের আবাদ ছিল। কিন্তু হস্ত ও পদে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়েন ও ইহার চিহ্নও দেখাইলেন। ইহার পর পারিবারিক অশান্তিতে তিনি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন। এ পর্য্যটন সম্বন্ধে বার্ত্তালাপন করিতে যাইয়া

লেখক গঙ্গোনাথের নাম উল্লেখ করেন। এ নাম উল্লেখ করিবামাত্র সে ভদ্র লোকটী মস্তকে হাত দিয়া যোগাচার্য্যা জগতি বিদিতা ব্রহ্মচারী প্রধানা বলিয়া স্তব আরম্ভ করিলেন। ইহার পর প্রকাশ করিলেন যে, গঙ্গোনাথের এ মহাত্মা যে, বরোদা অঞ্চলের এক সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। আরও জানাইলেন যে, তাঁহাকে তিনি গুরুবৎ ভক্তি করেন, এবং তাঁহারই আদেশ মত ঘুঁটের ছাই দিবসে ২।৩ বার খাইয়া তিনি কুষ্ঠব্যাধি হইতে অনেকটা আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর এ মহাপুরুষ সম্বন্ধে নানারূপ আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন। এ ভদ্রলোক কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা করিতেন না। অযাচিত ভাবে কোথা কিছু পাইলে তাহাই ভক্ষণ করিতেন। ক্রমশঃ।

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

লেখিকা—শ্রীমতী সরসী রায়।

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত শিবপুর নামক একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম আছে। গ্রামটীতে নানা শ্রেণীর মানব বাস করে, উহা দেখিতে অতি সুন্দর—স্থানে স্থানে বটবৃক্ষ শ্রেণী পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রামখানি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। পথিকের পক্ষে গ্রামটী অগম্য না হইলেও গমনাগমন করা বড়ই কষ্টকর। অধিকাংশ পথ কলিকাতা হইতে রেলে যাইতে হয়, এবং অবশেষে হাড়োয়া নামক একটী স্থান হইতে নৌকা যোগে তথায় যাইতে হয়। যাইবার সময় দৃশ্য অতি মনোহর। উভয় পার্শ্বে বাপীতটে সুশ্যামল ক্ষেত্র খালের শোভা শত গুণ বর্দ্ধিত করিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যের মহৎ উৎকর্ষ সাধন করিতেছে। স্থানে স্থানে বটবৃক্ষ আচ্ছাদিত বৃক্ষতলে উপবেশণ করিয়া রাখালগণ সুমধুর স্বরে গান গাহিতে গাহিতে কেহ বা বংশীবাদন করিয়া গাভী দিগকে চরাইতেছে। কোন কোন গাভী খালে নামিয়া জলপান করিতেছিল, কেহ বা রৌদ্রে প্রপীড়িত হইয়া বটবৃক্ষের ঘন ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিতেছে। খাল দিয়া কাতারে কাতারে নৌকা শ্রেণী চলিয়াছে। দূর হইতে মাঝি দিগের দ্রুত দাঁড় বিক্ষিপ্ত শব্দ পথিকের কর্ণকুহরে অস্পষ্ট প্রবেশ করিতেছে, তরণীগুলি হেলিয়া দুলিয়া যেন পরস্পরে প্রতিদ্বন্দী হইয়া ছুটিয়াছে। গ্রাম্য রমণীগণ কেহ বা খাল হইতে জল আহরণ করিতেছে, কেহ বা হেলিয়া দুলিয়া নূপুর ধ্বনী করিতে করিতে খালাভিমুখে যাইতেছে। কোন কোন স্থানে বৃক্ষচূড়ে পাখীগণ মধুর কূজন করিতেছে। পাপিয়া

পিউ পিউ রবে গাহিতেছে। দূরে "বউ কথা কও" বলিয়া পাখী বনপথগুলি যেন মুখরিত করিতেছে। একটি তরণীতে আরোহী ছিলেন, শিবপুরের জমিদার সতীশ বাবু তাঁহার সহধর্ম্মিণী সরলা দেবী, ও তাহার দ্বাদশ বর্ষীয়া একমাত্র কন্যা রমা। তরণী সবেগে চলিতেছে, মাঝিরাও জমিদার বাবুকে স্বগ্রামে সত্বর পৌঁছিয়া দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। যখন নৌকা গ্রামের সন্নিকটে আসিল, তখন মাঝিরা বাঁধিয়া ফেলিল। সতীশ বাবু তাঁহার পত্নী ও কন্যার সমভিব্যাহারে নৌকা হইতে নামিলেন। বাহকগণ পাল্কী লইয়া গ্রামের আঁকা বাঁকা পথ দিয়া জমিদার—গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিল। জমিদার গৃহে দুর্গা পূজার আয়োজন হইয়াছে। তখন ধরার বক্ষে সন্ধ্যার ঘন আবরণ নামিয়া আসিয়াছে। জমিদার বাড়ীতে মধুর পূরবী রাগিণী আলাপ হইতেছিল।

তখন শরৎকাল আকাশ নির্ম্মল ক্রমে ক্রমে আকাশে তারকাদল আলোক রশ্মি মিটি মিটি বিকীরণ করিতেছে। চন্দ্র সদ্য উঠিয়াছে, ক্রমশঃ অন্ধকার দূর হইল। আকাশ উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল। মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি যাহা এতক্ষণ মায়ের আরতির মঙ্গলাচরণ করিতে ছিল, ক্রমশঃ নিস্তব্ধ হইয়া গেল। জমিদার বাড়ীতে মায়ের আরতি শেষ হইয়া গেল। বাড়ীখানি প্রাসাদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা সেখানে রহিয়াছে। বাহিরে কাছারী বাড়ী, ভিতরে নাটমন্দির, পূজা-মণ্ডপ কিছুরই অভাব নাই। জমিদার বাবু বহুসরিক পরিবেষ্টিত হইয়া ঐ গ্রামেই বাস করেন। জমিদার বাবু তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা মায়ের অপরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করতঃ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মাকে প্রণাম করিলেন। আত্মীয় স্বজন সকলেই জমিদার বাবুকে সম্ভাষণ করিলেন। প্রজাগণ আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল, এবং ভগবৎ সকাশে তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিল। চারিদিন ধরিয়া খুব ধুমধামের সহিত মায়ের পূজা হইল, নানা শ্রেণীর লোক জমিদার গৃহে ভূরি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। লক্ষ্মীস্বরূপিণী জমিদার-গৃহিণীর মুহূর্ত্তেরও বিরাম নাই। সমস্ত দিন তিনি রন্ধন ক্রিয়া ও সংসারের নানা কাজে ব্যাপৃত রহিলেন। স্বয়ং অভ্যাগত আত্মীয় স্বজন ও প্রজাদিগকে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন, এবং নিজেকে অন্ন বিতরণ হেতু অতিশয় ভাগ্যবতী মনে করিলেন। দশমীর দিন মহা ধূমধামের সহিত প্রতিমা বিসর্জ্জন হইল। জমিদার বাবু পত্নী ও কন্যাকে বাটীতে রাখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। প্রসঙ্গ ক্রমে বলিতে হইল যে, জমিদার বাবু এক্ষণে শুধু নামে মাত্র

জমিদার; তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের বিষময় পরিণামে তাহার প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই জ্ঞাতিবর্গ অধিকার করিয়াছে। তিনি এক্ষণে অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যাইয়া তাঁহার মনে শান্তি নাই। কেবল মাত্র বাধ্য হইয়া তিনি শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার সময় কয়েক দিবস অতি কষ্টে বাটীতে ছিলেন। তাঁহার মন এখন সংসারের সাররত্ন সতীলক্ষ্মী পত্নীর ও প্রাণাধিকা একমাত্র স্নেহের পুতুলী কন্যার মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহার এক-মাত্র উচ্ছৃঙ্খলার কেন্দ্রস্থলে ধাবিত হইল। তিনি তাঁহার বাড়ী হইতে দ্রুতপদ বিক্ষেপে কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা অপবিত্র অঞ্চলে ছুটিয়া গেলেন, যাইয়া দেখি-লেন, একটী দ্বিতল কক্ষে তাঁহার সেই ধ্বংসের পতনের একমাত্র মূলীভূত কারণ তাঁহারই সেই রক্ষিতা মানদা সুন্দরী আলুলায়িত কেশে স্থিরনয়নে বিষাদমানা হইয়া শুইয়া আছে। সহসা তাহাকে দেখিয়াই সর্পিণীর ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তোমার ভালবাসা বেশ বোঝা গিয়াছে। আমি তোমার জন্য পাগলিনী বেশে আজ কয়েকদিন বসে আছি, তোমার চিহ্ন মাত্র নাই। তোমার মুখের ভালবাসা মুখেই থাক্।"

সর্ব্বস্বান্ত জমিদার দুঃখভরে বলিল, "মানদা! তোমার জন্য সর্ব্বস্বহারা হইয়াছি, আমার সোণার জমিদারী ছারেখারে গিয়াছে, পথের ভিখারী হইয়াছি—পরের গলগ্রহ করিয়া পত্নীও কন্যাকে গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি। ইহাতেও কি তুমি জাননা, তোমায় আমি কত ভালবাসি?" গর্ব্বিতা ঠোঁট ফুলাইয়া কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া বলিল,—"তোমার সবই ভাণ মাত্র—পূজায় আমায় কি দিয়াছ? না দিয়াছ অর্থ, না দিয়াছ অলঙ্কার, যদি অলঙ্কার অর্থ না দাও, তবে এখানে তোমার স্থান হবে না—তুমি দূর হও!"

জমিদার বাবুর মাথা ঘুরিতে লাগিল, তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন.—তাঁহার মনে হইল, যেন সমস্ত বাড়ীখানি ঘুরিতেছে। তাঁহার হৃদয়ের ধন তাঁহার মানস-প্রতিমা আজ তাঁহাকে ঘৃণা করিতেছে। যাহার জন্য তিনি সংসারে অমূল্য তাঁহার সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার একমাত্র কন্যার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছেন, যাহার জন্য তিনি জলের মত অর্থ ব্যয় করিয়া ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পরে তাহার সমস্ত সম্পত্তি হারাইয়াছেন, পত্নীকে কন্যাকে পরের গলগ্রহ করাইয়াছেন, নিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন মনুষ্যত্বকেও বিসর্জ্জন দিয়াছেন, আজ সেই রমণী তাঁহাকে ভিক্ষুকের ন্যায় "দূর্ দূর্" করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে! বলা বাহুল্য জমিদার বাবু এক্ষণে তাঁহার জীবিকার জন্য

কলিকাতার কোন সওদাগরী আফিসে মাসে ৩০ টাকা বেতনে চাকুরী করিতে-ছেন। হায় কি বিচিত্র পরিণাম! বারাঙ্গনার মোহ মানুষকে অধঃপতনের কি চরম সীমায় আনয়ন করে! জমিদার বাবু ভাবিলেন যে, এখন একমাত্র সম্বল তাহার পত্নীর অলঙ্কার—যাহার অধিকাংশই তিনি তাহার পাপ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য নষ্ট করিয়াছেন। এখন তাহার একমাত্র সম্বল চাকুরী।

মনে করিলেন যে, গ্রামে ফিরিয়া যাইয়া তাঁর স্ত্রীর গহনা কাড়িয়া লইয়া আসিয়া তাহার প্রাণ প্রতিমাকে উপহার দিবেন। তবে নিশ্চয়ই তাহার ভালবাসা ফিরিয়া পাইতে সমর্থ হইবেন। হায় ভ্রান্ত বিশ্বাস! তুমি মানবকে কত বিপন্ন করিতে পার!

জমিদার ট্রেণ যোগে বাড়ী গেলেন। তখন সন্ধ্যা আগত; এদিকে অনাহার ও দারুণ চিন্তায় জমিদার পত্নীর অবস্থা শোচনীয়া, আর সে দিন নাই। একদিন যিনি দাস দাসী পাচক পাচিকা অনুজন পরিবৃতা হইয়া অট্টালিকায় বাস করিতেন, আজ তিনি কুটীরবাসিনী হইয়াছেন। সে অট্টালিকা আজ জ্ঞাতি বর্গের কবলিত। সেখানে জমিদার পত্নীর ও তাহার কন্যার আর স্থান নাই। গৃহে তণ্ডুল না থাকায় জমিদার কন্যা অতি কষ্টে জ্ঞাতিবর্গের বাটী হইতে চাহিয়া লইয়া আসিয়াছে। দিনগুলি দুঃখেই চলিতেছে। এত দৈন্যের মধ্যেও জমিদার গৃহিণী তাহার শেষ সম্বল গহনাগুলিও গা ছাড়া করেন নাই। কন্যা ও স্বামীকে অনশন হইতে রক্ষা করিবার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তখনই দিবেন। জমিদার পত্নী কলসী কক্ষে করিয়া পুষ্করিণী হইতে জল আনিতে যাইতেছেন এমন সময় কে পশ্চাৎ হইতে বলিল, "ওগো ফের ফের। আমার বড় বিপদ! বাড়ী চল।" বাড়ী বা কোথায়? সেই কুটীর গৃহে জমিদার ও তদীয় পত্নী উভয়ে প্রবেশ করিলেন। তাহাদের একমাত্র কন্যা তখন রন্ধন শালায় রন্ধন করিতেছিল। জমিদার বলিলেন, "তোমার ও তোমার কন্যার গহনাগুলি আমাকে দাও। এখান আমাকে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। জমিদার পত্নী কাঁদিতে লাগিল। বলিল, "ওগো, তুমি স্বামী আমার একমাত্র হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা, তোমায় অদেয় আমার কিছুই নাই। দেখ সবই হারাইয়াছ, কেন হারাইয়াছ তাহাও জান। এখন আমরা পথের ভিখারিণী, অন্নের কাঙ্গালিনী, এর চেয়ে চরম অবস্থা আর কি হবে? তুমি জমিদারের ছেলে অতুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলে। আজ সর্ব্বস্ব হারাইয়া পেটের দায়ে তুচ্ছ চাকুরী করিতেছ। পত্নী ও কন্যা জ্ঞাতিবর্গের মুখাপেক্ষী সমস্তই গিয়াছে, তবে শেষের সম্বল এই

কয়েকখানি গহনা, যাহার অধিকাংশই দিয়াছি, কেন ঘুছাইতেছ, তোমার পায়ে ধরি. মিনতি করি, এখনও বুঝ। তোমারই শেষ এই অলঙ্কার তোমারই বিপদে ব্যবহৃত হইবে। তবে কেন আমাদিগকে ও নিজেকে নিঃসম্বল করিতেছ? তুমি এখনও তোমার ভ্রান্তি দূর কর। জেনো মরুভূমি করি অসম্ভব পাষাণে প্রেম নাই—সে কুসুমে কীট ছাড়া গন্ধ নাই। ভ্রান্ত স্বামিন্, দাসীর জীবনের ধ্রুবতারা! এখনও তোমার স্নেহের পুত্তলিকা কন্যার মুখের দিকে তাকাও, এখনও বুঝ।" জমিদারের মন কিছুতেই বুঝিল না। সরলা পত্নীর এত আকিঞ্চন এত অনুনয় কিছুতেই তাহার মন দ্রবীভূত হইল না। তাহার মন ভাবিতেছিল, কখন সে তাহার সেই প্রণয় সঙ্গিনীর মুখখানি দেখিবে। তাই পত্নীর করুণ কাতর ক্রন্দনে তাহার হৃদয় বিগলিত হইল না। তখন সবে মাত্র আর দুই ঘণ্টাকাল ট্রেণের সময় আছে। জ্ঞান বিরহিত হইয়া জমিদার উন্মত্তের ন্যায় পত্নীর গা হইতে অলঙ্কারগুলি ছিনাইয়া লইলেন, তাহার পত্নীর সমস্ত শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল। প্রবল ধারায় রক্ত ছুটিতে লাগিল। জমিদারপত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মধুসূদন! আমার স্বামীকে রক্ষা কর। তাঁহাকে সুমতি দাও। তাঁহাকে আসন্ন মরণ হইতে উদ্ধার কর। চোখ দিয়া প্রবল ধারায় অশ্রুবারি ঝরিতেছিল, আর সেই পতিপরায়ণা সাধ্বী রমণী অনাথনাথ বিপদভঞ্জন দুর্গতিনাশন অগতির গতি একমাত্র ভগবানকে ডাকিতে ছিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ওগো, তুমি তোমার কন্যার আমার ত দুরের কথা, অন্নের সংস্থানও রাখিলে না।" জমিদার কিছুতেই শুনিলেন না। তখন লোভোন্মত্ত অবস্থায় তিনি আবার তাঁহার কন্যার দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, এবং জোর করিয়া তাহারও অলঙ্কারগুলি ছিনাইয়া লইলেন। কন্যা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার গাত্র হইতে প্রবল বেগে রক্ত ছুটিতে লাগিল। সে তখনই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। জমিদার বাবু তখন তস্করের ন্যায় দ্রুতপদ বিক্ষেপে ষ্টেশনাভিমুখে ছুটিয়া পলাইলেন। ট্রেণ ছাড় ছাড় এই অবস্থায় দ্রুত লম্ফ প্রদান করিয়া ট্রেণে উঠিলেন। ট্রেণ ষ্টেশন ছাড়িয়া কলিকাতা অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। জমিদার বাবুর আর কোনও চিন্তা নাই। কেবল মাত্র চিন্তা যে কতক্ষণে যাইয়া প্রাণ প্রতিমাকে অলঙ্কারগুলি দিয়া আবার তাহার সেই পুরাতন প্রেম ফিরাইয়া পাইবেন। কোন দিকেই তাহার লক্ষ্য নাই। চিন্তায় বিভোর হইয়া যাহজ্ঞানশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ট্রেণ কলিকাতায় আসিয়া পৌছিল। ভাবনার আতিশয্যে ট্রেণে ভুল ক্রমে সেই গহনার পুটুলিটি

রাখিয়া গেলেন। পতঙ্গ যেরূপ অগ্নি শিখার প্রতি একমন হইয়া ধাবিত হইয়া থাকে, কাহারও নিষেধ শোনে না, জমিদার বাবুর মন সেইরূপ তাহার সর্ব্বস্বান্ত কারিণী বারাঙ্গনার প্রতি ছুটিয়া চলিল। কোনরূপ বাহ্যজ্ঞান নাই। কিছুই আর মনে উদিত হইতেছে না। সরলা কন্যা ও সাধ্বী পত্নীর প্রতি সেই অমানুষিক নির্য্যাতন কিছুই তাহাকে প্রতিহত করিতে পারে নাই। জমিদারের মন, প্রাণ, দেহ সকলই ছুটিল, কেবল একটী স্থল লক্ষ্য করিয়া জমিদার তাহার সেই প্রণয় প্রতিমার ঘরে উঠিলেন। বলিলেন, "ওগো! দেখ দেখ, তোমায় কত ভালবাসি। আজ তোমার জন্য আমার সর্ব্বস্ব আনিয়াছি গ্রহণ কর। আর আমায় তাচ্ছল্য করিও না। একবার বল, আমায় ভালবাস।" ইহা বলিয়াই যেই গহনার পুটুলির কথা মনে পড়িল, তখন দেখিলেন, পুটুলি আর নাই। উহা তিনি ট্রেনেই ফেলিয়া আসিয়াছেন, তখনই উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইলেন। এবং ষ্টেশনের দিকে দৌড়াইয়া গেলেন। আতিপাতি করিয়া সমস্ত ট্রেণগুলি খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও সে পুটুলির সন্ধান পাইলেন না। ভগ্নোদ্যম ভগ্ন মনোরথ ও বিষাদমগ্ন হইয়া আবার সেই বারাঙ্গনা-গৃহে জমিদার বাবু প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহাকে দেখিয়া তাহার সেই আদরের বারাঙ্গনা সর্পিনীর ন্যায় তাহার প্রতি গর্জ্জন করিতে করিতে বলিল, কই, টাকা কোথায়? তুমি প্রতারক তোমার ভালবাসা সব বোঝা গিয়াছে, আমাকে আর জ্বালাতন করো না, এখনই দূর হও।" সহসা জমিদার বাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার পদদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, যেন ধরিত্রী তাহার পা হইতে সরিয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া আসিল। সহসা জমিদার বাবু চীৎকার করিয়া বলিল, "ওগো! তুমি না একদিন আমাকে সমস্ত হৃদয় দিয়াছিলে? বলিয়াছিলে যে, তুমি আমার জীবন পথের সহগামিনী হইবে। কই সে প্রতিশ্রুতি কোথায়? তুমি কি সেই রমণী, যার জন্য জমিদারি, অর্থ, পত্নী, কন্যা, যশঃ, মান সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছি, যার জন্য আজ ভিখারী হইয়াছি, যার জন্য কন্যার ভালবাসা, পত্নীর পাতিব্রত্য, বন্ধু-বান্ধবের প্রেম সব বিসর্জ্জন দিয়াছি! ওঃ! আমার চরম শাস্তি হইয়াছে, নরক কোথায়? আমাকে গ্রাস কর।" ঘাতকের তীক্ষ্ণ ছুরি কোথায় আমাকে হত্যা করুক।" হঠাৎ সেই বারাঙ্গনা চীৎকার করিয়া উঠিল, "ভণ্ড এখনই দূর হও।" সহসা রমণী রামচরণ, রামচরণ বলিয়া ডাকিল। সে তাহার পেয়ারের চাকর। সে এক সময় জমিদার বাবুর নিকট বহু বক্‌সিস্ পাইয়াছে। তখনই রমণীর আজ্ঞায় রামচরণ

প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ঘাড়ে ধরিয়া জমিদার বাবুকে বাহির করিয়া দিল। মনের গ্লানি এত অধিক হইয়াছিল যে, জমিদার বাবু তখনই বাটীর বাহির হইলেন। ও অবিলম্বে সুরা রাক্ষসীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আকণ্ঠ পুরিয়া সুরা পান করায় হঠাৎ মত্ততা আসিয়া গেল। রাজপথে মত্ততা হেতু রাজ পুরুষেরা তাহাকে ধৃত করিয়া থানায় লইয়া গেল। পরে তাহাকে আদালতে হাজির করিল। বিচারক তাহাকে কুড়ি টাকা জরিমানা অনাদায়ে সাত দিনের সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিলেন। সেই পুরাতন প্রবল প্রতাপ জমিদার হঠাৎ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অবশেষে যানযোগে হরিণ বাটী জেলে গমন করিয়া তথায় সশ্রম কারাবাস ভোগ করতঃ জেল হইতে বাহির হইলেন। ইতিমধ্যে কয়েক দিবস অনুপস্থিতির জন্য তাহার শেষ সম্বল চাকুরীও হারাইলেন। আত্মীয় স্বজন যে যেখানে ছিল সকলেই মুখ ফিরাইল। দীন দুঃখী ভিখারীর ন্যায় পথে পথে ভিক্ষা করিয়া যাহা অর্জ্জন করিতেন, তাহা দ্বারা অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেন। হায়, আজ কালের করাল গতি কে বুঝিবে! একজন প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার আজ সুখ দুঃখের চক্রের ঘূর্ণনে কি শোচনীয় অবস্থাই না প্রাপ্ত হইয়াছেন। দীন দুঃখী ভিখারীও আজ তাহা অপেক্ষা সুখী, কেন না পূর্ব্ব স্মৃতি তাহার চিত্তকে আলোড়িত করে না। দুষ্কৃতির কষাঘাত তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করে না। বিবেক তাহার আত্মাকে দগ্ধ করে না। আজ তিনি শত বৃশ্চিক কর্ত্তৃক দ্রষ্ট হইয়া জীবনের শত শত ক্ষুব্ধ উপাদানের সহিত বিশাল যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। শান্তি নাই, সুখ নাই, আছে কেবল নিরানন্দ, চারিদিকে তাহারই নিন্দাবাদ মনে হইল পৃথিবী ও নরক উভয়ই প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বলিতেছে দেখ দেখ, উভয়ই আমরা সমান। উভয়েরই ধ্বংসকারিণী শক্তি সমান। উভয়েই সমান প্রবল। মনে হইতেছে এ মুহূর্ত্তেই তাহার নশ্বর জীবনের শেষ হউক। কিন্তু পরকালের ভীতি পরকালের দুঃখ, পরকালের শান্তি তাহার সেই ইচ্ছাকে প্রতিহত করিয়া তুলিতেছে। মনে মনে ভাবিলেন, করিব কি করিব না। এই চিন্তাই তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। উন্মত্তবৎ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পূর্ণিমার রাত্রি, আকাশে নক্ষত্র উদিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। শরৎকাল আকাশে কোনই আবিলতা নাই। জমিদার বাবুর গ্রাম নিস্তব্ধ। রাত্রি চতুর্থ প্রহর। একটী কুটীর গৃহে একটী ভগ্ন খাটের উপর তাহার পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী শায়িতা। সমস্ত শরীর ফুলিয়া গিয়াছে। দৃষ্টিশক্তি মলিন, চক্ষে যেন রক্তের চিহ্ন নাই। গা যেন জ্বরের উত্তাপে পুড়িয়া

যাইতেছে। সংজ্ঞা পূর্ণ মাত্রায় লোপ হয় নাই। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওগো! একবার এসো, একবার বল যে তুমি আমায় মার্জ্জনা করেছ। আমি তোমায় তখন অলঙ্কার দেইনি, তাহার কারণ যথেষ্ট ছিল। যদি তার জন্য তোমায় দুঃখ দিয়া থাকি তবে স্বীয় গুণে আমায় ক্ষমা কর। আমি জ্ঞান হীন, যদি না বুঝিয়া কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে তুমি ছাড়া আমায় কে মার্জ্জনা করিবে। স্বামী হৃদয় দেবতা ইহকাল পরকাল দাসীর যথা সর্ব্বস্ব আমার হৃদয়ের ধ্রুবতারা! একবার এসো। একবার অন্তিমকালে তোমার দেবমূর্ত্তি আমায় দেখাও। আমি তোমারই পদধূলি ভবার্ণব পার হইবার একমাত্র পাথেয় লইয়া পরপারে যাই। তোমায় না পাইলে আমার মরণেও শান্তি নাই, সুখ নাই। মরণে নিরানন্দ চাহি না। আনন্দে মরিতে চাই।" পার্শ্বে একমাত্র কন্যা বসিয়া রহিয়াছে। তাহার গণ্ডদেশ দিয়া অশ্রুরাশি অবিরল ঝরিয়া পড়িতেছে। আর ফোঁপাই ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে আর ভাবিতেছে যে, তাহার জীবনের আজ সব চেয়ে যাহা শ্রেয়ঃ সব চেয়ে যাহা প্রিয়, মধুর শান্ত পবিত্র নিরবচ্ছিন্ন সেই অমূল্য মাতৃ-স্নেহ জনমের মত যে হারাইতে বসিয়াছে। গ্রাম্য ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন, ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, গৃহখানি যেন একটা বিকট নৈরাশ্যে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। মা ডাকিল, রমা! মা আমার! আমি চলিলাম, তবে দুঃখ রহিল যে, তাঁহার চরণ ধূলা নিয়ে মরিতে পেলেম না। আজ এই বৃহৎ গ্রামে এই রুগ্না অসহায় জমিদার পত্নীকে দেখিতে কেহই আসে না। জ্ঞাতি-বর্গ ত দূরের কথা, সামান্য এক প্রজা পর্য্যন্ত আসে নাই। আসিয়াছে জমিদার বাবুর কেবল মাত্র এক মামাত ভাই। তিনি আমাদের এই ডাক্তার বাবু। তিনি মনুষ্যরূপী দেবতা। আজ দুর্দ্দিনে জমিদার বাবুর অবর্ত্তমানে তিনি তাহার স্ত্রী ও কন্যার আহারের সংস্থান করিয়াছেন। তাহার পত্নীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঔষধাদি দিতেছেন, অর্থ ব্যয়াদিতেও কথঞ্চিৎ কার্পণ্য দেখান নাই। তবে তাহার দুঃখ যে, রোগিণীকে বাঁচাইতে পারিলেন না। রোগিণী অতি সত্বর কোন এক অজানা পথের পথিক হইবেন, ইহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। হায়, দুঃসময়ে কেহই সাথী হয় না। কেবল মাত্র এক জগদীশ্বর মানবের চিরসাথী। যে জমিদার বাটীতে একদিন লোকজন ধরিত না, কত প্রকারের লোক জমিদার বাবুর অভ্যুদয়ের সময় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিত, দুর্গা-পূজার সময় নানা স্থানের লোকসমাগমে যাহার অট্টালিকা এক সময় মুখরিত হইত, আনন্দের প্রস্রবণী যেখানে সতত প্রবাহিত হইত, আজ সেই স্থান জন-

মানবশূন্য ; এমন কি জমিদার পত্নীর সংবাদ লইবারও একটী প্রাণী নাই। হায় বিধাতঃ! তোমার চক্রের গতি কে রোধ করিবে? ইহা অতীব বিস্ময়কর। কাল প্রবাহ সতত বহিতেছে, কে তাহা বুঝিবে? কে গূঢ় সমস্যা ভঞ্জন করিবে? যাহার প্রভাবে রাজরাজ্যেশ্বর ভিখারী, ভিখারী রাজরাজ্যেশ্বর সে গূঢ়ত্বের মর্ম্ম কে বুঝিবে। কেই বা তাহার সমাধান করিবে? ইহার মীমাংসা একমাত্র সেই বিশ্ব-রচয়িতাই করিতে সম্যক্ সক্ষম। পূর্ব্বগগনে উষারাণী দেখা দিয়াছে। চাঁদ সারা রজনী বিশ্ব নিয়ন্তার আদেশ পালনে শ্রান্ত হইয়া অস্তাচলে শান্তি লাভ করিবার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আকাশের গায়ে দীপগুলি যেন নিভিয়া যাইয়া বিরাম লাভ করিতেছে। পূর্ব্ব গগনে উষাদেবী রক্তিম বসনে বিভুষিতা হইয়া ধরণীর পানে স্থির নেত্রে চাহিয়া তাহাকে অভিবাদন করিতেছে। প্রভাত বাতাস কম্পিত সরোবরে পদ্মিনী-বধুদিগের আনন্দের ক্রীড়া দেখিয়া অদূরে বৃক্ষশিরে পাখী গাহিতেছিল, "বউ কথা কও" "বউ কথা কও"। প্রকৃতি হাস্যময়ী, সেই আনন্দ উৎসবের মধ্যে কেবল মাত্র প্রতিফলিত হইতেছিল, একটা করুন নিরানন্দের দৃশ্য—সে সেই ভূতপূর্ব্ব জমিদারের পর্ণকুটীর, যাহাতে তাহার পতিব্রতা সহধর্ম্মিনী প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছিল।

হঠাৎ রমা তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার দুঃখের দুঃখী, ব্যথার ব্যথী সেই ডাক্তার বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভয় নাই, ভয় নাই! আমি তোমার একাধারে মাতাপিতা হঠাৎ বাহিরে মর্ম্মর ধ্বনি হইল।" সুরাপানে টলিতে টলিতে, অর্দ্ধোন্মত্ত সেই ভূতপূর্ব্ব জমিদার পর্ণ কুটীরে প্রবেশ করিলেন। বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ওগো ক্ষমা করো! ক্ষমা করো! মৃত্যুর পুর্ব্বে বলে যাও, তোমার হতভাগ্য স্বামীকে ক্ষমা করিলে।" জমিদার পত্নী আর কথা কহিতে পারিলেন না। ইঙ্গিত দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সহসা তাহার হৃদয়ের দীপালোক জনমের মত নির্ব্বাপিত হইল। জমিদার কাঁদিয়া উঠিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওগো, কোথায় যাও—আজ আমার প্রতিমা বিসর্জ্জন সর্ব্বশেষ। "বিসর্জ্জন, "বিসর্জ্জন বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, জমিদার বাবু কোন নিভৃত স্থানে চলিয়া গেলেন। কেহই আর তাঁহার সন্ধান পাইলেন না।

আনন্দময়ীর আগমনে।

লেখক—শ্রীযুক্ত হরিভূষণ রায়।

পূজোর ছুটিতে অবিনাশ বাবু বাড়ী এসেছেন, বাড়ীর ছেলে মেয়েদের কাপড়, জামা ইত্যাদি লইয়া আসিয়াছেন। অবিনাশ বাবু এম, এ, পাশ একটি বড় মার্চ্চেণ্ট আফিসে কাজ করেন, প্রায় মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন পান। এবার পূজোর Bonus নিয়ে প্রায় ১৫০০ টাকা পেয়েছেন, ও তা থেকে প্রায় ৫০০৲ টাকার কাপড় চোপড় ইত্যাদিতে খরচ করিয়া আসিয়াছেন। এ বৎসর তাঁর খরচের মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে, কারণ তাঁর স্বর্গীয় ভ্রাতার একমাত্র কন্যা মীনুর জন্য একখানি সাড়ীই তিনি ২০০৲ টাকায় কিনিয়াছেন। অবিনাশ বাবু তাঁহার ভ্রাতৃ বিয়োগ হওয়া অবধি আপনার পুত্র কন্যা অপেক্ষা মীনুকেই অধিক স্নেহ করিতেন। মীনুও তাঁর সবটুকু ভালবাসা দিয়ে জ্যাঠা বাবুকে সন্তুষ্ট করিত। মীনু তার পিতৃ-বিয়োগের কথা এখনও ভুলিতে পারে নাই। কারণ সে তবে দুইমাস গত হইয়াছে, তবে সে তার জ্যাঠা মহাশয়ের স্নেহ পাইয়া প্রায় তার পিতার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। মীনুর জ্যাঠা মহাশয়ের দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা পুত্র দুইটীর নাম যতীন ও শচীন, কন্যাটির নাম বীণা, ইহারা সকলেই মীনু অপেক্ষা ছোট; যতীন, শচীন ও বীণা সকলেই তাদের মীনু-দিদিকে ভালবাসিত ; এবং ভক্তি করিয়া সর্ব্বদাই তার নিকট হইতে সৎ উপদেশ লইত। মীনুর জ্যাঠাই মা ছিলেন একটু উগ্র স্বভাবের স্ত্রীলোক, ইহা ছাড়া অবিনাশ বাবুদের বংশের সকলেই স্নেহশীল ও বিদ্বান্। মীনুর পিতা স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় ছিলেন বাংলা দেশের একজন District Magistrate, গত দুই মাস পূর্ব্বে তিনি কলেরা ব্যাধি গ্রস্ত হইয়া ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন। জ্যাঠা বাবু বাড়ী এসেছেন, মীনুর আর আনন্দ ধরে না, জ্যাঠা বাবুও অনেক দিন পরে মীনুকে দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা। দেশের লোকজন সকলেই বলাবলি ক'র্‌ছে, "ওরে আমাদের বাঁড়ুয্যে বাবু এসেছেন, কত কি নিয়ে এসেছেন।" পরদিন রাত্রে মীনুর জ্যাঠা বাবু ও জ্যাঠাই মা ঘরে বসে কাপড় চোপড় দেখ্‌ছেন—কোন্‌টা কার, কত দাম, কিন্‌লে কবে?" ইত্যাদি প্রশ্ন চল্‌ছে, এমন সময়ে সেই ২০০৲ টাকার সাড়ী খানি দেখিয়া মীনুর জ্যাঠাই মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা! এ

সাড়ী খানা ঠিক্ আমার মনের মত কিন্‌লে কি করে বলত? সাধে কি বলি যে, আমার "ওনার" পছন্দ আছে!" অবিনাশ বাবু বল্‌লেন, "ওখানা আমার মীনুমার জন্যে কিনেছি, তোমার জন্যে নয় গো, ও তোমার জন্যে নয়।" গিন্নির মুখ "তোলো" হাঁড়িতে পরিণত হইল, কিছুক্ষণ বাদে বল্‌লেন, "ওমা! ও ছুঁড়ির জন্যে আবার অমন সাড়ী কেন্‌বার কি দরকার ছিল? ওকে ত একখানা কমদামী দিলেই হত। অপয়া ছুঁড়ি মরেও না ত। ঘাটে যাক না, আমার হাড় মাস জুড়োক মর্, মর্ আমি তা হলে পাঁচ পয়সার মানত দোব। ও ছুঁড়ির জন্যে আমার যে সব গেল গা! এত করে বলি, পোড়ার মুখী মরেও না ত? না:—কলিকালের দেবতাদেরও বিশ্বাস নেই, এত করে বলি কই "যম" তো ওকে নেয় না। আর তোমারি বা কি আক্কেল? বুড়ো হয়ে মর্‌তে চল্‌লে এখনও আপন পর জ্ঞান হল না? মীনু মা. মীনু মা করেই একেবারে অজ্ঞান। তোমায় নিয়েও আর পারি না, নিজের ছেলে মেয়ে গেল, পরের জন্যেই যত মাথা ব্যথা।" মীনু আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুন্‌ছিল, পর্ব্বত গাত্রে বিটপীকুল যেমন প্রবলবায়ু সঞ্চালনে বিকম্পিত হইয়া পুনরায় স্তব্ধ হয়", মীনুর আনন্দও আজ সেই অবস্থায় পরিণত হইল। মীনু তাহার জীবনে কখনও এরূপ ব্যবহার পায় নাই, সে মনের দুঃখে ও অভিমানে জ্যাঠা বাবুর আল্‌মারি হইতে কি যেন কিসের একটি শিশি বার করে নিঃশব্দে আঁচলের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মীনুর ছোট বোন্ বীণা লুকিয়ে সব দেখ্‌ছিল, সে দিদিকে শিশি নিতে দেখে তার দাদা যতীনকে ডেকে আন্‌লে। যতীন এসে মীনু দিদিকে দেখ্‌তে না পেয়ে মীনু দিদি বলে ডাক্‌তে লাগ্‌ল। যতীনের গলার স্বর শুনে মীনু যেন সন্ত্রস্ত হ'য়ে খিড়্‌কি থেকে বেরিয়ে এসে বল্লে "কি ভাই যতীন আমাকে ডাক্‌চিস্ কে রে? তোর বুঝি আবার মাথা ধরেছে? যে দুষ্টু হয়েছিস্ দিনরাত খালি রোদে ছুটোছুটি কর্‌বি ত আর মাথা ধর্‌বে না? মীনুর এ কথার অর্থ এই যে, যতীনের মাঝে মাঝে খুব মাথা ধর্‌ত, ও যতীন প্রায়ই মাথা ধরা মাত্রই তাহার মীনু দিদিকে ডাকিত, মীনু দিদি না কাছে থাক্‌লে তার কিছু ভাল লাগিত না। যাক্ এখন মীনু যেন তাকে সেখান হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতে পারিলে হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচে। যতীন মীনুর কথা শেষ হইতে না হইতেই জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি তুমি খিড়্‌কিতে কি কর্‌ছিলে বলত? চল দেখি ওখানে কি আছে।" মীনু প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যতীনকে আট্‌কাইতে পারিল না। সে দৌড়িয়া খিড়্‌কির দিকে গিয়া দেখিল, একটি ছোট শিশি

পড়িয়া আছে, উহার গায়ে লেবেলে লেখা আছে Acid sulphuric ও শিশিটার নীচে একটি ছোট লাল লেবেলে বাংলায় লেখা আছে "বিষ"। যতীন তৎক্ষণাৎ অবিনাশ বাবুর কাছে ঐ শিশিটি লইয়া হাজির করিল, ও সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল। অবিনাশ বাবু শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মীনু কোথায় গেল? মীনু দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছিল, জ্যাঠা বাবু ডাক্‌ছেন শুনে উত্তর দিলে "এই যে আমি জ্যাঠা বাবু!" অবিনাশ বাবু বেরিয়ে এসে বল্লেন, "মা এ সব তোর কি খেয়াল? কেন—তোর কিসের এত দুঃখ হ'ল যে বিষ খেয়ে মর্‌তে গেলি? বিষ খেয়ে মরে কারা? যাদের চাল্ চুলো নেই তারাই, তা মা তোর কে নেই যে, তুই বিষ খেয়ে মর্‌বি? তোর ছেলে এখনও বেঁচে আছে, তোর দুঃখ কিসের?" জ্যাঠা বাবু মীনুকে অনেক বুঝালেন ও আদর করে গালে ছোট্ট একটি চড় মেরে বল্লেন, "ছিঃ মা! ও রকম আর করো না, তুমি ও রকম করে বিষ খেয়ে মলে যে লোকে আমার বদনাম দেবে, এটা বুঝ্‌তে পার না, আর তুমি যে সে ঘরের মেয়েও নও, এ গাঁয়ের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তুমি সেই ঘরের মেয়ে এ কথা সব সময়ে মনে রেখো।" মীনু জ্যাঠা বাবুর কথায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে বাড়ার ভিতর চ'লে গেল। অবিনাশ বাবুও আর যাতে মীনু বিষ খেতে না পারে তার ব্যবস্থা কতকগুলি তালা ও চাবির দ্বারা সম্পন্ন করিলেন। এই ঘটনার পর হইতে মীনুর জ্যাঠাই মাও "ওনার" ভয়ে মীনুকে কিছু বল্‌তে সাহস পেতেন না। মীনু কিন্তু জ্যাঠাই মার সেই সকল ইতর ভাষা ভুলিতে পারেনি, প্রায়ই সে তাদের ঘরে ব'সে সেই কথা ভাবত আর গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। মীনুর মাঝে মাঝে মনে হইত, জ্যাঠা মশাইত এখনও বর্ত্তমান তার আবার দুঃখ কর্‌বার কি আছে? এইরূপে মীনুর দিনগুলি অতিবাহিত হইতেছিল। মীনু একদিন ঐরূপ গোপনে অশ্রুপাত করিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ তার মাতাঠাকুরাণী সেই দিকে অগ্রসর হইয়া মীনুকে কাঁদিতে দেখিলেন, এবং মীনুর অভিমানের কথা স্মরণ করিয়া তাঁরও চক্ষু দুটি সজল হইয়া আসিতেছিল। তিনি নিজ আঁচলের কোণে অশ্রু মুছিয়া বলিলেন, "ছিঃ মীনু! অত অভিমান কর্‌তে নেই; জানত ওরা ছাড়া আমাদের আর কেউ নাই, আর বড়ঠাকুরও তো আমাদের প্রতি কখনও মন্দ ব্যবহার করেন্‌নি। তিনি বরং তাঁর নিজের ছেলে মেয়েদের চেয়েও তোমাকেই অধিক স্নেহ করেন, গুরুজনের কথায় কি রাগ ক'র্‌তে আছে? তোমার জ্যাঠাই মা আমাদের গুরুজন, তাঁর কথায় যদি রাগ করি, সেটা আমাদের অন্যায় নয় কি? মীনু মা! আমার কথা শুন, তোমার ছোট

ভাই বোন্‌দের সঙ্গে খেলা করগে, মিছামিছি অত অভিমান কর্‌তে নেই।" মীনু অগত্যা মার কথা মত ছোট ভাই, বোন্‌দের নিয়ে খেল্‌তে গেল। মীনু কিন্তু খেল্‌তে গিয়ে আন্‌মনে থাকে, ও মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। হাব-ভাবে বুঝা যায় যে মীনু আর এক মুহূর্ত্তও এ পৃথিবীতে থাকিতে চাহে না। সে শুধু জ্যাঠা বাবু ও তার মার মুখ চেয়ে বেঁচে আছে। ক্রমে মীনুর পিতার মৃত্যুর দশ মাসের মধ্যেই এক উৎকট ব্যাধি মীনুর পরম আপন জন মাতৃদেবীকে সবলে ছিনাইয়া লইয়া গেল, অবিনাশ বাবু শত চেষ্টা করিয়াও ছোট বউমাকে বাঁচাতে পারিলেন না। মীনু গভীর শোকের মধ্যেও জ্যাঠা বাবুর সান্ত্বনা ও স্নেহ পাইয়া কোন রকমে প্রাণ ধারণ করে রইল। মীনুর মাতার মৃত্যুতে অবিনাশ বাবু শোকে অধীর হইয়া উঠিলেন, মীনুকে তিনি অনেক কষ্টে সান্ত্বনা দিলেন, অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখ মা! এ জগতে কেহ কারও নয়, সংসার শুধু মায়ার খেলা; যার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা কেহ খণ্ডন কর্‌তে পারে না।" এইরূপ অনেক সৎ উপদেশ তার নিকট ব্যক্ত করিলেন। ক্রমে মা আনন্দময়ীর আবার বাপের বাড়ী আসিবার সময় নিকটবর্ত্তী হ'ল, লোকের আনন্দ আর ধরে না, ক্রয় বিক্রয়ের ধুমধাম চল্‌ছে। মীনুর কিন্তু মুখে হাঁসি নেই, সদাই যেন কি ভাবে, আর মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে কাঁদে আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। মীনুর জ্যাঠা বাবু বাড়ী এসেছেন, তার জন্যে অনেক দামী সামগ্রীও এনেছেন। মহা ধূমধামের মধ্য দিয়া মা গৌরী বাপের বাড়ী এলেন। মা গৌরীর ষষ্ঠী পূজা দেখিয়া মীনু ও তাদের বাড়ীর সকলে রাত্রে বাড়ী ফিরিলেন। পরদিন প্রত্যুষে অবিনাশ বাবু শয্যা ত্যাগ করিয়া মুখ হাত ধুইতে বাহির হইলেন, বাহিরে আসিয়া সদর খোলা দেখিয়া, ছেলেদের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখেন, ওদেরও ঘর খোলা। ভিতরে গিয়া তিনি মীনু ছাড়া আর সকলকে শয্যায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন দেখিলেন। মীনুকে না দেখিয়া তিনি প্রমাদ গণিলেন; হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি মীনুর বিছানায় এক টুক্‌রা কাগজের উপর পড়িল; ব্যস্ত হইয়া তিনি কাগজখানি উঠাইয়া লইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি দুই হস্তে আপন মস্তক চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। সমস্ত পূর্ব্ব ঘটনা তাঁহার মানস পটে ছবির ন্যায় ফুটিয় উঠিতে লাগিল। তাঁহার নিজেরই অজ্ঞাতসারে তাঁর চোখের কোণ হইতে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়া তাঁহার হস্তস্থিত ক্ষুদ্র পত্রখানিকে সিক্ত করিল। তিনি

সবলে পত্রখানিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া উদাস নয়নে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আজ আমি সত্যই মাতৃহারা হইলাম। অবিনাশ বাবু আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—তাঁহার জ্ঞানহীন দেহ মেজের উপর লুটাইয়া পড়িল। শারদীয় সপ্তমীর রঙ্গিন উষার আলো খোলা জানালা দিয়া তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। আর ঠিক সেই সময়ে নিকটস্থ রায় বাটী হইতে মায়ের বোধনের করুণ সানাই বাজিয়া উঠিল,—"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে।"

"সর্ব্বসহা জননী আমার"।

লেখক—শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

(১)

মাগো!

বলেদে মা কোনরূপে পূজিব তোমার।
কতরূপে বিরাজিত জননী আমার॥
প্রসূতি রূপেতে সহ দুঃসহ যাতনা।
ক্রোড়ে শিশু হাসে মাগো প্রসন্ন বদনা॥

(২)

সর্ব্ব সহা পৃথ্বী রূপে হেরি মা তোমারে।
ভূধর কন্দর কত আছ বুকে ধ'রে॥
নদ নদী অগণন দয়ার সরসী।
ক্ষরিছে চাঁদের সুধা, সুধা মাখা হাসি॥

(৩)

জ্ঞানদা মোক্ষদা মাতা জ্ঞানবিধায়িনী।
শান্তি রূপা শান্তিময়ী আনন্দদায়িনী॥
সর্ব্ব-রূপ-সমাধান গোমাতা রূপেতে।
জীবের কল্যাণ হেতু আসিব নাশিতে॥

(৪)

কিবা রূপ অপরূপ জননী তোমার।
সন্তানবৎসলা মাগো দয়া অনিবার॥
দয়ার বিরাম নাই ঢালিতেছ সুধা।
জীবের জীবন রূপে হরিতেছ ক্ষুধা॥

(৫)

সঞ্জীবনী ক্ষীর রূপে অমৃতের ধারা।
বিতরিছ অবিরত নহেক কাতরা॥
হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার নাহিক জননী।
অতি শান্ত সুনির্ম্মল শান্তি প্রদায়িনী॥

(৬)

ধ'রেছ মা দেহ ভার পরহিত তরে।
জীবনের মহা-ব্রত পর উপকারে॥
নাহি স্বার্থ, পরমার্থ শুধু তব ঠাঁই।
নমামি চরণে মাগো ভগবতী গাই!

(৭)

বৈরাগ্য আধারে তব একি ভালবাসা!
আপনার সুখ তরে নাহি কর আশা॥
সহিছ কতই ক্লেশ সন্তানের তরে।
নাহি ব্যথা, নাহি খেদ প্রশান্ত অন্তরে॥

(৮)

হাম্বা হাম্বা রব করি বলিছ সদ্যই।
আসরে বাছনি মোর কোন ভয় নাই॥
থাকিতে জননী আমি কি ভয় সন্তানে।
সহিতে পারিব সব তোদের কারণে॥

(৯)

চাহিনাক সুখলেশ বিলাসবাসর।
সন্তান পালনে মাত্র চাহি অবসর॥
কি ভয় কি ভয় তার আমি আছি যথা;
স্বাস্থ্য, সুখ, অবিরাম বিরাজিত তথা॥

আগমনী।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

সুনির্ম্মল নীলাকাশে, স্থানে স্থানে মেঘ ভাসে,
স্তূপীকৃত তুলার মতন।
জননীর নখজ্যোতিঃ, অমল চন্দ্রমা দ্যুতি,
মনে হয় জলদেরগণ॥
শেফালি কুসুম চয়, কিবা অবনত হয়,
ধরাপরে লুটিয়া লুটিয়া।
সবুজ ধানের গাছে, শিশির দুলিয়া আছে,
জননীর অর্ঘ্য সাজাইয়া॥
কমল কুমুদ ফুল, শত সুষমার মূল,
মায়ের চরণতল ভাতি।
গুঞ্জরে মধুপ বৃন্দ, ফুলে ফুলে মহানন্দ,
চুম্বিতেছে প্রেমানন্দে মাতি॥
অম্বুদের গরজন, যেন মার আবাহন,
শুনিতেছি গম্ভীর সুতানে।
এস মা শারদে উমে! ওমা হর-মনোরমে!
গণপতি কার্ত্তিকের সনে॥
বিঘ্নহারী গজানন, কর বিঘ্ন বিনাশন,
বরাভয় করে এস হৃদে।
কমল-আসন প'রে, বস দেব কৃপা ক'রে,
হেরি আমি দুনয়ন মুদে॥

বিড়ালের তপস্যা।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

বসিয়া রন্ধনশালে ধবল ধরণী।
চোখ বুঁজি মিটি মিটি ভাবিছে গৃহিণী॥
বড়ই বাসেন ভাল মাছের মুড়াটী।
কেমনে লইব তাহা অতি পরিপাটি॥
ভাজা পেটি কয়খানি রেখেছে গোপনে।
আমি জানি, যাক্ বেটী মসলা সন্ধানে।
তখনি করিব চুরি, এত ভাবি মেনি
কঠোর তপের হ্রদে মজিল তখনি॥
গৃহিনী চলিয়া গেল মসলা পিশিতে।
ধবলী উঠিল ত্বরা মুড়াটী খাইতে॥
মুড়াটী লইয়া যেই হইল বাহির।
দৃষ্টিতে পড়িয়া গেল পাগলা টেমির॥
"ঘেউ ঘেউ" রবে টেমি ধাইল ত্বরায়।
ভীত হ'য়ে মেনি মুড়া ফেলিয়া পলায়॥
গিন্নি আসি দেখি জলে, অগ্নির আকার।
লৌহ হাতা ফেলি মারে পৃষ্ঠেতে তাহার॥
ঘেউ ঘেউ রবে টেমি করিল প্রস্থান।
সেই অবকাশে মেনি রান্নাঘরে যান॥
দুটী চোখ মুদি চাহে মাছের পেটিতে।
গিন্নি আসি ঝাঁটা ফেলি লাগিল পিটিতে॥
শশব্যস্তে ধায় মেনি চুল নাহি বাঁধে।
মুড়াটি যাওয়ায় গিন্নি অবিরত কাঁদে॥

মণিরহস্য।

পৌরাণিক উপাখ্যান

লেখক—শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

কাব্যরত্নাকর।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

অক্রুরের এই কথা শ্রবণ করিয়া শতধন্বা কহিলেন, "আচ্ছা তাহাই হইবে।" ইহার পরই শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে দেখিবার জন্য বারণাবত নগরে গমন করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি হেতু পাপিষ্ঠ শতধন্বা সুপ্ত সত্রাজিৎকে বধ করিয়া স্যমন্তক মণিরত্নটি গ্রহণ করিলেন। হায় ধনাশা! তুমি মানবকে দানবে এবং দানবকে পিশাচে পরিণত কর। তুমি না পার এমন কর্ম্মই নাই।

দেবী সত্যভামা পিতৃবধ-জনিত-শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া ত্বরায় রথারোহণে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন পূর্ব্বক পাপিষ্ঠ শতধন্বার আচরণ এবং পিতার নিধন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে শোক পরিত্যাগ কর! আমি দুরাত্মা শতধন্বার শাস্তি বিধান করিতেছি।" এই বলিয়া ত্বরায় রথারোহন পূর্ব্বক সত্যভামাকে লইয়া দ্বারকায় আগমন করিলেন।

অনন্তর নির্জ্জনে বলদেবকে লইয়া কহিলেন, মৃগয়াগত প্রসেনজিৎ সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হইলে ঐ মণি আমি সত্রাজিৎকে আনিয়া দিয়াছিলাম, এক্ষণে ঐ স্যমন্তক মণি দুরাত্মা শতধন্বার অধিকারে রহিয়াছে, পাপিষ্ঠ শতধন্বা সুপ্ত সত্রাজিৎকে নিহত করায় তাহার পাপাস্পর্শ ঘটিয়াছে, সুতরাং উহার নিকট ঐ মণি থাকিতে পারে না। আসুন আমরা পাপীর দণ্ড বিধান করিয়া স্যমন্তক মণি গ্রহণ করি।

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে বলদেবও তাহা স্বীকার করিলেন। এদিকে শতধন্বা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উদ্যোগ জানিতে পারিয়া ভয়ে কৃতবর্ম্মার নিকটে গমন করিয়া তাঁহার সাহার্য্য প্রার্থনা করিলেন। কৃতবর্ম্মা কহিলেন, "রাম-কৃষ্ণের সহিত আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না।"

তখন শতধন্বা অক্রুরের সাহার্য্য প্রার্থনা করিলেন। অক্রুর কহিলেন, "জগতে

এমন কেহই নাই যে, রাম-কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে সমর্থ হয়। আমার ত সাধ্যই নাই, আপনি অন্যত্র শরণ প্রার্থনা করুন।

অক্রূর এই কথা বলিলে শতধন্বা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বলিলেন, "আপনি যদি আমাকে রক্ষা করিতে না পারেন তবে মণিটি রক্ষা করুন।" অক্রূর কহিলেন, "তা পারি; কিন্তু আপনি এই মণির কথা আমরণ প্রকাশ করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করুন।"

শতধন্বা "তাহাই হইবে" বলিলে, অক্রূর স্যমন্তক মণিটি গ্রহণ করিলেন। শতধন্বাও একটি শত যোজন বাহিনী ঘোটকীতে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। চতুরশ্ব যোজিত স্যন্দনে আরোহণ করিয়া রামকৃষ্ণও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন।

সেই বড় বা শত যোজন পরিমিত পথ অতিক্রম করিয়া মিথিলার বন সমীপে প্রাণত্যাগ করিলে, শতধন্বা পদব্রজে পলায়ণ করিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও দুই ক্রোশ মাত্র অতিক্রম করিয়া চক্র দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। কিন্তু তাঁহার বস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিয়াও সেই মণি প্রাপ্ত হইলেন না। তখন বলরামের নিকট গিয়া কহিলেন, "বৃথাই শতধন্বাকে বিনাশ করিলাম। কিন্তু অখিল সংসারের সারভূত মণিরত্নটি পাইলাম না।"

বলরাম শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া কোপ সহকারে বলিলেন, "তোমাকে ধিক্। তুমি অর্থ লিপ্সু ভ্রাতা বলিয়া তোমার অপরাধ ক্ষমা করিলাম। এই পথ দিয়া তুমি যেথায় ইচ্ছা চলিয়া যাও। তোমায় বা বন্ধুবর্গে আমার কোনও কার্য্য নাই। কেন তুমি আমার সম্মুখে অলীক শপথ করিতেছ?"

বলদেব এই প্রকারে তিরস্কার করতঃ বিদেহ পুরীতে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নানা প্রকারে প্রসাদ্যমান হইয়াও সেখানে অবস্থিতি করিলেন না। বলরামের এই প্রকার সংশয় জ্ঞাত হইয়া ভগবান দ্বারকায় গমন করিলেন।

বিদেহরাজ জনকঋষি বলদেবকে সাদরে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক নিজ গৃহে প্রবেশ করাইলেন। এদিকে দুর্য্যোধন বলদেবের নিকটে আগমন পূর্ব্বক গদা যুদ্ধ শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিন বৎসর পরে বভ্রু, উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ "শ্রীকৃষ্ণ সেই রত্ন গ্রহণ করেন নাই," ইহা জ্ঞাত হইয়া বিদেহ পুরে গমন করতঃ বলদেবের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন।

এখানে অক্রূর ও মণি-সম্ভূত স্বর্ণ দ্বারা অনেক যাগ যজ্ঞ ব্রত দান ধ্যান করিতে

লাগিলেন। এই মণি-রত্নের প্রভাবে দ্বারকায় অকাল মৃত্যু দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি হইত না।

অনন্তর অক্রূর পক্ষীয় ভোজগণ সাত্বতের প্রপৌত্র শত্রুঘ্নকে বিনাশ করিলে, ভোজগণের সহিত অক্রূরও পলায়ন করিলেন। অক্রূরের পলায়নের পর দিবস হইতেই দ্বারকায় অনাবৃষ্টি, মারীভয়, হিংস্র জন্তুর উপদ্রব প্রভৃতি উপস্থিত হইল। তখন রামকৃষ্ণ ও উগ্রসেন প্রভৃতি ভাবিতে লাগিলেন, একি? অক্রূর দ্বারকা ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই এরূপ মহদনর্থ উপস্থিত হইল কেন? ইহার কারণ কি?

অন্ধক নামক জনৈক যদু বৃদ্ধ কহিলেন, "এই অক্রূরের পিতা শাকল্য যেখানে বাস করিতেন, সেইখানে কোনও সময়ই অনাবৃষ্টি আদি হইত না। সেই পুণ্যবান পিতা এবং পুণ্যবতী মাতা গান্দিনীর সন্তান অক্রূর। ইহার অনুপস্থিতি হেতু এই সমস্ত ঘটিতেছে। অতএব সকল অপরাধ বিস্মৃত হইয়া অক্রূরকে দ্বারকায় আনয়ন করুন।

অন্ধকের বাক্য শ্রবণে বলদেবাদি যাদব মুখ্যগণ অক্রূরকে অভয় প্রদান করতঃ দ্বারকায় আনয়ন করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত উৎপাতের প্রশান্তি ঘটিল। ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পরম চক্রী, তিনি চিন্তা করিয়া বুঝিলেন, স্যমন্তক প্রভাবেই এই সকল ঘটিতেছে। নতুবা অক্রূর সামান্য ব্যক্তি হইয়া যজ্ঞ ব্রতাদি করিলেন কিরূপে? ইহার নিকটই স্যমন্তক মণি রহিয়াছে, ইহা নিশ্চিত।

ইহা ভাবিয়া প্রসঙ্গ ক্রমে পরিহাস পূর্ব্বক অক্রূরকে কহিলেন, "হে দানপতে! আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি যে, শতধন্বা স্যমন্তক মণিটি—আপনাকে প্রদান করিয়াছে! আপনি সেই মণিটি আমাদিগকে দেখান, কারণ লোকের বিশ্বাস দৃঢ়মূল হউক।"

অক্রূর ভগবানের বাক্ কৌশলে পরাজিত হইয়া সেই রত্নটি দেখাইলেন। এবং বলিলেন, "এই রত্নটি কাছে থাকায় এ কাল বড়ই শঙ্কায় কালহরণ করিতে ছিলাম, এক্ষণে উহা আপনি গ্রহণ করিয়া আমাকে ভার মুক্ত করুন।"

শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অক্রূরের বাক্য শ্রবণে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। সত্যভামা স্বীয় পিতৃ-ধন ভাবিয়া মণিটি গ্রহণে সস্পৃহ হইলেন, এবং বলরাম ও অপূর্ব্ব মণিটি গ্রহণাভিলাষী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মনোভাব পরিজ্ঞাত হইয়া কহিলেন, "এই মণি শুচি ও ব্রহ্মচর্য্য ধারারই ধারণ করা উচিত। সুতরাং সত্যভামা ও বলভদ্র উহা ধারণ করিতে অসমর্থ। অথচ সত্যভামা ব্যতিরেকে উহার

উত্তরাধিকারী কেহই নহেন। কিন্তু অশুচি হইয়া উহা ধারণ করিলে, ধারণ কর্ত্তার প্রাণ বিনাশ করে। অতএব হে অক্রুর! আপনিই উহা ধারণ করুন। উহাতে যাদব কুলের এবং দ্বারকাবাসীর মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল হইবে না। আমার কলঙ্ক প্রক্ষালনার্থে আপনাকে ঐ মণি দেখাইতে বলিয়াছি, অন্যভাবে মনে করিবেন না। যাদবসমাজে আমার বৃথা কলঙ্ক দূরীভূত হইল। আপনি সানন্দে ঐ মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া সূর্য্যসম তেজস্বী হউন।”

ভগবানের বাক্য সকলেই সানন্দে অনুমোদন করিলেন। মহামতি অক্রুরও পুনর্ব্বার স্যমন্তক মণি ধারণ করিয়া হৃষ্ট হইলেন।

ভগবানের এই মিথ্যা অপবাদ ক্ষালন বৃত্তান্ত যে ব্যক্তি শ্রবণ করিবেন, তাহার কোনও কালে অল্প মাত্রও মিথ্যাপবাদ হইবে না। তাহার ইন্দ্রিয় অব্যাহত থাকিবে, এবং সে সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

আবাহন গীত।

হাম্বির—চিলে তেতালা।

এস মা এস মা উমা মহেশ হৃদি বাসিনী।
কাতরে সন্তান তোরে, ডাকে মা দিবা রজনী॥
গজানন উপর ষড়াননে,
কোলে করি জয়াসনে,
তুষিতে ভক্তজনে এ'লো লক্ষ্মী বীনাপাণি।
করুণা নয়নে হের, ত্রিনয়নে শিবরাণী॥

শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল বা কালকেতু।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

তৃতীয় অঙ্ক।

অষ্টম দৃশ্য—মুরারি শীলের বাটী।

মুরারি। (গিন্নির প্রতি) দেখ, ঘরকন্না কর্ত্তে গেলে খুব ভেবে চিন্তে তোমার গে খরচ পত্র কর্ত্তে হয়। আমার পিতামহ স্বর্গীয় লক্ষ্মীকান্ত শীল মহাশয় মাসের মধ্যে একদিন মাছ কিন্‌তেন। তাতে তাঁর পাঁচদিন স্বচ্ছন্দে কেটে যেত।

গিন্নি। বল কি? পাঁচ দিন যেত? তিনি মাছের নস্যি নিতেন নাকি?

মুরারি। নস্যি নয়, নস্যি নয়। তবে শোন তোমার গে। যেদিন মাছ কিন্‌লেন সেদিন আঁশ, ফুল্‌কো, কাঁটা, এই সব খেয়েই কেটে গেল, তোমার গে। পরদিন দুই চারিখানি মাছ রাধলেন, কিন্তু কেবল ঝোলটুকু দিয়েই এক পাথর অন্ন সেবা কর্‌লেন। তার পরদিন একখণ্ড মাছ, তাও খণ্ড খণ্ড করে এক টুক্‌রো দিয়েই খেলেন, তোমার গে। কদিন হ'ল?

গিন্নি। তিন দিন।

মুরারি। আর দুটো দিন একটু অম্বল ক'রে এক দিন ঝোলে চল্‌লো, আর একদিন সব শুদ্ধ খেয়ে বল্‌লেন, “আজ কেবল মাছ ভাজা মাছের ঝোল, মাছের অম্বল এই ত্রিবিধ ব্যঞ্জনেই উদর পূর্ণ হ'লো; দুধ, দই, ক্ষীর খেতে পারাই গেল না।

গিন্নি। ঘরে দুধ ছিল তো?

মুরারি। গাই ছিল না। গাইএর মত একটা এঁড়ে ছিল, তোমার গে! আমার পিতৃদেব অকালে ৺কাশী প্রাপ্ত হ'লেন, সেই শোকে বৃদ্ধ পিতামহ দেবও বৃন্দাবন গমন কর্‌লেন তোমার গে। দুগ্ধ ছিল বৈকি!

গিন্নি। এঁড়ে ছিল বল্‌ছো, তা সেটা আবার গাইএর মত। এর মানে কি ?

মুরারি। এটাও বুঝ্‌লে না গিন্নি! মাকুন্দ চোপা পুরুষ মানুষ, যেমন মেয়েলি ধরণের। সেটাও তাই ছিল, তার ঝুঁট ছিল না। তোমার মত কটাক্ষপাত কর্‌তো; ঠিক অই অমনি তোমার গে।

গিন্নি। এ্যাঁ, আমি তোমার দিকে এঁড়ে চোখে চাই ? বটে, বটে, আচ্ছা রোসো। ঝাঁটা গাছটা কতদিন নিরামিষ পড়ে আছে, ঝেড়ে দিই। (গমনোদ্যত)

মুরারি। আর এ তোমার গে একি কাণ্ড হচ্ছে ? সবুর, সবুর। শোন শোন, তোমার গে। (ফিরাইতে চেষ্টা)

গিন্নি। আরে মিন্‌বে! আমার বয়স না হয় তো বড় জোর এক কুড়ি, আধ কুড়ি। তোমার যে তিন কুড়িতে পা দিলে। মাথাতে-পান্তর মাঠের মতন বিরাট টাক প'ড়্‌লো। এখনো রস ?

মুরারি। রস তোমার গে, ঐ তিন কুড়িতেই ঝরে। মুখে লাল পড়ে, তোমার না আমার ? আধ কুড়ি তোমার গে আধ কুড়ি! দশে পা দিলেই ঐ দশা! তা তুমি আমার—তোমার গে—তোমার গে—আধ কুড়ি।

গিন্নি। আর তোমার গে! "তোমারগের" জ্বালায় অস্থির। আমি আধ কুড়ি কেন হ'বো ? আমার কি দায় পড়েছে ? ভাল দেখে একটা আনগে। আমি এখন বাসি ঝুনো, কালো বুনো, খাই দুনো আমাকে কেন মনে ধরবে ? বেশ আমি আজ বাপের বাড়ী চলে যাচ্ছি। তোমার বুকের ভাত নামুক। (পা দুটি ছড়াইয়া) বসিল, এবং উচ্চৈস্বরে বলিল) "ওগো! গো! কোথা আছ গো। তোমার দুঃখনী মেয়ের দশা দেখে যাও গো," বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মুরারি। (নিরুপায় ভাবে) হায়, হায়, হায়! তোমার গে. একি হোলো ? তোমার গে একি বিভ্রাট কাণ্ড বাধালে দেখেছো ? দ্বিতীয় পক্ষের কিনা! একটু বেশী তোমার গে অভিমানী। (হাত ধরিয়া) গিন্নি! ক্ষমা চাই তোমার গে।

গিন্নি। না আমি কে ? আমার কাছে কেন ? আধ কুড়ির কাছে যাও।

মুরারি। ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা না হ'লে নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ বিধি। দেখি তোমার গে। নারায়ণাস্ত্র দ্বারা কি হয় ? (পদ ধরিতে গেলে) গিন্নি! আমি তোমার, তোমার গে পোষা কুকুর ক্ষমা।

গিন্নি। (হাসিয়া) হয়েছে, হয়েছে। (নেপথ্যে "খুড়া বাড়ীতে আছ," বলিয়া কালকেতু ডাকিতেছেন)। দেখ, পোদ্দার! তোমায় কে ডাক্‌ছে। বোধহয় কালু এসেছে।

মুরারি। এইরে মলো.! ছোঁড়াটা তোমার গে বড়ই সেয়ানা। তা দেখ, আমি লুকুই! তুমি বলো বাড়িতে নেই। মাংসের দাম কত পাবে গা।

গিন্নি। দেড় বুড়ি। (পুনরায় "খুড়ো আছ" শব্দ) যাও যাও শোওগে, এসে পড়্‌লো যে।

[মুরারির প্রস্থান।

(কালকেতুর প্রবেশ)।

কালকেতু। খুড়ি মা প্রণাম। খুড়ো কই ?

গিন্নি। পোদ্দার ত বাড়িতে নেই বাবা সেই সকালে উঠেই খাতক পাড়া গেছেন তাগাদা কর্ত্তে। তা তোমার মাংসের দাম্‌টা কাল নিও বাবা!

কালকেতু। তার জন্যে আসিনি। একটা আংটি ভাঙ্গাব। তা খুড়ো ত নাই অন্যত্র যাই।

গিন্নি। বাবা একটু বিলম্ব কর। এই এলো বলে। আস্‌বার সময় হ'য়ে এসেছে। দেখি অঙ্গুরীটি কেমন বাবা!

(কালকেতু অঙ্গুরী দেখাইলেন)

(মুরারি শীলের হরপী তরাজু হস্তে প্রবেশ)।

গিন্নি। অঙ্গুরী দেখিয়া) এ অমূল্য নিধি। এমন জলুষ আর কখন দেখিনি। এই যে এয়েছ। এখুনি তোমার নাম কচ্ছিলাম। দেখ দেখি আংটিটি কেমন! (প্রদান)

মুরারি। কি গো ভাইপো যে। আজকাল আর তোমাকে দেখ্‌তে পাইনে কেন বাপ! তোমার গে।

কালকেতু। খুড়ো আমরা হলাম গরীব মানুষ। সকালে উঠে শিকারে যাই, সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরি। চার পহর যায় বনেই। ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়ি। বেড়াতে সময় পাইনে। তা খুড়ো এই আংটিটি ভাঙ্গাতে এসেছি, ইহার উচিত দাম ক'রো।

(অঙ্গুরী প্রদান)

মুরারি। দেখি, (তৌল যন্ত্রে কুঁচ ইত্যাদি চড়াইয়া) এই গোলো রতি দুই ধান হ'লো বাপ্। এর দাম হচ্ছে রতি প্রতি দশ গণ্ডা কড়ি। তা হ'লে দশ যোলম্ একশ ষাট গণ্ডায় আট আনা, আর দুই ধানের দাম পাঁচ গণ্ডা, একুনে হ'লো সওয়া আট আনা। আর তোমার পিছলা বাকি দেড় পয়সা, সর্ব্ব মোট আট আনা আড়াই পয়সা। তা সব কড়ি না লও, কিছু খুদ কিছু কড়ি নিতে পার। তোমার গে।

কালকেতু। (স্বগতঃ) এর এই মূল্য? তা হ'লে সাত ঘড়া ধনেরই বা কি মূল্য? সব মিথ্যা। সব মিথ্যা। (প্রকাশ্যে) খুড়ো কড়িতে কাজ নাই। অঙ্গুরী দাও। যিনি এ অঙ্গুরী দিয়েছেন, তাঁকেই ফিরে দেব। এঁ্যা—এত কম মূল্য?

মুরারি। আরে বাবা রেগো না রেগোনা। এ জিনিষটা কি জান? সোনা সোনাও নয় রূপোও নয়; এ হচ্ছে বেঙ্গী পিতল। মেজে ঘসে একটু উজ্জ্বল করেছ বৈত নয়। তা আমার সঙ্গে তঞ্চক হবে না। পাঁচ বট বাড়িয়ে দিলাম নাও। তোমার গে কাঁহাতক কচ্লান্ত করি।

কালকেতু। না খুড়ো, আমি এ রকম চাইনে। আমাকে অঙ্গুরিটি দাও, আমি অন্যত্র যাই।

মুরারি। আরে বাবা কালু! অন্যত্র গেলেই কি দাম বাড়বে? আমার সঙ্গে ধর্ম্মকেতুদার অনেক দিনের লেনা দেনা। মাংস দিয়েই যাচ্ছে দিয়েই যাচ্ছে। আমি বলি, দাম নাও হে। তিনি বলেন, "তুমি কি আমার পর? নিলেই হবে একদিন। তা সেই বাপের বেটা তুম! অতি সজ্জন! অতি সজ্জন। আচ্ছা, তুমি যখন ক্ষুণ্ণ হচ্ছো, তখন আর কিছু বাড়িয়ে দিচ্ছ নাও। আড়াই বুড়ি বাড়িয়ে দিলাম। তা হ'লে তোমার গে হলো গিয়ে মোট নয় পণ মাত্র। বুঝেছ বাপ্।

ক্রমশঃ।

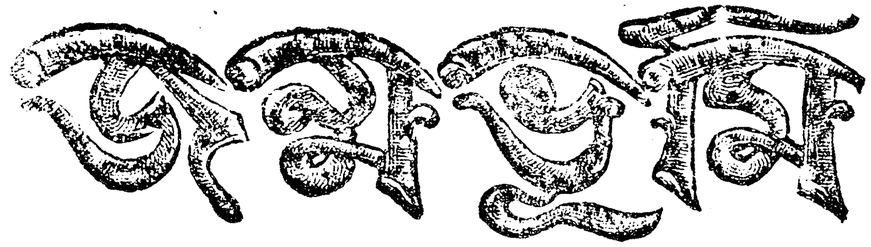

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৬শ বর্ষ } ১৩৩৭ সাল, কার্ত্তিক। { ৭ম সংখ্যা।

বিজয়া দশমীর দিনে।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।
কাব্যরত্নাকর।

হায়! হায়! একি আজি হ'ল!
গত হ'ল তিন দিন, ক্রমে সুর হ'ল ক্ষীণ,
সানাই বিষাদ-গীতি গাইতে লাগিল॥
এত ত্বরা এত সুখ আজি ফুরাইল?
বিধবা বসন প্রায়, উৎসব ভবন হায়!
বিমলিন শোকদিগ্ধ শত স্মৃতি-মাখা;
সন্ন্যাসের চিহ্নটুকু সর্ব্ব-অঙ্গে-আঁকা!
"আবার এসমা বলি", নত নেত্রে কৃতাঞ্জলি,
দাঁড়াইল পুরবধূ দ্বার-অন্তরালে।
বরণ হইল শেষ, ব্যাপিল সুরের রেশ,
বিদায়! বিদায় শুধু দিক্ চক্রবালে!
গিয়াছে বিজয়া আঁকি, শোক-দিগ্ধ "রাখী" রাখি,
যাহার হৃদয় তটে কাঁদে সে বিহ্বল!

প্রতিমার ম্লান মুখ, হেরিয়া ফাটিছে বুক !
কত কথা মনে উঠে আজি অবিরল !
কবে কোন্ আদিকালে মেনকা ভবনে।
এসেছিল কন্যা তাঁর,
তিন দিন মা আমার,
রেখেছিল মহানন্দে সে সুখ-সদনে ॥
গিয়েছিল দশমীতে কৈলাস-ভবনে।
সেই পরিম্লান উমা মেনকার প্রাণে—
কি ব্যথা জাগায়ে দিয়ে, চলে গেল হাসি নিয়ে,
ঝরিল শেফালি কলি ,বিষাদের গানে—
পূরিল হেমন্ত গেহ, সেদিন স্মরণে—
আজিও মাতার আঁখি, বিষাদ শিশির মাখি'
ঝরে যথা—শ্রাবণের জলধরগণ—
ধারাবারি প্রদানিয়া করয়ে ক্রন্দন।
আমারো জীবনে মাগো মেনকা নন্দিনি !
তিনদিন গেছে সুখে, ছিনু গৃহে হাসি মুখে
রেখেছিলে প্রিয়াসনে আনন্দ দায়িনী—
আজি কোথা হৃদয়ের ফুল্ল সরোজিনী ?
এই সবুজের ঘ্রাণে, কত সুখ দিত প্রাণে,
সোহাগে সেফালি ফুলে—গাঁথিয়াছি দাম।
বিনিময়ে চম্পকের, গাঁথি মাল্য সোহাগের,
পরায়েছে প্রিয়া মোরে চিরানন্দ ধাম !
আকাশে বাতাসে মধু বরষিত শুধু—
কোথা আজি হৃদাকাশ আলো করা বিধু ?
বিজয়ার ব্যথা ভরা
পরাণ উদাস করা
বাজিছে সানাই আজি কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
আসিছে ভকত দেবী বিসর্জ্জন দিয়া ॥
শূন্য বেদী হেরি সবে ক্ষুণ্ণ মনে বসি

ভাবে যেন কত কিছু
গেছে প্রতিমার পিছু
আনন্দ উৎসাহ হাস্য মুখে লিপ্ত মসী—
হেরে সবে ক্ষুণ্ণ মনে শূন্য বেদী বসি'
আমিও দ্বারকা নীরে দিছি' বিসর্জ্জন
জীবনের শান্তিলতা শ্রান্তি বিনোদিনী
পঞ্চ ভূতাত্মক কায়
ভস্মীভূত দ্বারকায়
তারাপুরে ; সর্ব্বহরা কপর্দ্দী কামিনী
নিয়েছেন স্নেহ-অঙ্কে, করেছে বর্জ্জন—
চিরতরে প্রফুল্লতা হৃদয়ে আমার
বিরাজিছে চিরদীপ্ত কৃশানু অঙ্গার !
বিজয়ার বিসর্জ্জনে আনন্দ মিলন
নববস্ত্র পরিধান, করিয়া সকলে পান
আশীর্ব্বাদ দণ্ডবৎ স্নেহ আলিঙ্গন
বিজয়ার অন্তে হয় আনন্দ মিলন ॥
আমিও প্রতীক্ষা করি আছি মা অভয়ে !
কবে পাব শমনের দৃঢ় আলিঙ্গন
মুখে বলি "দুর্গা নাম"
হবে পূর্ণ মনস্কাম
আনন্দে যাব মা চলি আনন্দ নিলায়।
কবে হবে সেইদিন সেই শুভক্ষণ ?

কীর্ত্তন।

ভুবন মোহনরূপ যদি না দেখিল—
পোড়া আঁখি আমার তবে কি হেরিল !
এত কাছে থাকে, আঁখি নাহি দেখে,
বুঝি পোড়া আঁখি আমার অন্ধ হ'ল,
(হায় কে তায় এমন করিল রে)

যার ভক্তি নাই, তার আঁখি নাই,
ভক্ত কেবল এইরূপ, হেরে মজে ছিল।
(জনমের মতন রে)
সে নয়ন ফিরাত না, আর কিছুই দেখিত না,
চিরদিনের মতন রূপ সাগরে ডুবে ছিল।
(আর উঠিল না রে)
(তার নয়ন আর কিছুই দেখিল না)
আহা কি রূপ রে, তোরা দেখে যারে,
রূপে যোগী জনার, চিত্ত হয় আলো,
(সে আর কিছুই দেখে না রে)
(এই রূপ বিনা)
রূপের মাধুরী কত, যদি পাপী দেখিত,
পাপ চলে যেত, জনম হত সফল।
গোপবালা যত, এইরূপে মোহিত।
রূপের বালাই লয়ে, রাই উন্মাদিনী হয়েছিল।
(হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে)

কে তুমি ?

লেখক— শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস।

রাগিণী—ইমন্।

সংসার গহনে সুদূর জীবনে শুধু আনমনে
চলেছি কোথায় ?
কে তুমি বল না ? দিলেগো সান্ত্বনা
তোমারই করুণা ফিরাল আমায়॥
কল্পনাতে গড়া সুখ দুঃখ যত ;
স্বপন কুহেলী আবরি সতত ;—
নিরাশা মাঝারে শুধু অযাচিত—
তোমারই ব্যাকুলী মধুর ভাষায়।
এলে যদি প্রিয় স্নেহ পরকাশি,
সেই সাথে করি মোহ তম নাশি,
স্মৃতির মন্দিরে রাখি দিবানিশি,—
পূজিব আজিগো দেবতা তোমায়॥

বিষ-বৃক্ষের সূর্য্যমুখী ও কমলমণি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তুলনা মূলক সমালোচনা।

লেখক—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

অন্তরের গুপ্ত কোণে কুন্দের প্রতি একটি সূক্ষ্ম ঈর্ষ্যা জন্মিয়াছিল, তাহাই বিতাড়িত করার একমাত্র কারণ, ইহা বলিলে সূর্য্যমুখীর প্রতি অবিচার করা হয়। তবে ঐ সূক্ষ্ম ঈর্ষা অজ্ঞাতসারে যদি তাহার উপর কোন অব্যক্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা চলে না। বিশ্বের আদর্শরূপা জনকনন্দিনী সীতাও যে লক্ষ্মণের মত দেবরকে অকথ্য, যাহা না বলা যায়, তাহা বলিয়াছিলেন। মর্ত্তের মানবী মাত্র হইয়া সূর্য্যমুখী যে অবস্থায় "কুন্দকে দূর হ' বলিয়াছিল, তাহাতে অস্বাভাবিকত্ব কিছু হয় নাই। ক্রোধ বা উত্তেজনা সময়ে সংযম যথাযথ থাকে না, বিশেষতঃ নারীর পাপের প্রতি ঘৃণাই সূর্য্যমুখীর মত সতী সাধ্বীর চিত্তকে এমনই বিচলিত করিয়াছিল—যাহার ফলে "দূর হ" "দূর হ" বলিয়াছিল। কার্য্যত দূর অবশ্য করে নাই, ইহাও চিন্তনীয়।

দ্বিতীয় দোষ সম্বন্ধে বক্তব্য যে, সূর্য্যমুখী যে, কি অবস্থায় পড়িয়া কুন্দকে স্বামীর হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিল, তাহা অনুধাবণ করিলে আর তাহাকে দোষ দেওয়া চলে না। কি নারীত্ব, কি পত্নীত্ব কোনটীই এই কার্য্যে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং উজ্জ্বলই হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ যখন বলিলেন, "তোমাতে আর আমার সুখ নাই—যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবেই আসিব, নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষ্যাৎ।" এ কথা শুনিয়া পতিগত-প্রাণা সতীর বিবাহ দেওয়া ব্যতীত অন্য পথ ছিল না। স্বামীর সম্পূর্ণ পরবশ মনটীকে ফিরান অসম্ভব জানিয়াই সূর্য্যমুখী এই সাত রাজার ধন মাণিকটীকে অপরের হস্তে প্রদান করে। এ আত্মবিসর্জ্জন, দেবতার তৃপ্ত্যর্থ এ আত্মবলি। স্বীকার করি সতী নারীর আর একটী আদর্শ আছে, যাহাদের পক্ষে এই বিবাহ দেওয়া সম্ভব নহে। সে আদর্শ ভ্রমরের সূর্য্যমুখীর নহে। সতী নারীর কাছে সূর্য্যমুখীর আদর্শই বড়। ইহাকে সংস্কারমূলক গতানুগতিক আদর্শ বলিলেও তজ্জন্য সূর্য্যমুখী দোষী হইবে না। ভ্রমরের যে আদর্শের পরিণাম ঐহিক সুখের দিক দিয়া তাহাকে সুখিনী করে নাই। অবশ্য

গোবিন্দলাল ভ্রমর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সামগ্রী লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিল, এজন্য গোবিন্দলালের পরিণাম পারমার্থিক দিক দিয়া ভালই হইয়াছিল, বলিতে হইবে। গোবিন্দলালের রোহিণীকে লইয়া পলায়নের সহিত নগেন্দ্রনাথের কুন্দনন্দিনীর বিবাহের তুলনাই হয় না।

বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয়—সূর্য্যমুখীর প্রথমে এই বিশ্বাসই ছিল; শেষে স্বামীর জন্য এই যে ধারণা তাহার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, "বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রে আছে তবে দোষ কি ?"

তৃতীয় দোষ সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ। আপাতদৃষ্টিতে কুলবধু সূর্য্যমুখীর পক্ষে ইহা দোষ হইলেও কৃত প্রস্তাবে ইহাকে চরিত্রগত দোষ বলা যায় না। ইহা অভিমান ও চিত্তদৌর্ব্বল্য মাত্র। এ অভিমান ও ক্রোধ মিশ্রিত প্রচণ্ড অভিমান নহে। যে ক্রোধমিশ্রিত প্রচণ্ড অভিমানে যযাতি পত্নী দেবযানী গৃহ ত্যাগ করিয়া যায়, সে অভিমান সূর্য্যমুখীর নহে। চিত্তদৌর্ব্বল্যটীও ততদূর সহের সীমা অতিক্রম করে নাই, যাহাতে অবলা নারী আত্মহত্যা করিতে পারে। এ চিত্তদৌর্ব্বল্য সতীনারী-সুলভ। "মেরিকরেলির" "থেলমা" উপন্যাসের "থেলম চরিত্রের সহিত সূর্য্যমুখীর এ বিষয়ে বরং সাদৃশ্য আছে।

আর একটী বিষয় এখানে দেখিতে হইবে, সূর্য্যমুখীর বয়স সে সময়ে প্রায় ত্রিশবৎসর। ঘরণি গৃহিনী সূর্য্যমুখী একপ্রাকার বয়স কাল কাটাইয়া মধ্য-বয়সে মনের দুঃখে বিবাগী হইয়া গৃহের বাহির হইয়াছিল; এজন্য তাহাকে সহানুভূতির পাত্রী ভাবিতে হয়। সূর্য্যমুখী আত্মবিসর্জ্জন করিয়া আপনার বুকভরা বেদনা লইয়া প্রফুল্লচিত্তে যদি গৃহে থাকিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে আমরা স্বর্গের দেবী ও সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী বলিয়া ভক্তি করিতাম, এই পর্য্যন্ত। রক্তমাংস-ময়ী সূর্য্যমুখী হাসিতে হাসিতে মরণকেই যদি আলিঙ্গন করিত, তাহা হইলেই কি ভাল হইত ? তাহা না পারিয়াই গৃহত্যাগ করিয়া যায়। সেত ভালই। মরনই (আত্মহত্যা নহে) যে তাহার সহনীয়, তাহা কমল-মণির উদ্দেশ্যে লিখিত পত্র-খানি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। "আশীর্ব্বাদ করি. স্বামীপ্রেমে যেদিন বঞ্চিত হইবে. সেদিন তোমার যেন মৃত্যু হয়। আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।"

মরণই সূর্য্যমুখীর বাঞ্ছনীয়, তবে সে আত্মহত্যা করিল না কেন ? উত্তর, আত্মহত্যা মহাপাপ -আত্মহত্যাকারীর গতি নাই, উদ্ধার নাই, জানিয়া শুনিয়া সতী সাধ্বীর আত্মহত্যায় ক্ষতি জন্মিবে কেন ? আত্মহত্যাকারীর দাহ নাই, শ্রাদ্ধ নাই। তবে এ অবস্থায় এত বড় মহাপাপ সূর্য্যমুখীর মত স্থিরবুদ্ধি গৃহিনী করিতে

পারে না। অল্প বয়সে অমার্জ্জিত "রুচি অবলা কিম্বা ধর্ম্মভাবশূন্য শিক্ষায় শিক্ষিতা নারী অথবা অসহ্য অত্যাচারে অত্যাচারিতা বধূরাই আত্মহত্যা করিয়া থাকে। সূর্য্যমুখী আধুনিক উপন্যাস ও নাটক পড়া স্ত্রীলোক হইলে, হয়ত আত্মহত্যা করিতে পারিত। কারণ উপন্যাস নাটকে আত্মহত্যা দেখিয়া তৎপ্রতি অস্বাভাবিকত্ব দোষ তাহার লোপই পাইত। আত্মহত্যা প্রসঙ্গে কৈকয়ীর প্রতি উর্ম্মিলার উক্তিঃ—

সাধু সঙ্গের মহিমা।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রভু নিত্যানন্দ একদা বীরচন্দ্রপুর হইতে নবদ্বীপ যাইতে ছিলেন। তখন শীতকাল, হরিদ্রাবর্ণ সূর্য্যকিরণ দিনান্তে গাছের মাথায় লাগিয়া তাহাকে সোণার বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে। ধানের গন্ধে ঘাট মাঠ ও বাট আমোদিত হইয়াছে। পৌষের শীত, প্রভুপাদ নিত্যানন্দ রাত্রির আগমনে আর যাইতে পারিলেন না। নিকটেই একটি ক্ষুদ্র পল্লী গ্রাম দেখিয়া তাহাতেই প্রবেশ করিলেন। তখন বড় ঠেঙ্গাড়ের ভয় ছিল।

গ্রাম খানির নাম দেবপুর। কালী পূজার নিদর্শন স্বরূপ গ্রামের বাহিরে অনেকগুলি বেদী ও যূপকাষ্ঠ প্রোথিত আছে। সেই সকল যূপকাষ্ঠে সিন্দূর ও রক্ত মাখান রহিয়াছে। একটি বেদীর সম্মুখে ত্রিশূল পোতা আছে, তাহাতেও সিন্দুর ও পশুরক্ত লিপ্ত। নিত্যানন্দের মুখে নির্গত হইল যথা :—

"ছাড় হিংসা দ্বেষ কর পশুত্ব বিনাশ।
পশুর বিনাশে উহা না হয় বিনাশ॥
কামনার মুখে কর নাম সংকীর্ত্তন।
মনের শুদ্ধতা তাহে হবে উদ্ভবন॥
হিংসায় কি ধর্ম্মলাভ হইবে তোমার।
ব্যাঘ্র আদি জীব তবে তরিত সংসার॥
অহিংসা ধর্ম্মের সার আর্জব অক্ষোভ।
হরি পাদ-পদ্ম-মধু তরে কর লোভ॥

চলিতে চলিতে গ্রামের একজন বৃদ্ধ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়ের কোথা যাওয়া হবে ?

নিত্যানন্দ। অদ্য এই গ্রামেই অবস্থান করিব। এখানে হরি-মন্দির বা দেবালয় আছে কি ?

বৃদ্ধ। দেবালয় নাই, হরি-মন্দিরও শুনিই নাই। গ্রামে বাগ্‌দী, ডোম, শূদ্র, আর মুসলমান আছে। আপনি কোন্ জাতি ?

নিত্যানন্দ। ব্রাহ্মণ।

বৃদ্ধ। তাহ'লে এখানে আপনার অসুবিধা দেখ্‌ছি।

নিত্যানন্দ। সুবিধাই হোক্ আর অসুবিধাই হোক্ রাত্রি যাপন কর্ত্তেই হবে। একটু থাকিবার স্থান কি মিলিবে না ?

বৃদ্ধ। এ দক্ষিণ বীরভূম। এখানে কারও সঙ্গে কারও সম্বন্ধ নাই। আত্মীয় কুটুম্ব ভিন্ন রাত্রে স্থান নাই। তবে আমার বৈঠক-খানায় থাক্‌তে পার্‌বেন ? চাকর বাকরেরা থাকে। বেশ থাক্‌বেন। অগত্যা সেই বৃদ্ধের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রেমের গোঁসাই নিতাই প্রভু চলিলেন। নিত্যানন্দের মনোহর আকৃতি দেখিয়া বৃদ্ধ একটু শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রশ্ন। আপনার নাম কি ?

উত্তর। নিত্যানন্দ ওঝা।

প্রশ্ন। নিবাস কোথায় ?

উত্তর। একচক্রা গ্রাম। (বীরচন্দ্র পুর বর্ত্তমান নাম)

প্রশ্ন। কোথায় যাওয়া হবে ?

উত্তর। শ্রীধাম নবদ্বীপ।

"আসুন আমার সঙ্গে", এই বলিয়া বৃদ্ধ চলিতে লাগিলেন। নিতাই প্রভুও চলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈঠকখানায় একটা সভা হইতেছে। সভার বিষয় আগামী কল্য গ্রাম্য-দেবতা বাশুলীর পূজা। পরাণ পোদ একটা মুরগী দেয় নাই, গ্রামের মোড়ল (সেই প্রভুর পথ প্রদর্শনকারী বৃদ্ধ) বলিতেছেন, "তোকে একটা বড় পাঁঠা ও একটি মুরগীর বাচ্চা দিতেই হবে। নতুবা তোকে পতিত কর্‌বো।"

পোদ কহিল, "আমার ধান পান হয় নাই, এবার আমায় মাপ কর। আস্‌ছে বারে নিশ্চয় দিবো।"

মণ্ডল বলিল, "কি! আমার কথায় জবাব দিলি ? ওরে নিশা ও প্যালা! তোরা দু-জনে ওর দুটো কাণ ধরে উঠ্‌বোস্ করা।" বলিবা মাত্রই কার্য্যারম্ভ হইল। পোদের ছেলে দুটি কাঁদিয়া আকুল হইল।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি বলরামের অবতার, একটু ক্রুদ্ধও হইলেন। ভাবিলেন, এ সকল জঘন্য কাণ্ড ঘটিতে দিবেন না। কল্য থাকিয়া ব্যাপারটী দেখিবেন। তিনি বৃদ্ধকে কহিলেন, "উহাকে ওরূপ ভাবে প্রহার করিতে আপনার কষ্ট হয় না ? আপনাকে যদি ঐরূপ কেহ প্রহার করে, তাহ'লে কেমন বোধ করেন ?

বৃদ্ধ জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, "কি! আমার সাম্‌নে তুমি আমাকে অপমানের কথা বল ? আমার কাণে হাত! এ্যাঁ! ওরে নিশা, ওরে প্যালা,—

নিতাই প্রভু কহিলেন, "বৃদ্ধ। তোমার মতিভ্রম ঘটিয়াছে। তোমার নিশা ও প্যালার মত শত শত বীর পুরুষকে একটি হুঙ্কারে বশ কর্ত্তে আমার ক্ষমতা আছে। কিন্তু ক্ষমতা দেখাতে আমি আসি নাই। হরিভক্তি-হীন গ্রামের মোড়লকে একটু প্রেমভক্তি দিতে আসিয়াছি।

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "প্রেমভক্তি ? কিসের প্রতি প্রেমভক্তি ?

নিত্যানন্দ। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা বা শ্রদ্ধা।

বৃদ্ধ। ঈশ্বর কোথায় ?

নিত্যানন্দ। তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। তোমার অন্তরে, বাহিরে, তৃণাদিতে, পুষ্পে, ফলে, মহীধরে, বালুরাশিতে যেখানেই দেখ সর্ব্বত্রই সেই হরি বর্ত্তমান। এই বলিতে বলিতে প্রেমিক-শিরোমণির প্রেম-সিন্ধুতে জোয়ার আসিল। তিনি যে উদ্দাম-নর্ত্তনে নদীয়া কাঁদাইয়াছেন, জগাই মাধাই মহা পাপীদ্বয়কে মুগ্ধ করিয়াছেন, যাঁহার শ্রীমুখের—

"হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে,
বল মাধাই মধুর স্বরে।
নারদ ঋষি দিবানিশি ঐ হরিনাম জপ করে॥
নামের গুণে গহন বনে মৃত তরু মঞ্জরে।
নাম সুধা পান কল্লে পরে ভাস্‌বি সুখের সাগরে॥"

এই গান শুনিয়া শত শত পাপী, তাপী গলদশ্রু-নয়নে তাঁহার ত্রিলোক-পাবন চরণ কমলে শরণ লইয়াছে, সেই প্রভু আবার ভাবাবেশে গান ধরিলেন,

"নয়নের পাতে যে, আসন পেতে তাঁরে যে,
দেখিতে পাই না !
তিনি হৃদয়ে আমার খুঁজি চারি ধার নিজ
প্রতি কেন চাই না।
প্রতি অণু দেহে,
অনুক্ষণ রহে,
নিশ্বাস প্রবাহে সর্ব্বদাই—
অনলে অনিলে,
ভূধরে সলিলে,
গিরি পাদমূলে হেরি হে তাঁয়
ছাড় দাগাবাজি, হরি পদে মজি
দিবানিশি কর সাধনা।
ঘুচিবে সন্তাপ দূরে যাবে পাপ
মলিনতা কিছু রবে না॥
(ওরে মলিনতা কিছু রবে না)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গান শুনিয়া এবং মনোহর নৃত্য দর্শন করিয়া তদুপরি তাঁহার দেহের অপার্থিব জ্যোতিশ্চক্র দর্শন করিয়া অসভ্য ও অশিক্ষিত দর্শকগণ মুগ্ধ হইল।

গ্রামের আবালবৃদ্ধ নর-নারী ছুটিয়া আসিল। প্রভুর বিরাম নাই। কখন বলেন, "মেরেছ কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দিব না ? মাধাই রে !" আবার বলেন, "খেয়ে নেরে প্রেমামৃত ধন, অফুরন্ত আজ।" প্রেমের সমুদ্র নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর তখন বাহ্য-জ্ঞান নাই। সকলের করে ধরিয়া বিনয় করিয়া বলিলেন :—

"কহ চৈতন্য, লহ চৈতন্য, বল চৈতন্যের নাম।
যে জন চৈতন্য ভজে সেই আমার প্রাণ॥"

গ্রামের মণ্ডল কাঁদিয়া পায়ে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে পাত্র মিত্র চাকর বাকর সকলেই ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। এইরূপে রজনীর তৃতীয় যাম অতিক্রান্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আহা ! সাধু সঙ্গের কি অপূর্ব্ব মহিমা ! যাঁর এক দণ্ডের সংশ্রবে আসিয় মহাপাপীও পরিত্রাণ পায়। প্রভাত হইল, পূর্ব্বাশার কোলে নব-ভানু দে

দিলেন। সেই পৌষের শীতে নগ্নগাত্র গ্রামবাসীরা মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রভাতী গানে যোগ দিল, গানের লহরে লহরে ভুবনমোহন নৃত্য। কিবা আঁখর ! যেন স্বর্ণ খচিত মুকুট মধ্যে নীলকান্তমণির প্রকাশ। গ্রামবাসীরা এমন গান জন্মেও শুনে নাই। এমন নৃত্য জন্মেও দেখে নাই। তাহারা গলিয়া গেল, ক্রমে ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। অদ্য যে বাশুলী পূজা, মদ্য মাংসের মহাভোগ, বলিদানের পর তাণ্ডব নর্ত্তন, তাহা তাহারা ভুলিয়া গেল। পরশমণির পরশে লোহা সোণা হইল।

গ্রামের দুই একজন মণ্ডলের কাণে পূজার কথা বলিতে আসিল। কিন্তু মণ্ডলের তখন "দশা" (ভাব) লাগিয়াছে। কাজেই কথাটা শুনান হইল না। হরিবোল হরিবোল রবে মণ্ডলের "দশা" ভাঙ্গিল। তখন প্রভুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ। আনন্দে বদন-কমল উদ্ভাসিত হইল। মধুর বচনে কহিলেন, :—

জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।
এই তিন সার হয় শুন যশোধন॥
অদ্য হ'তে হিংসা ছাড় বল হরিবোল।
কৃপা করি শ্রীগৌরাঙ্গ দিবেন শ্রীকোল॥

গ্রামের মণ্ডল কহিল :—

অত্যন্ত অধম মুঞি নাহি জানি পূজা।
কৃপা করি বল মোরে জগতের রাজা॥
মদ্য মাংস খাই, করি পাথর অর্চ্চনা।
হরিভক্তি আমাতে নাহিক এক কণা॥

নিত্যানন্দ বলিলেন :—

নাম গানে রতি হ'লে ভক্তি উপজিবে।
অবশেষে আনন্দের সমুদ্রে ভাসিবে॥
অনুক্ষণ নামামৃত পান কর ভাই।
হরিনাম ভিন্ন জীবের আর গতি নাই॥
অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর নদীয়া তপন।
শচী সুত বিশ্বম্ভর কর দরশন॥

এই কথা বলিতে বলিতে নিত্যানন্দ ঢলিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ মণ্ডল কোলে করিয়া "হরিবোল, হরিবোল" বলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে প্রভুর চৈতন্য

হইল। বৃদ্ধ আজ হইতে দীক্ষা লইয়া "বৈষ্ণব" হইল। এই ঘটনা যে যেখানে শুনিতে পাইল, কাতার দিয়া দেখিতে আসিল। বৃদ্ধকে গেরুয়া আলখিল্লা পরাইয়া মস্তক মুণ্ডিত করিয়া অষ্টাঙ্গে গোপী চন্দনের তিলক পরাইয়া দেওয়া হইল। চিড়া দই, ক্ষীর, রম্ভা ও নানাবিধ ফলমূল ও মিষ্টান্ন আনাইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর ভোগ লাগান হইল। ভোগের পর আবার ভোগারতি কীর্ত্তন হইল। সকলেই মহানন্দে কলার পাতে মহাপ্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইল। এই ঘটনার বহুকাল পরে গ্রামের নাম নিত্যানন্দপুর ধারণ করিয়াছে।

শ্রীমদ্ বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাজ বালানন্দের অভীষ্টদেব

শ্রীমন্মহারাজ ব্রহ্মানন্দের কিঞ্চিৎ বিবরণ :—

আমাদের গুরুদেব শুনাইয়াছেন যে, তিনি এ ভারতবর্ষের বহুস্থান পর্য্যটন করিয়া বহু সাধুসঙ্গ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গুরু মহারাজের মত সরল প্রাণের সাধু ও পরদুঃখ-কাতর সাধু দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার অতিথি সৎকার, আতুরের সেবা ও যোগ-বিভূতি সম্বন্ধে দুইটী গল্প শুনাইয়াছেন। একদিন রাত্রে গঙ্গোনাথে তিনি ও তাঁহার অপর দুই গুরুভ্রাতা কেশবানন্দজী ও নিত্যানন্দজী তাঁহাদের গুরুদেবের আসন হইতে কিছু দূরে আসন গ্রহণ করিয়া রাত্রে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গভীর রাত্রে নর্ম্মদা পরিক্রমকারী এক সাধু দূর হইতে চীৎকার করিয়া তাহার কষ্ট জানাইতেছিল। এ ব্যক্তির অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এক শূলবেদনা উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের বৃদ্ধ মহাত্মা ইহা শুনিতে পাইয়াই কাহাকে কিছু না বলিয়া উক্ত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হন, ও সেই পর্য্যটনকারীকে নিজের আসন সমীপে লইয়া আসেন। তাহার পর সেই রাত্রে নিজেই জঙ্গলে যাইয়া কিছু "জড়ীবুটী" (ঔষধ) উঠাইয়া আনেন ও নিজ হস্তে উহা পেষণ করিয়া সেই ব্যাধিগ্রস্তটীকে সেবন করান। এ ঔষধ সেবন করিবার খানিক পরেই সে ব্যক্তি সুস্থ হয়, ও সে বড়ই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে

জানায়। ইহা জানিয়া এ বৃদ্ধ মহারাজ নিজেই ভাণ্ডার খুলিয়া কিছু গোটা মুগ বাহির করিয়া আনেন, ও নিজের লোটার দ্বারা ধুনীতে সিদ্ধ করেন ও উক্ত-ব্যক্তিকে খাইতে দেন। এরূপ হইলে যখন সে ব্যক্তি বেশ সুস্থতা লাভ করে, তখন তাহাকে লইয়া মহা আনন্দে গল্প করিতে থাকেন। এরূপ করিতে করিতে রাত্রি ৩টা বাজিয়া যায়। এ সময়ই পরম গুরুদেবের শৌচাদি ক্রিয়া ও স্নানের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল, এজন্য তিনি স্নানে বাহির হন। এ সময়ে আমাদের গুরুদেব ও অন্যান্যের নিদ্রাভঙ্গ হয়, ও তাঁহারা রাত্রের ব্যাপার জানিতে পারিয়া নিজেরা বড়ই অপ্রতিভ বোধ করেন। কেন তাঁহাদের কাহাকে উঠান নাই, ইহা বৃদ্ধ মহারাজকে বলিলে, তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "লেড়কা লোক নিদ্ গেয়া, কাহে উঠায়েঙ্গে, বহুৎ কুছ ব্যাপারতো নাহি হুয়া।" অনেকেই সিদ্ধ মহাপুরুষ গণের নানারূপ যোগ-বিভূতি সম্বন্ধে উপাখ্যান শুনাইয়া থাকেন, এবং অনেকের ধারণা যে, যোগীরা সর্ব্বদাই নানারূপ যোগ-বিভূতি দেখাইয়া থাকেন। ইহা ভুল ধারণা। মহাপুরুষগণ যোগ-বিভূতি সম্পন্ন হইয়াও এ বিষয়ে সর্ব্বদাই গুপ্তভাবে চলিয়া থাকেন। তাঁহারা লোকের নিকট "বুজরুকী" দেখান অতিশয় ঘৃণার বলিয়াই মনে করেন। তথাপিও কখন কখন তাঁহাদের কোন কোন বিভূতি প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমাদের এ পরম গুরুদেব সম্বন্ধে নানারূপ গল্প প্রচলিত, পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের গুরুদেব এ মহাত্মার প্রথম শিষ্য। এজন্য আমরা জানিতে চাহিয়াছিলাম যে, তিনি কখনও কিছু দেখিয়াছিলেন কি না? এ সম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে একটী গল্প শুনাইয়া ছিলেন। ইহা এইরূপ,—এক সময়ে আমাদের গুরুদেব যখন গঙ্গোনাথে ছিলেন, সে সময়ে বরোদা-রাজমহিষী যমুনা বাই বড় মহারাজকে রাজধানীতে পদার্পণ জন্য আমন্ত্রণ করেন, ও যাইবার জন্য বড় জুড়ী-গাড়ীর বন্দোবস্ত করেন। গুরুদেব সঙ্গে যাইবেন স্থির হইল। এজন্য তিনি নিজ হস্তে বৃদ্ধ মহারাজের আসনাদি সঙ্গে লইলেন, ও স্বহস্তে তাঁহার ঝোলায় দ্রব্যাদি রাখিয়া তাঁহার স্কন্ধে দিলেন। গঙ্গোনাথ হইতে কিছু দূরে এ গাড়ী অপেক্ষা করিতে ছিল। তাঁহারা কিছু দূর আসিতেই এক ব্যক্তি ডালায় কিছু শাক (তরকারী) লইয়া পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল। ইহা দেখিয়াই বড় মহারাজ দণ্ডায়মান হইলেন। সে ব্যক্তিটী নিকটে আসিয়াই বলিল, যে সে তাঁহার জন্য শাক লইয়া যাইতেছিল। ইহা শুনিয়াই তিনি আচ্ছি আচ্ছি, দেও, দেও" বলিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার প্রদত্ত তরকারীগুলি নিজ ঝোলায় রাখিলেন, ও তাহাকে খুসী করিয়া বিদায় দিলেন। ইহার পর

গুরুদেব ও তিনি উভয়ে জুড়ী গাড়ীতে উঠিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইবার পর এক রাখাল বালক তাঁহাদের প্রণাম করিয়া গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিল। ইহা দেখিয়াই বৃদ্ধ মহারাজ গাড়ী থামাইতে বলিলেন, ও উহা থামিলেই সেই বালকটীকে গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া নিজের পার্শ্বে বসাইলেন, ও তাহার সহিত নানারূপ হাসি তামাসা ও রঙ্গরস আরম্ভ করিয়া দিলেন। এরূপ করিতে করিতে গাড়ী রাজ-প্রাসাদে যাইয়া পৌঁছিল। বরোদারাজ ও রাজমহিষী রাজ-প্রাসাদে গাড়ী উপস্থিত হইলেই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও দেখিলেন যে, রাখাল বালক মহারাজের পার্শ্বে বসিয়া আছে। ইহা দেখিতেই মহা হাসি তামাসার তরঙ্গ উপস্থিত হইল। ইহার পর সকলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এখানে নানারূপ হাসি তামাসার সহিত সেই পূর্ব্বোক্ত চাঁদীর তোপের গোলা কাহার কতদূর যায়, প্রভৃতি গল্প হইল। পরে রাণীর দৃষ্টি মহারাজের ঝোলার উপর যাইয়া পড়িল। যমুনা বাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আজ হামারি ভাগ্ বহুৎ সুপ্রসন্ন হৈ। আজ মহারাজকা ঝোলা বড়ী ভারী দেখ্‌তে হুঁ। আজ্ হামারি বহুৎ প্রসাদী মিল জায়েগি।" ইহা শুনিয়াই বড় মহারাজ বলিলেন যে, "তেরি মালুম ঠিক্ হৈ। আজ বহুৎ মিলেগা। ক্যায়া মাংতে হুঁ।" সে সময়ে আঙ্গুর মিলিবার নয়, এজন্য রাণী সাহেবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মহারাজ! আঙ্গুর বহুৎ দিন খায়া নেহি, আঙ্গুর মিল্‌নেসে খুয়া হোয়েগী।" ইহা শুনিয়াই বুড়ো মহাত্মা বলিলেন যে, আঙ্গুর নেই খায়া? দেখা যায় হামারি ঝোলামে যব কুছ্ হৈ।" এই বলিয়া সেই শাক পরিপূর্ণ ঝোলার ভিতর হইতে উত্তম এক থলো আঙ্গুর বাহির করিয়া রাণীকে দিলেন, ও বলিলেন "তেরি নসীব বহুৎ আচ্ছী হৈ। দেখ্ বহুৎ আঙ্গুর মিল্‌গেয়া।" রাণী মনে করিলেন, যথার্থই বুঝি আঙ্গুর লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের গুরুদেব ঝোলায় কি ছিল ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, এজন্য বড় মহারাজের এ যোগ-বিভূতি দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন।

আমরা স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহা পরে বর্ণনা করা হইবে। তবে গঙ্গোনাথে যাইয়া অন্যান্যের মুখে আমরা বহুবিধ যোগ-বিভূতির বিষয় শুনিয়াছি। ভাণ্ডারা হইবার কালে অন্ন কম পড়িলে কিরূপে তাঁহার দৃষ্টি পড়িবামাত্র উহা প্রচুর হইয়া যাইত, তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। একবার এরূপ সময়ে ঘৃত কম পড়িয়া যায়। তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইবামাত্র তিনি ঘৃতের টিনটীকে ধুনীর উপর বসাইয়া বলিলেন যে, "বহুৎ ঘৃত হৈ", বাস্তবিক তাহাই হইল। এক সময়ে এ

মহাত্মা কয়েকটি শিষ্যের সহিত একটী সাহেবের বাঙ্গলা হইতে দূরে আসন লইয়াছিলেন। শিষ্যগুলি তাহা হইতে তফাতে ছিল। সে সময় দারুণ শীতকাল। সে বাঙ্গালার আস্তাবলে সাহেবের টমটম্ ছিল। শিষ্যগুলি ইহার বোমকাষ্ঠ দুই খানিকে জ্বালাইয়া ফেলে। সাহেব ইহা জানিতে পারিয়া শিষ্য গুলিকে মহারাজের সম্মুখেই ছাবুক মারিবার জন্য উদ্যত হন। ইহা দেখিয়াই মহারাজ সাহেবের প্রতি কি একবার দৃষ্টি করিলেন। সাহেবের হস্ত শূন্যেই আবদ্ধ হইয়া গেল। দুই তিনবার চেষ্টার পরও হাত নামাইতে না পারিয়া সাহেব যেন অবাক্ হইলেন। পরে সাহেবের মুখে বোম জ্বালানর বিষয় অবগত হইয়া তিনি শিষ্যগণকে বড়ই ধমকাইলেন, ও মাপ চাহিলেন। সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

এ বড় মহারাজের ভগবদারাধনা কিরূপ ছিল, এ সম্বন্ধে একটী সামান্য গল্প শুনাইতেছি। কোন সময়ে আমাদের গুরু-ভ্রাতা পূর্ণানন্দজী গুরুদেবের সহিত গঙ্গোনাথে ছিলেন। তিনি বয়সে অল্প ও বড় মহারাজের "নাতি" স্থানীয় বলিয়া গুরুদেব তাঁহাকেই পরম গুরুদেবের সেরা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইহাঁকে পাইয়া নানারূপ রঙ্গরস ও তামাসার সহিত তিনি সময় কাটাইতেন। বৃদ্ধ মহারাজ প্রতিদিন অন্যান্য পূজার সহিত এক পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন। পূর্ণানন্দজী শিবলিঙ্গ গড়িয়া পূজার আয়োজন করিয়া রাখিতেন। একদিন এইরূপ করিয়া আসিয়াছেন, ও বড় মহারাজ পূজা করিতে যাইতেছেন, এরূপ করিতে যাইয়াই তিনি ডাকিতে লাগিলেন ও বলিলেন যে, "পূর্ণানন্দ তেরা শিবলিঙ্গ আজ নারদ আয়কে পূজা করকে গিয়া।" ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া পূর্ণানন্দজী ও অন্যান্য সকলে যাইয়া দেখেন যে শিব-লিঙ্গের উপর পুষ্প অক্ষত ও বিল্বপত্র পড়িয়া আছে। বড় মহারাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট শিবলিঙ্গ অপরে সে আশ্রমে পূজা করিবে ইহা অসম্ভব। বড় মহারাজ বলিলেন ইহা ঠাট্টা নহে, যথার্থই নারদজী পূজা করিয়াছেন। ইহার পর শাস্ত্র খুলিয়া পড়িয়া শুনাইলেন যে, নর্ম্মদা তীরে যদি কেহ মৃত্তিকা নির্ম্মিত লিঙ্গ গড়াইয়া ও উহার মস্তকে বিল্বপত্র না দিয়া রাখে, তবে "পূজার যথার্থ অধিকারী কাহারও জন্য ইহা রাখা হইয়াছে," ইহা বুঝিয়া নারদজী আসিয়া পূজা করিয়া যান। ইহার পর পুনরায় শিবলিঙ্গ গড়াইয়া দেওয়া হইল, ও তিনি পূজা করিলেন।

এ মহাপুরুষের অপার কৃপাবলে আমাদের একবার তাঁহাকে দর্শন করিবার

সুযোগ হইয়াছিল। ইহা হইতেছে আজ ২৪ বৎসরের উপর অর্থাৎ ইং ১৯০৫ সালের চৈত্র মাসে। আমাদের সর্ব্ব প্রথম গুরুভ্রাতা ৺রামচন্দ্র বসু মহাশয়ের দেহত্যাগের পর তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কাত্যায়নী দাসী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কেরাণী বাদে রামনিবাস নামক আশ্রমে তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর মোক্ষ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া এক শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করেন, ও তথায় এক শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। আমাদের গুরুদেবের কাতর প্রার্থনায় আকৃষ্ট হইয়া বৃদ্ধ মহারাজ আসিবেন ইহা জ্ঞাপন করেন। এজন্য পূর্ণানন্দজী জয়পুরে যাইয়া প্রস্তর মূর্ত্তিগুলি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করান, ও গঙ্গোনাথে গমন পূর্ব্বক উক্ত বৃদ্ধ মহাত্মাকে সঙ্গে করিয়া বৈদ্যনাথে আগমন করেন। এ উপলক্ষে আসিয়া তিনি কিছুদিন রামনিবাস আশ্রমে অবস্থান করেন এবং উক্ত আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত "নর্ম্মদা গুরু" নামক শিবলিঙ্গ নিজ হস্তে প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর বৈদ্যবাটী, কলিকাতা ও পুরী হইয়া গঙ্গোনাথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত নাড়াজলের রাজা ৺নরেন্দ্রলাল খাঁর বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থিত ভবনে বাস করিয়াছিলেন। এজন্য আমাদের প্রাচীন গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণের মধ্যে অনেকেই হয় কেরাণী বাদে নয় কলিকাতায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া ছিলেন। এ লেখক তাঁহাকে কেরাণী বাদেই দর্শন করিয়া ছিলেন। সে আজ বহু দিনের ঘটনা হইলেও এখন যেন তাঁহার সে আনন্দময় বাল্যভাব ব্যঞ্জক চিত্র যেন সম্মুখে বিরাজিত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। যখন এ মহাত্মা আগমন করেন তখন তাঁহার সহিত কতিপয় শিষ্য ভক্ত ও বৈদিক কর্ম্মে অভিজ্ঞ কতিপয় পুরুষেরও আগমন হইয়াছিল।

কেরাণী বাদে অবস্থান কালে আমরা তাঁহার "নাতি" স্বরূপে তাঁহার সহিত বহুল প্রকার রঙ্গরস করিয়াছি। আমাদের গুরুদেবও আমাদিগকে বালক ভাবে তাঁহার সহিত মিশিতে ইঙ্গিত করিয়া ছিলেন। এ সম্বন্ধে ২।৪টী বিবরণ শুনাইতেছি।

কেহ বলিল "মহারাজ! বহুৎ বুড্‌ঢা" তিনি অমনি বলিলেন, "নাহি নাহি হাম্ লেড়্‌কা হৈ। হামারি উমের এক কুড়ি না হয় ধর্‌লেও দো কুড়ি" অনেকের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার নিজমুখে তাঁহার বয়স কত জানিয়া লইবেন; কিন্তু কেহ সফলকাম হয়েন নাই।

কেহ কেহ হয়ত কোন শাস্ত্রীয় এক প্রসঙ্গই উত্থাপন করিলেন। অমনি হাসিতে হাসিতে মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "হাম্ কুছ্ নাহি জান্‌তে হুঁ।"

গুরুদেবকে তিনি "বালা" বলিয়াই প্রায় সম্বোধন করিতেন। এ সময়ে গুরুদেবকে সম্মুখে পাইলেই অমনি বলিতেন, "বালাকো পুছো, ও বহুৎ জান্‌তে হুঁ। ও হাম্‌সে বুড্‌ঢা হৈ।" অমনি হাসির তুফান উঠিত।

এ মহাত্মার সহিত যে সকল পুরুষ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দুই বেলা সিদ্ধি সেবন করিতেন। এজন্য দুবেলা পরিপাটী রূপে সিদ্ধির সরবৎ হইত। তাঁহারা বৃদ্ধ মহারাজকে নিবেদন না করিয়া নিজেরা খাইতেন না। এজন্য প্রথমেই এক গেলাস সরবৎ তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইত। ইহা পাইয়াই অমনি হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "হাম্ লেড়্‌কা হুঁ, হাম্‌কো নেশাখোর বানায়েগা?" অমনি সকলে বলিত, "নাহি মহারাজ! কুছ্ নাহি হোগা," ইহার পর বালকের মত হাসিতে হাসিতে খানিকটা পান করিয়া গেলাসটী গুরুদেবের হস্তে দিতেন। তিনি এ গুরুদত্ত প্রসাদী আনন্দে পান করিতেন। ইহার পর বৃদ্ধের আজ্ঞা হইত, "সব্‌কো পিলাও, হাম্‌কো পিলায়া, হাম্ কিছিকো ছোড়েগা নাহি।" কেহ খাইবে না বলিলে, তাঁহার জোর জবরদস্তির আজ্ঞা চলিত, ও সে সময়ে এক মহা হাসির তরঙ্গ উঠিত। এ চিত্র মনে করিয়া কবিবর হেমচন্দ্রের "ইন্দ্রালয়ে সিদ্ধি পান" বলিয়া পদ্যটী যেন এখনও হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে।

আমাদের এ বুড়ো মহারাজের নিয়ম ছিল যে, নিজের পরিধানের কৌপীন নিজেই কাচিতেন। একদিন স্নানের সময় আমাদের গুরুদেব এ কৌপীন কাচিবেন বলিয়া যেমন লইয়াছেন, অমনি বালকের মত বৃদ্ধ মহারাজ তাঁহার সহিত কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিলেন। যখন গুরুদেব জোর করিয়া হাত হইতে ছিনাইয়া লইলেন, তখন হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন, "জোয়ান হো, ছিনাই লেয়া, আজ লেও, কাল্‌সে নাহি মিলেগা।"

উক্ত শিব-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কয়েক দিন ধরিয়া কেরাণীবাদে অভিষেচন নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞ কার্য্য চলিতে থাকে। এ সময়ে মণ্ডপের মধ্যে এক স্থানে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে তিনি অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় অবস্থান করিয়া সমুদয় কার্য্যাদি দর্শন করিতেন, ও কোন্‌টীর পর কি হইবে বলিয়া যাইতেন, ও অবসরমত চণ্ডীপাঠ করিতেন। বয়সে অতি বৃদ্ধ হইয়াও তাঁহার চশমা ব্যবহার ছিল না। আমাদের গুরুদেবও আজ পর্য্যন্ত চশমা গ্রহণ করেন নাই। বহু শিষ্য ও ভক্ত-মণ্ডলী চতুর্দ্দিকে বসিয়া থাকিত। একদিন এরূপ ভাবে অবস্থান সময়ে এক নৈবেদ্য হইতে বালক যেমন চুরি করে এরূপ ভাবে এক টুক্‌রা শশা লইয়া মুখে দিলেন। আমরা হাসিয়া উঠিলাম। অমনি নিজেও হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন,

যে, "কাহে হাস্‌তা হৈ। বালাকো পুছো হামারি বাস্তে এ রাখ্‌ দিয়া কি না।" বাস্তবিকই ইহা গুরুর জন্ম নির্দ্দিষ্ট নৈবেদ্য ছিল।

কেহ হয়ত প্রশ্ন করিত যে, "মহারাজ! এ কলিকালে আমরা কি করিয়া নিস্তার পাইব?" অমনি হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "কলিকাল বহুৎ আচ্ছী কাল। বহুৎ সুগম পন্থা হৈ।" "কলৌ নাস্ত্যেব কেবলম্‌, কলৌ দানৈব কেবলম্‌।"

কেহ একদিন প্রশ্ন করিল, "মহারাজ! এ ইংরাজরাজ কি প্রকার?" অমনি বলিলেন যে, "এ ইংরাজরাজ সাধু ও গৃহস্থ দোনকো বাস্তে বহুৎ আচ্ছী হৈ।" ইহার পর বলিলেন, "হিন্দু-রাজের কথা ছাড়িয়া দাও। উহা তো বহুদিন হইল চলিয়া গিয়াছে। মুসলমান রাজত্ব সময়ে সাধু ও গৃহস্থগণ কখন কিরূপে হয়ত তাহাদের তীর্থ, ধর্ম্ম ও ইজ্জৎ যাইবে, আশঙ্কা করিয়া শশব্যস্ত থাকিত। কিন্তু ইংরাজ রাজত্বে কোন চিন্তা নাই। ধর্ম্মে বল পূর্ব্বক হস্তক্ষেপ নাই। স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ ধর্ম্ম কার্য্য করিয়া যাও। পূর্ব্বের মত ভয় নাই।" একদিন যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান জন্ম দিবাভাগে কাহারও ভোজন হইবার উপায় ছিল না। এজন্ম সন্ধ্যা আরতির পর ভোজনের ব্যবস্থা হইল। বন্দোবস্ত হইল, বড় মহারাজের ভোজনের পর আর আর সকলের ভোজন হইবে। ইহা শুনিয়াই বলিলেন, তাহা হইবে না।" এজন্ম আসনে বসিয়া ব্রাহ্মণ শিষ্য মণ্ডলীকে আহ্বান পূর্ব্বক নিজের চতুষ্পার্শ্বে বসাইয়া ভোজনে বসিলেন, ও অন্যান্যকে বাহিরে বসিতে আজ্ঞা দিলেন।

আমরা এ বৃদ্ধ মহারাজের যোগ-বিভূতি সম্বন্ধে বহু বিষয় শুনিয়াছিলাম। কিন্তু স্বচক্ষে কিছু দেখি নাই। বোধ হয় আমাদের এ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল। তাহা এইভাবে পূর্ণ করিলেন। যে সমুদয় বিগ্রহ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাদের অভিষেকাদি ক্রিয়া কয়েকদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছিল। বিধি অনুসারে ঐ সমুদয় বিগ্রহ মস্তকোপরি লইয়া সে গুলিকে বাবা বৈদ্যনাথের লিঙ্গ স্পর্শ করাইয়া আনিবার বন্দোবস্ত হইল। আরও বন্দোবস্ত হইল যে, বৃদ্ধ মহারাজকে পাল্কী করিয়া সঙ্গে লওয়া হইবে ও তিনি বাবা বৈদ্যনাথের পূজা করিয়া আসিবেন। তিনি পাল্কী করিয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। কেরাণীবাদ হইতে মন্দিরের দূরতা শুনিলেন যে, প্রায় দেড় মাইল। অমনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, "হাম্‌তো বুড্ঢা হৈ। এত্‌না দূরে চল্‌নে নাহি শেখেগা। তব্‌ যদি কোই হাম্‌কো কাঁধপর লেয়, তব্‌ শেখেগা।" ইহা শুনিয়া কেহ কেহ অবশ্য কাঁধে লইবে বলিল। তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছি হৈ, তব্‌

যব্‌ হাম থকেগা তবে লেওগে।" ইহার পর "হর বম্‌ বম্‌", "হর, শিব শঙ্কর মহেশ, রুদ্র, পশুপতি ঈশান" প্রভৃতি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সমারোহের সহিত মিছিল বাহির হইল, ও বৃদ্ধ মহারাজ বালকের ন্যায় হাসিতে হাসিতে ও রঙ্গরস করিতে করিতে হাঁটিয়া চলিলেন। বৈদ্যনাথের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সমুদয় শিষ্য ও ভক্ত মণ্ডলীকে লইয়া এক সঙ্গে পূজা সম্পন্ন করিলেন, ও বিগ্রহ গুলিকে যথাবিধি লিঙ্গ স্পর্শ করান হইল। এ সময়ে সর্দ্দার পাণ্ডা ৺শৈলজানন্দজী জীবিত ছিলেন। এ মহাত্মা একজন বিশিষ্ট তন্ত্রশাস্ত্র-বিৎ কর্ম্মী পুরুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন। বড় মহারাজ ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া "আপ্‌ তো সাক্ষাৎ বৈদ্যনাথ হৈ।" ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া বহু প্রকারে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সর্দ্দার পাণ্ডাজীও "আপ্‌ তো সাক্ষাৎ নর্ম্মদেশ্বর ভৈরব ও যোগী-রাজ হৈ" বলিয়া উভয়ে উভয়ের গলায় পুষ্পমাল্য প্রদান করিলেন। ইহার পর মন্দির হইতে ফিরিবার আয়োজন হইল। বোধ হয় তাঁহাকে কাঁধে লওয়া হইবে বলা কথাটা তখন মনে আসিল। তিনি এ সময়ে বালকের ভাব গ্রহণ করিয়া কখনও দৌড়াইতে বা হাততালি দিতে দিতে সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া "হামারি সাথ আও, দৌড়কে আও, হটাকে লিয়া" বলিতে বলিতে নানা রঙ্গরস ও হাবভাব দেখাইতে লাগিলেন। আমরাও তাঁহার এ সময়ের মহিমা প্রাপ্তির যোগ-বিভূতি দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া গেলাম।

ইহার পর বৎসরেই অর্থাৎ ইংরাজী ১৯০৩ সালের মাঘ মাসে তিনি দেহ রক্ষা করেন। এ সম্বন্ধে এক্ষণে সামান্য কিছু শুনাইব। চৈত্র মাসে রামনিবাস আশ্রমে নিজহস্তে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া এখান হইতে কলিকাতায় গমন করেন। সেখানে অবস্থান সময়ে রায় বাহাদুর ডাক্তার ৺দেবেন্দ্রনাথ রায় (ক্যাম্বেল স্কুলের অধ্যাপক) একদিন তাঁহাকে দর্শন করেন। তিনি নিজমুখে শুনাইয়াছেন যে, এই দর্শনকালে কি এক প্রকার দৃষ্টি তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন, ও তিনি দেখিলেন যে, দুই চক্ষু হইতে কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ যেন বাহির হইল। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে আমাদের গুরুদেব বরাবর পুরী প্রভৃতি হইয়া ইঁহার সঙ্গে গঙ্গোনাথ গমন করেন। সেখানে উপস্থিত হইবার কয়েক মাস পরে শীতকাল উপস্থিত হইলে, তিনি একাদশরুদ্র-যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সে এক বিরাট ব্যাপার। এ যজ্ঞের সময় লেখকের খুল্লতাত ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নাড়াজোলের রাজা ৺নরেন্দ্রনাথ খাঁ উপস্থিত ছিলেন। এ সমাবেশের একখানি ফটো এখনও মহারাজের আশ্রমে আছে। এ যজ্ঞকার্য্য শেষ হইতেই

মাঘ মাস উপস্থিত হয়। পূর্ব্বোক্ত মহারাজ মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এ শেষোক্ত যজ্ঞ সময়ে কৃষ্ণ বাবু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন না। এ উভয় যজ্ঞই বড় মহারাজ সুন্দর রূপেই পর্য্যবেক্ষণ করিতে ছিলেন। কিন্তু দেখা গিয়াছিল যে, মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ যেমন শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, অমনি তাঁহার শরীরও যেন অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। ইহা শেষ হইবার অল্প বাকি থাকিতে এক-দিন তিনি আমাদের গুরুদেবকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন যে, "বালা! তু হামার সন্ন্যাস লেনেকো বন্দোবস্ত কর্।" হঠাৎ এ কথাগুলি শুনিয়া গুরুদেব বিচলিত হইলেন, ও কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, তিনি দেহ রক্ষা করিবেন। ইহা শুনিয়াই গুরুদেব বলিলেন যে, "আপনি কেন এরূপ বলিতেছেন। ইচ্ছা করিলে এখনও ত আপনি বহুদিন দেহ ধারণ করিতে পারেন।" ইহা শুনিয়াই বৃদ্ধ মহারাজ উত্তর দিলেন যে, "অউর নেহি, বহু পুরাণ হো গেয়া।" ইহা শুনিয়া ও তাঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া সকলেই তাঁহা-দের অভীষ্টদেবের অভিলাষ বুঝিলেন, ও তদনুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারই নির্দ্দেশ মত এক সন্ন্যাসীর দ্বারা এ মহাপুরুষকে প্রেম্য-মন্ত্রে দীক্ষিত করাইয়া তাঁহার সন্ন্যাস সম্পন্ন করিলেন। ইহা শেষ হইতে ত্রয়োদশীর সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। এ সন্ধ্যার পর হইতেই তাঁহার দেহে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি যোগাসন গ্রহণ করিলেন। এদিকে সমবেত শিষ্য ও ভক্ত-মণ্ডলী তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিল। এখন হইতে সময়োপযোগী গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ ও বেদপাঠ আরম্ভ হইল। মহাপুরুষ ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া রহিলেন। এ ভাবে চতুর্দ্দশী অতিবাহিত হইল; ও পুণ্য মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথির অরুণালোক পূর্ব্ব গগনে দেখা দিল। এই প্রকার পুণ্য মুহূর্ত্তে এই নর্ম্মদার বরপুত্র, সিদ্ধ যোগী ও ব্রহ্মচারী, এ ভারতের এক প্রাচীন রত্ন সজ্ঞানে হাসি হাসি মুখে, ও যোগাসনে আসীন হইয়া যেন ক্রমে ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন, ও তাঁহার নশ্বর মৃত-দেহ সেই গঙ্গোনাথস্থ নর্ম্মদা-তটে রক্ষা করিলেন, ও কৈলাস ধামে গমন করি-লেন। শ্রীগুরুদেবের মুখ-নিঃসৃত বর্ণনা পাঠকগণ একবার মানস-চক্ষে ধ্যান করিবেন।

বড় মহারাজের দেহের অবস্থা পূর্ব্বেই বরোদা মহারাজ ও তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্য ও ভক্ত-মণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। তজ্জন্য লোক সমাগম পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়া প্রাতঃকালে সে স্থান পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। ইহার পর এক বিরাট মিছিলের আয়োজন হইল। এ মহাত্মার মৃতদেহ এক সজ্জিত মঞ্চো-

পরি পুষ্পমাল্য দ্বারা পরিশোভিত করিয়া নর্ম্মদা তীরে লইয়া যাওয়া হইল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আমাদের গুরুদেবই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য। এ জন্য এ সমারোহ ব্যাপারে তিনিই অগ্রণী হইয়াছিলেন, ও তাঁহার এ সময়ের মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই বিগলিত হইয়াছিল। পরে মহাপুরুষের মৃতদেহ নৌকাপরি উঠাইয়া নর্ম্মদার বক্ষে কিছুক্ষণ শোভা যাত্রার পর একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বাক্সে স্থাপন পূর্ব্বক নর্ম্মদা মধ্যগর্ভে সংরক্ষিত হইয়াছিল। এ সময়ে "জয় নর্ম্মদা মাইকো জয়" "জয় গঙ্গোনাথ দেবকো জয়" "জয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজকো জয়" ইত্যাদি শব্দ ও ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়াছিল। যাহারা অজ্ঞানী ও এ মহাত্মার নিকট নানারূপে আশ্রিত ছিল, তাহারা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। আজ বহুদিন যদিও এ ঘটনা ঘটিয়াছে, তথাপি আইস ভাই, আজ আমরাও একবার বলি "জয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজকো জয়।" এ সময়ে কয়েকটী আশ্চর্য্য ঘটনা হয়। তাহার বিবরণ আমরা গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি। সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি!

গঙ্গোনাথের সন্নিকটস্থ জঙ্গলে ও নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে বহু ভীল বাস করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের এ বুড়ো মহারাজের পরম ভক্ত ছিল। তাহারা নানারূপে তাঁহার নিকট সাহায্য পাইত, এজন্য তাহারা সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভাবে চিনিত। যে দিন গঙ্গোনাথে এ মহাপুরুষের দেহের সমাধি হইবে, সে দিন গঙ্গোনাথ হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরে কয়েক জন ভীল নর্ম্মদার তীর দিয়া গঙ্গোনাথে আসিতেছিল। তাহারা পরম গুরুদেবের কৈলাস-বাসের সংবাদ কিছুই জানিত না। এরূপ সময়ে পথিমধ্যে তাহাদের এই বড় মহারাজের সহিত দেখা হয়। তিনি নর্ম্মদার তীরে বিপরীত দিকে যাইতে ছিলেন, ও যেরূপ বেশে স্কন্ধে ঝোলা লইয়া সময়ে সময়ে পর্য্যটনে বা ভিক্ষায় বাহির হইতেন, ঠিক সেইরূপ বেশেই চলিতে ছিলেন। ভীলগণ তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিল, ও তিনি কোথায় যাইতেছেন জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বাক্যা-লাপ না করিয়া বা কিছু উত্তর না দিয়া কেবল হাত দিয়া একস্থান দেখাইয়া দিলেন, ও চলিয়া গেলেন। ইহার পর ভীলগণ গঙ্গোনাথে আসিয়া দেখে যে, এ মহাত্মার দেহ নদী গর্ভে রক্ষা করিবার আয়োজন হইতেছে। ইহাতে তাহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইল, এবং তিনি যে দেহ রক্ষা করিয়াছেন ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। কারণ কিছু পূর্ব্বে তাঁহার সজীব মূর্ত্তি যে তাহারা রাস্তায় চলিতে দেখিয়াছে, ইহা সকলকে বলিতে লাগিল। পরে যখন তাঁহার পার্থিব

দেহ মঞ্চোপরি শোভিত দেখিল. তখন বিশেষ রূপে তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইল। যাহারা শুনিল তাহারাও অবাক্ হইয়া গেল।

অপর ঘটনাটী এইরূপ। পরম গুরুদেবের এ সমাধি লাভের পর তাঁহার স্মরণার্থ বরোদারাজ এবং অন্যান্য বহু শিষ্য ও ভক্ত-মণ্ডলী নিয়মিত দিনে এক বিরাট ভাণ্ডারার আয়োজন করেন। এই ভাণ্ডারার দিন একব্যক্তি ডাকোর হইতে গঙ্গোনাথে আসিয়া উপস্থিত হয়, ও এক লাড্ডু আমাদের গুরুদেবকে দিয়া বলে যে, আমাদের এ বুড়ো মহারাজ ডাকোরে ২।৩ দিন পূর্ব্বে এক ভাণ্ডারা দিয়াছিলেন, ও সেই ভাণ্ডারার এই এই প্রসাদ তাহার দ্বারা আমাদের গুরুদেবকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সকলে ইহা শুনিয়া অবাক্ হয়। গুজরাট প্রদেশে ডাকোর এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ও সেখনে শ্রীরণহর বলিয়া প্রসিদ্ধ এক বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন। ইহা গঙ্গোনাথ হইতে বহু দূরে অবস্থিত। বোধ হয় ৫০ ক্রোশের উপর হইবে। উক্ত ব্যক্তিও গঙ্গোনাথে আসিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কারণ সে আসিয়া শুনিল যে, বড় মহারাজ ১০।১২ দিন পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করিয়াছেন, ও এ দিনে তাঁহার স্মরণার্থ ভাণ্ডারা হইতেছে। উক্ত ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছিল যে, ২।৩ দিন পূর্ব্বে এই মহাত্মা ডাকোরে উপস্থিত হন, ও বহু মূর্ত্তিকে এক এক "লাড্ডু" ও এক এক টাকা দক্ষিণা দান করেন। পরে "উত্তরীয়া" যাইতেছেন বলিয়া চলিয়া যান। সেই ব্যক্তিকে এক "লাড্ডু প্রসাদ স্বরূপে দিয়া উহা আমাদের গুরুদেবের নিকট গঙ্গোনাথে পৌঁছাইতে বলেন। উক্ত ব্যক্তির এ সমুদয় বাক্য সহসা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিল না। বরোদা মহারাজের তরফ হইতে ইহার সঠিক সংবাদ লইবার বন্দোবস্তও হইল। এবং তদন্তান্তে ডাকোরে এরূপ ভাণ্ডারা দান যথার্থ বলিয়া সকলে জানিতে পারিল।

ক্রমশঃ।

মা আমার!

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

মা!

এখনো কি বুঝিয়াছি মহিমা তোমার?
হারায়েছি দেবি! তোমা স্নেহের আগার!
জঠরে ধরেছ দশ মাস দশ দিন;
অভাগা সন্তান তরে, অনিদ্রায় অনাহারে,
জাগিয়াছ বিভাবরী; কত কষ্ট চিন্
রয়েছে অঙ্গেতে তব, হবেনাক লীন॥
স্বার্থ-বিবর্জ্জিত মনঃ, সতর্ক প্রহরী,
ধরণী সমান ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা মরি!
শত অপরাধ করি, তবু ক্ষমার অধিকারী,
দোষের অধিক ক্ষমা করিয়াছ দান।
হায় দেবি! কেবা আছে তোমার সমান?
পৃথিবীও রোষে ফুলে ভূমিকম্প হয়,
তোমার গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্য বলিবার নয়;
সমুদ্র রতন সনে, সর্প আদি প্রাণিগণে,
রহে সদা পরিপূর্ণ; হৃদয় তোমার—
অতুল্য মাণিক্যপূর্ণ বাৎসল্য আধার।

মা!

বুঝি নাই কোন দিন তোমার করুণা।
আজি কাঁদি স্মরি হায়! তব স্নেহকণা॥
কেহ নাই মুছাইতে, অভাগার অশ্রুপাতে,
কেহ নাই শুধাইতে কুশল আমার।
তাই মনে পড়ে আজি শ্রীপদ তোমার॥
জায়া পুত্র কন্যা মিত্র সুহৃদ্ বেষ্টিত,

অতুল ঐশ্বর্য্য যার করতলগত,
সেও যদি মাতৃস্নেহে, সতত বঞ্চিত রহে,
অভাজন সেইজন জানি গো জননি !
স্বর্গাদপি গরীয়সি, স্নেহ-মন্দাকিনি !

মুখের মত।

লেখক—শ্রীযুক্ত হরিভূষণ রায়।

আজ প্রায় ৫।৬ বৎসর হইল সুধীর এম্, এ, পাশ করিয়াছে, কিন্তু তার এমনই কপাল যে এখনও পর্য্যন্ত একটি চাক্‌রি জোটাতে পার্‌লে না। সে কত আফিসে চাক্‌রির জন্য লিখিয়াছে, কত লোকের খোসামোদও করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল হইল না। বেচারা নিরাশ হইয়া চাকরির আশা ত্যাগ করিল। একদিন সে নিজের কুঁড়ের দাওয়ায় বসিয়া ভাবিতেছে, "কি করিলে দিন চলে? পিতার অর্জ্জিত ধনত প্রায় শেষ হয়ে আস্‌ছে, ভবিষ্যতে কি করা যায়?" ইতি মধ্যে গ্রামের মোড়ল মধু খুড়ো হুঁকা হস্তে সুধীরের দরজায় আসিয়া ডাকিল, "সুধীর! বাড়ীতে আছ নাকি?" সুধীর মোড়ল মশাইয়ের গলার আওয়াজ পাইয়া উত্তর দিল, "এইযে মোড়ল মশাই! আসুন।" মধু খুড়ো দরজা ঠেলিয়া ভিতরে আসিলেন, ও ধীরে ধীরে দাওয়ায় উঠিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ এ কথা, সে কথার পর মধু খুড়ো সুধীরকে শুনাইয়া বলিলেন, "আর যে দিন-কাল পড়েছে বাবা, আমাদের মত লোকের বাঁচাও দায় হয়ে উঠেছে। ঐ আমার বোন্‌পোটার একটা চাক্‌রি আর জোটাতে পার্‌লাম না, কত চেষ্টাই না ক'র্‌লাম কিন্তু কিছুই হ'ল না। আর তোমারও বোধ হয় এখনও কিছুই হ'ল না? তাই ভাবি বাবা, তোমার মত শিক্ষিত সোণার চাঁদ ছেলেও যখন চাক্‌রি পেলে না, তখন আমাদের বাড়ীর ছেলে ত কোন্ ছার। ও গাধার ত বিদ্যে থার্ডক্ল্যাশ পর্য্যন্ত, তাই নিয়েই উনি আবার চাক্‌রি, চাক্‌রি করে অস্থির হচ্ছেন। কাল নাকি অমলেন্দু বাবু বাড়ী এসেছেন, আর তিনি নাকি তোমাকে সঙ্গে করে কলিকাতায় নিয়ে গিয়ে তাঁর কোন এক বন্ধুর আফিসে কাজ করে দেবেন। তিনি বলেন, স্বর্গীয় বিমল আমার ছেলে বেলার ইয়ার, তার তার

ছেলেটা লেখাপড়া শিখেও কাজ পাবে না, এ আমার সহ্য হয় না। তা বাবা, আমার বোন্‌পোটার একটা গতি করে দিও। তোমারত একরকম হ'ল। দেখো, এ মধু খুড়োর কথা মনে রেখো।" মধু খুড়ো এ সকল কথার পর বিদায় নিলেন। যাবার সময় আবার বলে গেলেন, "দেখ বাবা সুধীর, আমার কথা যেন মনে থাকে।" সুধীর ব্যস্ত হয়ে বল্লে "সে আর আপনাকে অত করে বল্‌তে হবে কেন খুড়ো মশাই! আমার একটা কাজ হ'লেই ওরও একটা জুটিয়ে দেব, পারুক্ না পারুক্ পরের কথা, আর পেট থেকে পড়েই ত কেউ পণ্ডিত হয় না।" মধু খুড়ো আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিলেন, "কে বলে আমাদের সুধীরের বুদ্ধি নেই? যেমন বিদ্বান্ তেমনি বুদ্ধিমান্। তা বাবা, আমি এখন আসি।" মধু খুড়ো চলিয়া গেলেন, সুধীরও সঠিক খবর নেবার জন্য অমলেন্দু বাবুর গৃহাভিমুখে রওনা হইল। ক্রমে সুধীরের কলিকাতা যাইবার দিন আসিল। সুধীরের ইচ্ছা ছিল যে কুঁড়েখানা বেচে কিছু টাকা হাতে রাখ্‌বে। কিন্তু তার শত চেষ্টাতেও কেউ ঐ জীর্ণ কুটীরখানি ক্রয় করিল না। অমলেন্দুবাবু ও সুধীর কলিকাতায় আসিলেন। সুধীর এখন দিন কতকের জন্য অমলেন্দু বাবুর বাসাতেই রহিল।

অমলেন্দু বাবু একদিন সুধীরকে লইয়া তাঁর মস্ত বড়লোক বন্ধুর নিকট গিয়া তার চাক্‌রির কথা পাড়িলেন। ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ম্যাট্রিকটা পাস করেছ হে?" সুধীর মাথা নীচু করিয়া ধীর-কণ্ঠে উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" ভদ্র লোকটি অমলেন্দু বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "অমল! ওর চাক্‌রির জন্য ভাব্‌তে হবে না, ওকে কাল আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। তোমাকে আর কষ্ট করে আস্‌তে হবে না, ও একা এলেই হবে।" পরদিন সুধীর যথা সময়ে হাজির হইল। ভদ্র লোকটি একবার আড়চোখে সুধীরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওহে বাপু! তোমার বিষয় একটু ভাব্‌বার আছে। যদি কোন রকমে আই, এ, টা পাস কর্‌তে পার্‌তে তাহ'লে না হ'য় তোমার বিষয় যা হয় একটা কিছু কর্‌তে পার্‌তাম।" সুধীর অতি নম্রভাবে কহিল, "আজ্ঞে, আপনাদের কৃপায় আমি বি, এ, উপাধিটাও পেয়েছি।" ভদ্রলোক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তবে আবার কি। কাল এস ঠিক করে দেব।" পরদিন পুনরায় সুধীর হাজির হইলে ভদ্রলোক যেন বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "না হে বাপু! আমি এম, এ, পাশ করা লোক পেয়েছি। তা তুমি যদি এম, এ, টা দিতে তাহ'লে না হয় অমলের খাতিরে তোমায় রাখ্‌তাম।" সুধীর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া

বলিল, "হুজুর! আমি এম, এ, উপাধিটাও পেয়েছি।" ভদ্রলোক পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত হইয়া মনে ভাবিলেন, "আচ্ছা নাছোড় বান্দার পাল্লায় পড়েছি।" কিছুক্ষণ পরে প্রকাশ্যে বলিলেন, "আচ্ছা, কাল এখানে এস, তোমাকে আমার বাড়ীতে আপাততঃ একটা কাজ দিব, পরে কোন স্থানে আফিসে কাজ খালি হইলে তোমাকে সেই আফিসে নিযুক্ত করিয়া দিব।" সুধীর তার পরদিন ভদ্রলোকের বাটীতে উপস্থিত হইলে সেখানে তার দুবেলা খাওয়া, থাকা ও ছেলেদের পড়াইবার ঠিক হইল, মাহিনার কথা কিছুই ঠিক হইল না। সুধীর এইভাবে প্রায় দুই বৎসর কাটাইল কিন্তু এক পয়সাও মাহিনা পাইল না। সুধীরের আজ এমনই অবস্থা যে একখানা পরণের কাপড় ও একটি মাত্র জামা ছাড়া আর কিছুই নাই। এমন পয়সাও তার হাতে নাই যা দিয়া সে একখানা কাপড় কিনিতে পারে। এইরূপে প্রায় আরও তিন মাস গত হইল, তবুও তার কোনও উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল না। চতুর্থ মাসে ঐ ভদ্রলোকটির বাটীতে একটি বিরাট সমাগম হইবে। সুধীরের উপর গাড়ি ভাড়া চুকান ও লোকজনদের অভ্যর্থনা করার ভার পড়িল। ক্রমে ঐ দিন আসিল, সুধীর গেটে একজন সরকারকে লইয়া কাজে ব্যস্ত আছে। দেখা শুনা, আদর অভ্যর্থনা ইত্যাদি চল্‌ছে, এমন সময়ে সুধীরের সম্মুখ দিয়া একটি উলঙ্গ পাগল দৌড়িয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সুধীর যেন তাহা দেখিয়াও দেখিল না। এই ব্যাপারের কিছুক্ষণ পরে ভিতরে মহা হৈ, চৈ পড়িয়া গেল, শেষে দেখা গেল যে দুই, তিনটি দরওয়ানে মিলিয়া সেই উন্মত্ত পাগলটিকে গেটের দিকে আনিতেছে। সুধীর ব্যস্ত হইয়া দরওয়ানকে প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে দরওয়ানজী?" দরওয়ান সেলাম করিয়া উত্তর দিল, "বাবুজি, এই পাগল নে অন্দরমে একদম মাইজি লোগন্‌কা পাস্ চলা গেঁয়ি থি। বাবুনে বোলিন্ কি ইস্‌কা নিকাল দেও।" এই ব্যাপারে গৃহকর্ত্তা বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়া রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমাদের জন্য আমার কাল লোকের কাছে অপমান হ'তে হ'ল। কে ঐ পাগলটাকে ঢুক্‌তে দিয়ে ছিল বল, নইলে সকলকে তাড়াব।" সকলের অবস্থার কথা ভাবিয়া সুধীর উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আমি!" বাবু চোখ লাল করে বল্‌লেন, "তুমিত আচ্ছা Stupid, লেখাপড়া জেনেও এ রকম গাধার মত বুদ্ধির পরিচয় দিলে কেন? তোমাকে আর কাজ করতে হবে না, কাল তোমার যা কিছু আছে নিয়ে চলে যেও।" সুধীর নীরবে সব সহ্য করিয়া পরে কহিল, "হুজুর! আমার কোনই দোষ নাই; কারণ আমি ঐ

পাগলটাকে আমার Senior জ্ঞানে ভিতরে যাইতে দিয়াছিলাম। এই দেখুন না, আজ দুই বৎসর কাজ করিয়া আমার কাপড় সেলাই করিতে করিতে হাঁটু পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, তাই আমি ভাবিলাম যে, ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই আপনার পুরাতন কর্ম্মচারী, নতুবা উহার দেহে কাপড় থাকিত। এ ক্ষেত্রে আমি Junior হ'য়ে তাঁকে কি করে আট্‌কাই? হুজুর, আপনি এ সমস্যায় পড়িলে কি করিতেন?" এইরূপ মিষ্ট-জুতা খাইয়া বাবুর চোখ ফুটিল, তিনি সেই দিন হইতেই সুধীরকে ২০০৲ টাকা বেতনে আফিসে একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সুধীর ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও সে তার মধু খুড়োর কথা এক বর্ণও ভুলে নাই, এবং তাঁহার কথা রাখিবার জন্য যাহা কিছু করা সম্ভব সকলই করিতে আরম্ভ করিল।

শ্রী শ্রীচণ্ডীমঙ্গল বা কালকেতু।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

কালকেতু। ত্রিনি অঙ্গুরিটী দেবার সময় বলেছিলেন, এই যে অমূল্য রত্নটী দিলাম, এর দাম সাত কোটী টাকা। তুমি বল্‌ছ নয় আনা মাত্র। কাকে বিশ্বাস করি? নাঃ কাজ নাই, অঙ্গুরিটী ফিরিয়ে দাও। যাঁর কাছে পেয়েছি, তাঁকেই ফিরিয়ে দিই গে।

মুরারি। (স্বগতঃ) তাইতো কি করি? বদলে ফেলি। ছোঁড়াটা নেহাৎ গোঁয়ার। যে গোঁ ধরে তা ছাড়ে না। আচ্ছা, বসো বাবা! কষ্টি পাথরে ঘষে দেখি এটা কি? সোণাও নয়, তোমার গে রূপোও নয়, তবে এটা কি? বেল্লা পিতল ত এর চেয়ে ভাল।

আকাশবাণী হইল।

"হে বণিক! ত্যজ ছল, দেহ মূল্য বীরে,
সপ্ত কোটী স্বর্ণ-মুদ্রা সম্মান ইহার,
বাড়িবে তোমার ধন অভয়ার বরে,
দুঃখ না থাকিবে তব, সত্যবাণী সার।"

মুরারি। (সাশ্চর্য্যে) একি শুনি? রাজরাজেশ্বরী মা শঙ্করী বল্‌ছেন, এর মূল্য সপ্তকোটী স্বর্ণ-মুদ্রা। আর কেন? (প্রকাশ্যে) বাপ্ কালু! মনে কিছু ক'রোনা, এতক্ষণ ঠাট্টা তামাসা কর্চ্ছিলাম। এর দাম দিতে পারে এমন বণিক পৃথিবীতে নাই। তথাপি মায়ের কৃপায় আমার যা আছে, সর্ব্বস্ব দিয়েও অঙ্গুরিটী রাখ্‌ব। এস, তোমাকে মুদ্রাগুলি গুণে দিই গে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

নবম দৃশ্য—গুজরাট বন।

কালকেতু স্তব করিতেছেন।

গীত।

বাগীশ্বরী—একতালা।

ধন দিয়ে ধনেশ্বরি! বঞ্চিত করিলে দাসে।
অনিত্য পার্থিব ধন সকল সুগুণ নাশে॥
তুমি দেবি! রাজরাণী,
দুর্গা মাহেশ্বরী বাণী,
নিশুম্ভ শুম্ভ নাশিনী, অভয়ে! তার মা ত্রাসে॥
সকল দুর্গতি-খণ্ডী
মহিষ-মর্দ্দিনী চণ্ডী
ভীমা ভৈরবী চামুণ্ডী দৈত্য দল অনায়াসে॥
তুমি আদ্যা সনাতনী
কপালমালী-মোহিনী
কপর্দ্দিনী, ত্রিনয়নি! দেহ দেখা দীন দাসে॥

(ভগবতীর আবির্ভাব)

ভগবতী। তুষ্ট আমি স্তবে তব ওহে মহাবীর!
কি কারণে এ বন ভবনে
কাতর রোদনে মোরে করিলে স্মরণ?

কালকেতু। (প্রণিপাত পুরঃসর)
হেরিতে ও বিশ্বারাধ্য চরণ কমল

সদা পিপাসিত দাস।
মনো আশ মিটেনা আমার।
ধন দিয়ে ভাঁড়াইলে ওমা রাজেশ্বরি!
এত ধনে কি কাজ আমার?
যে ধনে মত্ততা আনে, নাশে সর্ব্বগুণ,
বিগুণ মানব মন করে অনুক্ষণ
ধনের চিন্তন, সেই ধনে অহঙ্কার বাড়ে
ভুলায় মা বিশ্বরমে! রাতুল চরণ।
তাই বলি জগদম্বে!
ফিরে দাও পূর্ব্বের জীবন
কাননে কাননে ফিরি করিব মা জীবন ধারণ॥

ভগবতী। আমার প্রসাদ বৎস বিফল না হবে,
গুজরাটে নগর বসিবে।
তুমি হবে রাজা এ বনের।
বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত সুচারু ভবন
রঞ্জিবে গো মানব নয়ন।
বৃথাই কি দিনু বৎস! সপ্ত কোটি ধন?
ধনের কি দোষ বীর! ধীর মহাজন
ধন বলে কত কর্ম্ম করিছে ধরায়—
ক্ষুধার্ত্তেরে অন্নদান, তৃষিতে সলিল,
অজ্ঞানে সুজ্ঞান দান, ব্যাধিতে ভেষজ,
দান ধ্যান ব্রত আদি হয় ধনবলে।
অনাসক্ত কর্ম্ম কর আমার আদেশে
কর্ম্মফল কর সমর্পণ!

(অন্তর্দ্ধান)

ব্যাধবেশে হনুমান ও বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ।

হনুমান। হেঁরে ছোঁড়া কালকেতু কাঁহা ছে রে?

কালকেতু। কে তোমরা?, কালকেতুকে কিসের প্রয়োজন?

বিশ্বকর্ম্মা। আরে পিরোজন কি শুন্‌বি? হামার এই চেঙ্গড়াটার কুস্তি লড়্‌বার বড় সাধ। তা শুন্‌ছি কালকেতু বলে একটা ছোঁড়া

নাকি মস্ত পহলমান, তাকে চিনিস্? কুথায় থাকে সে?

কালকেতু। আমিই কালকেতু।

হনুমান। বেশ বেশ। আর ঢুঁড়্তে হলো না। তা হামার সাথে থোড়া থুড়ি কুস্তি খেল্বি?

কালকেতু। তা খেল্তে পারি। কিন্তু অনর্থক লড়ায়ে বলক্ষয় করে কি হবে? তোমাদের আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে তোমরা আমার জাত ভাই। যদি মজুরের কাজে বাধা না থাকে, তবে তোমাদিগকে বড় কাজ দিতে পারি, অবশ্য তার মজুরি আগেই দেব। কারণ তোমাদের অবস্থা ভাল নয়।

বিশ্বকর্ম্মা। আমাদের অবস্থার কথা তুই কি ক'রে জান্বি রে ছোঁড়া! আমরা তোর জাত ভাই বলে কি বেরুণ খাট্বো নাকি?

হনুমান। খুব বড় মানুষের বেটা হয়েছিস্ না? এক থাপ্পড়ে তোর গাল তোড়েঙ্গে। হাম্রা তোর বেরুণিয়া মজুর?

কালকেতু। দেখ্, ব্যাধ হলেই হয় না। মুখের কথাগুলো একটু মধুর কর্ত্তে শেখ্। আমি কিছু অন্যায় বলিছি কি?

হনুমান। অনল্যায় বলে অনল্যায়! হাম্রা অগ্নি-কুলের ব্যাধ, কারু বেরুণ খাটিনা। তু কেনে এমন কথা কহিলি? লে কাণ মল, নাকে খৎ দে। (হাত ধরিলেন)

কালকেতু। (হাত ছাড়াইয়া লইয়া) আয় দেখি কে কাকে নাক খৎ দেওয়ায়।

(উভয়ের ধ্বস্তাধ্বস্তি। বিশ্বকর্ম্মা হাস্যমুখে নিকটেই দণ্ডায়মান)।

হনুমান। (স্বগতঃ) হাঁ কালকেতু নাম সার্থক তোর।

(ক্ষণকাল লড়াই করিয়া পরিশ্রান্ত কালকেতুর উপবেশন)।

কালকেতু। উপযুক্ত হয়েছে। এখন আমার একটা কথা রাখ, আমাকে যুদ্ধে অস্ত্র দিয়ে বধ কর। এই আমার শেষের নিবেদন।

হনুমান। ওঃ ভারি অভিমান দেখ্ছি। যুদ্ধে জয় পরাজয় ত আছেই। এ ত যুদ্ধ নয় রে। পবনতনয় হনুমানের সঙ্গে একটু কোলাকুলি মাত্র!

কালকেতু। (সাশ্চর্য্যে) আপনি কি সেই সুরাসুর বিজয়ী রামভক্ত পবননন্দন হনুমান? আমি কোন্ পুণ্যে সীতাকান্তের পদচ্ছায়ায়

শীতল ভক্ত-শ্রেষ্ঠ হনুমানের শ্রীচরণ দর্শন পেলেম। অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করুন দেব। (প্রণাম)

আর আপনি কে প্রভু!

বিশ্বকর্ম্মা। আমি ব্রহ্মার পুত্র বিশ্বকর্ম্মা। ভগবতীর আদেশে গুজরাট অরণ্যে নগর নির্ম্মাণের জন্য আগমন করেছি।

কালকেতু। (প্রণত হইয়া) ক্ষম দেব! অজ্ঞান নন্দনে।
দেব-যোগ্য সম্ভাষণ মুখে না জুয়ায়
রাখ পায় কৃপাবলোকনে।
হেরি মোরে দীন দুরাচারী
শুভঙ্করী কৃপা করি দিলেন দর্শন।
আদেশে তাঁহার গুজরাট ভীষণ কান্তার
কাটাইনু তাঁহারি দয়ায়।
এবে কৃপা করি
কর দেব যাহা আজ্ঞা তাঁর।

বিশ্বকর্ম্মা। রচিব অতুল হর্ম্ম্য বাসব-ভবন!
চণ্ডীর দেউল আর ভোগের আশ্রয়!
শিবের মন্দির শত, অনাথ-আশ্রম,
অন্নসত্র, জলসত্র, নাট্য-নিকেতন।
যেথানে যেমনি রত্ন সাজিবে নগরে
সাজাইয়া দিব বীর! গুজরাট পুরে।

হনুমান। চল বীর! দেখাও কানন,
অবিলম্বে কার্য্যারম্ভ করিব এখন।

কালকেতু। চলুন দেব! (সকলের নিষ্ক্রান্ত)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—কলিঙ্গ রাজসভা।

রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি ও সভাসদগণ।

(মাগধগণ গান করিতেছে। মৃদু বাদ্য বাজিতেছে।)

গীত।

হে রাজন্! মহিমার জ্যোতিঃ তব ব্যাপিয়া ভুবন।
রবি শশী বরিষে তব শিরে আশীর্ব্বাদ কিরণ।

চার্চ্চিত চন্দনে তনু
নবোদিত যেন ভানু
শঙ্কিত অরাতিবৃন্দ করিছে দূরে পলায়ন।
সূর্য্যোদয়ে তমো যথা সর্ব্ব দুঃখ নিবারণ।
(কিবা) দশদিকে গায় গান
তব অতুলিত যশোমান,
রক্ষিছ প্রকৃতি-পুঞ্জে রঞ্জিয়া চিত মন

রাজা। বন্দিগণ! আজ তোমাদের মুক্তি! জগন্মাতা চণ্ডীর পূজায় দিনে কেউ যেন নিরানন্দে না থাকে। মন্ত্রীবর! নগরে ঘোষণা প্রচার করে দাও যে প্রতি মঙ্গলবারে সমস্ত হিন্দু প্রজা এখানে চণ্ডী-পূজা কর্‌বে এবং প্রসাদ পাবে। কেউ যেন অভুক্ত না থাকে।

সকলে। জয় কলিঙ্গ মহারাজের জয়!

রাজা। জয় জগন্মাতা চণ্ডীর জয়!

সকলে। জয় জগন্মাতা চণ্ডীর জয়!

রাজা। মন্ত্রীবর! দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য সীমান্তের দুঃস্থ প্রজাগণ আবেদন করেছে। তাদের কি ব্যবস্থা করেছেন?

মন্ত্রী। আপনার আদেশে তথায় লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করা হয়েছে।

রাজা। না না মন্ত্রি! শুধু মুদ্রা দিলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে না। প্রচুর পরিমাণে তণ্ডুল, বস্ত্র, লবণ, তৈল এবং ফলমূলাদিও প্রেরণ করুন, এবং আপনি স্বয়ং গিয়ে সে সকল যথাযথ ভাবে বিতরণ করুন।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

রাজা। (স্বগতঃ) রাজকার্য্য কি কঠোর কর্ত্তব্যময়। যারা ভাবে রাজা কেবল প্রজার করসংগ্রাহক মাত্র, তারা ভ্রান্ত। প্রকৃতিরঞ্জনই রাজার কার্য্য। ত্রেতায় দাশরথি রামচন্দ্র প্রজা রঞ্জনার্থে প্রাণ-প্রতিম জানকীরে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, এই জন্যই প্রকৃতিরঞ্জক রাজার সুশাসনে শাসিত হ'লে এখনও প্রজাগণ রাম-রাজ্যের সঙ্গে সেই রাজ্যের তুলনা করে থাকে। (করযোড়ে) দয়াময়ি জগদম্বে! যে গুরুভার অধীনের শিরে স্থাপন করেছ, মা! সে গুরুতর ভার বহনযোগ্য শক্তি দিও মা শক্তীশ্বরি!

ক্রমশঃ।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৬শ বর্ষ | ১৩৩৭ সাল, অগ্রহায়ণ | ৮ম সংখ্যা।

শ্রীমদ্ বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাজ বালানন্দের অভীষ্টদেব

শ্রীমন্মহারাজ ব্রহ্মানন্দের কিঞ্চিৎ বিবরণ :—

এ তৃতীয় ঘটনাটী আমাদের গুরুদেব স্বচক্ষে দর্শন করেন।

এই মহাত্মার গঙ্গোনাথে যে স্থানে আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার সম্মুখে এক-খানি টিনের "ছাপর" ছিল। একটী খোলা বারান্দার সম্মুখেই ইহা ছিল। লেখক গঙ্গোনাথে যাইয়া ইহা দেখিতে পান নাই। কারণ বড় মহারাজের যে স্থানে পূর্ব্বে আসন থাকিত, এক্ষণে সে স্থান ও গঙ্গোনাথের মন্দিরের পূর্ব্বাংশ প্রভৃতি এক নূতন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গঙ্গোনাথের ধর্ম্মশালা ও রন্ধন-শালার মধ্যে ইহা ছিল। এখানে বসিলে গঙ্গোনাথ সর্ব্বদাই চক্ষুর উপর থাকিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে গঙ্গোনাথের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে অপর মন্দির হইয়াছে, ও পূর্ব্বের ভিতরস্থ বারান্দা এখন চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত হইয়াছে।

এজন্য মন্দিরের ভিতরে যাইবার প্রবেশ-দ্বার উত্তর দিকে হইয়াছে। এই নব-নির্ম্মিত মন্দির ও গঙ্গোনাথের প্রাচীন মন্দির এক্ষণে প্রাচীর-বদ্ধ হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্ব স্থানের অনেক নূতন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তবে পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট আসনের সামান্য একটু অংশ আছে মাত্র।

পূর্ব্বে আমাদের এই বড় মহারাজের যেখানে আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেখানে অখণ্ড ধুনী সর্ব্বদাই তাহার সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত থাকিত। উহারই পার্শ্বে একটী ছোট কুঠুরির মধ্যে একটি আলমারি দেওয়ালে এখনও বর্ত্তমান আছে। এই আলমারির এক প্রকোষ্ঠে এক অখণ্ড দীপক অহরহঃ প্রজ্জ্বলিত থাকিত। এখনও একটি অপরিসর ক্ষুদ্র গৃহে পূর্ব্বের মত অখণ্ড ধুনী ও দীপক রক্ষিত হয়, ও উহা প্রায়ই বাহির হইতে বন্ধ থাকে। আমাদের গুরুদেব বর্ণনা করিয়াছেন যে, ঐ ভাণ্ডারার দিন সমুদয় কার্য্যাদি শেষ হইবার পর তিনি যাইয়া সরস্বতী দেবীর গুহার সমীপস্থ স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। এ সরস্বতীর গুহা গঙ্গোনাথের মন্দির হইতে প্রায় ১৫০ হাত দূরে অবস্থিত হইবে। এই সরস্বতী-মন্দির এক পরম রমণীয় স্থান, এ স্থানে বসিলে চতুর্দ্দিকের বহুদূর পরিদৃষ্ট হয়। নর্ম্মদা নদী পাদদেশে প্রবাহিত আছেন, ও দক্ষিণদিকে বিন্ধ্যগিরি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

এখানে আমাদের গুরুদেব বসিয়া আছেন এমন সময়ে দেখিলেন যে, সেই টিনের ছাপরখানি হঠাৎ ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল যেখানে বড় মহারাজের আসন থাকিত, সেখানকার সমুদয় হঠাৎ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। ইহার পরক্ষণেই দেখিলেন যে, একটী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-শিখা সেই ঘর হইতে উঠিয়া ক্রমে আকাশের দিকে উড্ডীয়মান হইতে হইতে আকাশের শূন্যে যাইয়া মিলিয়া গেল। ইহা আমাদের গুরুদেব ও অন্যান্য ৩।৪ জন যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতে লাগিলেন, এবং ইহা দেখিয়া সকলেই বড় মর্ম্মাহত হইলেন। কারণ, আমাদের এ পরম গুরুদেবের শেষ স্মৃতি-স্বরূপ এক জ্যোতিঃখণ্ডও যেন এ গঙ্গোনাথ হইতে অন্তর্হিত হইল, ইহাই তাঁহারা সকলে ধারণা করিলেন। গুরুদেব বলেন যে, এ ঘটনার পর আর তাঁহার গঙ্গোনাথে থাকিবার ইচ্ছা হইল না। তিনিই আমাদের পরম গুরুদেবের প্রথম শিষ্য ছিলেন। এজন্য তিনি এখানকার গদি আমাদের গুরুদেবকেই দিয়া যান। কিন্তু উক্ত ঘটনার পর আর সেখানে অবস্থান করিতে গুরুদেবের ইচ্ছা হইল না। এজন্য ইহার পরদিনই তাঁহার গুরুভ্রাতা কেশবানন্দজী মহারাজকে "চাদর উড়াইলেন," অর্থাৎ গঙ্গোনাথের আসনে প্রতিষ্ঠিত

করিলেন। অন্যান্য গুরুভ্রাতা নিত্যানন্দজী, পৃথ্যানন্দজী প্রভৃতির উপর উক্ত স্থানের সম্যক্ পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া গুরুদেব সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বড় মহারাজের এই কৈলাস বাসের দিন স্মরণ করিয়া এখনও আমাদের গুরুদেব তাঁহার গুরুদেবের নামে এক ভাণ্ডারা বরাবরই রামনিবাস আশ্রমে দিয়া আসিতেছেন। গঙ্গোনাথেও ইহা সুসম্পন্ন হইবার জন্য প্রতি বৎসর তথায় তিনি মুদ্রা প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। আমাদের গুরুদেব প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, দুইটি বিষয়ের জন্য তিনি নিজেকে বড় ভাগ্যবান বলিয়া মনে করেন। নবম বৎসর বয়সে তিনি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া যেরূপ ভাবে পর্য্যটন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কখনও আশা করেন নাই যে, তিনি তাঁহার মাতৃ-দেবীর ও তাঁহার গুরুদেবের অন্তিম সময়ে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। কিন্তু এই দুইটীই তাঁহার ভাগ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। কিরূপ ভাবে আমাদের পরম গুরুদেবের দেহ রক্ষার সময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিয়া নিজ হস্তে তাঁহার সেবা ও সমাধি কার্য্য সমাধা করেন, উপরে তাহার বর্ণনা করা হইল। পূর্ব্বে মাতৃ-দেবীর অন্তিম কাল বর্ণিত হইয়াছে।

পরম গুরুদেবের সমাধি লাভের পর আমাদের গুরুদেব আর গঙ্গোনাথে গমন করেন নাই। তবে সেখানকার প্রতিষ্ঠা যাহাতে রক্ষিত থাকে, তজ্জন্য কেরাণীবাদের আশ্রম হইতে বরাবরই অর্থ সাহায্য ও সাময়িক পরামর্শ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। আমাদের গুরুদেবের ভ্রাতা কেশবানন্দজীর কৈলাস বাসের পর এ আশ্রমের ভার তৎশিষ্য কৈলাসানন্দজী গ্রহণ করেন। ইহার সহিত মহারাজের গুরুভ্রাতা নিত্যানন্দজীর কিছুদিন মনান্তর চলিয়াছিল। পরে এ নিত্যানন্দ মহারাজও দেহ রক্ষা করিয়াছেন। এই শেষোক্ত মহাত্মা পরম গুরুদেবের এক মর্ম্মরপ্রস্তরখোদিত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবিতসময়ে উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। লেখক স্বয়ং গঙ্গোনাথে যাইয়া এ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। সন ১৯২৪ সালে কেশবানন্দজী কেরাণীবাদে আসিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনি যাইয়া উক্ত সনের ফাল্গুন মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া উক্ত মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করেন।

আমাদের গুরুদেবের জীবন চরিতের সহিত এই বৃদ্ধ মহাত্মার জীবনের অতি সামান্য কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের বড়ই আনন্দানুভব হইল।

আমাদের শাস্ত্রের আদেশ শিষ্য গুরুর আদর্শই গ্রহণ করিবেন। শ্রীগুরুদেব ইহা পূর্ণরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন।

আমাদের গুরুদেব ও পরম গুরুদেব এই দুই মহাত্মার কার্য্যাবলী দেখিলে আমাদের মত অজ্ঞানী গৃহীগণের মনে হয়ত ভিন্ন ভাব উপস্থিত হইতে পারে। হয়ত মনে হইবে যে, ইহাঁরা বিরক্ত পুরুষ হইয়াও পুনরায় কেন ব্যবহারিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকেন। এজন্য স্মরণ করাইতেছি যে, এই মহাপুরুষেরা গৃহস্থাশ্রম হইতেই পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিবলে বৈরাগ্য লাভ করেন। এ বৈরাগ্যের মূল হইতেছে "নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকঃ।" দেখিবেন যে এই বৈরাগ্য লাভের সহিত তাঁহারা নিত্য বস্তুর প্রতি পূর্ণ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ও সেই কারণে কেবল "নেতি নেতি" করিয়া গুরুমার্গ প্রদর্শিত পথে ষট্‌কর্ম্ম সাধন রূপ অভ্যাসের সহিত অগ্রসর হইতে থাকেন। অনিত্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা এই সাধন সময়ে দেশ, জন্মভূমি, পিতামাতা, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, যশ-আকাঙ্খা, অর্থাভিলাষ, শরীরের প্রতি আরাম বা কোনরূপ সুখকর ব্যাপার, আশ্রম, শিষ্য বা নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান, এ সমুদয় উপেক্ষা করিয়া প্রায়ই পর্য্যটনে ব্যাপৃত থাকেন। এইরূপ করিতে করিতে তাঁহারা যখন "নেতি নেতি'র শেষে যাইয়া পূর্ণ সত্যে বা নিত্যে সুদৃঢ়রূপে আরূঢ় হন, তখন তাঁহারা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইহা পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করিতে থাকেন। এরূপ অবস্থা হইলে এই মহাত্মারা উপলব্ধি করিতে থাকেন—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥"

আর যখন এরূপ অবস্থা হয় তখন

"ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভি প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥"

তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানলাভ করিয়া "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু" হইয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় "সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বানো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ" হইয়া থাকেন। অপর দিকে যাহারা অজ্ঞানী তাহাদিগকেও পূর্ব্বোক্ত সৎ পথে লইয়া যাইবার জন্য অভিলাষী হইয়া থাকেন। এজন্য তাঁহারা নিজে জ্ঞানের পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় অধিরূঢ় হইয়াও

"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহং।"

যাহারা অজ্ঞানী ও কর্ম্মাসক্ত তাহাদিগকে এইরূপ মহাত্মাগণের শিক্ষা প্রদান অতিশয় আবশ্যক। এইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্তি না হইলে মনুষ্যগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবানও এজন্য কখনও দেহবানের ন্যায় হইয়া অবতার গ্রহণ করেন, এবং পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানী মহাত্মাগণও হইতেছেন তাঁহার অংশ বিশেষ। শ্রীভগবানও এজন্য বলিয়াছেন যে,—

"যদ্ যদ্ বিভূতি মৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবং॥"

এ ভারতবর্ষে যে সমুদয় মঠ বা আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে তাহা এইরূপ পূর্ণ জ্ঞানী ও ত্যাগী মহাত্মাগণের কৃপার জন্য। অদ্বৈতবাদীর শিরোমণি আচার্য্য শঙ্কর এজন্য এ ভারতের চতুষ্কোণে চারিটি মঠ সংস্থাপন করিয়া তাঁহার মঠানুশাসনে এরূপ আজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন যে,—

"কেবলং ধর্ম্মমুদ্দিশ্য বিভবো বাহ্যচেতসাং।
বিহিতস্তোপকারায় পদ্মপত্র জলং ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ সাধুগণের ঐশ্বর্য্য কেবল মাত্র ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ও বাহ্য বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তিগণের উপকার জন্য। কিন্তু এরূপ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও এই মঠাধীশেরা পদ্মপত্রের ন্যায় অসঙ্গ হইয়া চলিবেন। এজন্য এরূপ মঠে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইবেন তাঁহারা হইবেন

"শুচির্জিতেন্দ্রিয়ো বেদবেদাঙ্গাদি বিশারদঃ।
যোগজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রাণামস্মাস্থানমাপ্নুয়াৎ॥"

এই প্রকার মঠে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে পূর্ব্বে জিতেন্দ্রিয় ও যোগী হইতে হইবে। মঠের প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতি হইবে এরূপ আকাঙ্খা ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ ব্যবহার স্থাপিত করিতে হইবে প্রারব্ধের উপর। ইহাঁদের সাধনা পূর্ণ পুরুষকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। যৌবনের উদ্দাম সময়ে ইহাঁরা কঠোর সংযমী। ইহাঁরা এ সময়ে ভিক্ষান্নজীবী ও সর্ব্বদা বিচরণশীল। যে সময়ে এই সংযমের পূর্ণতায় ইহাঁরা প্রতিষ্ঠিত হন সে সময়ে তাঁহারা কেহ কেহ আশ্রমে বদ্ধ হইয়া থাকেন। অতি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত আমাদের এই পরম গুরুদেব বা গুরুদেবকে কখনও চশমা ব্যবহার করিতে দেখি নাই। জীবনের প্রথমাবস্থায় ইহাঁরা গুরু, দেবতা ও

স্বভাবের উন্মুক্ততা ভিন্ন আর কাহারও সহিত আত্মীয়তা রাখেন নাই। গৃহস্থ-গণের সহিত এ সময়ে তাঁহাদের সংস্রব অতি বিরল। তাঁহাদের সাধু জীবনের কার্য্যাবলী ও নিত্যকর্ম্মাদি ঠিক ঘড়ীর ঘণ্টার সহিত যেন নিয়মিত ভাবে চলে। এক পরমাত্ম-জ্ঞানলাভ ভিন্ন তাঁহাদের অপর বুভুক্ষা কিছুমাত্র থাকে না। এ উভয় মহাত্মার জীবন অন্যদিকে তেমনি মহান্। ইহাঁরা সর্ব্বদাই উপদেশ দিয়া-ছেন যে, "মধুমক্ষিকা হো যাও" বা "যদ্যপি দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখিবে তাই। পাইলেও পেতে পার লুকান রতন॥" আমাদের বড় মহারাজের সকল আদর্শই আমাদের শ্রীগুরু মহারাজে দেখিতে পাইবেন।

আর একটি কথা দেহ রক্ষার পর যে কয়েকটী আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাও কেহ অসম্ভব মনে করিবেন না। যদি কেহ Bible বাইবেল পড়িয়া থাকেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, যীশুখৃষ্ট তাঁহার Cross এ দেহ রক্ষার পর পুনরায় দেখা দিয়াছিলেন।

কেনারাম ও তৎপুত্র বেচারাম।

একটি গল্প।

লেখক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল।

জেলা যশোহরের অন্তর্গত সোণামুখী একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। তাহাতে সমাজ-পতি রাজা বিমলাপতি জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু সকল জাতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিত। সমাজপতি ইচ্ছা করিলে কাহাকেও জাতিচ্যুত কিম্বা জাতির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত তাঁহার দানশক্তির পরিচয় পাইয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

দামু ঘোষ জাতিতে গোয়ালা। সুকুমারী নাম্নী জনৈকা যুবতী রমণী বিধবা হইয়া পতিতা হয়। যাহার সহিত ভ্রষ্টা হয়, তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া দামু ঘোষের আশ্রয় গ্রহণ করে। দামু ঘোষ তখন বিপত্নীক অবস্থায় ছিলেন। সুকুমারী তাহার আশ্রয়ে বর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ দামুর সংসর্গে সুকুমারীর গর্ভসঞ্চার হয়। পরে সে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করে। সেই

পুত্রের নাম হইল কেনারাম রায়, কারণ সুকুমারী রায় বংশীয়া কন্যা ছিলেন। কেনারাম ওরফে কিনু মাতৃ-বংশের পরিচয়ে পরিচিত হইল। কেনারাম পাঠশালায় অঙ্ক, ধারাপাত, শুভঙ্করী, শিশুশিক্ষা, তালপাতে লেখা, কলাপাতায় লেখা, পরে কাগজে লেখা প্রভৃতি শিক্ষা করিতে লাগিল। কেনারাম ওরফে কিনু অতিশয় মেধাবী বালক ছিল, তজ্জন্য গুরু মহাশয় তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। সে অতি শীঘ্র তাহার পাঠ অভ্যাস করিয়া ফেলিত। গুরু মহাশয় যাহা উপদেশ দিতেন, তাহা শীঘ্র মুখস্থ করিয়া ফেলিত। অন্যান্য পড়ুয়ারা তত শীঘ্র শিখিয়া লইতে পারিত না। কেহ বলিত, কেনারামের পূর্ব্ব-জন্মের সংস্কারে এত শীঘ্র বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিতেছে। অথবা কাঁচ যেমন সূর্য্য-কিরণ প্রতিফলিত করে ঢেলা তাহা পারে না। কেনারাম খুব হিসাবী, খুব হুঁসিয়ার ছেলে। তাহার জমা খরচ জ্ঞান ভাল ছিল। পড়া না করিয়া ভূষী-মালের ব্যবসা করিয়া খুব উন্নতি করিতে লাগিল। কেনারাম জিনিষ দেখিলেই খরিদ করে। খরিদ করা কেনারামের বাতিক ছিল। কেনারাম জায়গা, শালীজমি, বাগান, জোত, বাড়ী প্রভৃতি খরিদ করিতে আরম্ভ করিল। কেনারাম দলিলে "মহামহিম" ব্যতীত অন্য কোন পাঠ লেখে নাই। ক্রমশঃ অবস্থান্তর ঘটায়, বাটীতে শ্রীশ্রী৺শারদীয়-দুর্গা আসিলেন। কেনারাম নিজের বাল্যকালের কষ্টের বিষয় ভোলেন নাই। তিনি পরের কষ্ট বেশ বুঝিতেন। তিনি পূজার তিন দিন ভিখারী ভোজন করাইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। ছোট বাটীতে স্থান সংকুলান হইত না বলিয়া রাস্তার ধারে ভিখারী বসাইয়া খাওয়াইতেন। এই উন্নতির সময় কেনারাম সমাজপতি রাজা কমলাপতির সাহায্যে এক ভদ্র বংশে বিবাহ করিলেন। পাত্রীর নাম শতদলবাসিনী। তাঁহাকে দেখিতে সুশ্রী, রং গৌরবর্ণ, কোমলাঙ্গী, চক্ষু জ্যোতিঃপূর্ণ, মুখ-মণ্ডল মৃদুহাস্যময়। তাঁহাকে দেখিতে সুন্দরী বলা যায়। কেনারাম বিবাহ করিবার পর ব্যবসায় আরও উন্নতি হইতে লাগিল। প্রথমে একটী পুত্র, পরে একটী কন্যা হইল। পুত্রের নাম হইল বেচা-রাম ওরফে বেচু ও কন্যার নাম হইল মোক্ষদা। ৺কেনারাম শারদীয় উৎসবে বসত বাটীতে অধিক সংখ্যক ভিখারী এক সঙ্গে বসাইয়া খাওয়াইতে পারিতেন না বলিয়া একটী বৃহৎ উঠান-বিশিষ্ট বাটী তৈয়ার করিতে সংকল্প করিলেন। গ্রামের প্রান্তভাগে বিশ বিঘার এক বাস্তু জমি খরিদ করিয়া তাহাতে এক বৃহৎ অট্টা-লিকা তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিলেন। উক্ত বাস্তু জমিতে কমবেশ একশত নারিকেল গাছ ছিল। উক্ত নারিকেল গাছ না কাটিলে কেনারামের চকবন্দী

উঠান ও পূজার দালান তৈয়ার হয় না। গাঙ্গুলী মহাশয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ নারিকেল গাছ কাটিতে নিষেধ করিলেন। কেনারাম তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। কেনারাম ভাবিলেন, উহা কুসংস্কার মাত্র। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী সভ্যতা উচ্চ স্তরের বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল। বেচারামকে ইংরেজ শিক্ষক দ্বারা ইংরাজী শিখাইতেন। মেম আসিয়া তাহার কন্যা মোক্ষদাকে সেলাই শিখাইত। বেচারাম এক কুস্তির আখ্‌ড়া করিয়াছে। তাহাতে পাড়ার ছেলেরা কুস্তি শিখিত। কুস্তি শিখিবার জন্য একজন ইংরেজ (Wrestler) কুস্তিগির পালোয়ান নিযুক্ত হইয়াছিল। কুস্তির পর কিসমিস্, পেস্তা, বাদাম, বেচারাম নিজে খায়, এবং পাড়ার ছেলেদের খাওয়ায়। কেনারাম নিজে দাঁড়াইয়া পাড়ার ছেলেদের খাওয়া দেখেন। বেচারাম ছেলে বয়স হইতে একটু উদ্ধত স্বভাব বিশিষ্ট ছিল। একদিন গাঙ্গুলিদের কিনু চড় খাইয়া বাড়ী গেল। যখন কুস্তি খেলা শেষ হইল, কেনারাম আসিয়া ছেলেদের খাওয়াইতে লাগিলেন। কিনুকে না দেখিয়া বেচারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে বেচারাম সকল সমাচার অবগত করাইল। তৎপরে কেনারাম একটী থাল সাজাইয়া বেদানা, পেস্তা, কিস্‌মিস্, বাদাম প্রভৃতি একটী চাকরের সহিত লইয়া গাঙ্গুলিদের বাটিতে উপস্থিত। তৎপরে কিনুকে ডাকিয়া বেচারামের নিন্দা করিয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইতে লাগিলেন।

এ দিকে ছেলে যেমন বিলাসপ্রিয় ও অত্যাচারী হইতে লাগিল, কেনারামের স্ত্রী পতির যত্নে সন্তুষ্ট না হইয়া মর্ম্মাহত হইয়া রহিলেন। বাটীতে দিগম্বর পাইনের যাত্রার দল গাহিল। অধিকারী দিগম্বর পাইন আসরে নিজে নামিলেন। সকলে দিগম্বরের গান শুনিয়া পুলকিত হইল, কেনারামও খুব সন্তুষ্ট হইল। অন্দর মহলে দিগম্বরের গতিবিধি সর্ব্বত্র। তখন হইতে দিগম্বরের সহিত শতদলবাসিনীর জানা শুনা হইল। দিগম্বর দেখিতে সুপুরুষ যুবা। সুন্দর গান গাইতে পারে। শতদলবাসিনীর সম্মোহ উপস্থিত হইল। কেনারামের সাক্ষাতে কোনরূপ অনাচার হয় না বটে, কিন্তু স্পষ্ট জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী ভ্রষ্টা। বেচারামও অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক। "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ।" বেচারাম আর ত কেনারামকে মানে না। বেচারামও হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া ধার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বন্ধু, উপবন্ধু, চাটুকার প্রভৃতি সমাবেশ হইতে লাগিল।

কেনারাম এদিকে ১০০ একশত নারিকেল গাছ কাটিয়া এক বৃহৎ প্রাসাদ

প্রস্তুত করিয়াছে। তাহাতে ৫০০০ কাঙ্গালী একত্র বসিয়া খাইবে এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রকাণ্ড দশ ফোকর পূজার দালান। এই বৎসর নূতন বাটীতে দুর্গোৎসব হইবে স্থির হইয়াছে। আশা মায়াবিনী, কিন্তু মানুষ ভাবে এক প্রকার, হয় অপর প্রকার। কেনারামের পদস্ফুট হইল। ইংরেজ ডাক্তার ঘা অস্ত্র করিলেন। প্রস্রাবের দোষ ছিল। কেনারাম অস্ত্র সহ্য করিতে পারিলেন না, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।

কেনারাম প্রকাণ্ড অট্টালিকা, প্রকাণ্ড বাগান, বাগিচা, নগদ বিংশতি লক্ষ টাকা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। এখানে প্রকাশ থাকে যে, কেনারাম রায় জীবদ্দশায় তাহার এক মাত্র কন্যা শ্রীমতী মোক্ষদার সহিত বুনিয়াদি সিংহ বংশের শ্রীমান্ গুরুপদ সিংহের বিবাহ দেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কেনারামের স্ত্রী শতদলবাসিনীর সহিত দিগম্বর পাইনের ঘনিষ্ঠতা ছিল। কেনারামের মৃত্যুর পর তাহা ঘনীভূত হইতে লাগিল। কেনারাম গত হইলে বেচারামের আবির্ভাব হইল। কেনারাম ওরফে কিনু ক্রয় করে, বেচারাম ওরফে বেচু বেচিয়া নিশ্চিন্ত হয়, এই সংসারে স্বতঃসিদ্ধ। বেচারাম সাহেবিয়ানার চূড়ান্ত করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পরিচ্ছদ তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একটি পরিদর্শক নিযুক্ত হইল, তাহার মাসিক বেতন ৫০০৲ টাকা। অশ্বশালায় একজন ইংরেজ ২০০৲ টাকা মাহিনায় নিযুক্ত হইল। তাহার সাবান Toilet পরিদর্শনার্থ একজন ২৫০৲ টাকা মাহিনায় পরিদর্শক নিযুক্ত হইল। এক কথায় বেচারাম ষোল আনা সাহেব হইল। মিষ্টার জি, রায় ব্যতীত বেচারাম যায় সম্বোধন করিলে সে বিরক্ত হইত, কার্ড না পাঠাইলে দেখা করিত না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তোষামোদকারীগণের মাসহারা বন্দোবস্ত ও তাহাদের কথা শিরোধার্য্য হইল। এত বাবুগিরি অথবা সাহেবগিরি বিনা পয়সায় হয় না। পাওনাদারগণের বিল আসিতে লাগিল। বেচারাম একে একে পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। এখানে বেচারামের সাপক্ষে বলিতে হইবে যে, সে বারবনিতা গমন কিম্বা নিষিদ্ধ-ফল ভক্ষণ অর্থাৎ সুরা দেবীর উপাসনা কখনই করেন নাই। এদিকে দিগম্বর পাইনের পরামর্শে শতদলবাসিনী আদালতে মামলা জুড়িয়া দিল। প্রকৃত ঘটনা এই যে, কেনারামের মৃত্যুর পর অশৌচ অবস্থায় শতদলবাসিনী কেনারামের দানসাগর শ্রাদ্ধ করিবার প্রস্তাব করে, এবং বলে যে, তাহার গহনা বিক্রয় করিয়া স্বয়ং খরচ সরবরাহ করিবে। দিগম্বর এ বিষয় বেচারামকে বলে, তাহাতে বেচারাম উহা সাহেবিয়ানার বিরুদ্ধ জানিয়া এবং দিগম্বরের অনধি-

কার চর্চ্চা দেখিয়া তাহার মাতাকে বন্দুক দিয়া মারিতে উদ্যত হইলে শতদল-বাসিনী প্রাণভয়ে বাস্তু-ভিটা পরিত্যাগ করে, এবং দিগম্বরের তত্ত্বাবধানে থাকে। কেনারামের মৃত্যুর পর আদ্য-শ্রাদ্ধের দিনে তাহার স্থাপিত দালানে চপ্ কাটলেট ও প্রকাণ্ড উঠানে বাইনাচ্ হইতে লাগিল। কেনারামের ভিখারী-ভোজনের সঙ্কল্প তাহার একমাত্র সন্তানের দ্বারা লুপ্ত হইল। শতদলবাসিনী নালিশ রুজু করিয়া অর্দ্ধেক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইল। মোকর্দ্দমা খরচায় কেনারামের সাধের ভদ্রাসন যাহা ১০০ একশত নারিকেল গাছ কাটিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা মাটীর দরে বিক্রীত হইল। ইট, কাঠ, পাথর, প্রভৃতি পৃথক বিক্রয় হইল। বাড়ী মাঠ হইল, ঐ মাঠে পাড়ার ছেলেরা ফুটবল খেলিতে লাগিল। বাড়ীর চিহ্ন মাত্র রহিল না। ইতিপূর্ব্বে বেচারাম তাহার ভগ্নীপতি গুরুসদয় সিংহকে বিলাতে ডাক্তারি শিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিল; তিনি বিলাত হইতে ডাক্তারি শিখিয়া বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বেচারামের এরূপ দর্প ছিল যে, বাটীর বারান্দায় বসিয়া চুরুট খাইতেছে, এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ গৃহস্থ-প্রতিবাসী নিজের বাজার করিতে যাইতেছে দেখিয়া গয়ার, থুতু ফেলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বেচারাম! আমি যদি যথার্থই ব্রাহ্মণ-সন্তান হই, তবে তুই অতি শীঘ্রই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আমার মতন বাজার করিবি।" একটি একটি করিয়া বেচারামের বিষয় বিক্রয় হইতে লাগিল। বেচারামের চেতনা নাই। পরে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এক্ষণে বেচারামের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পথের ভিখারী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষায় জীবন যাপন করে, এমন সময় বেচারাম পীড়িত হইল। তখন শ্রীমান্ গুরুসদয় সিংহ বেচারামের দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে নিজের বাটীতে আশ্রয় দিলেন। পীড়িতাবস্থায় নিজ ভগ্নী মোক্ষদা এক্ষণে বেচারামের সেবা করিয়া তাহাকে সুস্থ করিলেন। ভগ্নীপতি গুরুসদয় বেচারামের কন্যাগণের একে একে বিবাহ দিতে লাগিলেন, এবং পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। কোন কারণে বেচারাম কলিকাতায় আসে, তথায় গাড়ী চাপা পড়িয়া তাহার অপঘাত মৃত্যু হয়। বেচারামের সকল সুখ মিটিল। নিমতলার শ্মশানে তাহার নশ্বর দেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইল। ইংরাজী বিলাসিতা ভোগের বিষময় ফল সাধারণে চক্ষে দেখিলেন। বেচারাম মিথ্যা মরেন নাই। তাঁহার দৃষ্টান্তে আমাদের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। সকলের জমাখরচ ঠিক রাখা উচিত, নচেৎ বেচারামের মত হইবে।

মস্তক-মুণ্ডন।

লেখক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

রামসদয় বাবুর ছয় পুত্র, তিন কন্যা, পত্নী ও স্বয়ং লইয়া সংসারে এগারোটী লোক। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের কোন নির্দ্দিষ্ট আয় নাই। একমাত্র ভরসা ভগবানের কৃপা। আত্মীয় স্বজন অনেক আছেন, কেহ বড় একটা সংবাদ লন না, কারণ নিজে তিনি গরিব। এ সংসারে গরিবের খবর কেহ লইতে ইচ্ছা করেন না, পাছে কিছু সাহায্য করিতে হয়। রামসদয় বাবু সেজন্য বিন্দুমাত্র দুঃখিত নন। কারণ তাঁহার ভরসা ভগবান।

একদিন পত্নী নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আজ কোন সামগ্রী নাই, কিসে কি করিব কিছু ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছি না।" শুনিবামাত্র রামসদয় বাবু একবার "হায় ভগবান্!" বলিয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "কি করিব, উপায় নাই, যাহা তাঁহার ইচ্ছা তাহাই হইবে।" গৃহিণী অধোবদনে অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রামসদয় বাবু বাহির হইলেন। কোথায় যাইবেন কি করিবেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া ব্যাকুল চিত্তে ভগবানের নাম করিতে করিতে এক কাবুলির নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "আমাকে চল্লিশটি টাকা কর্জ্জ দিতে পার?" সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সুদ বাবদ পাঁচ টাকা কাটিয়া লইয়া পঁয়ত্রিশটি টাকা দিল। প্রতি মাসে প্রতি টাকায় দুই আনা হিসাবে সুদ দিতে হইবে। এই অতিরিক্ত সুদে টাকা লইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "প্রতি মাসে ইহাকে পাঁচ টাকা সুদ দিতে হইবে। কিন্তু কি করিব, উপায় নাই, যখন অন্য কেহ কর্জ্জ দিবে না, তখন বাধ্য হইয়া উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় এই সুদে টাকা কর্জ্জ লইলাম। ভগবান, তুমি ইহাই দেখিও যেন নিয়মিত ভাবে মাসে মাসে সুদ দিতে পারি, এবং অবিলম্বে টাকা পরিশোধ করিতে পারি।" কাবুলিকে বলিলেন, "তুমি এই টাকার জন্য আমাকে তাগাদা করিও না। আমি মাসে

মাসে তোমাকে এখানে আসিয়া গোপনে সুদ দিয়া যাইব। তুমি এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।" সে তাহাই স্বীকার করিল।

বাড়ী আসিবার সময় প্রয়োজনীয় সামগ্রী খরিদ করিয়া আনিয়া গৃহিণীকে অর্পণ করিলেন। গৃহিণী তখন পূজার ঘরে ভূমিতে শয়ন করিয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিতেছিলেন, "ভগবান! কেন আমাদের সন্তান-সন্ততি দিলে? যদি দিলে তবে তাহাদের ভরণ পোষণের উপায় করিয়া দিলে না কেন? এত কষ্ট, এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা আমাদের মৃত্যুই একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমাদের পরিত্রাণ কর দয়াময়! আর যে সহ্য করিতে পারি না। আমরা মাতা পিতা হইয়া যদি ক্ষুধার সময় সন্তানকে খেতে দিতে না পারি, তবে আমাদের এ বৃথা জীবন ধারণের কি প্রয়োজন প্রভু? আমার কায়-মনোবাক্যে এই প্রার্থনা যে, তোমার দেওয়া জিনিষ তুমি লও। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঘৃণিত জীবনের শেষ যবনিকাপাত কর। সকল জঞ্জাল ঘুচিয়া যাউক।" এই ভাবে কাতর প্রার্থনা জানাইতে ছিলেন। এমন সময় রামসদয় বাবুকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন, "এ সকল কোথা হইতে আনিলেন, কে দয়া করিয়া আমাদের ঘোর বিপদের সময় সাহায্য করিল।" স্বামী কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন. "যিনি দিবার তিনি দিয়াছেন, বিপদভঞ্জন মধুসূদন দিয়াছেন।" পত্নী বলিলেন, "সে কি প্রকার? তিনি কি মানব বেশধারী হইয়া এই সাহায্য দান করিয়াছেন? বড়ই কৌতুহল হইতেছে, আমাকে দয়া করিয়া বলুন।" স্বামী বলিলেন, "বিস্তারিত ঘটনা পরে বলিব. এখন সকলের খাবার প্রস্তুতের ব্যবস্থা কর, অনেক বেলা হইয়াছে, কেহ কিছু খায় নাই, বিশেষতঃ ছেলেদের অশেষ কষ্ট হইতেছে।" স্বামীর কথায় স্ত্রী দ্বিরুক্তি না করিয়া ভগবানের অপার করুণার কথা স্মরণ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

রজনীযোগে আহারান্তে পত্নী স্বামীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে ভগবানের দয়ার কথা বলিবেন বলিয়াছিলেন, এখন কি তাহা বলিবেন?" স্বামী বলিলেন, "সে কথা শুনিবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ কেন? তাহাতে বিশেষ কোন লাভ নাই, বরং শুনিলে তোমার মনে অন্য চিন্তা আসিয়া বর্ত্তমান শান্তি নষ্ট করিবে, তবে এই পর্যন্ত শুনিয়া রাখ, ভগবানের দয়া অসীম, তিনি সকল অবস্থায় সকলকে সকল রকম সাহায্য দান করিতেছেন, তবে তাঁহার

সাহায্য লইবার জন্য সকলে প্রস্তুত নহে।" স্ত্রী আর বেশী বিরক্ত করা উচিত নয় বলিয়া নীরবে রহিল, কিন্তু বিবরণ জানিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুলিত হইল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া রামসদয় বাবু বলিলেন. "শোন তবে বলি, কিন্তু এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। এমন কি পুত্রদিগকেও জানাইও না। এস্থলে বলা আবশ্যক. রামসদয় বাবুর চারিটী পুত্র কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত হইলেও বহু চেষ্টা করিয়া বহু লোকের নিকট গিয়া কর্ম্ম লাভ করিতে না পারায় বিফল মনোরথ হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়াছে। পুত্রেরা সকলেই ধর্ম্ম-ভাবাপন্ন, নিয়মিতরূপে প্রতিদিন শয্যাত্যাগান্তে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ কীর্ত্তন ও ধ্যান করিয়া অন্য কর্ম্ম করে। পত্নী ধর্ম্মশীলা, রামসদয় বাবুও অধার্ম্মিক লোক নহেন, কিন্তু বাহিরে কঠোরভাব অনেক সময় দেখাইয়া থাকেন, তাহাও কর্ত্তব্যের অনুরোধে; কিন্তু লোকে ভাবে বা মনে করে অন্যরূপ; তজ্জন্য তিনি কিছুমাত্র বিচলিত নহেন। লোকে নিন্দা করিবে বা প্রশংসা করিবে সে বিষয় তিনি চিন্তা করিয়া নিজ মনের শান্তি নষ্ট করেন না, এবং কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হন না, ইহাই তাঁহার দোষ বা বিশিষ্টতা যিনি যাহা খুসি ধারণা করিতে পারেন। সংসারটী বেশ সুখের সংসার, ভগবান সবই দিয়াছেন, মানুষ যাহা পাইবার বাসনা করে, যাহা পাইলে সংসারে প্রকৃত সুখী হয় তার সবই আছে, তবু দুঃখ, কষ্ট, যাতনা, হা-হুতাশ কেন? কেবল একটী জিনিষের অভাবে সব শূন্য, একটি জিনিষের যদি অভাব না থাকিত তাহা হইলে মণিকাঞ্চন যোগ হইত। সে জিনিষ আর কিছুই নয়, সে জিনিষ সামান্য অর্থের যোগাযোগ! এই অর্থের অভাবে এত বিড়ম্বনা, এত লাঞ্ছনা, এত অবর্ণনীয় যাতনা, এত প্রাণ ধারণে অনিচ্ছা, এত বিষাদমাখা ভাবে দিবা রজনী সমাচ্ছন্ন, যেন সব আছে অথচ কিছুই নাই। এই পূর্ণ হয় হয় আবার পরক্ষণেই সবই অপূর্ণ। অভাবগ্রস্ত জগতের ঘৃণিত কৃমি কীটের ন্যায় নিজেকে বোধ করিয়া মর্ম্মন্তুদ আত্মগ্লানিতে অস্থির। এই যে ভাব, এই যে তাণ্ডব লীলা, এই যে বিকট রহস্য—ইহা ভেদ করিয়া সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইয়া যিনি নিজ মনকে প্রশমিত করিতে পারেন তিনি অবশ্যই শান্তির সুবিমল জ্যোতিঃ দেখিয়া জীবন জনম সফল করিতে সক্ষম হন। তাঁহাকে আর বহিরঙ্গের দুঃখে, ক্লেশে, যাতনায় অভিভূত করিতে পারে না। অন্তরে শান্তির প্রস্রবণ প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হওয়ায় সকল অবস্থায় তিনি পরম ধন সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। "সুখ অভিলাষ মনে করিবে যে জন। সন্তুষ্ট রাখিবে সেই

আপনার মন॥ সকল সুখের মূল সন্তোষ জানিবে। অসন্তোষে হৃদে দুঃখ কেবল জ্বলিবে॥" তাই রামসদয় বাবু অনেকটা গোড়া বাঁধিয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করেন। সেইজন্য তিনি সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেকটা সুখী। অবশ্য সকল ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে যে তিনি সফলকাম হইতে পারেন তাহা নয়, তত্রাপি তিনি সকল সময় নিজ মনকে এবং নিজ পরিজনবর্গকে সাধ্যানুসারে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। সেই সাধু চেষ্টার দরুণ তিনি অনেকটা আনন্দে জীবনাতিপাত করিয়া থাকেন। সাধারণ মানব পর্য্যায়ের উপরে তাঁহার স্থান তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

একদিন মধ্যাহ্নে বাটিতে রামসদয় বাবু বসিয়া আছেন, মনে মনে অনেক আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছেন। সংসারের অভাব অভিযোগ কি করিলে নিবারণ হইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় পত্নী হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন, দেখিবামাত্র রামসদয় বাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! এই সংসারের অবস্থা, তাহার উপর আবার রোগ; চারিদিকে ভীষণ অভাবরাশি বিকট বদন ব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে সমুদ্যত, তাহার উপরে আবার রোগ! কোথা হইতে চিকিৎসা হইবে, কে সংসারের কাজকর্ম্ম করিবে, কে কার মুখে অন্ন জল দিবে? কে অবস্থা, সুন্দর অবস্থা, উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পুরস্কার বিধাতার দান এই আপস্মিক রোগ। হাতে এক কপর্দ্দক নাই, কিসে কি করিব। হা ভগবান "নড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" আমার কেন হইল? কি অপরাধ করিয়াছি, কিসের জন্য এই কঠোর শাস্তি বলিয়া দাও দয়াময়! আর যে পারি না, সহ্য করিবার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তুমি মঙ্গলময়, সকল অবস্থায় মঙ্গলবিধান করিয়া থাক, এই কি তোমার মঙ্গল বিধান? ইহা যদি মঙ্গল বিধান হয়, তবে অমঙ্গল বিধান কিরূপ প্রভো! জানি না তোমার লীলা, বুঝি না তোমার উদ্দেশ্য চিন্তাতীত—ধারণাতীত—কল্পনাতীত। কেন এমন হয়, কিসে এমন হয়, তাহা যদি জানিতাম তা হ'লে এত ক্ষোভ প্রকাশ করিবার কোন কারণ থাকিত না। দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, ক্রমেই পত্নীর পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সংসার একরূপ অচল হইয়া পড়িল, তাহার উপর রোগের চিকিৎসা। বাড়ীর সকলেই ব্যতিব্যস্ত, আবার সেই সঙ্গে একটি পুত্রেরও পীড়া হইল। এক পত্নীর পীড়ার চিন্তায় অস্থির, তাহার উপর পুত্রের পীড়া—ইহা ঠিক গোদের উপর বিস্ফোটক। দিবারাত্র অনাহার অনিদ্রায় রামসদয় বাবু কাল কাটাইতেছেন

তত্রাপি ভগবানের মধুময় নাম হইতে একবারও বিরত নহেন। অদ্ভুত বিশ্বাস, অপূর্ব্ব মনের বল, চিন্তা করিতে করিতে এক একবার অশ্রুমার্জ্জন পূর্ব্বক কাতর কণ্ঠে বলিতেছেন. "হে ভগবান্! আর যে কষ্ট সহ্য করিতে পারি না, দিন দিন অবসন্ন হইতেছি, সাহস দাও নাথ! ধৈর্য্য দাও প্রভো! বিশ্বাস দাও দয়াময়! আমার যে কেউ নাই। দেখা দিয়া প্রাণে শান্তি দান কর নাথ! তোমার আসার আশাপথ চেয়ে আছি, হৃদয়াসনে এসে বসিয়া হৃদয়, মন, প্রাণ শীতল কর। আর কতদিন হৃদয় শূন্য রাখিব দীনবন্ধু! যার কেউ নাই তার যে তুমি আছ, তবে আমার প্রতি বাম কেন করুণাময়! তোমার করুণায় সমস্ত জগৎ চলিতেছে, তবে আমি কি তোমার জগৎ ছাড়া? যার যতটুকু ভার বহনের শক্তি, তাকে ততটুকু ভার দিয়া থাক, কিন্তু আমার ভার যে আমার শক্তির অতীত। আমি যে ভার বহন করিতে পারিতেছি না।"

জন্মভূমির মায়া।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

দামোদর নদের তীরে ক্ষুদ্র পল্লী। বন্যার প্রকোপ নিবারণের নিমিত্ত সরকার বাহাদুরের যে বাঁধ আছে, সেই বাঁধের অনতিদূরেই ঝাউপাড়া গ্রামটি অবস্থিত। তথায় দুই চারি ঘর সাঁওতাল, মাল এবং বাগ্‌দী শ্রেণীর লোক বাস করে। উর্ব্বর মাটীতে নানাবিধ তরিতরকারী বারমাসই হয়, কেবল বর্ষাকালে যখন বাঁধের নিকটে বন্যার জলরাশি তরঙ্গায়িত হইয়া ঝাউপাড়ার নিরীহ অধিবাসিগণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে, তখনই তথায় কোনও ফসল বা তরকারী উৎপন্ন হয় না।

বাঙ্গালা সন ১৩২০ সালের বন্যার কথা বর্দ্ধমানবাসীর মনে সর্ব্বদাই জাগ্রত আছে। সে বৎসর খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত পল্লী সমূহের যে প্রকার ক্ষতি হইয়াছে এমনটি আর কোথাও হয় নাই। কিন্তু যে দিকে বাঁধ আছে সেদিকেও কম ক্ষতি হয় নাই। কত গৃহস্থের ঘরবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। কত গৃহস্থের সারা বৎসরের খাদ্য ধান্যের মরাই ভাসিয়া গিয়াছে, কত লোক গৃহ-হীন ও নিরন্ন হইয়া স্থানান্তরে চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসে নাই

কবিবর ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ ক্ষীর সম স্বাদুনীর।" নীর ক্ষীর সম স্বাদু বটে, কিন্তু ঐ নীরের তরঙ্গ তাড়নে বিরাট গুম্ফের বিপুল আস্ফালনে কর্কশ কণ্ঠের কঠোর গর্জ্জনে দামোদর তীরাশ্রিত জীবগণ একদা "ত্রাহি ত্রাহি" পলায়নপর হয়, তখন আর দামোদরের স্বাদু নীরের কথা মনে হয় না। তখন মনে হয় ঈশ্বরের প্রত্যেক কার্য্যই যদি মঙ্গলমণ্ডিত, তবে দামোদরের ভাষণ প্লাবনে কোন মঙ্গলময় কর্ম্ম সম্পাদিত হইতেছে? অজ্ঞ নর, পরম দয়ালু ঈশ্বরের কার্য্য সমালোচনার কি সামর্থ্য তার?

এবারও খুব বর্ষা হইয়াছে। অনবরত বৃষ্টিপাতে পথ, ঘাট, কর্দ্দমাক্ত এবং পিচ্ছিল। খাল, ডোবা, নালা, পুকুর প্রভৃতি জলে পরিপূর্ণ হইয়া চক্ চক্ করিতেছে। বর্ষাজলস্নাত আনন্দোন্মত্ত দাদুরাবৃন্দ মহাহর্ষে কলরব করিতেছে। পূর্ব্বের বাতাসে কৃষক-কুলের সিক্ত শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে। সংবাদ আসিল, দামোদর নদীতে "ঢল" নামিয়াছে। "ঢল" শব্দের অর্থ—অকস্মাৎ বন্যার আগমন, ঝাউপাড়ার মঙ্গলা মাঝির চার বছরের কন্যা টেংরি বাবাকে বলিল, "বাবা, বান এলো যে।"

মঙ্গলা। তাইতো ভাব্‌ছি রে কি কর্‌বো।

টেংরি। মামার বাড়ী চলো বাবা!

মঙ্গলা। বান পেরিয়ে কেমন করে যাবি? বান ম'লে যাব।

রঞ্জন কুর্ম্মি ভীতস্বরে মঙ্গলাকে কহিল, "মঙ্গলু, এবারও বুঝি বিশ সাল হয়। আমার ত পোতা তেমন উঁচু নয়, মাঝে ফাট ধরেছে। কোদাল কতক মাটি দিবি আয় ভাই! মঙ্গলা বলিল, "বান কি এখনো বাড়্‌ছে?"

রঞ্জন বলিল, "বাড়্‌ছে বৈ কি। সকালে যে গাছটা জেগে ছিল, এখন সেটা ডুবে গেছে।"

মঙ্গলার দুশ্চিন্তাপূর্ণ বদন-মণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রঞ্জন বলিল, "সে বারে তোর ঘরখানা ধুয়ে মুছে নিয়ে ছিল নয়? এবার কি হয়।"

মঙ্গলা বলিল, "তখন ত একা ছিলাম। ভয় ভাবনা ছিল না। যা ভগবানের মনে আছে তাই হবে। ভেবে কি কর্‌বো বল্?"

"তা ত বটেই" এই বলিয়া রঞ্জন ও মঙ্গল কালী তলার নিকট দিয়া যাইতে লাগিল। উভয়ে ভয়ে ভক্তিভরে বেদীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া অন্তরের কথা অন্তর্যামীকে নিবেদন করিল।

গৈরিক বসন পরিধান করিয়া উন্মত্ত দামোদর কড়্ কড়্ হড়্ হড়্ রবে গর্জ্জন করিতেছে। কত গাছ পালা কাঁটার ঝোপ ভাসিয়া যাইতেছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। পারাপারের নৌকা বন্ধ হইয়াছে। একটি তালগাছের গোড়ায় পাঁচগাছি নারিকেলের মোটা দড়ি দিয়া নৌকাখানিকে বাঁধিয়া পাটনী তীরে বসিয়া কত কি ভাবিতেছে।

মঙ্গলার কন্যাটি বড়ই চঞ্চল। কালো কোঁকড়ান কেশ-গুচ্ছ নাচাইতে নাচাইতে সে একবার কালীতলা একবার বাগ্‌দী পাড়া যাইতেছে, আর নূতন নূতন খবর আনিয়া মা বাপকে শুনাইতেছে। ঢেঁকি তলায় সে খেলার ঘর বাঁধিয়াছে। বাগ্‌দীর ছেলেগুলিকে ডাকিয়া আনিয়া সে পুতুলের বিয়ে দেয়, ভোগ রাঁধে, লোকজন খাওয়ায়, গান করে ও নাচে। আজ কাঁকড়ি পোড়া আর কচুর শাক দিয়া ভাত খাইয়া গণেশ মাঝির কন্যা টেংরীকে ডাকিতে গিয়া শুনিল যে নদীতে বান পড়িতেছে। অমনি দৌড়িয়া আসিয়া বাবাকে বলিল, "বাবা, বান বাড়্‌ছে যে।"

বালিকা বাণের কথা রোজই শুনে। কতদিন সে মার মুখে শুনিয়াছে যে, "ঘোড়াবান" ঘোড়ার মতই ছুটিতে ছুটিতে আসে, কেউ জান্‌তে না জান্‌তে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু "হাতীবান" ধীরে ধীরে আসে। ঘোড়াবান যেমন আসে তেমনি যায়, হাতীবান অনেক দিন থাকে, তবে যায়। "হড়কা" কেমন ক'রে হড়্ হড়্ শব্দে পৃথিবী ভাসিয়ে হড়াম্ হড়াম্ শব্দে গর্জ্জন করে। গোরু বাছুর, ছাগল, ভেড়া, মানুষ প্রভৃতি ডুবিয়ে মারে। এ সব সংবাদ টেংরির জানা আছে। তবুও লাল জলে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া হাসিতে হাসিতে সাঁতার দেয়। মাছ ধরার ভাণ করে কুলকুচি করিয়া হাসিতে থাকে, ঘটি ভরিয়া জল আনে।

এই আনন্দ প্রতিমাটি মঙ্গলার সর্ব্বস্ব। মঙ্গলা মাঝি সারা দিন জল পাইট খাটিয়া ক্লান্ত দেহে ঘরে আসিয়া ঘর্ম্মাক্ত শরীরেই টেংরিকে কোলে লয়, কত সুখ দুঃখের নালিশ শুনে, অজস্র চুমায় আচ্ছন্ন করে, পরে বলে "মা টেংরু, এক ঘটি জল আন্‌তো।" বালিকা তাড়াতাড়ি ঘটিতে করিয়া জল আনে। জল না থাকিলে মাকে বড়ই বকে। "দুষ্টু মেয়ে জল দিতে পারে না। আমি বাবাকে জল এনে দি।" এই বলিয়া ঘটি কাঁকে লইয়া নিকটস্থ ডোবায় জল আনিতে যায়। বাবা তাড়াতাড়ি আসিয়া বলে, "এই যে জল কলসীতেই আছে। আমি জল ঢেলে দিই এস," এই বলিয়া জল ঢালিয়া দেয়। তারপর একসঙ্গে ভাত

খাইতে বসে। এইরূপে এই দরিদ্র দম্পতী মহানন্দে টেংরিকে কোলে করিয়া স্বর্গ-সুখ ভোগ করে।

ক্রমে ক্রমে বান আসিয়া কালী-তলার নিকটস্থ খেজুর গাছের কোমর ডুবাইল। ঝাউ পাড়ার বালক, বৃদ্ধ ও যুবার বদনমণ্ডল দুশ্চিন্তায় কালো হইয়া উঠিল।

মঙ্গলার একখানি ঘর রাস্তার ধারেই। আর একখানি তাহার পাশে। ফেনিল চঞ্চল জলস্রোত ক্রমে ক্রমে আসিতেছে। অদূরে পূর্ণকায় দামোদরের ভীষণ ভৈরব নৃত্য। সে নৃত্যে কত কোটি জীবের ধ্বংস-সাধন হইতেছে কে জানে?

টেংরি এতক্ষণ দাওয়ায় বসিয়া বানের জল দেখিতেছিল। অনেক পোকা মাকড় জলে ভাসিয়া উঠিয়া ডুবিতেছে ও মরিতেছে। টেংরির কাতর বদনমণ্ডলে গভীর পাণ্ডুর ছায়া পতিত হইল। তাহার "সোঙ্‌রা" (সই) অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিল এবং অশ্রু গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কহিল, "আমাদের কি হবে ভাই?"

টেংরি। কি হলো ভাই?

সই। আমাদের ঘর যে পড়ে গেল ভাই! উভয়ে বন্যা জল বিধ্বস্ত কুটীর খানির ধ্বংস-দশা দেখিতে গেল। সইএর দুঃখ-মলিন বদনখানি দেখিয়া টেংরিরও মুখ শুকাইয়া গেল। আহা! এই পর্ণ-কুটীরে তাহার কত সুখের স্মৃতি নিহিত আছে। সর্ব্বনাশী দামোদরের বিপুল করাল গ্রাসে তাহা আজ ভাসিয়া যাইতেছে। বালিকা ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার খেলা ধূলির পুতুল (কাঠের পুতুল) টিকে কুড়াইয়া লইল। একখানি সবুজ রংয়ের সাড়ী (পুতুলের কাপড়) টেংরি দেখিতে পাইয়া সাগ্রহে কুড়াইয়া লইল এবং সইকে দিল।

এদিকে বন্যা-গর্জ্জনের বিরাম নাই। আকাশে জলভারাক্রান্ত জলদ-মণ্ডলী ঘোরাকারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। বাতাসের শন্ শন্, বন্যার হুড়্ হুড়্ রবের সঙ্গে শব্দ মিলাইয়া জন-মণ্ডলীকে ভীত সন্ত্রস্ত করিতেছে।

একটি বিপুলকায় শাল্মলী তরু বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিল। তাহার উল্টা-পাল্টা নিমজ্জন দেখিয়া ভয়ের সঞ্চার হয়। ওপারের কাশ কুসুমের শ্রেণী মাথা নোয়াইয়া রুষ্ট নদের প্রসাদ ভিক্ষা করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে মুষলধারায় বৃষ্টি নামিল। মঙ্গলা ও তাহার স্ত্রী একটি ভারে হাঁড়িকুঁড়ি তালাই ও থালা বাটী সাজাইল, অপর ধারে ছেঁড়া কাঁথা, পাঁঠার চামড়া এবং কয়েকটি মুরগীকে বাঁধিয়া রাখিল। তারপর কোন অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াইয়া বসিয়া রহিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে রঞ্জন কুম্মি আসিয়া মঙ্গলাকে বলিল, "আর রক্ষে নাই মঙ্গলা; এবারও সব শেষ। মঙ্গলা তাহার কথার কোনই উত্তর দিল না। তাহার ভাষা মূক হইয়াছে। বুক ফাটিয়া যাইতেছে, সে পুরুষ সেইজন্য কাঁদিল না। মঙ্গলার স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিল এবং টেংরিকে বুকে লইল। টেংরিও মায়ের সঙ্গে কাঁদিতে লাগিল।

তাহার পর আর কি? বন্যার প্রবল ধাক্কায় ঝাউপাড়ার অনেকগুলি গৃহ ধরাশায়ী হইল। ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। মঙ্গলাও ভারটি কাঁধে লইয়া নিঃশব্দে উত্তর দিকের রাস্তা ধরিল। ভীত বালিকার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া তাহার জননীও জলে জলে হাটিতে লাগিল।

বন্যার বেগ প্রশমিত হইবার মাস খানেক পরে টেংরি মাতাকে বলিল, "মা, বাড়ী চল্।"

মা। বাড়ী কোথায়? সে তো ভেসে গেছে রে।

কন্যা। না ভেসে যায়নি, চল মা! এখানে থাক্‌তে ভাল লাগে না।

ভাল কাহাকেও লাগে না। জন্মভূমির শ্যামল সৌন্দর্য্য প্রত্যেক দিন প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তাহাদের নয়নে প্রতিভাসিত হইতেছিল, কিন্তু কি করিবে? তারা যে বড়ই গরীব। কেমন ক'রে আবার ঘর নির্ম্মাণ করিবে?

মঙ্গলা বলিল, "টেংরি, লগাঁ ভাল, না ঝাউপাড়া ভাল? দেখ দেখি এখানে বানের ভয় নাই।

টেংরি। না বাবা, বাড়ী চল্, এখানে থাক্‌তে ভাল লাগে না। আমাদের সইদের দেখ্‌বো বাবা!

মঙ্গলা। তারা কি আছে রে? তারা পালিয়ে গেছে, আর বানের দেশে তারা আস্‌বেক নাই!

টেংরির এ কথা ভাল লাগিল না। তাহার বালিকা হৃদয় সেই দামোদরের বন্যা কলঙ্কিত ঝাউপাড়ার দৃশ্যই দেখিতেছে। আব্‌দার করিয়া বলিল, "না বাবা! আমাদের বাড়ী চল্। আমি কচুর শাক কাট্‌বো, মা ঝাউ রাঁধ্‌বে। আমি সইদের বাড়ীতে খেল্‌তে যাবো, চল বাবা!"

মঙ্গলার পুরুষোচিত বজ্রসার হৃদয় অল্পে অল্পে দ্রব হইতেছিল। ঝাউপাড়ায় টেংরির যখন জন্ম হয় তখন আনন্দের মত্ততায় মঙ্গলা একটি শূকর বলিদান দিয়া পাড়ার বন্ধু-বান্ধবগণকে হাঁড়িয়ার ভোজ দিয়াছিল। আজ সেই টেংরির সাদীর বয়স হইতেছে। তাহাকে কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে? যেখানে বন্য বালক

বালিকার উদ্দাম-নৃত্য নাই ; মত্ত মাঝি-মাঝিনীর নৃত্য শব্দে পল্লী মুখরিত হওয়ার আশা ভরসাঃ নাই। নেহাৎ বামুন কায়েতের গাঁ। এখানে কি তাহারা থাকিতে পারে ? তাহার দুরন্ত পাগল দামোদরের উদ্দাম-নৃত্য ভীত সন্ত্রস্ত করে বটে, কিন্তু অমন মিষ্ট জল, অমন প্রাণ মন শীতল করা জল, অমন পবিত্র জল ত পৃথিবীতে নাই। পাতার ছাওয়া কুটীর খানির দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিল। পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "তাই বটে মা। আমাদের ঝাউপাড়াই ভাল।"

একদিন মধ্যাহ্নকালে রঞ্জন-কুর্ম্মি সহর্ষে দেখিল যে, মঙ্গলা মাঝি হাঁড়িকুঁড়ি তালাই, মুরগী,, কাঁথা, থালা, বাটী ও চাটাইয়ের ভার স্কন্ধে ঝাউপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত। আনন্দে তাহাকে গাছতলায় বসাইয়া খরশান চুণ খাওয়াইল। টেংরিকে দেখিয়া বলিল, "কিরে টেংরি এতদিন কুথায় ছিলি ? আমাদিকে ভুলে গিয়েছিস নাকি ?"

টেংরি হাসিয়া বলিল "লগাঁ ভাল না। আমাদের বাড়ী কৈ বাপুয়া ?"

রঞ্জন আনন্দের সহিত মস্তক হেলাইয়া বলিল, "বাড়ীর জন্যে ভাবনা কিরে ! তোদিকে দেখে বাঁচলাম। চল্ চল্ মঙ্গলা আমার ঘরে, এই বলিয়া কোদাল হস্তে রঞ্জন-কুর্ম্মি পথ দেখাইয়া দেখাইয়া চলিতে লাগিল।

ভগবৎ-প্রাপ্তি।

লেখক—শ্রীযুক্তবলাইলাল মুন্সী, সাহিত্য-রত্ন।

আমাদের গোড়ার কথা ভগবৎ আরাধনা। সে কেমন আরাধনা, সে কেমন সাধনা, যাহার উপর বিশ কোটি হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষিত হইতেছে। অন্ধ বিশ্বাসী হিন্দু বারমাসে তের পর্ব্ব অনুষ্ঠান করেন। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজাইয়া ইষ্ট আরাধনা করেন। স্বধর্ম্মানুযায়ী ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী থাকেন।

আধুনিক হিন্দুর ধর্ম্মানুরাগ যেন কিছু লাঘব হইয়াছে। আমাদের অজ্ঞতায় একতা, সমতা ও বদান্যতার অভাব পরিদৃষ্ট হয়। আমরা হিন্দুত্বের দোহাই দিয়া ছুঁৎ মার্গের গভীর গহ্বরে নিপতিত রহিয়াছি। অনুন্নত ভ্রাতার শিক্ষা দীক্ষায় উদ্ধার পরিসাধন কল্পে এখনও আমরা বদ্ধ পরিকর নই।

বৈদিক কর্ম্মে আমরা সম্পূর্ণ অনধিকারী বেদ বিধানানুযায়ী যাগ যজ্ঞে আমরা একেবারেই অনভ্যস্ত। বেদের কঠোর গণ্ডীপ্রান্তে যাইবার ক্ষমতা আমাদের আদৌ নাই। বৈদিক যুগের মানুষেরা বৈদিক কর্ম্মে অধিকারী ছিলেন, কারণ তাঁহারা বহু সহস্র সহস্র বৎসর জীবিত থাকিতেন—জীর্ণ দেহ ছিল না।

বেদ বলেন—তুমি কৃচ্ছ সাধ্য তপস্যা করিয়া বিশেষ ভাবে ত্যাগ-স্বীকারে আত্ম-বলিদান দিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভাব উপলব্ধি কর। তন্ত্র কিন্তু তাহা বলেন না—তন্ত্র বলেন, এত বড় একটা বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে বিশেষ ভাবে জানা, তাহার জ্ঞানে জ্ঞানবান হওয়া কলির দুর্ব্বল জীবের পক্ষে কি সম্ভব ? তুমি কেবল তোমার এই দেহ-ভাণ্ডটীকে ভাল করিয়া দেখ বুঝ এবং জান, তাহা হইলেই তোমার এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে জানা হইবে—ঘরে বসিয়া তুমি বিশ্বের সংবাদ দিতে পারিবে।

সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের তন্ত্র সাধনাই আধুনিক কলিযুগের ব্যক্তির পক্ষে যুক্তিযুক্ত। হিন্দুর তন্ত্র-শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম, গূঢ়-তত্ত্ব-নিহিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, তন্ত্র-তত্ত্ব ও তন্ত্র রহস্যের পঞ্চ মকার রহস্য—পঞ্চম-সাধন, কামিনী মায়া সাধনে মহামায়া, সুরা সাধনে অমৃতলাভ প্রভৃতি তান্ত্রিক শাক্ত-সাধকবর্গের গুপ্ত রহস্যাদির সম্যক্ মর্ম্মানুভব করা সাধারণ সংসারীর ক্ষমতার অতীত। হিন্দুর নিগূঢ় তন্ত্র-সিদ্ধি নির্ভর করে মাতৃভাবাবলম্বনে।

ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া আরাধ্য দেব-দেবীর প্রতিচ্ছবিত্তের সন্নিবেশকে সাধনা বলা হয়। আরাধ্য বিষয়ের সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্তিই সাধনার উদ্দেশ্য। এই ইষ্ট সাধনার সার্থকতা সাযুজ্য।

শ্মশান ও মৃত্যু এই উভয়ের অতি নিকট সম্বন্ধ। সেই মৃত্যুভয় উপেক্ষা হেতু হিন্দুর শ্মশানসাধনা কর্ত্তব্য। হিন্দু ধর্ম্মে অগোণে ভগবৎ প্রাপ্তির এক শ্রেষ্ঠ পন্থা—শ্মশানে শব সাধনা। এই কঠোর সাধনায় সাধককে প্রথমে মৌনী, নিরহঙ্কারী, সুখদুঃখে সমবোধ, ভয়, লোভ, ক্রোধ ও অভিমানাদি শূন্য হইয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে হয়। মন্ত্র দ্বারা প্রেতদেহে আত্মার পুনঃ সঞ্চারে সাধক দেখিতে পান, এ জগতে কেবল মাত্র আত্মাই নিত্য বস্তু, আর সমুদয় পদার্থই নশ্বর। জড়বৎ এই সংসারে কেবল মাত্র আত্মার সঞ্চারে জীব ভাবের বিকাশ হইয়াছে। শব সাধনায় কৃতী মহাপুরুষ দেখিতে পান, মায়াময় এই বিশ্বের অন্তর্নিহিত কেবল মাত্র মহাশক্তি আত্মাই বিরাজিত। অতএব

শব-সিদ্ধ মহাপুরুষ মায়া মোহকে সহজে উপেক্ষা করিতে পারেন। মায়া মোহ হইতে সংযোগ বিয়োগ, অভাবজাত সুখ দুঃখের অনুভূতি হইয়া থাকে, কিন্তু মায়ার স্থানে সংসারে সতত এক অপরিবর্ত্তনীয় আত্মারূপী—নিত্য সত্য বস্তুর অবস্থান অবলোকন করিয়া সিদ্ধ মহাপুরুষগণ সুখ দুঃখ হৃদয়ে স্থান দেন না। নিজদেহ, পরদেহ, জড়বৎ শবদেহ ইহাদের পৃথকত্ব অনুভব না হওয়াতে শব-সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষ ক্রোধ ও অভিমানাদি শূন্য হইয়া থাকেন। কেবল মাত্র শব-সাধনা দ্বারা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারা কোনও কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন, তাঁহারা নিমিত্ত মাত্র।

অনন্ত আকাশের ন্যায় নিশ্চল শবরূপ মহাকালের (পুরুষের) উপর ত্রিভুবন-প্রসবিনী মহাশক্তি (প্রকৃতি) কালী নামে অভিহিতা। সৃষ্টির আদিতে সকলই অন্ধকার, সকলই কালো ছিল, তাই মা আমাদের কালো রূপে বিভূষিতা। তন্ত্রে ধ্যানে উক্ত হইয়াছে :—"মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং।" অনন্ত কোটী সংসার সাগর-লহরীর ন্যায় মায়ের গর্ভ হইতে প্রাদুর্ভূত ও তাহাতেই লীন হইতেছে।

এ হেন মহামায়া আমাদের সর্ব্বময়, কেহ প্রভুভাবে, কেহ পিতৃভাবে, কেহ কেহ মাতৃভাবে, কেহ সখীভাবে, এবং কেহ বা দাসভাবে—মায়ের আরাধনা ও উপাসনা করিয়া থাকেন। শীত প্রধান ইউরোপবাসী ও অন্যান্য খৃষ্টধর্ম্মা-লম্বীগণ পিতৃভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন। গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষের শাক্ত-গণ মাতৃভাবে, শৈবগণ পিতৃভাবে, ব্রাহ্মণগণ দাসভাবে, এবং বৈষ্ণবগণ সখী-ভাবে মাতার অর্চ্চনা ও ভজনা করেন।

ইচ্ছাময়ী মা আমাদের স্বাহা, স্বধা, বেদের ওজোময়ী শক্তি, বেদান্তের পরা ব্রহ্ম, সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতি, ন্যায়ের ব্রহ্ম, আত্মা, প্রকৃতি ও পরমাণু। আবার ইনিই খৃষ্টানের বাইবেলের যীশু এবং মুসলমানের কোরাণ, হাদিসের খোদা।

হিন্দুধর্ম্মে শ্মশানে শব-সাধনায় বহু একনিষ্ঠ সাধক ভগবৎলাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে বামাক্ষেপা, কমলাকান্ত ও শিবরাম স্বামী প্রভৃতি শব-সাধনায় সুনিপুণ ভক্ত এবং সাধনমার্গের পুরোহিতগণের নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

অতি অল্পকালের মধ্যে ভগবৎ লাভ, একমাত্র হিন্দুর তন্ত্র-শাস্ত্রের শব-সাধ-নায় উল্লেখ করে। একমাত্র হিন্দুই শ্মশান-সাধনায় অচিরে ভগবৎলাভে ধন্য হ'ন।

উপস্থিত কি প্রকারে শব-সাধনা করিতে হয়, তাহার বর্ণনা করিব। শনি ও মঙ্গলবারের স্বাতী নক্ষত্রের গভীর অমানিশিতে এই শব-সাধনার প্রশস্ত সময়।

ইহা অতি বীভৎস কর্ম্ম। এই সাধনায় একটী মৃত শবদেহ লইয়া তাহার বক্ষের উপর বসিয়া গুরু-প্রদত্ত দ্বি-অক্ষর বিশিষ্ট ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে হয়। এই সাধনায় সাধককে নিজ বিঘ্ন হেতু প্রায় ৩৷৷০ হস্ত পরিমিত এক গণ্ডী কাটিয়া রাখিতে হয়। সাধক মন্ত্রপূত করিয়া উক্ত ৩৷৷০ হস্ত পরিমিত স্থান চিহ্নিত করিয়া দেন। ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী, লাকিনী, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি বহু শরীরী ও অশরীরী অপদেবতা শব সাধকের সাধন-পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে। কিন্তু তাঁহার উক্ত ৩৷৷০ হস্ত পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে তাহারা কেহ যাইতে পারে না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাধককে কুবের সদৃশ অতুল ধন রত্নের অধিকারী হইতে লোভ দেখায়। কেহ বা এককালীন শত সহস্র বজ্র নির্ঘোষবৎ বিকট শব্দে ত্রিভুবন কম্পিত করিয়া ভয় দেখায়, কেহ বা বিশাল মুখ ব্যাদন করিয়া ভক্ষণ করিতে অগ্রসর হয়। আবার কেহ বা স্বর্গের অপ্সরী, মেনকার ন্যায় অতুলনীয় রূপে রূপবতী হইয়া যৌবনের মোহে ভুলাইতে যায়। মূলে সকলেই সাধককে সাধন-পথে নিবৃত্ত হইতে বলে, এবং বহুবার বহুরূপে পরীক্ষা গ্রহণ করে। প্রকৃত শব-সাধকের মন্ত্র বলে—"অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা বিঘ্ন কারকাঃ"—কোনও শরীরী কিংবা অশরীরী তাঁহার কোনও বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না।

সাধক গভীর সাধনায় নিমগ্ন আছেন, এদিকে জড় শবটার শরীরে আত্মার পুনরাবির্ভাব হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করিল। কখনও সাধককে মুখ ব্যাদন করিয়া ভয় দেখায়, আবার কখনও বা তাঁহাকে ধরাশায়ী করিতে যত্নবান্ হয়। সাধক মন্ত্রবলে শব দেহের মুখ-গহ্বরে কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংস টুক্‌রা দিয়া নিরস্ত করেন। শবদেহী খাদ্য না পাইলে সাধকের বহু অনর্থ ঘটাইতে পারে। এমন কি তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে পারে। শব-সাধনাভিজ্ঞ সাধক শব এবং প্রেতাদি ভয়ে কিছুমাত্র ভীত হন না। শব-সাধনায় শব এবং ভূত প্রেতাদির ভয়ে যে সাধক ভীত হইবেন, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারেন। সাধককে সর্ব্বাবস্থায় অটল, অচল ও মরণজয়ী বীর হইতে হইবে। কখনও কখনও শুনা গিয়াছে, শব-সাধনে অনভিজ্ঞ সাধক শব-সাধনা করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া ভীষণ উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া কোনরূপে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছেন।

শ্মশানে শব-সাধনায় সাধককে নানা কঠোরতর পরীক্ষায় পরীক্ষিত করিবার পর মধুর নূপুর ধ্বনি করিয়া বরাভয়দাত্রী অভয়া সাধককে অভয় দিতে স্বয়ং সঙ্গিনী সহ আবির্ভাব হ'ন। সাধক চির-আরাধ্য স্বীয় ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হ'ন। হিন্দু ধর্ম্মের সাধনায় অচিরে এইরূপ ভগবৎ-লাভ বড়ই অতুলনীয়।

জগন্নাথ-দর্শন।

লেখক—শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ।

(১)

জয় জগন্নাথ, ত্রিভুবনপতি,
দারুব্রহ্মরূপে তোমার মূরতি
সুনীল অচলে সমুদ্রের কোলে
প্রতিষ্ঠা করিল ইন্দ্র দমন।
সৌন্দর্য্যের সার! ওরূপ কেমন?

(২)

সুন্দর মন্দিরে সাগরের তীরে
না ফেরে সংসারে যেবা তোমা হেরে,
কোথা সেই রূপ, ওহে অপরূপ!
যা দেখিলে আর বুজে না আঁখি,
সহস্রাক্ষ হয়ে শুধু চেয়ে থাকি।

(৩)

যে রূপ হেরিয়ে নিমাই পাগল,
আনন্দে বিভোর দেয় হরিবোল,
শ্রীক্ষেত্রে আবাস করে হরিদাস।
তব অদর্শনে পরমাদ গণে
হয় দিশেহারা চাহে না জীবনে।

(৪)

কোথায় তোমার সে রূপ মোহন
যাহা হেরে স্তব্ধ তব ভক্তগণ?
কেহ নাচে গায় পাগলের প্রায়,
হাসে কাঁদে কেহ বাতুল "বাউল",
তুমি তাহাদের সে দশার মূল।

(৫)

কেহ বা ত্যজিয়া প্রাণ-প্রিয়া সতী
পুত্র পিতামাতা প্রাণসম পতি
ধায় তোমা পানে, যেন আকর্ষণে
টানে হে চুম্বক! তব কণ্ঠস্বর
বংশীরব সম শুনে যেই নর,

(৬)

হয়ে আত্মহারা তোমা পানে ধায়,
জাতি, কুল, মান কিছু নাহি চায়।
ওহে জগপতি অগতির গতি!
দেখাও আমারে সে রূপ মোহন,
হৃদয়-মন্দির করিয়ে শোভন।
ঘুচাও দাসের মায়ার বন্ধন।

(৭)

জনস্রোত ওই করি ঊর্দ্ধহাত
ধায় তোমাপানে করে প্রণিপাত।
মদনমোহন! ভকতি অমন
দাও হে আমায় হরি দয়াময়!
সত্যানন্দ দাস করে অনুনয়।

(৮)

তোমায় হেরিলে সংসার-বন্ধন,
জাতি ভেদ আদি হয় হে মোচন;
চণ্ডাল ব্রাহ্মণে নাহি ভেদ মানে,
একের সন্তান, একই সংসার।
একত্র আহার একি চমৎকার!
উচ্চ নীচ বলি নাহিক বিচার।

শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতা প্রকাশিকা।

(মহীধর অবলম্বনে)

লেখক—শ্রীযুক্ত তারানন্দ ব্রহ্মচারী।

যদীয় বিলসজ্জটাশ্রয়লসৎফলা জাহ্নবী
পুনাতি ভুবনত্রয়ং নিখিলকল্মষ-ধ্বংসিনী।
ত্রিবিক্রমনুতোঽপ্যসৌ ভুজগমণ্ডলাভূষিতো
নমাম্যহমহর্নিশং বৃজিননাশকং তং শিবম্॥ ১
যৎপাদপঙ্কজরজঃ স্মৃতিপূজনাভ্যাম্
তৎ সংশ্রিতস্য দুরিতৌঘতমো বিলীনম্।
সেব্যং পরং সুবিমলং প্রতিভাপ্রদাতৃ
শ্রীমদ্‌গুরোশ্চরণযুগ্মমদঃ প্রপদ্যে॥ ২
ত্রয্যাঃ শিরোভূষণ সংহিতায়াম্
মিতাক্ষরাং শুক্ল-যজুঃ প্রকাশাম্।
জিজ্ঞাসবে স্বল্পধিয়েঽতি যত্নাৎ
প্রকাশিকাখ্যাং বিদধে সুটীকাম্॥ ৩
কার্য্যং ত্বিদং শিশুহিতায় ন বুদ্ধিসার
প্রখ্যাপনায় বিদধে সুধীত্বগর্ব্বাৎ।
কিং কুঙ্কুমস্য সুরভির্নিতরাং চ কান্তি
গো সর্পিষা ন, বিদুষামিতি ধারণাস্তু॥ ৪

ব্রহ্মপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়া বেদব্যাস মনুষ্যগণের মন্দমতি বিচার পূর্ব্বক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত নামক স্বীয় শিষ্য চতুষ্টয়কে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদের উপদেশ দিয়াছিলেন। এইরূপে পরম্পরায় বেদের মন্ত্র, উপনিষৎ ও ব্রাহ্মণ আদি ভেদে সহস্র শাখা উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য আদি স্বশিষ্যগণকে যজুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। যজুর্ব্বেদ শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমটীর ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রভাগে অগ্ন্যাধান, দর্শপূর্ণমাস, অগ্নিষ্টোম, ইষ্টি প্রভৃতির বিষয় যথাক্রমে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত থাকায় ইহার নাম শুক্ল-যজুর্ব্বেদ

হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়টীতে তাহার বিপর্য্যয় হওয়ায় কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ নাম ধারণ করিয়াছে। অথবা শুক্ল ও কৃষ্ণের ভেদ সম্বন্ধে একটী প্রসিদ্ধ কিংবদন্তী আছে। একদা কোন রাজবাটী হইতে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ উপস্থিত হইলে ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন বেদপারায়ণনিষ্ঠ স্বীয় শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য সমভিব্যাহারে রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য, রাজা বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনিদ্বয়ের ব্রহ্মতেজ ও বেদের সার্থকতা পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিয়া উক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যজ্ঞান্তে বৈশম্পায়ন যজ্ঞীয় প্রথা অনুসারে যাজ্ঞবল্ক্যকেই আশীর্ব্বাদস্বরূপ শান্তিজল প্রদানার্থ রাজ-সমীপে প্রেরণ করিলেন। তিনি শান্তিউদক সেচনান্তে রাজ-প্রদত্ত প্রভূত দক্ষিণা গ্রহণ পূর্ব্বক গুরু সহ স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যে গৃহে রাজা শান্তি-জল গ্রহণ করিলেন, সেই গৃহমধ্যে কতকগুলি তুষ-রহিত তণ্ডুলকণা ইতস্ততঃ বিকীর্ণ ছিল; মুনি-দ্বয়ের প্রস্থানান্তে রাজা সেই তণ্ডুল-কণা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে অবলোকন করিলেন, এবং ইহা যে শান্তি-বারি সেচন হেতু এরূপ সংঘটিত হইয়াছে তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইতে বাকী রহিল না। অতঃপর রাজা বেদ মন্ত্রের সার্থকতা ও মুনিগণের ব্রহ্মতেজ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্ত হইলেন। রাজা অপুত্রক ছিলেন; পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতঃ পুনরায় মুনিবর বৈশম্পায়নকে উক্ত ক্রিয়ার ভার অর্পণ মানসে তৎ-শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যকেও নিমন্ত্রণ প্রদান করিলেন। যথা সময়ে বৈশম্পায়ন গমনোদ্যত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে আহ্বান করিলেন। তৎ কালে যাজ্ঞবল্ক্য বেদপারায়ণ-নিরত-মানস হওয়ায় গুরু আজ্ঞা-পালনে বিমুখ হইলেন। গুরুদেব ক্রুদ্ধ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে তদুপদিষ্ট বিদ্যা ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য যোগবলে গুরূপদিষ্ট বিদ্যাকে মূর্ত্তি-স্বরূপা করতঃ বমন করিয়া দিলেন। সুতরাং বৈশম্পায়ন অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার অন্যান্য শিষ্য-বর্গকে উক্ত বান্ত (উদ্গার) ভক্ষণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন "গুরু আজ্ঞা গরীয়সী" ভাবিয়া তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণ তিত্তির পক্ষীর রূপ ধারণ পূর্ব্বক উক্ত বান্ত ভক্ষণ করিলেন। ইহা হইতেই তৈত্তিরীয় শাখার সৃষ্টি হইল, এবং উক্ত যজুর্ব্বেদের মন্ত্র সমূহ বুদ্ধির মলিনতা প্রযুক্ত কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ নামে প্রসিদ্ধ।

অতঃপর দুঃখিত-মানস বেদহীন যাজ্ঞবল্ক্য কঠোর তপস্যায় রত হইয়া সূর্য্য ভগবানের আরাধনা করতঃ যে বৈদিক মন্ত্রসমূহ প্রাপ্ত হইলেন, তাহাই সংসারে শুক্ল-যজুর্ব্বেদ নামে বিখ্যাত। মুনিশ্রেষ্ঠ এই শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতা জাবাল, বৌধেয়, কান্ব, মাধ্যন্দিন আদি স্বীয় পনরটী শিষ্যকে উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রুতিতে প্রমাণ আছে।"আদিত্যানীমানি শুক্লানি যজুংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যে-নাখ্যায়ন্তে" (বৃহ ৫।৫।৩৩) অর্থাৎ * বাজসনের সূর্য্যের নিকট শুক্ল অর্থাৎ পরিশুদ্ধ যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বেদের সহস্র শাখা ; তন্মধ্যে এই শুক্ল-যজুর্ব্বেদ সংহিতাকে মাধ্যন্দিন শাখা কহে। যদ্যপি যাজ্ঞবল্ক্য জাবাল আদি তাঁহার পনরটী শিষ্যকে এই বেদ শিক্ষা দেন, তথাপি পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় মাধ্যন্দিনের তপঃ প্রভাবে তাঁহারই নামে ইহা "মাধ্যন্দিন শাখা" বলিয়া প্রখ্যাত। এই মাধ্যন্দিন শাখা যাঁহারা জানেন বা অধ্যয়ন করেন, শিষ্য পরম্পরায় তাঁহাদিগেরও মাধ্যন্দিন শাখা বলিয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গল বা কালকেতু।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

(গীতকণ্ঠে জনৈকা ভিখারিণী বালিকার প্রবেশ)

গীত।

বালিকা। ভিক্ষা করি ফিরি আমি কেউ ত কিছু দেয় না।
ঘুরে ঘুরে শীর্ণ তনু আর বুঝি বয় না॥
জগতে কেউ নাইত দানী,
সবাই ধনের অভিমানী,
ধনী কেবল সংসাজা গো! দীনের দিকে চায় না।
অন্ধ আতুর ফকীর বেশে,
কত যায় আর কত এসে,
সে সব দুঃখী দেখ্‌তে গেলে মান বুঝি রয় না॥

প্রহরীগণ। আরে আরে হিঁয়া কাহে? নিকালো আবি, নিকালো। অন্দর দেউরি পর যা। হুঁয়া ভিক্ মিলেগা।

* বাজস্য অন্নস্য সনির্দানং যস্য স বাজসনিস্তদপত্যং বাজসনেয়ঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ

বালিকা। (কাতর ভাবে) ওঃ এখানেও সেই প্রহরীর প্রচণ্ড তর্জ্জন! কর্ত্তা কেবল সাক্ষী গোপালের ন্যায় দণ্ডায়মান। হায়! এই কি রাজাধিরাজ কলিঙ্গনাথের রাজ্য? তবে যাই রাজা! অন্যত্র যাই? যেখানে প্রবল পরাক্রমশালী ধনপতির যম-কিঙ্কর-সদৃশ নির্দ্দয় প্রহরীর রক্তচক্ষুর কটাক্ষ নাই। (প্রস্থানোদ্যতা)

রাজা। (শশব্যস্তে আসিয়া) যেও না মা, যেও না। এখনও বীর-কেশরী স্বর্গীয় রাজার পদাঙ্কবাহী অধম পুত্র বীরবাহু বর্ত্তমান। তোমাদের মলিন মুখে হাস্যরেখা দর্শনের জন্য এ দাস সর্ব্বদা উৎসুক। বল মা বল, তুমি কি চাও?

বালিকা। রাজা—

রাজা। না না "রাজা" নয়, "পিতা" বল। শুনে শীতল হই।

বালিকা। পিতা! আমার সংসারে কেউ নেই। মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, বন্ধু-বান্ধব সকলেই চলে গেছেন। একাকিনী সংসার-সাগরের প্রবল স্রোতে অসহায় ভাবে ভেসে চ'লেছি. আমায় আশ্রয় দাও পিতা!

রাজা। দিনান্তকালের বিজন প্রান্তরে শান্ত প্রকৃতির কোমল অঙ্কে তৃণ শয়নে শয়ন ক'রে মধুর স্বর বীণাবাদ্য শ্রবণেও এত তৃপ্তি পাইনি, আজ এই সংসার অরণ্যের একটি ক্ষুদ্র বিহঙ্গম কি যেন মধুর সঙ্গীতে আমার হৃদয় আকর্ষণ করলে! আমি তৃপ্ত হ'লেম, ধন্য হলেম। বালিকে! আজ হ'তে আমি তোমার সর্ব্ব প্রকার রক্ষার ভার গ্রহণ করলেম।

বালিকা। বাবা! বাবা! আমায় কি কোলে নেবে না? আমি যে দুঃখিনী ভিখারিণী।

রাজা। এস মা এস। কলিঙ্গপতির এই নীরস হৃদয়ে শান্তি বারি প্রদান কর্ত্তে আমার কোলে এস। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য! চিরপরিচিত কণ্ঠের মধুর পিতৃ-শব্দও কি এত মিষ্ট হয়? এ যেন সুধা সাগরে স্নাত হচ্ছি! আহা! মায়ের আমার কি কমনীয় রূপ। (কোলে লইয়া একদৃষ্টে মুখখানি দেখিতে দেখিতে) আহা মরি! মরি! ঈশ্বরের সৃষ্ট এই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুধায় কাতর মলিন বদনেও কি অপূর্ব্ব সুষমা!

বালিকা। বাবা! আমাকে মার্‌বে না ত?

রাজা। না না সে ভয় তোমার নাই মা! মার্‌বো কেন?

বালিকা। যদি কোনও দোষ করি—তাই বল্‌ছি।

রাজা। তুমি যে কোন দোষ কর্ত্তেই পার না মা!

যুগাবতার ও যুগধর্ম্ম।

(পৌরাণিক)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
কাব্যরত্নাকর।

চণ্ডী মণ্ডপের বারান্দায় শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ হইতেছিল। কথক মহাশয় ঋষভ দেবের কথা প্রসঙ্গে যুগ ধর্ম্মের কথা বলিতেছিলেন। একজন অসহিষ্ণু শ্রোতা বলিয়া উঠিল, "মহাশয় এক, দুই, তিন, চারি এই রূপেই পাঠ করি, এক, তিন, দুই, চারি ত শুনি না; আপনি প্রথমে সত্যযুগ, তৎপরে ত্রেতাযুগ, তৎপরে দ্বাপর, শেষে কলিযুগ বলিতেছেন, ইহা কিরূপ কথা?"

কথক মহাশয় কথা বন্ধ রাখিয়া শ্রীহরি স্মরণ করিলেন, এবং বলিলেন, ব্যাসাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় তর্ক করিতে নাই, কিন্তু তোমার ধৈর্য্য নাই। শ্রীমদ্‌ ভাগবত পাঠ সমাপ্তি পর্য্যন্ত স্থির থাকিতে পারিলে না। অতএব শোন, সংখ্যা গণনা, আর যুগ গণনা, একরূপ নহে। ধর্ম্মের সঙ্গে সংগতি রাখিয়া যুগের নাম-করণ হইয়াছে।

শ্রোতা। সে কি রকম?

কথক। চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি ঋষয়োঽব্রুবন্।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্॥
পূর্ব্বং কৃতং যুগং নাম ততস্ত্রেতা বিধীয়তে।
দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব যুগানি পরিকল্পয়ন্॥

অর্থাৎ ঋষিগণ ভারতবর্ষে চারি যুগের কথা বলিয়াছেন। আদিতে সত্যযুগ, তখন ধর্ম্মের চতুষ্পাদই অক্ষুণ্ণ ছিল। পরে ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ-ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তারপরে দুইভাগ ধর্ম্ম আর দুইভাগ পাপ অনুষ্ঠিত হওয়ায়

নাম হইল দ্বাপর। এখন বর্ত্তমান কলিযুগে সত্যযুগের বিপরীত আচরণ হইতেছে। একপাদ ধর্ম্ম, আর ত্রিপাদ পাপ। ধর্ম্মের চতুষ্পাদ কল্পনা করিয়া ৪, ৩, ২, ১ এইভাবে ধর্ম্মাচরণ নিরূপিত হইয়াছে।

শ্রোতা। প্রত্যেক যুগের পরিমাণ কি?

কথক। সর্ব্বশুদ্ধ মনুষ্য মানের গণনায় ৪৩২০০০০ তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার যুগ পরিমাণ। সত্যযুগ ১৭২৮০০০ বর্ষ। ত্রেতাযুগের পরিমাণ ১২৯৬০০০ বর্ষ। দ্বাপরের পরিমাণ ৮৬৪০০০ এবং কলির পরিমাণ ৪৩২০০০ বর্ষ। ইহাই মদ্‌ভাগবতের মত।

এক্ষণে যুগধর্ম্ম শ্রবণ কর:—

ধ্যানং পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥

সত্যযুগে ধ্যানই তপস্যা ছিল। ত্রেতায় জ্ঞান-যোগ, দ্বাপরে নানাবিধ যজ্ঞই ধর্ম্ম-স্বরূপ ছিল; সেইজন্য অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইত। কলিতে দানই ধর্ম্ম। এই দান নানাবিধ হইতে পারে, যথা—অন্নাদি দান দরিদ্রে। জ্ঞান দান অবোধে। ঔষধ ও পথ্য দান রোগীকে। জল দান তৃষ্ণার্ত্তকে। ধর্ম্ম উপদেশ দান ধার্ম্মিককে। প্রেম দান সর্ব্বজীবে। "হরিনাম" দান আচণ্ডাল দ্বিজে। অতএব এই যুগে দানই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। কায়িক বাচনিক ও মানসিক যে প্রকারেই হউক পরোপকারে নিযুক্ত থাকিবে। এলজন্যই শাস্ত্র বলিতেছেন, "দানাৎ পরতরং ন হি"।

শ্রোতা। সত্যযগে কোন্ দেবতা উপাস্য ছিলেন? সেই যুগে কোন্ কোন্ অবতার?

কথক। শাস্ত্র বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ জ্ঞানবলে সবই ব্রহ্মময় দেখেন। এই ঈশ্বর একমাত্র, কিন্তু লীলায় অনন্ত কোটী। তাঁহার স্বরূপ ঋষিগণ ধ্যান-মগ্না-বস্থায় কিছুমাত্র জানিয়াছেন, জানিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছেন। এই অবিশ্বাসের যগে সত্যযুগের কথা সকলের ভাল লাগিবে কি? এক ঈশ্বর, নিজের ইচ্ছায় স্বীয় বাম অঙ্গে প্রকৃতির সৃষ্টি করিলেন। তাঁহা হইতে তি ব-ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

ব্রহ্মা কৃতযগে দেবস্ত্রেতায়াং ভগবান্ রবিঃ।
দ্বাপরে দৈবতং বিষ্ণুঃ কলৌ রুদ্রো মহেশ্বরঃ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা সূর্য্যঃ সর্ব্ব এব কলিষ্বপি।
পূজ্যতে ভগবান্ রুদ্র শ্চতুর্ষ্বপি পিনাকধৃক্॥
ইতি কূর্ম্ম পুরাণম্।

"অবতার" কথাটির মানে "অবতরণকারী"। যিনি যুগে যুগে অধর্ম্মের অভ্যুদয় ও ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনার্থ অবতীর্ণ হইয়া লোক শিক্ষা প্রদান করেন, তিনিই অবতার।

এই অবতার তিন প্রকার—পূর্ণ, অংশ ও অংশাংশ। মৎস্য কূর্ম্মাদি অংশ অবতার। কপিলাদিও অংশাবতার। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পূর্ণাবতার। নারদাদি ভক্তগণ অংশাংশ। বেদব্যাসাদিও ঐ প্রকার। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—

"কৃতে যুগে পরং জ্ঞানং কপিলাদি স্বরূপভৃৎ।
দদাতি সর্ব্ব ভূতাত্মা সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥
চক্রবর্ত্তি স্বরূপেণ ত্রেতায়া মপি স প্রভুঃ।
দুষ্টানাং নিগ্রহং কুর্ব্বন্ পরিপাতি জগত্রয়ম্॥

দ্বাপরে বেদ বিভাগ করিতে ভগবান বেদব্যাস অবতার, কিন্তু "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে অবতার ধরা হয় নাই। কলিতে কল্কী অবতার, তিনি দুর্ব্বৃত্তগণকে ধ্বংস করিয়া পুনর্ব্বার সত্য যুগের প্রবর্ত্তন করিবেন।

শ্রীভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত ও তিরোহিত হন। শ্রুতি বলেন, "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" অর্থাৎ হে সৌম্য! এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল, সৃষ্টির পর তাহার আবির্ভাব হইয়াছে মাত্র; আবার প্রলয়কালে তাহার তিরোভাব হইবে (নাশ হইবে না। "নাশ বা ধ্বংস" এবং তিরোভাব এক কথা নহে)।

শ্রীগীতায় আছে :—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্তনয়ো স্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

অর্থাৎ অসৎ হইতে সৃষ্টি (উৎপত্ত) হয় না। আর যাহা সৎ বস্তু তাহার বিনাশ নাই। সুতরাং সৎ ও অসৎ এই উভয় বস্তুর তত্ত্ব-এই প্রকারেই তত্ত্বদর্শীগণ নিশ্চয় করিয়াছেন। দুধ সৎ, দধি অসৎ। দুধ হইতে দধি হইয়াছে। দুধের বিকার দধি। কিন্তু দধি হইতে আর দুধ পাওয়া যায় না।

ইশ্বর সৎ! তাঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। অবতারাদি অসৎ। তাঁহাদের তিরোভাবাবির্ভাব আছে, ধ্বংস নাই।

ক্রমশঃ।

জগদ্ভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৬শ বর্ষ } ১৩৩৭ সাল, পৌষ { ৯ম সংখ্যা।

শ্রীমদ্‌বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাজের পর্য্যটন।

শ্রীগুরুদেব অনেকবার আমাদিগকে শুনাইয়াছেন যে, সাধু জীবনে পর্য্যটন একটী মহা ব্রত বা সাধনা। যে সাধু রীতিমত ভাবে পর্য্যটন করেন নাই, তিনি কখনও পরিপক্ক বলিয়া ধর্ত্তব্য নহেন। যথার্থ জ্ঞান লাভের অভিলাষী হইলে, পূর্ব্বে ষট্ সম্পত্তির সাধনা আবশ্যক। এই ষট্ সম্পত্তি হইতেছে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান। রীতিমতভাবে কেহ পর্য্যটন ব্রত অবলম্বন করিলে উপরোক্ত সাধনাগুলি আপনা আপনি সাধিত হইয়া আইসে। ইহা কিরূপে হয়, তাহা গুরুদেবের উপদেশাবলিতে বিস্তারিত হইবে। এ কারণে অতি প্রাচীনকাল হইতে সাধু-সমাজে এই পর্য্যটন ব্রত নির্দ্দিষ্ট আছে। আমাদের গুরুদেব এ পর্য্যটন ব্রত অতি বিশাল ভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন।

তিনি এ ভারতবর্ষের বহু স্থান ও বহু তীর্থ বহুদিন ও বহুবার পরিদর্শন করিয়াছেন। সম্যক্ প্রকারে সে সমুদয় এক্ষণে বিবৃত করা বড়ই সুকঠিন। ইহার কারণ, ইহা বহু পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে। এ সকল যে প্রকাশ কর

হইবে তাহা কেহ মনেও করে নাই, ও সেইজন্য ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াও রাখা হয় নাই। নবম বৎসর বয়সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়াই তিনি পর্য্যটন আরম্ভ করেন। ইহা হইল প্রায় ৮০ বৎসরের উপরের ঘটনা। এ সময় হইতে ইহা আরম্ভ হইয়া বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার এ ভ্রমণের বিরাম ছিল না; কেরাণীবাদের আশ্রম প্রায় ২৫।২৬ বৎসর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা হইবার পর এ ভ্রমণ কতকটা বন্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে। সুতরাং বলিতে হইবে যে, তাঁহার জীবনের প্রায় ৬০ বৎসর কাল তিনি এ পর্য্যটনেই ব্যয় করিয়াছেন। বহু সাধুজীবনেই এত সুদীর্ঘকালব্যাপী পর্য্যটন দেখা যাইবে না। তাঁহার এ পর্য্যটন অতি দুঃসাধ্য ভাবেই সংঘটিত হইয়াছে ও ইহা নানা বিস্ময়-ব্যাপারে পরিপূর্ণ। ইহা কিরূপ কষ্টকর ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা অপরের বোধগম্য হওয়া কঠিন। আধুনিক রেলবর্ত্মের অধিকাংশই সে সময়ে হয় নাই। রেলপথে ভ্রমণ সদাচারের ও ব্রহ্মচারী নিয়মের বহুল প্রকারে ব্যত্যয় উপস্থিত করে বলিয়া তিনি অধিকাংশ সময়ে পাদচারী হইয়াই ভ্রমণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ কোন কোন স্থানে রেলপথ থাকিলেও তাহার জন্য অর্থ ব্যয় করিবার সামর্থ্যও ছিল না।

এ সময়ের দেহরক্ষা ছিল ভিক্ষোপজীবিকা দ্বারা, সুতরাং অর্থাভাবও লাগিয়াই ছিল। এ পর্য্যটনকালে তিনি বৃক্ষতল, দেবমন্দির বা কোন সাধুর আশ্রম ব্যতীত কখনও কোন গৃহস্থের আবাস গ্রহণ করেন নাই। নিজের আসবাব ছিল আসন, লোটা, কম্বল, কৌপীন প্রভৃতি সামান্য আচ্ছাদন বস্ত্র, কয়েকখানি পুস্তক, ধুনীর কাষ্ঠাহরণ নিমিত্ত চিমটা, ছোট কুড়ালী বা সাবল। এ সমুদয় নিজেই বহন করিয়াছেন। পদব্রজে বহুদূর চলিয়া যে স্থানে আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সেখানেই প্রথমতঃ ধুনীর কাষ্ঠের জন্য হয় গভীর জঙ্গলে প্রবেশ বা কোন বৃক্ষোপরি আরোহণ করতঃ শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছেন। আহারের জন্য ভিক্ষান্নের চেষ্টা করিয়াছেন, নতুবা জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া সাবল দ্বারা কন্দ-মূল উঠাইয়া আনিয়াছেন। ভোজন বরাবর নিজ হস্তেই প্রস্তুত করিয়াছেন। এ পরিভ্রমণ কালে কখনও কোন সাধু সঙ্গী হইয়াছেন, নতুবা অধিকাংশ সময়ে একাকীই ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কখনও এরূপ হইয়াছে যে, ৭।৮ দিন একাকীই ভ্রমণ করিয়াছেন ও এ সময়ের মধ্যে কোন লোক বা লোকালয় দর্শন হয় নাই। অনেক স্থানে এরূপ হইয়াছে যে, তিনি ধুনীর সম্মুখে আসনে উপবিষ্ট আছেন, তাহার অনতিদূরেই ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুরা জলপান করিয়া ও তাঁহার প্রতি সচকিত দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এমন ঘটনা ঘটিয়াছে যে কলেরায় আক্রান্ত হইয়া পথে মৃতবৎ পড়িয়া আছেন বা ক্রমাগত কম্প দিয়া জ্বর ভোগ হইতেছে ও তিনি পথে চলিতেছেন। কোন স্থানে সামান্য কিছু ভিক্ষা বা একটু দুগ্ধের প্রার্থী হইলে নানারূপ কটূক্তি শ্রবণ বা প্রতারিত হইবার মত হইয়াছেন। ঝড় বৃষ্টি তুফান বা শিলাপাত বা বরফবর্ষণ কত সময়ে মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বৃক্ষে কাষ্ঠ ছেদন জন্য উঠিয়া নিজের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত কলেবর হইয়াছেন। এ সমুদয় একটীও অতিরঞ্জিত নহে, কারণ পরে এ সকলেরই বিস্তৃত বিবরণ শুনাইবার ইচ্ছা আছে।

যাহা হউক, এরূপ দুঃসহনীয় অবস্থায় পড়িয়া মহারাজ তাঁহার ভ্রমণ বন্ধ রাখেন নাই। তিনি এ ভারতবর্ষের উত্তর হইতে দক্ষিণ ও পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকেস্থিত প্রদেশ, জনপদ ও তীর্থ ২।৩ বার করিয়া চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

নর্ম্মদা পরিক্রম সাধু জীবনে এক কঠিন ব্যাপার। এ পরিক্রম তিনি বহু বৎসর ধরিয়া করিয়াছেন। এ পরিক্রমের অর্থ এই যে, নর্ম্মদা নদীর তীরের কোন স্থান হইতে ভ্রমণ আরম্ভ করিতে হয়, এরূপ করিয়া এক তীর অবলম্বন পূর্ব্বক ইহার উৎপত্তি স্থান অমরকন্টক পর্য্যন্ত যাইতে হয় ও পরে অপর তীর অবলম্বন পূর্ব্বক নর্ম্মদার সাগর দর্শন করিতে হয় বা সমুদয় নর্ম্মদা নদীকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়। ধীর ভাবে ইহা করিলে ৩।৪ বৎসর লাগিয়া থাকে। তবে ক্ষিপ্র গতিতে পারিলে ২ বৎসরেও সম্পন্ন হয়। এ সময়ে পরিক্রমাকারীগণকে কয়েকটী নিয়ম পালন করিতে হয়। পদব্রজে ভ্রমণ ত করিতেই হইবে ও এ সময়ে পাদুকা বা ছত্র ব্যবহার করিবার নিয়ম নাই। রাত্রিকালে নর্ম্মদা নদীকে সম্মুখে করিয়া আসন গ্রহণ করিতে হইবে। তীরবর্ত্তী কোন দেবমন্দির বা সাধুর আশ্রম মিলিলে সেখানে অবস্থান করা যায়। ইহা না মিলিলে উন্মুক্ত নদীর তীর বা বৃক্ষমূলে অথবা নিজ হস্তের প্রস্তুত ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীরে বাস করিতে হয়। বহু স্থানে ছোট ছোট নদী আসিয়া নর্ম্মদায় মিশিয়াছে। এগুলি নৌকাযোগে উত্তীর্ণ হইবার নিয়ম নাই। পদব্রজে বা সন্তরণ দ্বারা পার হইতে হইবে এবং এ সময়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে যে, ভুলক্রমে এই উত্তীর্ণ সময়ে যদি নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইয়া যায় তবে পরিক্রমা খণ্ডিত হইয়া যাইবে। লোকালয়ে অবস্থান করিবার নিয়ম নাই, সুতরাং অনেক সময়ে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা প্রভৃতি শিরোপরিই বহন করিতে হয়। এ নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী জঙ্গল ব্যাঘ্র ও

ভল্লুক ও বন্যহস্তী দ্বারা বহুল অংশে পরিপূর্ণ। সময়ে সময়ে ইহারা সম্মুখেও আসিয়া যায়। ইহার তীরবর্ত্তী জঙ্গলে বহু অসভ্য ভীলগণ বাস করে। দস্যুবৃত্তিই অনেকের উপজীবিকা। অনেক সময়ে সাধুদের নিকট হইতে লোটা, কম্বল বা অর্থ দেখিতে পাইলে বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইয়া যায়। শত শত মাইল বিস্তৃত তিনটী "ঝকড়ী" বা জঙ্গল অতিবাহিত করিতে হয়। ইহাদের নাম (১) অমর কণ্টক বা মহারণ্য (২) ওঁকার (৩) শূলপানি। এই শেষোক্ত জঙ্গলে লোটা কম্বল প্রভৃতি লইয়া যাইবার উপায় নাই। সঙ্গে লইয়া গেলেই ভীলগণ উহা কাড়িয়া লয়। এজন্য এ জঙ্গলে প্রবেশের পূর্ব্বে সাধুগণ নিকটবর্ত্তী কোন আশ্রমে এগুলিকে ত্যাগ করিয়া যান। উভয় দিক হইতে এ জঙ্গলের প্রবেশ পথে এরূপ ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য এক সাধু একদিকের প্রবেশমুখে যাহা ত্যাগ করেন অপর সাধু জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া তাহা লইয়া থাকেন। এজন্য জঙ্গলের বাহিরে একের অভাব অন্য কর্ত্তৃক পূরিত হয়। জঙ্গলে অবস্থান কালে জলপাত্র জন্য তুম্বা (লাউয়ের খোল) বা করপাত্র মাত্রই সম্বল করিতে হয়। ক্ষুন্নিবারণের জন্য তীরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ বা জঙ্গল হইতে কন্দমূল আহরণ ও পরে ধূনীর অগ্নিতে হাতে রুটী করিয়া বা সিদ্ধ করিয়াই দেহ রক্ষা করিতে হয়। তবে সৌভাগ্য এই যে, এ দেশবাসীরা পরিক্রমাকারীগণকে বড়ই ভক্তি শ্রদ্ধা করেন ও এজন্য সাধ্যমত অনেকেই তাঁহাদিগকে সদাব্রত দান বা লোটা, কম্বল ও কটীবস্ত্র প্রভৃতি দানের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এজন্য সাধুগণ জঙ্গল হইতে বাহিরে আসিলে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করেন না। যাহাহউক, এই সমুদয় বর্ণনা হইতেই পাঠকগণ বুঝিবেন যে, এ নর্ম্মদাপরিক্রম কিরূপ কঠিন ব্যাপার। অতি অল্প সাধুই এ পরিক্রমা সম্পন্ন করিয়াছেন। আমাদের গুরুদেব কিন্তু এই পরিক্রমা বহুদিন ধরিয়া করিয়াছেন। সাধুদিগের অপর দুঃসাধ্য পর্য্যটন হইতেছে উত্তর-খণ্ডে বা হিমালয় প্রদেশে। ২।৪ জনের এ পরিভ্রমণের ঘটনা লইয়া আজকাল নানা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের গুরুদেব এ উত্তর-খণ্ডে বহুদিন ভ্রমণ করিয়াছেন। হিমালয়ের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত পরশুরাম কুণ্ড ও চন্দ্রনাথ কামিখ্যা ; ইহার মধ্যস্থলস্থ বদরীনারায়ণ, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী ও পশুপতিনাথ এবং এ সকলের উত্তরস্থ অন্যান্য বহু তীর্থ, ও পশ্চিমে অমরনাথ, মন্মহেশ, বৈজুনাথ, জ্বালামুখী ও কাংড়া প্রদেশস্থ বহু তীর্থ ও এ সমুদয়ের সহিত কেদার, ত্রিযুগীনারায়ণ, হৃষীকেশ, হরিদ্বার ডাকসু প্রভৃতি স্থান দর্শন এবং ইহাদের অনেক স্থানে বহুদিন ধরিয়া তিনি

অবস্থান করিয়াছেন। এ উত্তরখণ্ড অতিশয় শীতপ্রধান দেশ, এজন্য ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র কম্বলাদি নিজ স্কন্ধে লইয়াই চলিতে হইয়াছে। এ সমুদয় দেশে সচরাচর ভিক্ষান্ন পাওয়া বড়ই দুর্ঘট। এজন্য সময় মত ৪।৫ দিনের ভক্ষ্য সঙ্গে লইয়া ও বরফের মধ্য দিয়া উচ্চে আরোহণ ও অবরোহণ পূর্ব্বক চলিতে হইয়াছে। অপর দিকে তাঁহার অধ্যবসায় শুনিলেও সকলে চমৎকৃত হইয়া যাইবেন। সংকল্প করিয়াছিলেন, গঙ্গোত্তরী হইতে গঙ্গাজল লইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে মহাদেবের উপর নিজ হস্তে নিক্ষেপ করিবেন। এতদনুসারে ২।৩ বৎসর কাল পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ের উচ্চ শিখর হইতে আগমন পূর্ব্বক ভারতের দক্ষিণে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। হরিদ্বার, নাসিক ও প্রয়াগে দ্বাদশ বৎসর অন্তর যে কুম্ভ ও ছয় ছয় বৎসর অন্তর অর্দ্ধকুম্ভ মেলা হয়, এ সব কুম্ভ মেলায় সাধুগণের সহিত অবস্থান ও কল্পস্নান ২।৪ বার করিয়া করিয়াছেন। সূর্য্য-গ্রহণ-কালীন কুরুক্ষেত্র ও চন্দ্র-গ্রহণকালীন ৺কাশী ও প্রয়াগ ধামে গঙ্গাস্নান ও নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। এ তীর্থস্থান ব্যতীত পঞ্জাব, রাজপুতানা, সিন্ধুপ্রদেশ, কচ্ছ, গুজরাট, কাটীবার, বোম্বাই, হায়দরাবাদ, মহীশূর, কিস্কিন্ধ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ত্রিবাঙ্কুর, মাদ্রাজ, কর্ণাট, মদুরা, ত্রিঞ্চিনপল্লী, উড়িষ্যা ও মধ্যভারতবর্ষের ইন্দোর, গোয়ালীয়র, ভূপাল প্রদেশস্থ তীর্থস্থান ও বিশেষ বিশেষ জনপদ ইনি পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এদিকে বঙ্গদেশের গঙ্গাসাগর, কালীঘাট, তারকেশ্বর, নবদ্বীপ প্রভৃতি কোন তীর্থ স্থানই তিনি এ ভ্রমণের বহির্ভূত রাখেন নাই। পুনরায় অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, ত্রিকুট, প্রয়াগ, আবু, গির্ণার, কাশীধাম, মথুরা, বৃন্দাবন ও গয়াধামে বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছেন।

এ ভ্রমণ সম্বন্ধে আরও জানাইয়া রাখিতেছি যে কেবল যে তিনি ভাসা ভাসা ভাবে উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছেন ইহা যেন কেহ মনে না করেন। পর্য্যটনকারী কোন সাধুর সহিত যখনই তাঁহার এ ভ্রমণের বার্ত্তালাপ করিতে আমরা শুনিয়াছি, তখনই যেন উপরোক্ত স্থানগুলি তাঁহার চক্ষুর উপর বিরাজিত রহিয়াছে, এইভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাদের বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি! বঙ্গদেশের মধ্যে তারকেশ্বরে, কলিকাতার কাশীমিত্রের ঘাটে অবস্থিত কালীবাড়ীতে ও মেদিনীপুরের কর্ণগড়ে কিছুদিন ধরিয়াও বাস করিয়াছিলেন। ভক্তগণের প্রার্থনায় আকৃষ্ট হইয়া বৈদ্যবাটীতে শ্রীহরিপদ বন্দোপাধ্যায়ের, শিব-নিবাসে লেখকের খুল্লতাত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের শ্রীপ্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ও কলিকাতায় অবস্থিত বহু ভক্ত

ও শিষ্যের বাটীতে পদার্পণ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ ভ্রমণের ধারাবাহিক বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। তবে এ জীবনচরিতে যে যে বিষয়গুলি বিস্তার করিব তাহারই একটী সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতেছি। ক্রমশঃ।

দোখ্‌নে হাওয়া।

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ।

চাঁদের আলো, প্রাণ মাতালো,
ফুর্‌ফুরে ঐ হাওয়ায় দোলে!
সাঁঝের বেলায়, নবীন গলায়,
ডাক্‌ল পাখী নূতন বোলে॥
নূতন পাতায়, নূতন লতায়,
সবই নূতন আশে পাশে।
বসন্তের ঐ পরশেতে
সবাই যেন সবুজ বাসে॥
প্রকৃতি আজ উদাস মনে,
চেয়ে আছে ব্যাকুল প্রাণে,
কোন দয়িতের আশে,
(ও সে) নিজেই তাহা নাহি জানে।
আশাভরা বুকটী নিয়ে,
রূপের আলো ছড়িয়ে দিয়ে,
নীরবেতে বিশ্বমাঝে,
আছে যেন প্রেমের ধ্যানে॥
চাতক আজ শূন্যে চেয়ে,
দূরে দেখে চাতকীরে
আস্‌তে বলে নিজের কাছে।
ভ্রমর পিয়ায় বলে উড়ে,
ক্ষুদ্র তাহার পাখা নেড়ে,

"বেশী দূরে যাস্‌নে ওরে,
হারাব কি তোরে পাছে?"
নদী যেন আপন মনে,
কাঁপায়ে তীর গানের তানে,
ছোটে তারে বিলিয়ে দিতে
নিজের স্বামী সাগর-কোলে।
লজ্জানত পল্লীনারী,
সেও বলে "আর কি পারি?"
দোখ্‌নে হাওয়ার পুলক টানে
পথের মাঝে ঘোম্‌টা খোলে॥

সুখ কোথায়?

লেখক—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।

এ সংসারে সুখ কোথায়? কাঁদিয়া আসিয়াছি, এখনও অজস্র কাঁদিতেছি, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখের জল শেষ হইতেছে না কেন? এ অশ্রু-প্রস্রবণের কি অনন্ত সীমা? তুমি হাস, আমি এত কাঁদি কেন? প্রফুল্ল-ফুলের হাসি দেখিয়া তোমার মন উৎফুল্ল হয়। চন্দ্রিকার চঞ্চল তরঙ্গে তোমার মন, প্রাণ আলোকে ভোরপূর হইয়া যায়; প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া তোমার মন বিভোর হইয়া পড়ে। কৈ আমার তো এ সকল দেখিয়া তেমন হয় না! এই মানসিক বৈচিত্র্যের কারণ কি? অনুসন্ধিৎসু হইয়া আমার মানস রঙ্গ-ভূমির মসীময়ী যবনিকা কতবার উত্তোলন করিয়াছি, প্রতি কক্ষে প্রতি স্তরে কত অন্বেষণ করিয়াছি। কৈ কিছুই তো দেখিতে পাই না? দেখি কেবল অন্ধকার; বাহিরে ও অন্তরে সমান অন্ধকার। ভাবি এ সংসারে কিছুই ভাল বলিয়া নাই, সকলই মন্দ! সাধু মহাপুরুষেরা বলিয়াছেন, "ভাল মন্দ মনগড়া।" তা যদি হয় তবে নিশ্চয় আমার মন মন্দ, আমার মন একটানা; আমার মন বেসুরা। যে হৃদয়তন্ত্রী ঘাত প্রতিঘাতে বিবিধ সুরের ঝঙ্কার তুলে না, সেটাকে বেসুরা বৈ আর কি বলিব? তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি এ সংসারে সুখ কোথায়?

মনে মনে ভাবিতাম—ধনে সুখ। তা যদি হইত তাহা হইলে কেহ বা প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াও অতুল ঐশ্বর্য্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন কেন? মানেও তাই, মানী বা মানিনী মান বজায় রাখিতে যাইয়া কে কোথায় কোন্ কালে সুখের মুখ দেখিয়াছেন? সীতানাথের সীতাবর্জ্জন ও শ্রীরাধার মান হইার উজ্জ্বল নিদর্শন।

প্রেমেই বা সুখ কোথায়? কুহকী প্রেম মোহিনী মন্ত্রে সুখের সোণার প্রতিমা দেখাইতে সক্ষম হয় কি? রিষের ঘন ছাওয়ায় সেই মূর্ত্তি আবরিত করিয়া দেয়। প্রেমিক ও প্রেমিকা উভয়েই মিলনের সময়েও ভাবী বিরহের আশঙ্কায় সুখী নহে! বিচ্ছেদের পূর্ব্বের তো কথাই নাই।

অনেকে বলেন ধর্ম্মে সুখ। ধর্ম্ম বা পাপ পুণ্যের তারতম্য কিছুই বুঝিতে পারি না! তুমি যাহাকে পাপ বল, আমি তাহাকে হয়ত পুণ্য বলি; তুমি যাহাকে পুণ্য বল, আমি তাহাকে হয়ত পাপ বলি। আবার তুমি আমি যাহাকে পাপ বা পুণ্য বল, তৃতীয় ব্যক্তি হয়ত তাহাকে পুণ্য বা পাপ বলেন। আমরা হিন্দু, গো হত্যাকে পাপ বলিয়া থাকি, কিন্তু মুসলমানেরা তাহাকে পুণ্য বলিয়া মনে করে। চৌর্য্যবৃত্তিকে আমরা পাপ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি। কিন্তু এক সময়ে এক শ্রেণীর লোক তাহা পুণ্য বা প্রশংসার কার্য্য বলিয়া গণ্য করিত। তাহাতেই বলি কাহাকে পাপ আর কাহাকেই বা পুণ্য বলি?

যখন পাপ পুণ্যের ঠিক নাই, তখন সুখ কোথায় তাহা কিরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়? আপনি হয়ত বলিবেন হত্যায় মহাপাপ, তবে সেই হত্যা সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ আইনের এত ইতর বিশেষ কেন? শাস্ত্রের ও আইনের যদি একমত তবে "মাকড় মারিলে ধোকড়" আর মানুষ মারিলে ফাঁসী হয় কেন? আপনারা হয়ত বলিবেন, "আমার প্রাণ এত বড়, আর তার প্রাণ এতটুকু। তাই দণ্ডের বৈষম্য।" আপনি বিদ্যা-বুদ্ধি-বিশারদ। সৃষ্টির অধীশ্বর মানব, যে ক্ষুদ্র জীবের এতটুকু প্রাণ লইয়াছেন, কৈ তাহার ততটুকুখানি তাহাকে প্রত্যর্পণ করুন দেখি?

জ্ঞানেই বা সুখ কোথায়? জ্ঞানীর মন সতত সংশয় দোলায় দুলিতে থাকে! পূর্ণ জ্ঞানীর সুখ আছে বটে, কিন্তু এ সংসারে অপূর্ণ মানব-মনে পূর্ণ জ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভব।

খৃষ্ট ধর্ম্ম মতে জ্ঞান-তরুর ফল ভক্ষণ করিয়াই মানবের অধঃপতন ও সুখের বিনাশ! তা যদি হয় তবে জ্ঞানীর সুখ কোথায়? কিরূপে বলিব?

শৈশবে যখন অজ্ঞানী ছিলাম, জ্ঞানের ধার ধারিতাম না, ভাল মন্দ বিচার ছিল না, তখন এ সংসারে এত দুঃখ, এতটা জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করি নাই। সে কথা মনে হইলে কবির কথায় কাঁদিয়া বলিতে হয়—

"সারল্য সুবর্ণ মুদ্রা, সময় দালাল
কোটা আঁটা কপর্দ্দক পরীক্ষা রতন।"

তাহাতেই বলি সুখ কোথায়? অমিশ্র পূর্ণ সুখ কৈ?

যুগাবতার ও যুগধর্ম্ম।

(পৌরাণিক)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীভগবান সত্যাদি যুগে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যগণের বিনাশের জন্য বরাহ ও নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবই হইয়াছে মাত্র, মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ হয় নাই। আবার সময়ে তিরোভাব হইয়াছে। আবার শ্রীরামচন্দ্রাদি মাতৃ-জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া রাবণাদি ধ্বংস করতঃ তিরোহিত হইয়াছেন।

সত্যযুগে সমস্ত লোক ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যবাদী ছিলেন। শোক-ব্যাধি-বিবর্জ্জিত হইয়া ভগবান নারায়ণের সেবা করিতেন। রাজা প্রজারঞ্জক, দয়া, ক্ষমা ও মৈত্রীসম্পন্ন এবং ধার্ম্মিক ছিলেন। রাজার পুণ্যে প্রজারা সুখে ছিলেন।

ত্রেতায় ধর্ম্ম পাদোনত হইলেন। লোকে অল্প ক্লেশ ভোগ করিত। দান, যজ্ঞ ও বিষ্ণুপূজা করিত। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালিত হইত, ধরণী শস্যশালিনী ছিল। শূদ্রগণ গো-দ্বিজের সেবা করিত। ব্রাহ্মণগণ বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী, প্রতিগ্রহ-নিবৃত্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, তপঃ-সম্পন্ন, দাতা ও বিষ্ণু-পরায়ণ ছিলেন। পুত্র ভৃত্যসদৃশ হইয়া পিতৃ-সেবা করিত। শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য রক্ষার জন্য রাজ্য সুখে বিসর্জ্জন দিয়া অরণ্যচারী হইয়াছিলেন। প্রজারঞ্জনের জন্য নিরপরাধা পতিব্রতা সাধ্বী সতী জানকীরে বনবাস দিয়াছিলেন।

দ্বাপরে লোকসকল সুখে ও দুঃখে সংযুক্ত হইল। কেহ পাপ করিত, কেহ পুণ্য করিত, কেহ দুঃখী, কেহ সুখী ছিল। ব্রাহ্মণগণ কদাচিৎ দান লইতেন।

রাজা ধনলাভের জন্য কদাচিৎ প্রজাকে পীড়ন করিতেন। ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণু-পূজা করিতেন, শূদ্রেরা দ্বিজ-সেবা করিত, গুণের সম্মান ছিল। ভীষ্ম ক্ষত্রিয় হইয়াও বিপ্রগণ কর্ত্তৃক তর্পিত হইয়াছেন। বিষ্ণুর অপর মূর্ত্তি ব্যাসদেব পূজিত হইয়াছেন।

কলিকালের লোকের সুখ দুঃখের কথা আর বর্ণনার প্রয়োজন নাই। সত্য-ত্রেতাদি কালের যে পরিমাণ গুণ ছিল, এ কালে সেই পরিমাণে দোষ আসিয়াছে। পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে—

"ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা পাপপরায়ণাঃ।
নিজাচারবিহীনাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥
পরশ্রীহিংসকাশ্চৈব মিথ্যাবচনভাষিণঃ।
ভবিষ্যন্তি কলৌ বিপ্রাঃ পরবিত্তাভিলাষিণঃ॥"

কলির ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় সকলেই মিথ্যাবাদী, লোভী, হিংসুক, স্ত্রী-পরায়ণ, ভণ্ড, অবিশ্বাসী, ভক্তিহীন, পরনিন্দুক, ক্রূর, স্বার্থপর, কটুভাষী ইত্যাদি হইবে। পরন্তু এই যুগের একটি মহান্ গুণ আছে :—

"কলের্দ্দোষনিধের্বিপ্র অস্তিহ্যেক মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতঃ ফলম্।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
তস্মাজ্ জ্ঞেয়া হরির্নিত্যং ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ শৌনক।"

ইতি গারুড়ে।

অর্থাৎ হে বিপ্র! কলির অনেক দোষ আছে সত্য, পরন্তু একটি মহৎ গুণও আছে। তপ, জপ, ধ্যান, যজ্ঞাদির আচরণ না করিয়া কেবল ভক্তিভরে "হরিনাম" কীর্ত্তনেই মুক্তিলাভ করা যায়।

"হরি হরি মুখ ভরি বল সর্ব্বজন।
যে নামে তরিবে ভবসিন্ধু ততক্ষণ॥"

রূপ-সনাতন কথা।

লেখক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অমর ও সন্তোষের মহাপ্রভুদত্ত নাম যথাক্রমে সনাতন ও রূপ। রূপ ও সনাতন ভ্রাতৃদ্বয় বাঙ্গলায় একযোগে রূপ-সনাতন নামে বিখ্যাত। তাঁহারা এক সঙ্গে "ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু" নামক বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। উভয় ভ্রাতার জীবন, এক স্রোতেই প্রবাহিত হইয়াছিল। সনাতন জ্যেষ্ঠ ও রূপ অনুজ, কিন্তু রূপের নাম পূর্ব্বে উচ্চারিত হওয়ার কারণ এই যে, রূপ সনাতনের পূর্ব্বেই বৈরাগ্য লাভ করিয়া ভক্তি-জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যাহা-হউক রূপ-সনাতনের নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে আবাল বৃদ্ধ বনিতার পরিচিত। তাঁহারা যে পরম ভক্ত এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে মহা পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এ কথা বঙ্গীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর এমন কি সমগ্র হিন্দু সমাজেরও অবিদিত নহে। আমরা এই প্রবন্ধে উক্ত ভ্রাতৃযুগলের আদ্যোপান্ত জীবন কথা যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বংশ পরিচয়—রূপ-সনাতন ব্রাহ্মণবংশীয় কর্ণাটরাজ সর্ব্বজ্ঞের বংশধর। সনাতন-বিরচিত "লঘুতোষিণী" হইতে তাঁহাদের যে একটী বংশ তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে প্রকাশ যে, সর্ব্বজ্ঞের পুত্র **অনিরুদ্ধ দেব**, তৎপুত্র **রূপেশ্বর** ও **হরিহর**। রূপেশ্বর ভ্রাতৃবিরোধ হেতু কর্ণাট-রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া পৌরণ্ড রাজ্যান্তর্গত শেখর রাজ্যে, তথা হইতে পরে গৌড়ে আগমন পূর্ব্বক গৌড়েশ্বরের মন্ত্রীর কার্য্যে নিয়োজিত হন। রূপেশ্বর অচিরকাল মধ্যে পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র পদ্মনাভ গৌড়াধিপের অধীনে পিতৃপদের অধিকারী হন, এবং ৬৯ বৎসর বয়সে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক গঙ্গাবাস-কামনায় কাটোয়ার ৩।৪ মাইল উত্তরবর্ত্তী ভাগী-রথী তীরস্থ নবহট্ট (বর্ত্তমান নৈহাটী) গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। পদ্ম-নাভের **পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারী** ও **মুকুন্দ** নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। মুকুন্দের পুত্র **কুমারদেব** প্রথমে ফরিদ-পুর জেলার অন্তর্গত ফতেয়াবাদে বাস করিতেন। পরে গৌড়ে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয় মাধাইপুরে ও ঝাড়গ্রামে বাস করিতে থাকেন।

কুমারের রঘুনন্দন, অমর (সনাতন), সন্তোষ (রূপ), শ্রীবল্লভ (অনুপম) নামে চারিটী পুত্র ও এক কন্যা হয়। ইহারা সকলেই প্রথম জীবনে নৈহাটীতে বাস করিতেন। কুমারের পত্নী বা রূপ-সনাতনের মাতার নাম রেবতী দেবী।

রূপ-সনাতনের পাণ্ডিত্যাবস্থা—বিদ্যারম্ভের সময় উপস্থিত হইলে রূপ ও সনাতন নৈহাটীর তৎকাল প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সর্ব্বানন্দ বাচস্পতির নিকট যোগ্যতার সহিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া সেকালের রাজভাষা পার্সী ভাষাও বিশেষ রূপে অধ্যয়ন করেন। "শ্রীমদ্ভাগবততোষিণী"তে লিখিত আছে যে, সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও তদীয় সহচর বিদ্যাবাচস্পতি সনাতনের শিক্ষাগুরু ছিলেন। "ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতিং গুরুং।" শ্রীমদ্ভাগবত তোষিণী। টোলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া উত্তরজীবনে সনাতন উক্ত অধ্যাপকদ্বয়ের নিকট শাস্ত্র গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। যাহা হউক, সংস্কৃত ও পার্সী উভয় ভাষাতেই যে রূপ-সনাতন অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনী আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

কর্ম্মজীবন—তৎকালে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন সাহ গৌড়ের সিংহাসনে সমাসীন। তিনি উপযুক্ত হিন্দু কর্ম্মচারীগণের প্রতি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। অমর ও সন্তোষ বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উক্ত গৌড়েশ্বরের অধীনে উচ্চ কর্ম্মে (রাজ মন্ত্রিত্ব বা উজীরী পদে) নিযুক্ত হন। অবশেষে উভয় ভ্রাতার কর্ম্মদক্ষতা অবগত হইয়া গৌড়েশ্বর হোসেন সাহ অমরকে "আকর মল্লিক" (অর্থাৎ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ) এবং সন্তোষকে "দবির খাস" (খাস-মুন্সী) এই মর্য্যাদাসূচক উপাধি প্রদান করেন। সে সময় গৌড় রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী বিখ্যাত রামকেলীতে রূপ সনাতন ও অনুপম বাস করিতেন। উভয় ভ্রাতাই বাল্যকাল হইতে কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, এবং কনিষ্ঠ অনুপম রামভক্ত ও জ্যেষ্ঠ দ্বয়ের ধর্ম্মপথের অনুরাগী ছিলেন। মুসলমানের দাসত্ব গ্রহণ করিয়াও তাঁহারা কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা রামকেলীতে আপনাদের ভবনের নিকট শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড ও রূপসাগর নামে কয়েকটী জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের চতুঃপার্শ্বে কদম্বকানন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং উভয় ভ্রাতায় প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় গমন করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির উপাসনা করিতেন। রূপ ও সনাতন দীর্ঘকাল যাবৎ রাজসরকারে কর্ম্ম করিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট বিশেষ যশঃ ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা সুদক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহাদের উপর বাদসাহের অত্যধিক বিশ্বাসও জন্মিয়াছিল।

কালক্রমে উভয় ভ্রাতার বিষয়ভোগ-লালসা পরিতৃপ্ত হইলে, উভয়ে কৃষ্ণ-প্রেমে অতীব আসক্ত হইয়া পড়েন। রূপ ও সনাতনের বৈরাগ্য সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে—একদিন অতি প্রত্যূষে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছিল সেই দুর্দ্দিনে, রূপ-সনাতন রাজাদেশ মান্য করিয়া রাজদরবারে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথপার্শ্বস্থ একটি কুটীর হইতে জনৈক ভিক্ষুক-পত্নী তাহার স্বামীকে বলিতেছে, "বাবাজী! প্রভাত হইয়াছে, সত্বর শয্যাত্যাগ করিয়া ভিক্ষার্থ বহির্গত হও"। তদুত্তরে বৃদ্ধ ভিক্ষুক বলিল, "এখনও প্রাতঃকাল হয় নাই, এরূপ ঘোর ঘন-ঘটায় মানুষের বহির্গমন অসম্ভব। শৃগালাদি লোলুপ পশুরাও এবম্বিধ দুর্দ্দিনে বিবর হইতে বাহির হয় না। একমাত্র ক্রীতদাস ও নফরেরাই প্রভুর আদেশে এইরূপ দিনে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আজ্ঞা প্রতিপালন করে"। দরিদ্র ভিক্ষুকের বাক্যে রূপ-সনাতনের চৈতন্য হইল। দরিদ্র ভিক্ষুকের বাণী তাঁহাদের শ্রবণের মধ্য দিয়া মর্ম্মস্থলে আঘাত করিল। জীবনে দাসত্ব তাঁহাদিগকে শৃগালাদির অপেক্ষাও হেয় করিয়াছে, বুঝিয়া তাঁহারা রাজ-সম্মান ত্যাগ করিতে সেই দিন হইতেই কৃতসংকল্প হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিবেক আসিয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিল। সংসার ও মর্য্যাদা সেই সময় হইতেই তাঁহাদের নিকট বিষবৎ প্রতীয়মান হইল। রূপ সেই দিনই সুলতান সমীপে উপনীত হইয়া রাজকার্য্য সমাপনান্তে বাদসাহকে তীর্থ-যাত্রার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। অনেক ওজর আপত্তির পর গৌড়েশ্বর রূপকে তীর্থ দর্শনে গমন করিতে আদেশ দিলেন। রূপও প্রেমোল্লাসে বিভোর হইয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকার কালে শ্রীরূপ একদিন সংবাদ পান যে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রীরূপের মন প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনধাম যাত্রাকালে রামকেলি গ্রাম সন্দর্শন জন্য সহসা রামকেলিতে উপস্থিত হইলেন। চারিদিক হইতে হরিধ্বনির বন্যা-কোলাহল প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। গৌড়াধিপ হোসেন সা এই অদ্ভুত জনসঙ্ঘ দর্শন ও হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। কেশব ছত্রী ও রূপ-সনাতন তাঁহাকে গৌরাঙ্গ দেবের আগমন সংবাদ প্রদান করিলেন। গৌড়েশ্বরও গৌরাঙ্গের প্রভাবে সে সময় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

রূপ-সনাতন নামের উৎপত্তি—যাহাহউক সেই দিবস

রজনীযোগে নিত্যানন্দ ও হরিদাসের সঙ্গে রূপ-সনাতন দীনবেশে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং আপনাদিগকে নীচ, হীন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি উল্লেখে বিনয় নম্রতা প্রকাশ পূর্ব্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া দীনাতিদীনের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তদ্দর্শনে ও তাঁহাদের বিনয়পূর্ণ দৈন্যস্তুতি শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—

"প্রভু বলে শুন রূপ তুমি দবিরখাস।
তোমরা দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥ *
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ সনাতন।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
জন্মে জন্মে তোমরা দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥
এত বলি দোঁহার শিরে ধরি নিজ হাতে।
দুই ভাই নিল ধরি প্রভুর পদ মাথে॥

(চৈঃ চঃ প্রথম পঃ মধ্যলীলা)

অমর ও সন্তোষ দুই ভাই এই সময় হইতেই মহাপ্রভু কর্ত্তৃক যথাক্রমে সনাতন ও রূপ নামে অভিহিত হন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ বল্লভকেও মহাপ্রভু অনুপম নামে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন।

রূপ সনাতনের মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের অমূলক ধারণার প্রতিবাদ—এখন একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, রূপ-সনাতন মহাপ্রভুর নিকট গমন করিয়া আপনাদিগকে "নীচজাতি" "ম্লেচ্ছ-জাতি" প্রভৃতি উল্লেখ পূর্ব্বক প্রভুকে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন কেন? তাঁহারা সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণবংশীয় ও কখন ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই; তথাপি এরূপ পরিচয় প্রদানের কারণ কি? রূপ-সনাতনের এ সকল উক্তিতে ও সম্রাট-প্রদত্ত "আকর মল্লিক" ও "দবির খাস" উপাধিকে যাবনিক নাম অনুমান পূর্ব্বক বর্ত্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের সুপরিচিত কোন কোন ঐতিহাসিক (বর্ত্তমান

* পূর্ব্বকালে ব্রজে যিনি রূপ-মঞ্জরী ছিলেন, তিনিই রূপগোস্বামী ও লবঙ্গ-মঞ্জরী, গৌরাঙ্গের অভিন্নতনু সনাতন রূপে বিরাজ করিয়াছিলেন"। সেই কারণই এস্থলে মহাপ্রভু উভয় ভ্রাতাকে পুরাতন দাস ও জন্মে জন্মে কিঙ্কর প্রভৃতি বলিয়াছিলেন। (গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা ৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

প্রবন্ধে তাঁহাদের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বোধে উল্লেখ করিলাম না) "রূপ-সনাতন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন" বলিয়া একটা ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থ তাঁহারা যদি পাঠ করিয়া তাঁহাদের মূল্যবান সময়ের সামান্যাংশও নষ্ট করেন তাহাহইলে মহাত্মাগণের এই ভ্রম নিরাকৃত হইবে বলিয়া মনে হয়। উক্ত গ্রন্থে উক্ত ভ্রাতৃ-যুগলের এইরূপ পরিচয় জ্ঞাপনের কারণ লিখিত হইয়াছে যে,—

"পিতা, পিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার।
তাহা বিচারিতে মনে মানয়ে ধিক্কার॥
যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়।
হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয়॥
করি মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে যান।
এ হেতু আপনাকে কহেন ম্লেচ্ছের সমান॥
যবে মগ্ন হন দৈন্য সমুদ্র মাঝারে।
ম্লেচ্ছাদি হইতে নীচ গণে আপনারে॥
নীচ জাতি সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার।
এই হেতু নীচ জাত্যাদিক উক্তি তাঁর॥
আপনাকে বিপ্র জ্ঞান কভু নাহি করে।
বিপ্ররাজ হইয়া মহা খেদযুক্তান্তরে॥
(অন্যত্র) সর্ব্বাংশে উত্তম হৈয়া ঐছে দৈন্যকার।
নীচ ম্লেচ্ছ পাপী বলি আপনাধিক্কার॥"

রূপ-সনাতন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। কেবল মাত্র প্রেম-ভক্তিরূপ ধর্ম্ম, বৈষ্ণবোচিত বিনয়, নম্রতা, দৈন্যস্তুতি প্রভৃতি মহাপ্রভুর নিকট প্রদর্শন করিবার জন্যই দন্তে তৃণ করিয়া তৃণাদপি নীচ ভাবে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অতঃপর মহাপ্রভুর সারগর্ভ বাক্যেও বেশ বুঝা যায় যে, কেবল ভক্তি ও বৈষ্ণবোচিত বিনয় দেখাইবার জন্যই তাঁহারা মহাপ্রভুর নিকট আপনাদিগকে তৃণাদপি নীচ ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। যাহাহউক, ইহার পর গৌরাঙ্গদেব সনাতন ও রূপকে আশ্বস্ত করিলেন। প্রথম দর্শনেই অনেক প্রকার ধর্ম্মালাপ হইল। মহাপ্রভু তৎকালে বৃন্দাবন গমন জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে মহাপ্রভু সনাতনকে কয়েকটী সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন।

"দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ কৃপা পাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র॥
বিদ্যা, ভক্তি, বুদ্ধিবলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হইতে হীন॥
তার দৈন্যবাদ শুনে পাষাণ বিদরে।
প্রভু তুষ্ট হৈয়া তবে কহিল দোঁহারে॥
উত্তম হৈয়া হীন করি মানে আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে॥"
বলি প্রভু যবে দোঁহার বিদায় দিল।
গমন কালে সনাতন প্রহেলী করিল॥

প্রহেলী এই :—

"ইহা হৈতে চল প্রভু ইহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবন বলি না করি প্রতীতি।
তীর্থ যাত্রার তব সংঘট্ট ভাল নহে রীতি॥
যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটী।
বৃন্দাবনে যাবার এ নহে পরিপাটী॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য-২য় প)

মহাপ্রভুকে এইরূপ প্রহেলী করিয়া সনাতন রূপ সহ স্বীয় বাস ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে চিরতরে আকৃষ্ট হইয়া রহিল।

শ্রীরূপের সংসার ত্যাগ—প্রবল অনুরাগে শ্রীরূপ আর অধিক দিন গৃহে থাকিতে পারিলেন না। প্রভুর নীলাচলে অবস্থিতির সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট লোক পাঠাইলেন। লোক মুখে অবগত হইলেন যে, প্রভু তথা হইতে বৃন্দাবনধাম গমন করিয়াছেন। তখনি শ্রীরূপ বৃন্দাবনধাম গমনোদ্যত হইলেন। তিনি অনুজ বল্লভ (অনুপম) সহ শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ চন্দ্রের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত গৃহের বাহির হইলেন, এবং বৃন্দাবন যাত্রার পথে প্রয়াগ তীর্থেই মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিলেন। কিছুদিন প্রয়াগ তীর্থে অবস্থিতি করার পর মহাপ্রভু শ্রীরূপকে শক্তি সঞ্চার করিয়া বৃন্দাবন গমনের অনুমতি দিলেন।

"এইমতে দশ দিন প্রয়াগে থাকিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সর্ব্ব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥
শ্রীরূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্ব তত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ)

প্রভু প্রয়াগ হইতে বারাণসী গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রূপও মহাপ্রভু সহ কাশী গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলে প্রভু বলিলেন—

"প্রভু কহে তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন।
নিকট আসিয়াছি তুমি যাহ বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড় দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯ পঃ

"প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে, প্রেমস্বরূপে সহজাতিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে, ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥"

(চৈঃ চঃ নাটক ৯।৭৫)

"বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং, কালেন লুপ্তাং নিজশক্তি মুংকঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ সঃ, প্রভুর্বিদৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্॥"

পরম পুরুষ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে যেরূপ শক্তি প্রেরণা করিয়াছিলেন, চৈতন্য প্রভুও তদ্রূপ শ্রীরূপ গোস্বামীতে সমুৎসুক হইয়া স্বীয় শক্তি সঞ্চারণ পূর্ব্বক কালে বিলুপ্ত বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা পুনরায় প্রকাশ করিলেন।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ)

এইরূপে রূপকে বিদায় দিয়া মহাপ্রভু প্রয়াগ হইতে কাশীধামে গমন করিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

সনাতনের চাকরী ত্যাগ, কারাবাস, কারামুক্তি ও মহাপ্রভুর সহিত বারাণসীতে চন্দ্রশেখরালয়ে সাক্ষাৎ—জনশ্রুতি এই যে, রূপের বৃন্দাবন গমনের পর সনাতন যে সময়ে সংসারে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি জনৈক ব্রাহ্মণের বাটী লইয়া স্বীয় বাস-ভবনের আয়তন বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। উক্ত ব্রাহ্মণ সনাতনের নিকট

অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াও তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ না হইয়া অবশেষে বৃন্দাবনে রূপের শরণাপন্ন হন। রূপ ব্রাহ্মণের মুখে সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া জ্যেষ্ঠকে কেবল ৮টী অক্ষর লিখিয়া উপদেশ প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ সনাতনের নিকট উক্ত ৮ অক্ষরপূর্ণ পত্র আনিয়া দিলে মহাপণ্ডিত সনাতন প্রত্যেক চরণের আদ্যন্তে দুইটী দুইটী অক্ষর সংযোগ পূর্ব্বক শূন্যাংশ পূরণ করিয়া চারি-চরণযুক্ত একটী সুন্দর শ্লোক "য—রী", "র—লা", "ই—রং", "ন—য়" এই ৮টী অক্ষরের সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া রূপের মনোভাব বুঝিয়া লইলেন। এই ৮টী অক্ষরে নিম্নলিখিত কবিতাটী রচিত হইয়াছিল।

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী।
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা॥
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥

রূপের এই উপদেশে সনাতনের মতি পরিবর্ত্তন হওয়ায় ব্রাহ্মণ আর বাসভবনচ্যুত হন নাই বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। যাহা হউক, এদিকে সনাতনের তখনও বিষয়বন্ধন হইতে মুক্তি হয় নাই ইহা ঠিক। তিনি বিষয় ব্যাপারের বন্দোবস্ত করিতে তখনও ব্যাপৃত। অতঃপর তিনি সর্ব্বদাই বিষয়বন্ধন মোচনের উপায় দেখিতে লাগিলেন। রাজকার্য্যই দারুণ বন্ধন বলিয়া সনাতনের মনে হইল। হোসেন সা কোনক্রমেই সনাতনকে ছাড়িবেন না। যেহেতু তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তি দরবারে আর কেহই নাই। তিনি যেমন সুদক্ষ তেমনই বুদ্ধিমান। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সংসার-বৈরাগ্য ও ভগবদনুরাগ প্রবল ভাবে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। যেদিন সনাতন গৌরাঙ্গের সুশীতল পদছায়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই এই মহা প্রভাবশালী রাজপুরুষের হৃদয়ে একটা বিশাল পরিবর্ত্তন ঘটিল। বিষয়ব্যাপারে তাঁহার আর আস্থা রহিল না। রাজকার্য্যে ক্রমশঃই তাঁহার চিত্ত শিথিল হইতে লাগিল। মুসলমান সরকারে চাকরী করিতে তাঁহার পূর্ব্বাপর ইচ্ছা ছিল না। কেবল ভয়ে ও দায়ে কার্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন। সনাতন শেষে স্থির করিলেন যে, বাদসাহের অপ্রীতিভাজন হওয়াই তাঁহার মুক্তির প্রধান পন্থা। সনাতনের হৃদয় তখন ভগবদ্-ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার প্রিয়সহচর অনুজ তাঁহাকে সংসারে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এ অবস্থায় সনাতনের চিত্ত আর কিছুতেই রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইল না। অতঃপর তিনি রাজ

কার্য্য বন্ধ করিয়া বাদসাকে জানাইলেন যে তাঁহার শরীর অসুস্থ। হোসেন সা তাঁহার চিকিৎসার্থ রাজবৈদ্য প্রেরণ করিলেন। বৈদ্য সনাতনকে নীরোগ দেখিয়া বাদসাহকে জানাইলেন যে, "সনাতনের কোন ব্যাধি নাই। তিনি পণ্ডিতদিগের সহিত গৃহে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন।" গৌড়েশ্বর এই সংবাদ অবগত হইয়া বুঝিলেন যে, সনাতনের সংসারে বীতস্পৃহা জন্মিয়াছে। তথাপি সনাতনের ন্যায় উপযুক্ত কর্ম্মচারীকে তিনি ছাড়িতে নারাজ। মিত্রতা, ভয় বা ভৎর্সনা—যে কোন উপায়েই হউক তিনি সনাতনের মতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি অবশেষে একদিন তিনি স্বয়ং সনাতনের আলয়ে সহসা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মনোযোগের সহিত কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে সনাতন বলিলেন—

"সনাতন কহে নহে আমা হৈতে কাম।
আর একজন দিয়া কর সমাধান॥
তবে ক্রুদ্ধ হৈয়া রাজা কহে আর বার।
তোমার বড় ভাই (রঘুনন্দন) করে দস্যু ব্যবহার॥
জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ।
এথা তুমি কৈলে মাত্র সর্ব্বকার্য্যনাশ॥
সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯ পঃ)

অনেক চেষ্টার পর যখন হোসেন সা সনাতনকে কিছুতেই ফিরাইতে পারিলেন না তখন তিনি সনাতনকে বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ করিলেন। কারণ কারাবাসের ভয়ে যদি সনাতনের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সনাতন তাহাতেও অচল। অম্লানবদনে কারাগারে গমন করিলেন। সুতরাং গৌড়েশ্বর ইহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কারাবাসের সময়ে একদিন সনাতন অনুজ রূপের সংস্কৃত কবিতায় রচিত একখানি পত্র জনৈক দূতের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া কারারক্ষী মীর হারলকে উৎকোচ দানের লোভ দেখাইয়া কারাগার ত্যাগের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কারারক্ষককে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিতে চাহিলেন, কিন্তু সে বাদসাহের ভয়ে সনাতনকে ছাড়িয়া দিতে সাহসী হইল না। অনেক মিনতি করিলেন, পূর্ব্বকৃত উপকারের কথা স্মরণ করাইয়া প্রত্যুপকার-প্রার্থী হইলেন; এবম্বিধ অন্যায় কার্য্য করিলে গৌড়ে-

শ্বরের নিকট হইতে কিরূপে ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে মুক্তিলাভে মীর সাহেব সমর্থ হইবে, তাহারও উপায় বলিয়া দিলেন। অবশেষে সাত সহস্র মুদ্রার লোভে কারারক্ষক সনাতনকে ছাড়িয়া দিলেন। সনাতন কারামুক্ত হইয়া ঈশান ভৃত্য সহ পাহাড়-পর্ব্বত, জল-জঙ্গল কিছুই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় দিবারাত্রি কখন পথে, কখন বা অপথে চলিতে চলিতে পাতরা পর্ব্বতের পথে জনৈক ভুঞা দস্যুর হস্তে সাতটী মোহর দিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। উক্ত ভুঞার ভৃত্যগণ তাঁহাকে রাতারাতি পর্ব্বত পার করিয়া দিল। সনাতন ঈশানকে তথা হইতে বাড়ী ফিরাইয়া দিলেন। অতঃপর আজিমপুরে সনাতনের ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত সহ সনাতনের সাক্ষাৎ হইল। শ্রীকান্ত তাঁহার মলিন বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে "ভদ্র" করিবার নিমিত্ত ২।১ দিন তথায় অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সনাতন কিছুতেই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। অবশেষে শ্রীকান্ত প্রদত্ত একখানি "ভোটকম্বল" লইয়া গঙ্গা পার হইয়া তখনিই চলিয়া গেলেন, এবং কিছুদিনের মধ্যেই বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় মহাপ্রভুর অবস্থিতি সংবাদ শ্রবণে মহানন্দে ব্যাকুলিত-চিত্তে প্রভুর অনুসন্ধান করিতে করিতে তথাকার চন্দ্রশেখর বৈদ্যের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। এদিকে অন্তর্যামী মহাপ্রভু মনে মনে সনাতনের আগমন সংবাদ অবগত হইয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "দ্বারদেশে উপবিষ্ট বৈষ্ণবটীকে এখানে আনয়ন কর।" চন্দ্রশেখর দ্বারে আসিয়া দরবেশ রূপী সনাতনকে দরবেশ ভাবিয়া ফিরিয়া গিয়া মহাপ্রভুকে বলিলেন, "প্রভো! দ্বারদেশে কোন বৈষ্ণব নাই, জনৈক দরবেশ রহিয়াছেন।" অতঃপর মহাপ্রভু বলিলেন, "তাঁহাকেই লইয়া আইস।" তখন সনাতন দৈন্য, আর্ত্তনাদ ও স্তুতি করিতে করিতে চন্দ্রশেখর সহ গমন করিয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলেন। তাহাতে মহাপ্রভু ব্যাকুল হইয়া নেত্র-জলে পরিষিক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং সনাতনকে সপ্রেম আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার ন্যায় ভক্তকে স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইলাম।" সনাতন দীনতার মূর্ত্তি; তাঁহার দৈন্য-বিনয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি পুনরায় বলিলেন,—

এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় কৃপাময় পতিত পাবন॥
মহা রৌরব হৈতে তোমায় করিলেন উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)

উত্তরে সনাতন বলিলেন, "প্রভো! আমি তোমা ভিন্ন অপর কৃষ্ণ জানি না, তুমি স্বয়ং কৃষ্ণ আমার উদ্ধারের হেতু।" অতঃপর তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর সহ সনাতনের মিলন হইল।

ক্রমশঃ।

উচ্ছ্বাস।

লেখক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

কি দিয়ে পূজিব দেব! নাহি কিছু সম্বল আমার।
যা ছিল সকলি মোর চলে গেছে, আছে মাত্র নয়ন-আসার॥
কত মনে আশা ছিল, সব ত শুকায়ে গেল,
পুড়িতেছি মনাগুনে সদা।
কিসে যে পাইব শান্তি, কিসে যে ঘুচিবে ভ্রান্তি,
তাই চিন্তা করি রাত্র দিবা॥
কেন যে এমন হয়, কিসে যে এমন হয়,
বুঝি না তা এই মনে খেদ।
তাই সদা নিরজনে ভাবি হে একান্ত মনে,
কিসে মোর যাবে মনঃক্লেদ॥
তুমি প্রভু ভগবান, হৃদয়েতে অধিষ্ঠান,
নাহি কিছু অজ্ঞাত তোমার।
তাই করযোড়ে ভিক্ষা মাগিতেছি, দাও শিক্ষা
কিসে চলি যাবে অন্ধকার॥
ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হৃদয় তমসাচ্ছন্ন,
কোন দিকে নাহি যায় দৃষ্টি।
কিছু যে লাগে না ভাল, কৃপার আলোক জ্বাল,
হোক মোর নব মন সৃষ্টি॥
আজ যে এশুভ দিনে, সকলে আনন্দ মনে,
করিতেছে কত আয়োজন।
আমি যে অধম অতি, তুমি অগতির গতি,
কৃপা করি দিও হে চরণ॥
মনে মনে যাহা ছিল, সকলি ত পণ্ড হল,

কি কাজ করিয়া ছার আশা।
যাহাতে নাহিক শান্তি, কেবল বিষম ভ্রান্তি,
দূরে চলে যাক্ সে দুরাশা॥
কোথায় পূজিব নাথ! করিতেছি প্রণিপাত
দূর হতে, নাহি যাব কাছে।
কি জানি যাইলে কাছে, পাপী স্পর্শে দোষ পাছে,
তাই ভাবি নাহি রাস্তা আছে॥
ক্ষম প্রভু অপরাধ, মিটে যাক্ সব সাধ,
জীবনের হোক অবসান।
কামনার জন্য আর, বলিব না বার বার,
শেষে যেন পাই পরিত্রাণ॥

উচ্ছ্বাস।

(গঙ্গা দর্শনে)

লেখক—শ্রীযুক্ত দেবীপদ চট্টোপাধ্যায়।

অয়ি পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে! পুণ্য-সলিলপ্রবাহে ত্রিভুবন-পূতকারিণি! পতিতপাবনি! পতিত জনগণের উদ্ধার কল্পেই ত' মা তোমার মর্ত্ত্যে আগমন। মাগো কল্লোলিনি! ব্রহ্মশাপ-বিধ্বস্ত সগর-বংশ তোমারই অনন্ত করুণা প্রবাহে পুনর্জ্জীবিত হয়েছিল; অভিশপ্ত বসুকুল তোমারই পূত সংস্পর্শে পুনঃ স্বর্গাধিরূঢ় হ'তে পেরেছিল; আবার কত শত মাদৃশ পাতকী নারকী তোমার পূত তরঙ্গ-মুখে উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে। মাগো! যথার্থই তুমি পতিতোদ্ধারিণী। পতিতপাবনি! তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

উন্মাদিনি! উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে মৃদু কলনাদে অনন্ত লীলাময়ের অপূর্ব্ব সৃষ্টি-নৈপুণ্যের মহতী-গাথা ঝঙ্কৃত কর্চ্ছ। এ উন্মাদনা কার তরে মা? কার তরে তুমি মা এত চঞ্চলা হয়েছ?

মাতঃ ভাগীরথি! তোমার প্রতি তরঙ্গ-ভঙ্গে প্রাচীনের কত পুণ্য ইতিহাস, কত রমণীয়, কত প্রাণস্পর্শী কথা আজ আমার হৃদয়ে জেগে উঠ্‌ছে, কত

পুণ্যকীর্ত্তি, কত মনোময় চিত্র, কত অতীতের স্মৃতি আজ আমার অন্তরের অন্তস্তলে প্রতিফলিত হচ্ছে। অয়ি পুণ্যময়ি! পুণ্যস্রোতোমুখে পূত-কুসুম-বাহিনি! প্রতি কুসুমে তোমার অনন্ত মহিমা কীর্ত্তিত হচ্ছে। মহিমময়ি মাগো! অপার মহিমায় ত্রিভুবনে "গরীয়সী" আখ্যায় আখ্যাত হ'য়েছ। যথার্থই তুমি গরীয়সী! জগতে তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে মা?

তোমার অনন্ত স্নেহ ধারায় "ত্রিজগৎ" বঞ্চিত নহে। স্নেহময়ি! মন্দাকিনী-রূপে তুমিই সুরপুরে সুমধুর সুরে সান্ত্বনা দিচ্ছ; তুমিই আবার ভাগীরথী রূপে মর্ত্ত্যে তরল তরঙ্গ-ভঙ্গে মর্ত্ত্য-বাসীর মত্ততা অপনোদন কর্চ্ছ। আবার তুমিই ত মা ভোগবতী রূপে রসাতলে দানবকুলের ভোগতৃষা বৃদ্ধি কর্চ্ছ, ত্রিজগতে তোমার করুণা অনন্ত।

অয়ি শৈলসুতে! আজ তোমার দর্শনে দর্শনাতীত শ্রীগোবিন্দচরণ স্মরণ-পথে আবির্ভূত হ'য়ে আমাকেও তোমার স্রোতোমুখে ভাসাইয়া দিয়াছে; হিমাদ্রির হেমকান্তির প্রতিচ্ছবি যেন আমার অন্তরে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সৃষ্টি কর্চ্ছে; মাগো অমলধবলবরণি! এত গুণের আধার বলয়াই সর্ব্বগুণাকর সর্ব্বেশ্বর সাদরে তোমায় শিরে ধারণ করে গঙ্গাধর হয়েছেন।

আবার মা তুমিই ভীষণ নক্রকুম্ভীরাদির আশ্রয়দাত্রী হয়েছ। এমন কি সময়ে সময়ে করাল কালসম ভীষণ ভাব ধারণ ক'রে তুমি নিজে কত শত সন্তানকে তোমার অঙ্কে চিরনিদ্রাগত কর। এ ভীষণতা কেন মা? এ বিভীষণতার উদ্দেশ্য কি? মূঢ় মানব আমি, তোমার রহস্য উদ্ঘাটনের ক্ষমতা আমার কোথায় মা?

অনন্তপিয়াসি! অন্তরে একটা অস্ফুট প্রতিমূর্ত্তি যেন আমায় বলে দেয়, "জগতে যে কেহ অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর হউক না কেন, ত্রিজগতে গুণ গরিমায় ধন্য হউক না কেন, এমন কি ভীষণতায় বিভীষণমূর্ত্তি ধারণ করুক না কেন, তাহার পরিণতি যে "অনন্তে সংমিশ্রণ" তাহা অবশ্যম্ভাবী।"

অয়ি দুকূলপ্লাবিনি! ঘন বিটপীশোভিনি! বিহগকুলের মধুর কূজনে সদাই কূজিত হয়ে চলেছ; কত শত যাত্রী তোমার প্রশস্ত বক্ষবর্ত্ম তরণী-তোরণে শোভিত ক'রে কত বিবিধ গাথায় মুখরিত কর্চ্ছে, দূর্ব্বাদলবসনাঞ্চলশোভিনি! কিবা তরঙ্গ ঝঙ্কার, কিবা তরীবাহকুলের উদ্দামবিক্ষিপ্ত ক্ষেপনীধ্বনি, কিবা নাবিক কুলের অবোধ্যগাথা, কিবা শতপত্রময়-তটবিটপীকুলোদ্ভব বিহগকুলের মধুর কাকলি! সকলই মধুর, সকলই মনোময়, সকলই সন্তাপনাশা।

মাগো সন্তাপনাশিনি! সন্তপ্ত চিত্তবিনোদিনি! লহরে লহরে কত শত চিতা বিধৌত করে অনন্তের পানে ছুটে চলেছ; আমার হৃদয়ের হৃদয়, অন্তরের অন্তর বিধৌত ক'রে মলিনতামাখা স্মৃতিকণা-চিতাভস্মটুকুও চিরতরে বিলুপ্ত করে দিয়ে যাচ্ছ। কিন্তু মা! আমার ত মনের চিতা মুছবে না। সে যে জ্বলন্ত, সে যে চিরদিনই দাউ দাউ করে জ্বল্‌বে। যাও উন্মাদিনি! রত্নাকর-প্রেম-বিহ্বলিনি! চিতাঙ্গার লয়ে তরতরে বয়ে যাও, সাথে তার—নয়ন আমার আমার নিয়ে যাও মাগো!

"সদ্যপাতক-সংহন্ত্রী সদাদুঃখ-বিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতিঃ॥"

গীত।

ইমন্—তেওরা।

কত ব্যথা পেয়েছি আমি, কত দুঃখ সহেছি হে!
ভগ্ন হৃদয়ে কারেও না দেখে, কতই কেঁদেছি যে!
শূন্য ঘরে, শূন্য হৃদয়ে, ভেসে নয়নের জলে,
কোথায় আছ তুমি, কোথায় পাব আমি, বলে ডেকেছি হে!
তখনি তুমি মোরে দয়া করি, প্রকাশিলে তব রূপ;
পাইনু কত সুখ, ভুলিনু সব দুঃখ, হেরিনু তব মুখ।
কত ভালবাস. না কাঁদিলে কে জানিতে পারে?
শোক-বিকারে, বিপদ-আঁধারে, হরি হে তোমারে জেনেছি হে!

শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গল বা কালকেতু।

লেখক—শ্রীযুক্তরাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বালিকা। না বাবা! যদি কখনো ভ্রান্তিবশে কোনও অপরাধ করি, তাহলে ত আমাকে বক্‌বে না?

রাজা। না, না, তোমার শত অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বো। সেনাপতে! অদ্য সভা ভঙ্গের ঘোষণা-ঘণ্টা বাদন করুন। ক্ষুধাতুরা মাকে নিয়ে আমি এখন অন্তঃপুরে গমন করি। প্রস্থান।

সেনাপতি। যে আজ্ঞে। (ঘণ্টাবাদ্য করণ)।

সকলে। জয় অনাথপিতা কলিঙ্গনাথের জয়। (সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য—গুজরাট রাজ্য।

রাজা সাজে কালকেতু: রাণী সাজে ফুল্লরা।

সভাসদ্‌গণ স্ব স্ব স্থানে আসীন।

কালকেতু। (দণ্ডায়মান হইয়া) হে গুজরাটের পৌর-জানপদবৃন্দ! আপনাদের অনুমতি গ্রহণ করে সর্ব্বমঙ্গলালয়া মা মঙ্গলচণ্ডীর নামে এই গুর্জ্জর নগরে মায়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হ'লো। আমি মায়ের শ্রীপদরেণুকণবাহী ভৃত্যের ভৃত্য। আপনারা সকলে মায়ের জয়ধ্বনি করুন।

সকলে। জয় মঙ্গলময়ী চণ্ডী মায়ের জয়!

কালকেতু। আপনাদের সর্ব্বপ্রকার সুখ-দুঃখের সঙ্গে এ ভৃত্য অদ্য হতে জড়িত হলো। মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রম প্রমাদ থাকা স্বাভাবিক। যদি কখনও আপনারা আমার কোনও দোষ ত্রুটি দর্শন করেন,

তবে যেন অকপটভাবে তাহা আমার কর্ণগোচর করবেন, এইটি আমার বিনীত নিবেদন।

সকলে। জয় সত্যবাদী কালকেতুর জয়।

কালকেতু। এই নূতন রাজ্যের রাজভক্ত প্রজাগণ আপনাপন যোগ্যতানুসারে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হবেন। তাঁরা চণ্ডী মায়ের নামে গুজরাট রাজ্য শাসন করবেন। আসুন! আপনারা কে কে কোন্ পদের প্রার্থী, নিবেদন করুন।

(কাঁচা কলার কাঁদি লইয়া গোবর্দ্ধন দাস পশ্চাতে,
অগ্রে ভাঁড়ু দত্তের কাণে কলম লম্বা কোঁচা)

ভাঁড়ু। হেঁ হেঁ গোবর! রাজা ত রাজা কালকেতু! ঠিক যেন যমদূত। দেখ্ দেখি কেমন ঝাউ কাঁটার মতন একযোড়া গোঁফ নিয়ে আদাড় বনে শিয়াল প্রভু উপবেষ্টন কচ্ছেন। আহা হা! ধর্ম্ম-পুত্র অলম্বুষ আর কি! (প্রকাশ্যে) জয় মহারাজাধিরাজ কালকেতুর জয়! (প্রবেশ করিল)

কালকেতু। আসুন, আসুন। আপনি কোথা হতে আস্‌ছেন? আসন গ্রহণ করুন।

গোবর। (হাসিয়া) হেঁ হেঁ লাজা কি বল্‌ছেক্? "আসুন আসুন"! তারা বল্‌ছিলো "আয় শালা, বস্ শালা, এই সব, হেঁ হেঁ।

ভাঁড়ু। (ধমক্ দিয়া) পেন্নাম কর্। শালার কথায় যেন মধু বর্ষণ হচ্ছে। (কালকেতুর প্রতি) আজ্ঞে এটি আমার ভৃত্য, আপনার নেগে এক কাঁদি কাঁচকলা ভেট এনেছি। দৃষ্ট করেন (কলা প্রদর্শন)। আমি সম্প্রতিক বহু দূর হতে। মনে করুন অঙ্গদেশ কিনা কর্ণের রাজ্য হতে। আর দাতা কর্ণও নাই, স্বর্ণও নাই। কাজেই আস্‌তে বাধ্য। তা আপনকার দেশে শুনলুম নূতন রাজ্য নূতন রাজা। ভারি মজা হলো। ভাবলুম রাজ-দরশনে যাই।

গোবর। তা কেনে, তা কেনে দত্ত! পাত্র হবাল মনে কলে এসেথো। তলাম্ কলে বলে ফ্যাল।

ভাঁড়ু। (চিম্‌টি কাটিয়া) চোপ্ শালা!

গোবর। আঁই, আঁই—আমি পালিয়ে যাই। (প্রস্থান।

ভাঁড়ু। আপদ্ গেল। শুনুন রাজা! ভৃত্যটির মগজে বুদ্ধির আসন প্রতিষ্ঠাবান নাই। শালার মগজ কাগজের ন্যায় ধবল ধূমো। তাই বল্‌ছি অর্থাৎ সবিনয়ে কিনা বিনয়ের সহিত, যে আমি একজন ভারস্থ কায়স্থ, তাই আপনার দ্বারস্থ।

জনৈক সভাসদ। আপনার কথাগুলিও বেশ রসস্থ।

ভাঁড়ু। হ্যাঁ নিজ গুণে হেঁ হেঁ বা বলেন। শাস্ত্রে বলেছে অমৃতং বাল ভাষিতং। অর্থাৎ অমৃত কিনা "বাল" অর্থাৎ "ভাল" আর ভাষিতং" কিনা বাসিতং। অর্থাৎ অমৃত কে না ভালবাসে? সবাই ভালবাসে। আপনিও আমার প্রতি আড়ষ্ট হয়ে অমৃত-ময় আমার বাল ভাষিতং কিনা ভালবাসিতং কর্‌ছেন। নমস্কার মশায়, নমস্কার। শুনুন রাজা! ধর্ম্মগুপ্তর পুত্র চিত্রগুপ্ত তাঁর বংশে আমল হাঁড়ার দত্ত। তাঁর বংশ নির্ব্বাণ এই কুল-কলঙ্ক ভাঁড়ু দত্ত, কাশ্যপ গোত্র। তক্ষক গাঁই আমার উপরে আর কেউ নাই। ঘোষ ও বসুর দুই কন্যা, কুলে শীলে নোলায় ধন্যা, কথায় যেন দামোদরে প্রবল বন্যা, এ হেন রমণী দুটী আমার সহধর্ম্মিণী। আমার বিপুল সংসার, দুই জায়া, তিন শালা, চারি পুত্র, ভগিনী মেলা। শ্বশুর নাই, শাশুড়ী আছেন। ছয় জামাই, আট ঝিয়ারি, আর আর বন্ধু-বান্ধব একপাল।

কালকেতু। আপনি এখানে বসতি কর্‌বেন?

ভাঁড়ু। যে আজ্ঞে, শাস্ত্রে বলেছেন, "চাটুতি অবসতি" অর্থাৎ চট্টো-পাধ্যায় কিনা কাশ্যপ-গোত্রীয়গণ অবসতি করেন কিনা ধনমান পেলেই থেকে যান, আর কি! আমিও কাশ্যপগোত্র কুলীন-পাংশুল। আমাকে প্রধান মন্ত্রীর পদটি প্রদান কর্ত্তে হুজুরের আজ্ঞা হোক্। পুনশ্চ নিঃ, কিনা নিবেদন এই যে, আপন-কার পিতা স্বর্গীয় ধর্ম্মকেতুর সঙ্গে আমার পিতৃ-পুরুষের ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব এবং কিঞ্চিৎ জ্ঞাতিত্ব বর্দ্ধমান ছিলেন। সেই হিসাবে আপনি আমার খুড়া ঠাকুর হইলেন। দয়া করে এই নিগূঢ় ঘনিষ্ট এবং গরিষ্ঠ সু-সম্বন্ধটি অঙ্গীকার কর্ত্তে আজ্ঞা হোক।

কালকেতু। আচ্ছা তাই হোল। আপনি সপরিবারে এখানে আগমন করুন।

আমি যথাযোগ্য ভূ-সম্পত্তি প্রদান করবো।

ভাঁড়ু। জয় দাতাকর্ণ ধূমকেতুর জয়।

সভাসদ্। (অনুচ্চস্বরে) ধূমকেতু নয় হে! "কালকেতু বল"।

ভাঁড়ু। আনন্দের স্রোতে ভাসমান হয়েছিলুম ভাই! জয় দাতাকর্ণ কালকেতুর জয়।

(কালকেতু মন্ত্রীর পোষাক ও পাগ্‌ড়ী পুরস্কার দিলেন। ভাঁড়ু দত্ত পরিধান করিতে করিতে)

ভাঁড়ু। বাহবা বাহবা! কেমন সুন্দর পোষাক! (গোবর্দ্ধন দাসকে ডাকিতে ডাকিতে) গোবর্দ্ধন! গোবর্দ্ধন!

(গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

এসেছ ধন! টিয়ালেই ছিলে বুঝি! হেঁ হেঁ যাবে কোথা? আমি যে এখানে প্রধান মন্ত্রী হলুম হে! বাড়ীতে গিয়ে বলো, বেশ! (মোজা দুইটি হাতে প্রবেশ করাইয়া, মাথায় পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়া এবং উল্টা করিয়া চোগা ও চাপকান পরিয়া) কেমন সুযোগ্য মন্ত্রী মানাচ্ছে না? ও মানাতেই হবে। সাত-পুরুষ দেওয়ানী করছি বাবা! একি এ জন্মের, যে ভেবড়ে যাবো? আচ্ছা এখন তোমরা আনন্দের সহিত বল, "জয় মহামন্ত্রী ভাঁড়ু দত্তের জয়।"

গোবর। হেঁ হেঁ দিদি বল্‌তো "নির্ধনেল ধন হয় দিনে দেখে তালা।"

ভাঁড়ু। দূর্ শালা, সব মাটী কল্লে। বেশ জমে এসেছিলো। প্রজাগণও "হাঁ" করে ছিলো। এমন সময় শালা মঘা, মূর্ত্তিমান মঘা, আর এড়াবি ক ঘা? আবার দেখি, জমাতে পারি কিনা। হে গুর্জ্জর-প্রদেশবাসী জর্জ্জর প্রজাবৃন্দ! তোমরা তোমাদের সুযোগ্য অনারোগ্য নবমন্ত্রীর মন্ত্রীত্ব ও সুমিষ্ট আমসত্ব প্রাপ্তি উপলক্ষে সর্ব্বজনসমক্ষে বল উচ্চরবে "জয় মহামন্ত্রী ভাঁড়ু দত্তের জয়"।

সকলে। জয় মহামন্ত্রী গোপাল ভাঁড়ের জয়।

ভাঁড়ু। বেশ্, সভা ভঙ্গের ঘণ্টাবাদ্য হোক্। অদ্যকার মত চৌষট্টি নামতা সমাপ্ত। ইতি—

গোবর। গজ।

(ভাঁড়ু দত্ত নানা ভঙ্গী ক্রমে যাইতে লাগিল। পশ্চাতে গোবর্দ্ধন অঙ্গুলি দেখাইয়া দাঁত দুপাটি বাহির করিল)

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

গুজরাট নগর শিবরাত্রি উৎসবে নাগরিকগণের গান।

সুর—ফাঁকতাল।

নাগরিকগণ। জয় জয় শিব শঙ্কর ভূতেশ্বর শম্ভো
অগতির গতি নাথ দেব দিগম্বর।
জ্বলন্ত হুতাশন্
জ্বলিতেছে ধক্ ধক্,
ভুজঙ্গ-রসনা করিতেছে লক্ লক্,
ছল্ ছল্ গঙ্গা ফেনিল তরঙ্গা
জটিল জটাজালে
বহিতেছে তর্ তর্
বিভূতি-ভূষণ প্রমথনাথ
অস্থিমালা গলে রুদ্রাক্ষ সাথ
বব বোম্ বব বোম্ নাচিতেছে রবি সোম
ওঙ্কার-রূপী, জয় ভুবনেশ্বর।

১ম নাগরিক। দেখ্ ভাই, এমন চতুর্দ্দশীর ঘন অন্ধকার রাত্রিও মহারাজের কৃপায় পূর্ণিমার ন্যায় আলোকিত হয়েছে। এমন প্রজারঞ্জক রাজা দুর্ল্লভ।

২য় নাগরিক। তা সত্যই, স্থানে স্থানে প্রহরীগণ সশস্ত্র চৌকী দিচ্ছে। রাস্তা-ঘাট পরিচ্ছন্ন, পথিকগণ চোখ বুজে মন্দিরে যেতে পারে।

১ম নাগরিক। চল্ ভাই, চল্, পূজার সময় হয়েছে। ঐ দেখ্ রমণীগণ পুষ্প বিল্বপত্রাদি গ্রহণ করে বিচিত্র ক্ষৌমবসন পরিধান ক'রে ধর্ম্ম-কেতুর নামে স্থাপিত শিবমন্দিরে গমন কর্‌ছেন! আহা! তাঁদের পবিত্র মুখমণ্ডলে কি উৎসাহদীপ্তি! হৃদয়ে কি ধর্ম্মানু-

রাগ ! জয় শিব দুর্গা, জয় শিবশম্ভো !

২য় নাগরিক। চল্ আমরাও যাই। (প্রস্থান)।

রমণীগণের প্রবেশ ও গান।

১মা। বাবা ! আমাদের পূজো নিও।

২য়া। বাবা আমাদের পূজনীয়।

বেলেরপাতে ধুতুরাতে
গঙ্গাজলে ধুয়ে নিয়ো।

সকলে। বছর বছর কর্‌বো উপোস্
গাইবো তোমার গান ;
কৃপা করো হে ভোলানাথ !
নিও দীনের দান ;
আমরা অধম নারী পূজ্‌তে পারি
এমন কিছু ক'রে দিয়ো॥

[চারিজন তস্করের মত্তাবস্থায় রমণীগণকে আক্রমণ,
রমণীগণ চীৎকার করিতেই ছদ্মবেশী
কালকেতুর প্রবেশ]

কালকেতু। (বংশীবাদ্য) সাবধান্ পাপিষ্ঠগণ ! আর এক পদ অগ্রসর হলেই মৃত্যু।

(প্রহরীগণের প্রবেশ)

১ম প্রহরী। ক্যা হুয়া হুজুর !

২য় প্রহরী। আরে বেহুদ্দা ! হুজুর তোম্‌লোক্‌কো বাতায় দেগা, আর তোম্‌লোক চোর ডাকু ধরেগা। ধর্ বাঁধ্ শালে লোক্‌কো। হারে চোট্‌ঠা ! তোমারা এত্‌না সাহস হুয়া ?

(সকলকে বন্ধন)

কালকেতু। (রমণীগণের প্রতি) যাও মা সকল ! শিবমন্দিরে পূজো দিতে গমন কর। ত্রিশূলী শঙ্করের ভৃত্য কালকেতু বর্ত্তমানে তোমাদের চরণে কণ্টকও বিঁধিবে না।

(রমণীগণের প্রস্থান)

প্রহরী ! এই স্থানে আলোক নাই দেখে তোমরা আমায় বল নাই কেন ? এইভাবে প্রকাশ্য রাজপথে রমণী-নিগ্রহ কি রাজার মহিমা-প্রসূনে পঙ্কলেপন করে না ? লোকে তোমাদের কর্ত্তব্য অবহেলায় দোষারোপ কর্লে আমার বড়ই কষ্ট হবে না কি ?

২য় প্রহরী। সাচ্‌বাত হুজুর ! লেকিন্ বাত্তিঠো জোর হাওয়ামে বুতায় গিয়া। হাম্ নেহি দেখা। কসুর মাপ্ কিজিয়ে হুজুর।

(পদধারণ)

কালকেতু। হয়েছে—হয়েছে। ক্ষমা করলাম। এখন এদের কি করা যায় ?

১ম প্রহরী। (রুলের গুঁতা মারিয়া) শালা চোট্‌ঠা ডাকু ! তোম্ লোক্‌কো বাস্তে লহরকা দাল আউর রোটি বনায় দেগা। চল্ বে শ্বশুরবাড়ী !

(প্রহার)

২য় প্রহরী। তমাম্ ঘাঁটি মশাল বাত্তিনে উজল হোগয়া। আউর তোম্ লোক্ ডাকু মদ পি করিকে চোরি কর্‌নে আয়া। হো শালা লোক ! তোম্ জান্‌তা নেই ক্যা মহারাজ ছদ্মবেশ ধর কর্‌কে তমাম্ রাত রাস্তাপর ঘুম্‌তে রহেঁ। ওঃ হঃ বড়া তাজ্জব কাণ্ড ! মহাবীরকা রাজমে এইসাহ কভি নেহি দেখা।

কালকেতু। তোমরা বেশ সবল, সুস্থদেহ ও নির্ভীক দেখ্‌ছি, তথাপি নিতান্ত হীনকর্ম্ম চুরি কেন কর ? তোমাদের বাড়ী কোথায় ?

২য় চোর। মহারাজ ! আপনার প্রশংসা শুনে আমাদের রাজা আপনার রাজ্য দেখ্‌বার জন্য প্রেরণ করেছেন। আমরা সোজা রাস্তায় না গিয়ে ঐ প্রকার হীন পথে গিয়েছি। এখন বুঝেছি আপনি যথার্থই মহাবীর কালকেতু।

২য় চোর। মহারাজ ! আপনার ছদ্মবেশ দেখে কেহই আপনাকে মহাবীর কালকেতু বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু সূর্য্যদেব মেঘমণ্ডলে আচ্ছাদিত হ'লেও তাঁর তেজোরাশি কখনই আবৃত হয় না। ধন্য আপনি। আপনার চরণে কোটি প্রণাম। (প্রণাম)

৩য় চোর। সর্ব্বত্রই শুনা যায়, রাজা আপনার দেশেই সম্মানিত হন, বিদেশে তাঁর সম্মান নাই। কিন্তু প্রভু ! আপনার যশোভাতি সুদূর অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হয়েছে। ধন্য আপনার সুশাসন !

ধন্য আপনার প্রজাপালন !

৪র্থ চোর। মহারাজ! আমাদের নিবাস বঙ্গদেশে। তথাকার রাজা আপনকার নাম শুনে আমাদের চারিজনকে ছদ্মবেশে রাজা দর্শনে প্রেরণ করেছেন। আমরা এখন চোররূপে ধৃত ও বন্দী হয়েছি। আমাদের কথায় বিশ্বাস না হয় এই দেখুন পাঞ্জা।

(পাঞ্জা দেখান)

কালকেতু। (পাঞ্জা পড়িয়া) শ্রীশ্রী ল শ্রীযুক্ত শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর বিক্রমাকেশরী প্রবল প্রতাপান্বিত বীরকেশরী নন্দন জগবন্দন। না, আমার আর সন্দেহ নাই। তবে আমার নিকটে সোজা-সুজি এলে যে সম্মান পেতে এখন তা পেতে পার না, কারণ তোমরা রাজবন্দী। রাজবন্দীর উপযুক্ত শাস্তি তোমাদের ভোগ কর্ত্তেই হবে।

২য় প্রহরী। আলবৎ।

১ম প্রহরী। ওয়াজীব।

কালকেতু। যাও প্রহরী! এঁদের বন্ধন মুক্ত করে দিয়ে নজরবন্দী ভাবে রাখ এবং মহামন্ত্রীকে সংবাদ দাও, যেন বঙ্গদেশের রাজার নামে একখানি পত্র লিখে পঞ্চাশ জন দূত সঙ্গে ঐ পত্র প্রেরণ করেন।

প্রহরীগণ। যো হুকুম। (বিভিন্ন পথে সকলের প্রস্থান)

বালকগণের প্রবেশ ও গান।

বালকগণ। ওরে আজকে শিবের পূজা।
ওরে আজকে শিবের পূজা।
সারাদিন সন্দেশ পাবো বলে গেছেন রাজা।
লুচি পুরী ক্ষীর কচুরী নিম্‌কি মোহন ভোগ,
ওরে সিদ্ধির নাড়ূ খেলে পরে ঘুচে যায় সব রোগ,
ধিন্‌তা ধিনি ধিনিতা, ধূত্‌রো বেলের পাতা
চল ভাই মন্দিরে যাই, দেখ্‌বো কতই মজা।
ও ভাই দেখ্‌বো কতই পূজা॥ (প্রস্থান)

ক্রমশঃ।

জন্মভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৬শ বর্ষ } ১৩৩৭ সাল, মাঘ { ১০ম সংখ্যা।

শ্রীমদ্‌বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহারাজের পর্য্যটন।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

নবম বৎসরে নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন ও ৭।৮ মাস কাল যাবৎ গঙ্গোনাথে অবস্থানের পর গৌরী-শঙ্কর মহারাজের সহিত মিলিত হইয়া নর্ম্মদা পরিক্রমা চলিতে থাকে। এরূপে ৭ বৎসর অতিবাহিত হয়। পরে উক্ত মহারাজের সহিত প্রয়াগে আগমন করিবার পর চিত্রকূট দর্শনে যাত্রা করেন। ইহার পর মধ্য ভারতবর্ষের বহু তীর্থ দর্শন করিতে করিতে পুনরায় যাইয়া নর্ম্মদা পরিক্রমা গ্রহণ করেন ও কয়েক বৎসর ধরিয়া এ পরিক্রমায় ব্যাপৃত থাকেন। এ নর্ম্মদা-পরিক্রমার ও মধ্য-ভারতবর্ষে ভ্রমণের কতকগুলি বিস্ময়কর বিষয় পরে বর্ণিত হইবে। ইহার পর দাক্ষিণাত্য ও বোম্বাই প্রদেশের বহু স্থান ও গুজরাট, কাটিবার, কচ্ছ, রাজপুতানা ও পঞ্জাব প্রদেশস্থ তীর্থ দর্শন করিতে করিতে উত্তরাখণ্ডে আগমন করেন। বহুদিন ধরিয়া উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করেন। এ সকল স্থানে যে সমুদয় আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল তাহাও শুনাইব। ইহার পর উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশস্থ বহু তীর্থ দর্শন করিতে করিতে এই বৈদ্যনাথ-ধামে আগমন করেন। এ সময়ে ৩।৪ দিন কাল শিবগঙ্গার ধারে অবস্থান

করেন ও ইহাই হইতেছে বৈদ্যনাথে প্রথম আগমন। গুরুদেব শুনাইয়াছেন যে, এ সময়ে সর্দ্দার পাণ্ডার পাকা দোতালা বাড়ী ভিন্ন অন্য দোতালা বাড়ী এখানে ছিল না। ইহার পর জগন্নাথজী দর্শনে যাইবেন মনে করিয়া পদব্রজে কলিকাতায় যাইয়া উপস্থিত হন ও জগন্নাথ ঘাটে আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে এবারে মহারাজ কলিকাতায় আসিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, বহুজনপূর্ণ এক জঙ্গলে যেন তিনি প্রবেশ করিয়াছেন। কোথা "দিশাময়দান" বা শৌচাদিতে যাইবেন, কোন্ স্থানেই বা ভোজন প্রস্তুত করিবেন এ সব ভাবিয়া অতি চিন্তাযুক্ত হইয়া বিমর্ষভাবে অবস্থান করেন। দুই একজন সাধু তাঁহার এ ভাব দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। তাঁহারা কালীঘাটের বিষয় বলিয়া দিলেন। পরদিন অতি প্রত্যুষে কালীঘাটে চলিয়া গেলেন ও সেখানে মা কালীর পূজা শেষ করিয়া সেখান হইতে দুই মাইল দক্ষিণে যাইয়া এক উন্মুক্ত স্থানে আসন স্থাপন করিতে পারিয়া নিজেকে যেন স্বস্থ মনে করিলেন। এখানেই ভোজনাদি সম্পন্ন করিলেন। ইহার পর পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। এতদঞ্চলেই বহু তীর্থ দর্শনান্তর কামিখ্যা দর্শনে মানস করিয়া ধুবড়ী পর্য্যন্ত গমন করেন। সেবার কামিখ্যা দর্শনে বাধা পড়িয়াছিল। ইহার বিবরণ পরে দিব। ফিরিয়া আসিতে আসিতে বহরমপুর খাগড়ায় উপস্থিত হন। এখানে এক বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের পাগল কিরূপে চিম্‌টার আঘাতে রোগমুক্ত হয়, তাহাও পরে জানাইব। এখান হইতে আসিয়া প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ঘাটে ভূতানন্দ স্বামীর সহিত মিলিত হন। ইহাঁরই পরামর্শমত মহারাজ তারকেশ্বরে গমন করেন। এ স্থানে যে সময় আগমন করেন তাহার কয়েকদিন পূর্ব্বেই ভূতপূর্ব্ব মোহান্ত মাধবগিরি নবীন-এলোকেশীসংক্রান্ত মোকর্দ্দমার কারাবাস হইতে মুক্ত হইয়া আসেন। ইহার বিবরণও পরে দেওয়া হইবে। এবার তারকেশ্বরে মহারাজ প্রায় ১ বৎসর অবস্থান করেন। এখানে কাশীর ক্রবেশ্বর মঠের মণ্ডলেশ্বর রামগিরি স্বামীর সহিত মিলিত হন ও হৃষীকেশের কালি কমলাওয়ালা (কম্বল ওয়ালা) নামক সদাব্রতদানের প্রতিষ্ঠাতার সহিত পরিচিত হন। এক বৎসর পরে পুনরায় কামিখ্যা দর্শনে বহির্গত হন। এখান হইতে ফিরিবার সময় কিরূপে [illegible] কলেরায় আক্রান্ত হইয়া রক্ষা পান ও এই বারই রাণাঘাটে আসিয়া কিরূপে রামচরণ বাবুর সহিত পরিচিত হন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা পরে দেওয়া হইবে। রাণাঘাট হইতে কালীঘাট, জলেশ্বর ও তারকেশ্বর হইয়া বৈদ্যনাথ আগমন করেন। ইহা হইতেছে দ্বিতীয়বার বৈদ্যনাথ আগমন। ইহার

পর উত্তরাখণ্ডে চলিয়া যান ও গঙ্গোত্তরীর গঙ্গাজল লইয়া পদব্রজে যাইয়া সেতুবন্ধে রামেশ্বরের মস্তকে সে জল নিজ হস্তে নিক্ষেপ করেন। এ সময়ে ত্রিকুলী নারায়ণে মনসাগিরির সহিত সাক্ষাতের পর যে সব অলৌকিক ব্যাপার হইয়াছিল তাহার বিবরণও পাঠকগণ পরে জানিতে পারিবেন। সেতুবন্ধ হইতে ফিরিয়া কাশীতে আগমন করেন ও রামগিরি স্বামীর পরামর্শমত রাণাঘাটে যাইয়া দীক্ষা প্রদান করেন ও পুনরায় পর্য্যটনে বাহির হন। ইহার পর গির্ণারে অবস্থান কালে কিরূপে ধ্যানাবস্থায় রামচরণ বাবুর অস্ত্রোপচার জানিতে পারেন ও ইহার কিছুদিন পরে হরিদ্বারের কুম্ভমেলার অব্যবহিত পরেই তাঁহার সহিত সেখানে মিলিত হন তাহাও বর্ণিত হইবে। ১৯২৭ সালে যে কুম্ভমেলা হরিদ্বারে হয়, এ কুম্ভ হইতেছে তাহার ৩৬ বৎসরের পূর্ব্বের কুম্ভমেলা। ইহার পর কাশী হইয়া ও স্বামী মউজ গিরিকে (এ সময়ে ব্রহ্মচারী ধীরানন্দ) সঙ্গে লইয়া বৈদ্যনাথ আগমন করেন। ইহা তৃতীয়বার সেখানে আগমন। এবার এখানে রামচরণ বাবুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার জন্য মহারাজ কিঞ্চিৎ প্রকট হন। কারণ সরকারী ডাক্তার ৺বাণীকণ্ঠ বন্দোপাধ্যায় এবার এখানে দীক্ষিত হন। এবারই যাইয়া প্রথম তপোবন দর্শন করেন ও সে স্থান বাসের অনুকূল হইবে ইহা প্রকাশ করেন। ইহার কিছুদিন পরে বারাসতে যাইয়া রামচরণ বাবুর সহিত মিলিত হন ও সেই দিনই আসিয়া কলিকাতায় মতিশীল ও প্রাণনাথ সেঠের ঘাটের মধ্যস্থলে অবস্থিত এক "ভূতের" বাড়ীতে অবস্থান করেন ও সেখান হইতে গঙ্গাসাগর মেলায় গমন করেন। এবার কলিকাতায় অবস্থান কালে অনেকের নিকট পরিচিত হন ও কয়েক জনকে দীক্ষা প্রদান করেন। এ ভূতের বাড়ীর বিবরণ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক ঘটনা পরে বিবৃত হইবে। ইহার পর বৈদ্যনাথে চলিয়া আইসেন ও কয়েকদিন হনুমান টিকরীর একটী বাড়ীতে অবস্থানের পর তপোবনে যাইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। এ অবস্থান সময়েই মহারাজের মাতৃদেবী তথায় আগমন করেন, ইহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। রামচরণ বাবু আলীপুরের চাকরী করিবার দুই বৎসর পরে পেন্‌সন গ্রহণ করেন ও বৈদ্যনাথে বাস করিবার জন্য বাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। পেন্‌সন লইবার পর প্রায় দুই বৎসর ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের ষ্টেটে ম্যানেজারি করেন ও এই সময়ের মধ্যে তাঁহার বৈদ্যনাথের বাড়ীও প্রস্তুত হয় ও তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়া সেখানে বাস আরম্ভ করেন। মহারাজের মাতৃদেবীর দেহত্যাগের পর ও রামচরণ বাবু আসিয়া বাস করিবার সময় আমাদের গুরুভ্রাতা পূর্ণানন্দ মহারাজ আসিয়া দীক্ষালাভ করেন ও তপোবনে মহা-

রাজের সহিত অবস্থান করেন। এ তপোবনে অবস্থান সময়েও মধ্যে মধ্যে মহারাজের পর্য্যটন বন্ধ ছিল না। এ সময়ে পূর্ণানন্দজী বরাবর মহারাজের সহিত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এ পর্য্যটন কালে তাঁহারা গঙ্গোনাথ, গুজরাট প্রদেশ, দাক্ষিণাত্যের বহুস্থান, মধ্য-ভারতবর্ষের বহুস্থান ও উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার, মন্মহেশ, জালামুখী, ও ডাকসু ও কাংড়া প্রদেশের বহুস্থান একসঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃষীকেশ, ডাকসু প্রভৃতি স্থানে অবস্থান সময়ে ২।১ বার ৺সাক্ষীগোপাল বড়াল ও লেখকের খুল্লতাত ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য অনেকে যাইয়াও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এ সময়ের মধ্যে পূর্ব্ব-বর্ণিত বঙ্গদেশের বহুস্থানে যাইয়াও তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন। এই তপোবনে অবস্থান সময়ের আশ্চর্য্য ঘটনা, এবং কিরূপে তপোবন ও কেরাণীবাদের আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা পরে ক্রমশঃ বিবৃত হইবে।

যাহাহউক এতক্ষণে পাঠকগণ হয়ত বেশ বুঝিয়াছেন যে, এরূপ কষ্টসাধ্য দীর্ঘকালব্যাপী ভ্রমণ আজকালকার সাধুসমাজে অতি বিরল। কোন কোন পাঠক হয়ত কেরাণীবাদে যাইয়া ও এ স্থানের ভোগৈশ্বর্য্য দর্শনের পর মনে করেন যে, এখানকার মহাত্মা ত পরম ভোগী, তিনি আবার সাধু কি প্রকারের? যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহারা ভারতের প্রাচীন সাধু চরিত্র অবগত নহেন। যৌবনের উদ্দামকালীন ভোগের সময়, তাঁহারা তিতিক্ষা দ্বারা অতি কঠোরতা আরম্ভ করেন। যখন তাঁহাদের ভোগাসক্তি তাঁহারা কঠোরতা দ্বারা বলি প্রদান করেন, তখন তাঁহারা ভোগ্যবস্তুর সহিত মিলিত হন। নিজে পাকা হইয়া তবে কাঁচা বস্তুর সহিত ক্রীড়া করেন। প্রথমে উপযুক্ত ওঝা হইয়া তবে বিষাক্ত বিষয়-রূপ গোক্ষুরা সর্পের সহিত ক্রীড়া করেন। যেখানে ইহার বিপর্য্যয় হয় সেখানেই অনর্থ দেখা যায়। উপরোক্ত পর্য্যটন ব্যাপার কেহ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে তবে তিনি বুঝিবেন যে, আমাদের মহারাজ কত বড় পাকা ঘুঁটী। আমাদের একটী বিষম ত্রুটী আছে। আমাদের নিজ নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা মানসিক ব্যাপার দ্বারা অপরের বিষয় বিবেচনা করিতে যাই। কিন্তু ভাই! ভাবিয়া দেখিবেন যে, আমার পা আর এই সাধুর পা কি একই প্রকারের? আমি দুই ক্রোশ পথ চলিতে যাইয়া কাতর হইয়া পড়ি, আর উঁহার পা এ ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই বিচরণ করিয়াছে। আমার হাত সামান্য একটু কঠিন কর্ম্ম করিতে যাইয়া ব্যথিত হয়, আর উঁহার হাত রন্ধন, কাষ্ঠ সংগ্রহ, জলাহরণ ও বাসস্থান নির্ম্মাণ অক্লেশে করিয়াছে। পরে জানাইব যে, তপোবনের

গুহা আবিষ্কার ও নির্ম্মাণ ও উপরে যাইবার পথ নির্ম্মাণ অধিকাংশই উঁহার নিজ হস্তের প্রস্তুত। আর আমাদের শরীর অল্প বাতাতাপেই মুহ্যমান হইয়া অবসন্ন হয় কিন্তু উঁহার শরীর শীত গ্রীষ্ম বর্ষার বাতাতপ এবং শিলাবৃষ্টি ও বরফপাত অকাতরেই সহ্য করিয়াছে। আমাদের চক্ষু এ ভারতের অতি সামান্যই দেখিয়াছে, আর এ মহাত্মার চক্ষু এ ভারতের বহুবিধ স্থান, আচার ব্যবহার ও হাবভাব বিলক্ষণ রূপেই দেখিয়াছে। আমরা জঙ্গলে হিংস্রজন্তু আছে শুনিয়া সেদিকে যাইতে ভয় পাইয়া থাকি, আর ইনি নিরুদ্বিগ্নচিত্তে একই জঙ্গলে ও একই স্থানে তাহাদের সহিত বাস করিয়াছেন। আমরা একটী বিষাক্ত সর্প দেখিলেই ভীত হই, আর এ বৈদ্যনাথেই বহুব্যক্তি এ মহাত্মার সদ্য স্বহস্তে ধৃত গোক্ষুরা সর্পের সহিত ক্রীড়া দেখিয়াছেন। পুনরায় ইঁহার রসনার সংযম কিরূপ তাহা যাঁহারা সর্ব্বদাই সন্নিকটে অবস্থান করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। বহু প্রকার সুমিষ্ট, সুস্বাদু, সুপক্ক ও সুপেয় মিষ্টান্ন ও ফলাদি স্তূপে স্তূপে পড়িয়া আছে। শিষ্য বা ভক্তগণ বহু প্রকার রুচিকর দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। কিন্তু এ মহাত্মার ভোজন ৪।৫ খণ্ড ছোট ছোট রুটী, না হয়ত লবণ-ঝালবর্জ্জিত মুগের ডাইলের ঝোল বা তরকারীর ঝোল বা কয়েক চামচ অন্ন বা খিচুড়ি। যিনি একদিন নানাস্থানে সামান্য অর্থের ভিখারী হইয়াছিলেন, আজ বহু শত টাকা অযাচিত ভাবে পাইয়া মুক্ত হস্তে তাহা নানাদিকে তিনি ব্যয় করিতেছেন। যদি সময়ের ব্যবহার কাহারও শিখিবার আবশ্যক হয় তবে দেখিবেন যে, একটী ঘড়ী প্রায়ই তাঁহার আছে, আর এই ঘড়ীর সময়ের সহিত রাত্রি ৩টা হইতে তাঁহার দৈনিক জপ তপ সাধনা, আহার নিদ্রা ব্যবহার, শৌচ-স্নান প্রভৃতি যেন হিসাববদ্ধ হইয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। আমরা ব্যবহার-মার্গে অবস্থান করিয়া সংসারে পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, ধনৈশ্বর্য্য মান সম্ভ্রম লইয়া বিব্রত আছি এ অবস্থায় চৈতন্য প্রভু কিরূপে যুবতী ভার্য্যা ও মাতা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইলেন, শঙ্করাচার্য্য কিরূপে মাতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, বুদ্ধদেব রাজভোগে লালিত পালিত হইয়া কিরূপে রাজৈশ্বর্য্য, পিতা-মাতা, স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিলেন, বা কেন করিলেন ইহা কি ধারণা করিতে পারি? এ প্রকারে এ ভারতের মহাত্মারা এক সময়ে সমুদয় ত্যাগ পূর্ব্বক "নেতি নেতি" ইহা পূর্ণ মাত্রায় বুঝিয়া পুনরায় তাঁহারাই আবার "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইহা বুঝাইবার জন্য অথবা "চিকীর্ষুর্লোক সংগ্রহং" নিমিত্ত কেন ব্যবহার সংস্রবে আগমন করেন ইহা আমরা কিরূপে বুঝিব? এজন্য এ সমুদয় মহাত্মাগণ

কর্ত্তৃক এ ভারতবর্ষের নানাস্থানে যে মঠ বা নানা প্রতিষ্ঠান হইয়াছে তাহার কারণ বুঝিবার জন্য যত্নবান হইবেন। নিজে অজ্ঞানী হইয়া সংসার-বৈরাগ্য কি ইহা বুঝিতে যাওয়া "অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধাঃ" বৎ এক বিষম ভ্রম আলোচনা মাত্র।

ক্রমশঃ।

গোপনে।

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ।

মনে কি পড়ে ও সই, তোমার বকুলরাণীর বিয়ে?
সেই যে, যে দিন তোমার তিনি এলেন ভিজে নেয়ে।
বিয়ে বাড়াতে সবাই গেল বাড়ী হল ফাঁকা,
তুমিই বল—এই বাড়ীতে একা কি যায় থাকা?
ঘরের দোরটী ভেজিয়ে দিয়ে, ফিতে কাঁটা নিয়ে,
সবে মাত্র বসেছিনু চুল বাঁধিতে গিয়ে।
হঠাৎ দোরটী খুলে গেল—ঘরে ঢুক্‌লো এসে
চুপ্‌টী করে মুখটী বুজে, বস্‌ল আমায় ঘেঁসে।
আহা, ন্যাকা যেন! ঢং দেখ্‌লে গায়ে আসে মোর জ্বর,
মনে পড়ে? দেখা হলে বল্‌ত তোকে "আমি
হব তোর বর"।
কেমন মজা! আর কখনও বল্‌বি আমায়—
সে হয় আমার কে?
মনে বুঝি নেইকো এখন—বর-বৌ খেলায়
কি হ'তো তোর সে?
কাছে বসে মুচ্‌কি হেসে বল্লে—"কি হচ্ছে গো বীণা"?
মেয়ে মানুষ একলা ঘরে—বল্‌তো ভাই,
লজ্জা হয় কি না?

চুল বাঁধা মোর রইলো পড়ে, বল্‌লুম—
"জ্বালি এখন আলো"
বল্‌লে কি জানিস্? "তোমার রূপেই যাবে ঘুঁচে
মনের যত কালো।"
কথা শুনেই ফেল্‌লুম হেসে, বলে কি না "লাখ
টাকা ওর দাম";
সত্যি ভাই, মুখের হাসির যে এত দাম—
সেই সবে শুন্‌লাম।
আমার কথা ওর কাণে নাকি বীণার মত বাজে।
এই যে এত বল্‌লে সে দিন—সব কথা তার বাজে।
পকেট হ'তে ফুলটি নিয়ে দিলে চুলে গুঁজে,
বাধা দিতে পার্‌লুম নাকো—রইলুম্‌ মুখটী বুজে।
দূর, মরণ আর কি! ভাল কেন বাস্‌তে যা'ব তাকে?
হাজার হোক খেলার সাথী, তাই, বলে দিতে
মন ওঠে না মাকে।
তাকে কেন বল্‌লুম নাকো যেতে? সই, সেটা
কি দেখায় ভাল,
অতিথিকে তাড়িয়ে দোব সন্ধ্যা বেলায়
নাহি জ্বেলে আলো?
মাটীতে ব'সে আছে দেখে—ব'ল্‌লুম্‌
"দোব আসন পেতে"?
একটু হেসে বল্‌লে আমায়—হৃদয়-আসন দিতে।
উপোসীর মত তাকাইয়া থাকে মোর মুখে অনিমিখ,
পাছে কেহ দেখে এই ভয়ে আমি দেখিনু চারিটি দিক।
"ভয় নেই বীণা, বাঁধ তুমি চুল—কেহ নেই ঘরে আর";
কেহ না জানুক আমরা ত জানি, আমি
কার—কে আমার।
"ও—বুঝেছি এবার! তুমি বুঝি হেথা নাহি
চাহ মোর আসা,
এই বুঝি তোমার পুকুর ধারের সব প্রেম ভালবাসা!

বেশ, আর না আসিব জ্বালাতে তোমায়, এই
মোদের শেষ দেখা,
তোমার আমার মিলন বোধ হয়, না
আছে ললাটে লেখা।"
"যেও না, শুন্‌ছো—শুন্‌লে না কথা!
আমার মাথাটী খাও,
রাত্তিরে আমি কিছু নাহি খাব, যদি তুমি চলে যাও।"
দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিল, হাসি ভরা তার মুখ,
আমার কিন্তু অজানা লজ্জায় কাঁপিয়া উঠিল বুক।
কত আদরের কথা সে বলিল হাত দুটী মোর ধ'রে,
সানাইয়ের সুর বাজিতে লাগিল বিয়ে বাড়ী হ'তে দূরে।
"জান না তো বীণু, সুবিধা পেলেই কেন আমি ছুটে আসি,
তুমি যে আমার মরমেরি বীণা, তোমায় যে ভালবাসি।
রাত্রি তো দেখি অনেক হইল—এখন উঠিনু তবে,
ছিঃ—কান্না কিসের? আস্‌ব আবার যখন সুযোগ হবে।"
আদর করিয়া বুকেতে ধরিয়া মুছায়ে দিল মোর চোখ,
কে ভাই জানিত এমন করিবে! এমন দুষ্ট লোক।
সে গেল চলিয়া—তবু মোর কাণে বাজিতে
লাগিল "বীণা",
হা'সছিস্ যে? বলে দিবি বুঝি? না—আর
তোরে বলিব না।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং"—গীতা।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
কাব্যরত্নাকর।

শ্রদ্ধা না থাকিলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না। যাঁহার যে পরিমাণে শ্রদ্ধা, তিনি সেই পরিমাণে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। এইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে আচার্য্যে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

রামনগরে সুশীল গাঙ্গুলী চল্লিশ বৎসর বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তন্ত্রাদির আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি অদীক্ষিত অবস্থায়ও মদ্য মাংস প্রভৃতির ব্যবহার করিতেন। এখন "মহানির্ব্বাণ" তন্ত্রে সেই সকল পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন। ভাবিলেন, বৈষ্ণব তান্ত্রিকগণের "সহজ-সাধন" হয়ত এই "মহানির্ব্বাণ" তন্ত্র দেখিয়াই সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছে!

"ভোগ-সাধন পন্থা" অবলম্বন করিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় প্রতি পর্ব্বে যথাসাধ্য পঞ্চমকার সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন। মৎস্য ভাজিয়া মাংস রাঁধিয়া মুড়ি চিড়া প্রভৃতির সহিত মদ্য পান করিতে করিতে পূজা করিতেন; উচ্ছিষ্ট বিচার তাঁহার ছিল না। বলিতেন, সকলই যখন ব্রহ্ম তখন উচ্ছিষ্ট কি? ব্রহ্ম বস্তু উচ্ছিষ্ট হইতে পারেনা। শাস্ত্রাদি অনেকের মুখে উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই। এই সকল ব্যাখ্যা শ্রবণে তাঁহার ভক্তগণ পরমানন্দ লাভ করিতেন, এবং মদ্য মাংস অগ্নিলিপ্ত করে পুষ্প বিল্বপত্র গ্রহণ করিয়া দেবীর শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিতেন।

এইরূপে ভোগী গাঙ্গুলী মহাশয় অনেকগুলি মাতাল "কৌল" পাইয়া মদ্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ বিলাতী মদ্যের দাম বেশী, "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিতঃ ধরণীতলে। উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" এই মন্ত্রের আবৃত্তি করিয়া ভক্তগণের জন্য মদ্য মাংসাদি যোগাইতে যোগাইতে গাঙ্গুলীর বাক্স খালি হইয়া গেল। কিন্তু তখন নেশা জমিয়াছে, কোনও দিনই বাদ দেওয়া চলে না। মদ্য না হইলে শরীর যেন মাটী মাটী করে, ক্ষুধা হয় না,

কর্ম্মে উৎসাহ থাকে না, মেজাজ বিকৃত হয়। সুতরাং "পচুই মদ" ই খাইতে হইল। এ মদ সস্তা কিন্তু অনেক খাইতে হয় নতুবা নেশা হয় না। এই ধান্যেশ্বরী মদ্য গাঙ্গুলী মহাশয় স্বভবনে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ক্রমে লোক জানাজানি হইল। লোকের ছাগল পাঁঠা পাসী হাঁস হারাইতে লাগিল। অতিষ্ঠ হইয়া লোক পুলিশের নিকট সংবাদ দিল। পুলিশ-পুঙ্গবের সঙ্গীনের গুতায় গাঙ্গুলীর প্রিয় ভক্তগণ মদ্য প্রস্তুতের হাঁড়ি নল প্রভৃতির সংবাদ প্রদান করিল। যথাকালে হাতে পায়ে লোহার বালা ও মল বাজাইতে বাজাইতে গাঙ্গুলী মহাশয় ও তাঁহার কৌল" ভক্তবৃন্দ শ্বশুরভবনে গমন করিলেন।

লোক পরম্পরায় গাঙ্গুলী মহাশয়ের ইষ্টদেব এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া জাগিত হইলেন। কিন্তু দুঃখিত হইয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন না। শিষ্যের উদ্ধারের জন্য শ্রীশ্রী৺ জগদম্বার নিকটে ভক্তিযুক্ত মনে প্রার্থনা করিলেন। প্রত্যহ অষ্টোত্তরশতসংখ্যক সাজ্য বিল্বপত্র দ্বারা হোম, এক বৃত্তি শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ, হাজার আট বার "দুর্গা"নাম জপ এই সকল তাঁহার নিত্যকর্ম্ম হইল। তিনি কখনই মদ্য স্পর্শ করিতেন না, অনুকল্প দ্বারা অর্চ্চনা করিতেন। কাংস্য পাত্রে নারিকেলোদক কিংবা তাম্রপাত্রে মধু রাখিয়া মদ্য নিবেদন করিতেন। আদার কুচি ও মুড়ির সহিত দগ্ধ কদলীই মৎস্য মাংস মুদ্রা নিবেদন করিতেন। শিষ্যের মঙ্গলাকাঙ্খায় ঐ ভাবে দেবীর অর্চ্চনায় দেবী প্রসন্না হইলেন।

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট মোকর্দ্দমার দিনে গুরুদেব জরিমানার টাকা দাখিল করিয়া শিষ্যকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। ভক্তগণ জেল খাটিতে লাগিল।

এখন গাঙ্গুলী মহাশয়ের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সকল কর্ম্মই করিতেছেন। একদা তাঁহার সঙ্গে গুরুদেবের এইরূপ কথা হইতেছিল—

গুরু। শাস্ত্রের অপব্যাখ্যায় কি অনিষ্টই করিয়াছ, বৎস! এখন বেশ বুঝিতেছ যে, ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই সুখ।

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। পঞ্চমকার সাধনায় সর্ব্বস্ব গিয়াছে। এখন কি করিব, উপদেশ করুন। আমার মতিভ্রম ঘটিয়াছিল, তাই আপনার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় কর্ণপাত করি নাই; তাহার ফলও বেশ পাইলাম।

গুরু। ঐ টুকুতেই তোমার পাপ কাটিয়া গেল। এখন হইতে এই ভাবে উপাসনা করিবে।

জপেৎ দুর্গা পঠেৎ চণ্ডী পূজয়েৎ পার্থিবং শিবং।
কারয়েদ্ধরি নামানি কলৌ কর্ম্ম চতুষ্টয়ম্॥

গঙ্গা মৃত্তিকায় নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ পূজা করিবে। গৌরী-পীঠে দুর্গাপূজা করিয়া সাধ্যমত জপ করিবে। তৎপরে একবার আদ্যন্ত মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাঠ করিবে। তৎপরে নারায়ণ পূজা, তুলসী দান, মধুসূদন মন্ত্র জপ করিবে। কলিকালে এইগুলিই পরম স্বস্ত্যয়ন।

শিষ্য। পঞ্চমকারের আভ্যন্তরিক অর্থটি আবার বলুন।

গুরু। মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রা ও মৈথুন ইহারই নাম পঞ্চ মকার। তন্ত্রে দুইটি পথ দেখা যায়। একটি ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগশিক্ষা, আর একটি নিবৃত্তি মার্গ। অধিকারী ভেদে উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে। যাহার যে প্রকার প্রবৃত্তি তাহাকে সেই দিক দিয়া লইয়া যাইতে যাইতেই নিবৃত্তির পথ দেখাইতে হইবে।

গুরু। গঙ্গা যমুনার মধ্যে সরস্বতী-নীরে যে মৎস্য বিচরণ করে তাহাই ভক্ষণ কর। অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলার মধ্যে সুষুম্না আছে; সেই সুষুম্নাবর্ত্মে কুলকুণ্ডলিনীকে আনয়ন কর। ইহাই মৎস্য-সাধন। ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা এই সাধন সিদ্ধ হয়।

তৎপরে মাংস সাধন। জিহ্বা সংযত করার নাম মাংস সাধন। মৌনী হইলেই জিহ্বা সংযত করা হইল।

মদ্য—অর্থ সুরা। এই সুরাই সুধা হয়। সহস্রদলকমল মধ্য হইতে যে সুধা নিয়ত ক্ষরিত হইতেছে, জিহ্বাকে ঊর্দ্ধগামী করিয়া সেই সুধা পান করিতে হইবে। উহাই সুরা সাধন। খেচরীমুদ্রা-তত্ত্বজ্ঞ যোগী ভিন্ন সুরা সাধনপ্রণালী শিক্ষা করা যায় না। বাহ্য পূজায় মদ্যে অনুকল্প "নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্র পাত্রে স্থিতং মধু।"

শাস্ত্রে বহুবিধ মুদ্রাবন্ধনের কথা লিখিত আছে। ঐগুলি যোগীর নিকট জ্ঞেয়। "মোদনাৎ সর্ব্ব দেবানাং মুদ্রা কথাতে বুধা"। দেবগণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য হস্তাদির যে সকল প্রক্রিয়া করা হয় তাহাও মুদ্রা, যেমন আবাহনী, সন্নিধাপনী, গালিনী, যোনি, ধেনু ও মৎস্য মুদ্রাদি। আর কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া ঊর্দ্ধে আনিবার যে সকল প্রক্রিয়া আছে তাহাও মুদ্রা বন্ধন বলিয়া কথিত হয়; যথা মহামুদ্রা, শক্তি-চালনীমুদ্রা ইত্যাদি। ইহা দ্বারা বিন্দু ধারণ ক্ষমতা রক্ষিত হয়। অতঃপর মৈথুন তত্ত্ব। ইহার অপব্যাখ্যায় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে মহান্ অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে। বিন্দু ধারণেই শক্তির বৃদ্ধি হয়, ক্ষয়ে

নহে। সেইজন্য অধিকারী ভেদে পঞ্চ মকার সাধনার ব্যবস্থা আছে। প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি দুইটি পথ। "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"। নিবৃত্তিতেই শান্তি লাভ হয়। মৈথুনের ভিতরের কথা আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন। এই মিলনের নামই মৈথুন। শ্রীগীতায় পাঠ করিয়াছ—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥

অর্থাৎ আত্মার দ্বারা আত্মাকে (জীবকে) সংসার হইতে উদ্ধার করিবে। কিন্তু আত্মাকে অধোনয়ন করিবে না। যেহেতু আত্মাই আত্মার (জীবের) বন্ধু এবং অসংযত আত্মাই (মনই) আত্মার শত্রু। যে জীবের দ্বারা মন জিত হইয়াছে, মন (আত্মা) সেই জীবের বন্ধু। এবং অবশীকৃত মনই জীবের শত্রুর ন্যায় শত্রুতাচরণ করে। অতএব জীবের আত্মা যখন পরম শিবে যুক্ত হয় তখনই মুক্তি হয়। এইত পঞ্চ মকারের শাস্ত্রোক্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে? এখন হইতে শ্রদ্ধা সহকারে সাধনা কর। সাধনায় নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

গুরুদেবের বাক্য শ্রবণে গাঙ্গুলী মহাশয়ের জ্ঞান-নেত্র বিকশিত হইল। তিনি কুসঙ্গী বর্জ্জন করিয়া একান্ত মনে সাত্বিক ভাবে দেবীর অর্চ্চনা, ধ্যান ধারণায় মন দিলেন। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়ায় তাঁহার জ্ঞান লাভ হইল। যথাকালে তিনি একজন সাধক বলিয়া পরিচিত হইলেন।

মৌ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

"মৌ" মধ্য-ভারতবর্ষে অর্থাৎ ইংরাজের রাজ্য বিভাগ মতে "সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ায়" অবস্থিত। ইহা ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের আবাস স্থান। এখানে একটি খুব বড় Cantonment, Court. ও ডিষ্ট্রীক্ট জজের আদালত আছে। স্থানটী সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ এজেণ্টের শাসনাধীন। মৌয়ের সীমানার বাহির হইতেই হোলকারের

রাজ্য আরম্ভ। মৌ হইতে একটি ষ্টেশনের পরেই অর্থাৎ "রাও" ষ্টেসনের সীমান্ত হইতে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী অহল্যা বাইএর রাজধানী ইন্দোর। এই ইন্দোরেই এখন হোলকার বংশের রাজধানী। আজকাল হোলকারের নাম একরূপ জগতের সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মমতাজ বেগম ও বাওলা হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি ব্যাপারে ভূতপূর্ব্ব হোলকারের নাম ভারতবিখ্যাত। হোলকার এখন সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের উপর রাজ্য ভার দিয়া এক ইউরোপীয় মহিলাকে বিবাহ করিয়া ইউরোপে অবস্থান করিতেছেন। যাহা এদেশে সর্ব্বজনবিদিত কাহিনী তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

মহাত্মা ছত্রপতি শিবাজীর দেহত্যাগের পর সুবিশাল মহারাষ্ট্র-রাজ্য নানা-ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। তাঁহার ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারীরা প্রত্যেকেই এক একটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করেন। ইহাদের মধ্যে বরোদার গাইকোয়াড়, ইন্দোরের হোলকার ও গোয়ালিয়ারের "সিন্ধি" বা "সিন্ধিয়াই" বর্ত্তমান যুগে শ্রেষ্ঠ মহারাষ্ট্রীয় খণ্ডরাজ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই মধ্যভারত এজেন্সির অধিকার মধ্যে দ্বারাবতী (বা ধারাবতী) ও রট্‌লাম নামে আরও দুইটী গণনীয় দেশীয় রাজ্য আছে। ইহাদের শাসনকর্ত্তাগণও উন্নতি-শীল ও শিক্ষিত। বর্ত্তমান যুগের প্রথানুসারেই ইহারা আধুনিক যুগের আদর্শ ধরিয়া স্ব স্ব রাজ্য শাসন করিতেছেন।

মৌ যাইতে হইলে হাওড়ায় বোম্বে মেলে চড়িয়া চিউকী হইয়া জব্বলপুর ও জব্বলপুর হইতে খাণ্ডোয়া যাইতে হয়। জব্বলপুর যাইতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা লাগে। জব্বলপুর হইতে খাণ্ডোয়ার পথও প্রায় ঐরূপ। খাণ্ডোয়া একটী প্রসিদ্ধ জংসন ষ্টেশন, ইহার একটী শাখা ভস্‌ওয়াল (Bhuswal) হইয়া বোম্বে পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর একটী শাখা খাণ্ডোয়া হইতে আজমীর উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত গিয়াছে। খাণ্ডোয়া হইতে যে রেল পথটী মৌ গিয়াছে তাহা বিন্ধ্যাচলের বক্ষভেদী টানেলের মধ্য দিয়া। বিন্ধ্য পর্ব্বতমালা বা Vindya Range শেষ হইয়া সাতপুরা পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়া না কি এই রেলপথ আরও অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন বিন্ধ্য-পর্ব্বতমালাই এই প্রদেশে নিজের শাখা বিস্তার করিয়াছে।

খাণ্ডোয়া হইতে আট দশটী ষ্টেশন পরে "মৌ"। দুই দিকে পাহাড় আর মধ্য দিয়া রেলপথ। চারিদিকে কেবল পাথর আর কাঁকর। এই প্রস্তরময় পথে

যখন গাড়ী চলে তখন কামান গর্জ্জনের মত একটা ভয়ানক শব্দের ঘাত প্রতিঘাত উৎপন্ন হয়। যাত্রীগণ গাড়ীর মধ্যে থাকিয়া একটা অদ্ভুত আনন্দ ভোগ করে।

এই পথে তিনটী টানেল (Tunnel) আছে। উপরে পাহাড়, দুই পাশে পাহাড়। নিম্নে বিরাট অন্ধকারে পাষাণ-মণ্ডিত গুহাবক্ষ। টানেলের মধ্যে ট্রেণ যখন মহাশব্দে অগ্রসর হইতে থাকে তখন গুম্ গুম্ দপ্ দপ্ শব্দে যাত্রীগণ বড়ই শঙ্কিত হইয়া উঠে। টানেলের মধ্যে গাড়ী প্রবেশ করিবা মাত্রই দেখিলাম, হিন্দু, পাঞ্জাবী, মারাঠি, মুসলমান সকলেই ভেদজ্ঞানবিরহিত হইয়া সৃষ্টি কর্ত্তাকে ডাকিতে লাগিল। সে ডাকের অর্থ যেন এই—"হে ভগবান! এখন আমরা এক অনিশ্চিত ভীষণ বিপদের মধ্যে, রক্ষা কর! রক্ষা কর।"

খাণ্ডোয়া ষ্টেশন পার হইলেই দুই দিকে বিশাল বনরাজির নয়নমনোহর দৃশ্য। এ দৃশ্য প্রাণারাম ও নেত্রতৃপ্তিকর। বৃহৎ বনস্পতিগুলির তলদেশগুলি এত পরিষ্কার যে কে যেন স্থান গুলিকে সম্মার্জ্জনী দিয়া তখনই পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। ইহাই মহাভারতোক্ত বিশ্ব-বিশ্রুত খাণ্ডব বন। হিন্দু পাঠক পাঠিকা মাত্রেই "খাণ্ডব দাহনের" ইতিহাস জানেন। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কি সুন্দর মনোরম দৃশ্য এই সব গিরিপ্রাকারবেষ্টিত নির্জ্জন স্থানের। দূরে অদূরে খুব দূরবর্ত্তী পাহাড়ের কোলে ছোট বড় বিল। এই সব বিলের মধ্যে রাশি রাশি "পদ্ম" ফুটিয়া রহিয়াছে। বিলের আশে পাশে দলবদ্ধ হইয়া হরিণের পাল বেড়াইতেছে।

হোলকারের রাজ্যের Game Laws অনুসারে কাহারও এ সকল হরিণ মারিবার ক্ষমতা নাই।

প্রকৃতির কোলে পালিত স্বাধীন বিহঙ্গমশ্রেণী—হংস, ক্রৌঞ্চ, ক্রৌঞ্চী, স্বভাবসৃষ্ট বিমল তড়াগ-সলিলে মনের আনন্দে ভয়বিরহিত মনে ক্রীড়া করিতেছে। তার আশেপাশে দূরে, অদূরে দলবদ্ধ শিখিযূথ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। কি বিচিত্র মনোহর দৃশ্য এসব। স্বচক্ষে না দেখিলে এ সব দৃশ্যের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বুঝাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। আমরা তিন চারিটী টানেল (Tunnel) পার হইয়া মৌ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতের উপত্যকার মধ্যে স্থাপিত এই "মৌ" সহর। পরে ইহার অন্যান্য বিবরণ বলিব।

রূপ-সনাতন কথা।

লেখক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহাপ্রভুর আদেশে সনাতনের ভদ্রবেশ ধারণ ও বৈরাগ্য গ্রহণ—সনাতন এতাবৎকাল কারাগারে থাকায়, তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র মলিন ও নখ, কেশ এবং শ্মশ্রু সকল বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সেই কারণ তাঁহাকে "অভদ্র" দেখাইতেছিল। এখন প্রভুর আদেশে সনাতন ক্ষৌর কার্য্যান্তে "ভদ্র" হইলেন। তাঁহার দরবেশাকৃতি দূরীভূত হইল এবং তিনি গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। স্নানান্তে চন্দ্রশেখর-প্রদত্ত নব বস্ত্র ফিরাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে সনাতন একখানি পুরাতন বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক, তাহা ছিন্ন করিয়া তাহাতে দুইখানি কৌপীন ও একখানি বহির্ব্বাস প্রস্তুত করিলেন এবং একেবারেই বৈরাগীবেশ ধারণ করিয়া মহাপ্রভুর সমীপস্থ হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহার বৈরাগ্য দর্শনে মহা আনন্দিত হইলেন এবং নিজের ভুক্তাবশেষ সনাতনকে দিয়া কৃতার্থ করিলেন। অতঃপর কাশীধামে মহাপ্রভুর চরণতলে অবস্থিতি করিয়া সনাতন "মাধুকরী" বৃত্তিতে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। সনাতনের এই বেশ ভক্তের চক্ষে অধিকতর গৌরবময় বলিয়া প্রতিভাত হইল। কৌপীনই ভারতবাসীর গৌরব পতাকা।

সনাতনের বিষয়ভোগের সমাপ্তি, মহাপ্রভুর নিকট উপদেশ লাভ ও বৃন্দাবন যাত্রা—সনাতনের বিনয়, বৈরাগ্য ও দৈন্য সন্দর্শনে মহাপ্রভু পরম পরিতুষ্ট হইলেন কিন্তু "ভোটকম্বল" তখনও সনাতনের গাত্রে ছিল। মহাপ্রভুর কটাক্ষ দৃষ্টিতে বুদ্ধিমান সনাতন প্রভুর মনোভাব অবগত হইয়া একদিন স্নানার্থ গঙ্গার ঘাটে গমন করতঃ জনৈক গৌড়ীয়কে "ভোটকম্বল" প্রদান পূর্ব্বক তাহার ছিন্ন কাঁথা বিনিময় করিলেন এবং সেই জীর্ণ কাঁথা গায়ে দিয়া মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু ছল ছল-নেত্রে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন—"কৃষ্ণ তোমার বিষয় ভোগ খণ্ডাইলেন, তিনি তোমার শেষ বিষয় ভোগ কেন রাখিবেন?" সনাতনের আচরণে মহাপ্রভু যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। সনাতন সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত,

অথচ বিনয়ের আকর। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য মহাপদের ন্যায় জ্ঞান করিয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় লইয়াছেন। মহাপ্রভু স্থির করিলেন, প্রেম-ভক্তির সুবিমল ধর্ম্ম প্রচারার্থ শ্রীরূপ-সনাতনই প্রকৃত পাত্র। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি শ্রীরূপেতে শক্তি সঞ্চার পুর্ব্বক তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এখন তিনি কাশীধামে সনাতনকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার সিদ্ধান্ত সমূহ উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং তাঁহাকেও শক্তি সঞ্চার করিয়া বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন।

শ্রীরূপ ও সনাতন জিজ্ঞাসুভাবে মহাপ্রভুর চরণতলে উপবেশন করিয়া যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করেন, তদীয় গ্রন্থনিচয়ে তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। কাশীধামে সনাতন মহাপ্রভুর নিকট যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হন, "চৈতন্যচরিতামৃতে" সেই সকল উপদেশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লিপিবদ্ধ আছে।

অতঃপর মহাপ্রভুর আদেশে সনাতন বৃন্দাবনধামে গমন করিলেন। তাঁহাকে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"তুমিই করিও ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরার লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তি-স্মৃতি-শাস্ত্র করি করিহ প্রচার॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৩ শ পঃ)

বৃন্দাবনে যাইয়া সনাতন কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি যেরূপ অনুরাগ ও ব্যাকুলতাময় ভজন নিষ্ঠায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের গড়িয়ানিবাসী শ্রীরাধাবল্লভ দাস, তাঁহার একটী পদেই ("সনাতন গোস্বামীর "সূচক" নামক গ্রন্থের) তাহার আভাস দিয়াছেন। এবং তাঁহার সেই পদটীতেই শ্রীপাদ সনাতনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে।

রূপ-সনাতন বৃন্দাবনে বাস করিয়া বৈষ্ণব মণ্ডলীর প্রীতি আকর্ষণ করিলেন। সংসার-বিরাগী হইয়া, যাঁহারা আপনাদের রাজ্য-সম্পদ ত্যাগ পুর্ব্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অতিশয় কৃপালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এখন শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-ভক্তিরূপ অতুল বিষয়-বিভব লাভ করিয়া দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অধিকারী হইলেন, অর্থাৎ বৈষ্ণব জগতের সম্রাট হইলেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ রামভক্ত, পরমবৈষ্ণব বল্লভ (অনুপম) শ্রীরূপের সহিত নীলাচলে আগমন কালে গৌড়দেশে গঙ্গালাভ করেন। সনাতন ও রূপ শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া মণ্ডলী-

মণ্ডলের লুপ্ততীর্থ সকলকে সুব্যক্ত করিলেন এবং তথায় অবস্থিতি করিয়া শ্রীব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি তাহাই, সর্ব্বত্র বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

"তবে ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
প্রভু-আজ্ঞায় দুই ভাই আইল বৃন্দাবন॥
ভক্তি প্রচারিয়া সর্ব্ব তীর্থ প্রকাশিল।
মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রচারিল॥
নানাশাস্ত্র আনি কৈল ভক্তিগ্রন্থ-সার।
মূঢ়াধম জনেরে তেঁহো করিলা নিস্তার॥
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সর্ব্ব শাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিলা প্রচার॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১ম পঃ)

রঘুনন্দন দাস রূপ-সনাতনের প্রিয়তম মিত্র ছিলেন। কথিত আছে যে, গোপ-বালকের বেশ ধারণ করিয়া দুগ্ধ-আহরণচ্ছলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এক সময় রূপ-সনাতনকে দর্শন দিয়াছিলেন।

যাহা হউক রূপ-সনাতনের লিখিত গ্রন্থাবলীই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রধানতম অবলম্বন। রূপ-সনাতন যেমন গৌড়েশ্বর হোসেনসার সুবৃহৎ রাজ্যের মহামন্ত্রী ছিলেন, ভগবানের ভক্তি-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াও তাঁহাদের পদ-গৌরব সেইরূপই হইয়াছিল। কৌপীনধারী সনাতন ও রূপ যে বিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র বৈষ্ণব সমাজকে অবনত মস্তকে তাহাই মানিয়া লইতে হইয়াছে।

বৃন্দাবনের ভুবন-বিখ্যাত শ্রীগোবিন্দজীর বিশাল মন্দির এই কন্থা-কৌপীন-করঙ্গধারী সনাতন ও তদনুজ রূপের প্রযত্নেই নির্ম্মিত হয়। এই ভ্রাতৃ-যুগলের ক্রিয়া কলাপের চিহ্ন এখনও বৃন্দাবনে বিরাজিত। ফলতঃ বর্ত্তমান বৃন্দাবন তীর্থ ইহাঁদেরই বিশাল কীর্ত্তির সাক্ষীস্বরূপ। এখনও ভক্তগণ ভক্তিপূত চিত্তে শ্রীবৃন্দাবনে রূপ ও সনাতনের সমাধিস্থান দর্শন করিয়া পরমানন্দে ধূলায় গড়াগড়ি দেন।

রূপ-সনাতন ১৪১১— ১৪৮০ শকে অর্থাৎ ১৪৮৯—১৫৫৮খৃঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহারা ২৭ বৎসর গৃহাশ্রমে যাপন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট ৪৩ বৎসরকাল শ্রীবৃন্দাবনে বৈরাগ্যাবস্থায় অতিবাহিত করেন। এই দীর্ঘকাল বৃন্দারণ্যে থাকিয়া ৮৪টী বনতীর্থ উদ্ধার করিয়া যান। তাঁহাদের উভয়েরই

ভক্তিযুক্ত ভাববিন্যাস ও লিপিকৌশল এবং তীর্থ নির্দ্দেশক শ্লোকাবলী পাঠ করিলে হৃদয়ে স্বতঃই আনন্দ ও বিমোহন ভাবের উদয় হইয়া থাকে। শ্রীরূপের লিখিত ৪৪ খানি সংস্কৃত ও ১খানি বাঙ্গালা প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত গদ্য পুস্তক এবং সনাতনের ন্যূনাধিক ১৪।১৫ খানি গ্রন্থ রহিয়াছে। উভয়ের গ্রন্থেই উভয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, রচনাকৌশল এবং বৈষ্ণব ভক্তির চরম পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রূপ-সনাতন ও তদ্বংশীয় শ্রীজীব এই তিন জনেই বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্তর্গত।

সনাতনের লিখিত গ্রন্থের মধ্যে—"হরিভক্তি-বিলাস" "ভাগবতামৃত" "দশম-টিপ্পনী" "দশম-চরিত" এই কয়খানির নাম চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে। তাঁহার আরও অনেক গ্রন্থ আছে।

শ্রীরূপ গোস্বামীর লিখিত গ্রন্থ সকলের মধ্যে—"রসামৃত-সন্ধু", "বিদগ্ধ-মাধব", "উজ্জ্বল-নীলমণি", "ললিত-মাধব", "দানকেলি কৌমুদী", "বহুগুণাবলী", "অষ্টাদশ-লীলাচ্ছন্দ", "পদাবলী" "গোবিন্দ বিরুদাবলী", "মথুরা-মাহাত্ম্য", "লঘুভাগবতামৃত" প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ শ্রীরূপ রচনা করেন বলিয়া চৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত রহিয়াছে।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১ম পঃ দ্রষ্টব্য)

বঙ্গে রূপ-সনাতন গোস্বামী ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বংশীয়গণের পাঁচটী আবাস স্থানের নাম পাওয়া যায়। (১) বাকলা চন্দ্রদ্বীপ (২) ফতেয়াবাদ (ফরিদপুর) (৩) নবহট্ট বা নৈহাটী (বর্দ্ধমান) (৪) রামকেলি * (মালদহ) (৫ মাড়গ্রাম (মুর্শিদাবাদ)।

রঘুনন্দন—রূপ ও সনাতনের জ্যেষ্ঠ সহোদর রঘুনন্দন তাদৃশ ভক্ত ছিলেন না বলিয়া বোধ হয় কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র যে সময় সনাতন গৌড়েশ্বর হোসেন সার মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে উদ্যত হন, সেই সময় গৌড়াধিপ সনাতনকে অনেক তিরস্কার করেন এবং আরও বলেন যে, "তোমার বড় ভাইএর দস্যুর ন্যায় ব্যবহার। জীব পশু প্রভৃতি হত্যা করিয়া সে আমার চাকলা সকল নাশ করিল, আর তুমি এখানে আমার সমস্ত কার্য্যই নষ্ট করিতেছ" ইত্যাদি। চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে এইটুকুই বুঝা যায় যে, রঘুনন্দন স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি বাদসাহকেও ভয় করিতেন না। এই রঘুনন্দনই মাড় গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

রঘুনন্দনের প্রপিতামহ পদ্মনাভ গৌড়েশ্বরের মন্ত্রিত্ব করিবার সময়ে জায়গীর স্বরূপ কতকগুলি পরগণা বাদসাহের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। তিনি নৈহাটীতে আসিয়া বাস করিলেও সে সময় তাঁহার পুত্রেরা ভিন্ন ভিন্ন পরগণার অধিবাসী ছিলেন। পদ্মনাভের পৌত্র কুমারদেব ফরিদপুরের ফতেয়াবাদে অবস্থিতি করিতেন। পরে গৌড়ে বিবাহ করিয়া অন্য ভ্রাতার সহিত স্বীয় পরগণা পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক গৌড়ান্তর্গত সেরপুর ও মহানন্দী পরগণা গ্রহণ করেন, এবং শ্বশুরালয় মাধাইপুর নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন। সেরপুর ও মহনন্দী পরগণার মধ্যবর্ত্তী মাড়গ্রাম নামক স্থানেও তিনি একটী বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র (সনাতন ও রূপের জ্যেষ্ঠ সহোদর) রঘুনন্দন এই মাড়গ্রামেরই অধিবাসী হইয়াছিলেন। মাড়গ্রাম গৌড় মণ্ডলের দক্ষিণে। রূপ ও সনাতনও বহুদিন যাবৎ এবং মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া বাস করিতেন তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। †

সনাতন শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ আনয়ন পূর্ব্বক এই মাড়গ্রামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি উক্ত বিগ্রহ বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং সনাতনের ভ্রাতার দৌহিত্রবংশীয় ও তৎশাখা বংশীয়গণ দ্বারা যথা নিয়মে অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছেন। রঘুনন্দনের দৌহিত্র ও শাখা বংশীয়গণ সনাতনের

---

* রামকেলি বা রামকাইল, বাঙ্গলার মালদহ জেলার প্রাচীন গৌড় রাজধানীর পার্শ্বস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। রূপ-সাগর নামক (রূপ গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত) সুদীর্ঘ দীর্ঘিকার তীরে অবস্থিত। এখানে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তির দিনে একটী মেলা বসিয়া থাকে। সেই মেলার সমাবেশ কালে মহা সমারোহে শ্রীকৃষ্ণের পূজা ভোগাদি হয়। উপর্য্যুপরি ৫দিন মেলা ও জনতা থাকে। মেলার জন্য এখানে কতকগুলি ঘরও নির্ম্মিত আছে। রূপ-সনাতন গোস্বামীদ্বয় ১৫১৫খৃঃ সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বনে এখানে নির্জ্জনবাস করিতেন। রূপ ও সনাতনের ঘটনা লক্ষ্য করিয়াই এখানকার মেলার অনুষ্ঠান। শুনা যায় এখানে আসিয়া অনেক বৈষ্ণব বিবাহ করিয়া যায়। এখানে গৌরাঙ্গদেবের পদচিহ্ন আছে। কাশীমবাজারের পরমবৈষ্ণব স্বর্গীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই স্থানের সংস্কার করিয়া দিয়াছেন।

† শ্রীমান ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি, এ, লিখিত "রূপ-সনাতন গোস্বামী" শীর্ষক প্রবন্ধ (ভারতবর্ষ ১৩৩৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

পরম ভক্ত ও পরম বৈষ্ণব রূপে সমাজে পরিচিত। রূপ-সনাতনের প্রভাবেই মাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম প্রধান বৈষ্ণব-সমাজ মধ্যে পরিগণিত ও বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

সনাতন গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ, দেবমন্দির, রাধাকুণ্ড, সনাতন-সাগর প্রভৃতি কীর্ত্তিকলাপ আজিও মাড়গ্রামে বিরাজিত রহিয়া রূপ-সনাতনের নাম ও গৌরব ঘোষণা করিতেছে। প্রভুপাদ গোস্বামী-বর্গের আবির্ভাব ও তিরোভাবোপলক্ষে প্রতি বৎসরই মাড়গ্রামে মহোৎসবাদি হইয়া থাকে।

এখানকার বিগ্রহের প্রত্যহ দশসের চাউলের অন্নভোগ হয় এবং আষাঢ়ীয় পূর্ণিমায় (প্রতিবৎসর সনাতনের তিরোভাবের সময়) মহা সমারোহের সহিত স্থানীয় গোস্বামীগণের উদ্যোগে মহোৎসবও হইয়া থাকে।

রূপ-সনাতনের বংশ-প্রবাহ।

কর্ণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ রাজ
সর্ব্বজ্ঞ—(১৩৮১—১৪১৪ পর্য্যন্ত রাজ্যকাল।)
|
অনিরুদ্ধ (১৪১৪—১৬১৬ পর্য্যন্ত)
|
রূপেশ্বর (গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী) — হরিহর (ইহাঁর বংশই কর্ণাটে রাজত্ব করেন)
|
পদ্মনাভ (গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী)
|
পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারী — মুকুন্দদেব
|
কুমারদেব (পত্নী রেবতী দেবী)
|
রঘুনন্দন — অমর (সনাতন) — কন্যা — সন্তোষ (শ্রীরূপ) — বল্লভ (অনুপম)
(মাড় গ্রামের অধিবাসী) — শ্রীজীব গোস্বামী (চির কুমার ছিলেন)
|
কন্যা
|
শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী
(সনাতনের শিষ্য পরমবৈষ্ণব ছিলেন)

শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গল বা কালকেতু।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

চতুর্থ অঙ্ক—

চতুর্থ দৃশ্য।

মহারাজ কালকেতুর রাজসভা।

নাগরিকগণ, বণিক, গোয়ালা, দোকানদার, মেছুনী ও হাটুরে।

বণিক। (করযোড়ে) মহারাজ, আপনার মহামন্ত্রী ভাঁড়ুদত্তের জ্বালায় আমরা অস্থির হয়ে পড়েছি। প্রত্যহ দোকানে গিয়ে কাপড়, জামা, পাগ্‌ড়ী, শাড়ী নিয়ে আসেন, কিন্তু দাম দেন না, বলেন "আমি মহারাজের মহাপাত্র, তোদের ইনাম দেওয়ার ভাবনা কি?" মহারাজ আমরা ব্যবসায়ী লোক, এমন করে কি করি বলুন।

গোয়ালা। রাজা, তোঁহার পিয়ারের দাওয়ান, আমাদের ঘাস কাটা বন্দ করলেক্। ঘাসের উপর খাজনা চায়; হহঃ! এত্তোদিন গুজরাটে বাস কর্লুম, তোঁহার বাপের বাপ্‌কে দেখ্‌লুম্, এমন লোক দেখিনি রাজা! আমরা গরীব মানুষ, দুধ দুহি ঘি বেচে দিন গুজরাণ করি; লেকিন্ গোপালভাঁড় রোজ রোজ দুধ দহি ঘি জোর করে খায়, কড়ি দেয় না, তার ওপর আবার না দিলে মারধোর করে। এই দেখ পিঠে চুন, খুন নিক্‌লে দিলে শালা।

দোকানদার। হুজুর মহারাজ, আমার দোকানে নুন তেল তামাক চাল ডাল বড়ি আদি নিত্যই উঠ্‌না খায়, মাস খানেক হোল কড়ি দেয় না। বলে" আমি দাওয়ান, আমার খাতির আলাদা। বছরের বছর কাবার করবো টাকা নিস্। এমন করে কি দোকান চলে? তাগাদা কল্লে বলে, আমায় তাগাদা? হারামজাদা মেরে নাক ছিঁড়ে দেব।" হুজুর এর বিচার না কল্লে দেশ ছেড়ে চলে যাব।

হাটুরে। ধর্ম্ম-অবতার ! আপনার দাওয়ান ঐ যে কি বলে ভাঁড়ু দত্ত না গোপাল দত্ত, তিনির দাপটে হাট করা দায় হোয়েছে। ধর্ম্মঅবতার তার ! নিতুই নিতুই ওঁর শালা গোব্‌রা আর ভাই শিবা দত্ত, তোলা নিয়ে যায়, আর গালি গালাজ করে। শাক, মুলা, কচু বেগুন দুটো খায় খাগ্‌গে, কিন্তু গালাগালি কেনরে বাপু ! আমাদের সর্ব্বস্ব নিবি, আবার না পেলে গাল ! তা ধর্ম্মঅবতার আমরা হল্যাম গরীব গুর্‌বা মানুষ, নিত্যিই তোলা দিই কেমন করে ? আপনার রাজ্যে এসে একি বিপদে পড়্‌লাম ধর্ম্ম অবতার?

মেছুনী। হেঁ রাজা, বল্‌চি কি, কলিকালে এমনি অধর্ম্ম সইতে হয় ? তোমার পাত্তর ধূর্ত্ত ভাঁড়ু দত্তর বড্ডই বাড় বেড়েছে। আমিও কম মেয়ে নই, মেছুনীর বিটি, মাছ ধরে টানাটানি কর্ত্তেই কোঁচায় ধরে টান দিলাম, কাছা খুলে গেল, ভাঙ্গা কড়ির পুটুলি বেরিয়ে প'ল। ওমা যাব কুথা গো, ভাঙ্গা কড়ির বেসাং। বলে "আমি রাজার দাওয়ান, আমার খাতির সম্মান আলাদা।" অমন খাতিরের মুখে পাঁশ। বলি কি ? ওকে দূর করে দিতে পার না, রাজা ? ঝাড় গুণেই কঞ্চি। ওর বেটা ত লম্পটের গোড়া, বহুড়ি ঝিয়ারির সাঁজের বেলায় ঘাট্‌কে যাওয়া দায়, যেমন ভাই তেমনি বুন। বাঁড়ীর মাছ খাওয়ার ঘটা কত ! ঝাঁটা মারি মুখে। বলি কি আমি—

কালকেতু। থাম থাম তোমরা। আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। আমার অনবধানতার জন্যই এতটা অত্যাচার হয়েছে, এর জন্য আমি দুঃখিত এবং লজ্জিত। প্রহরী ! প্রহরী !

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুর !

কালকেতু। দাওয়ান্‌জিকো সেলাম পহুঁচাও।

প্রহরী। যো হুকুম মহারাজ ! (প্রস্থান)

(ভাঁড়ু দত্তকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

কালকেতু। দত্তজা মশায়, আপনার বিরুদ্ধে এরা সব নালিশ করেছে। এ সম্বন্ধে আপনার কিছু বক্তব্য আছে ?

ভাড়ু। (স্বগতঃ) এই যে সব শালাই একত্তর হয়েছে। তবেই হয়েছে। ঐ যে মেছুনী শালীও হাস্‌ছে। মুখপুড়ী রাঁড়ীর সাহস ত কম নয়। বলে, "কদাচিৎ দন্তুরো মূর্খ কদাচিৎ দন্তুরা সতী"। (প্রকাশ্যে) তা এরা আমার বিরুদ্ধে নালিশ কর্ব্বে বৈ কি ? আমি যে শাসনগুণে সবাএর ঘুষ খাওয়াটা বন্দ করেছি কি না ?

মেছুনী। (হাত নাড়িয়া) বলে, "গাঁয়ে না মানে আপুনি মোড়ল।" শাসন কর্ত্তে এয়েছেন ! শাসনকর্ত্তার বেটা। বলি কি—রুইএর মাথাটা কেমন লাগ্‌লো গা ? আর কিছু চাই কি ? আজ গল্‌দা চিংড়ি ইল্‌সে, তপ্‌সে, ভেট্‌কি—

ভাড়ু। আরে থাম্ কুট্‌কী। আমি ভেট্‌কী মেট্‌কী চাইনে। বলি মহারাজ,—আমার অপমানের জন্যই কি আগমন হচ্ছেন ?

কালকেতু। নিজে নাহি নিতে জান নিজের সম্মান,
কিবা দোষ আমার ইহাতে ?
প্রজার শাসন ছলে—
ছলে বলে ধন হর তুমি; দিনু বৃত্তি ভূমি
থাক সুখে রাজ্যেতে আমার
নাহি কর প্রজা-অত্যাচার।
কিন্তু তুমি বিনামূল্যে দ্রব্যজাত নিয়ে
অসন্তুষ্ট করিছ প্রজায়,
এবে তারা প্রতীকার চায়।

ভাড়ু। প্রতীকার আছে সদুপায়।
বাঁধিয়া দোগায় সবে আনি লম্বা লাঠি
দোহাতিয়া বাড়ি মার পিঠের উপর।
শাসিত হইবে প্রজা দিবে করদান
ভাড়ুদত্ত বিরচিত এই অবদান।
কিংবা অই উচুদাঁতী মেছেতামুখীরে
লাড়কুলে ঝাটা দিয়া ঝেড়ে দাও মুখ—
আপনি হইবে জব্দ, শব্দ না করিবে
গুড়ি গুড়ি চলি যাবে আপনার

(প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে
গেঁড়া দত্তর প্রবেশ)।

ভাড়ু। আরে আরে, গেড়ুকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

প্রহরী। আরে কাহেকো ছোড়েঙ্গে হুজুর! ইন্‌লোক বড়া খারাবি কাম-কিয়া। দেখিয়ে হুজুর এহি আওরৎ ক্যা বোল্‌তা।

(জনৈক মেছুনীর প্রবেশ)

মেছুনী। (করযোড়ে) হুজুর! মহারাজ, আমার বহু ঘাট্‌কে গিয়েছিল, আর অই লম্পট তাকে বেইজ্জৎ করে। হুজুর ও বলে, "আমি দাওয়ানের বেটা, আমার খাতির আলাদা" আমরা কি করে হেথায় থাকি?

আগেকার মেছুনী। আমি ত বলেছিলাম রাজা, ঝাড় গুণেই কঞ্চি। (ভাড়ুর প্রতি) বলি গুণ যে বেরিয়ে প'ল। আর রুই মাছের তেল খাবে?

কালকেতু। (সক্রোধে) অরে অরে দুর্ব্বৃত্ত লম্পট!
কি সাহসে করিয়াছ ঘৃণ্য আচরণ?
জান না কি কালকেতু পাপীর কণ্টক?
জল্লাদ!

বেত্র হস্তে জল্লাদের প্রবেশ।

জল্লাদ। হুজুর মহারাজ!

কালকেতু। নিয়ে যাও দুরাচারে অন্ধকারাগারে।

গেড়া। (পদতলে পড়িয়া) ক্ষমা কর নরনাথ!

কালকেতু। ক্ষমা নাহি মোর, নিয়ে যাও ত্বরা এরে,
কর বেত্রাঘাত পৃষ্ঠোপরি;

(গেঁড়াকে লইয়া প্রস্থান)

ভাঁড়ু। বেত্রাঘাত করি প্রভু! দাও এরে ছেড়ে,
আর না করিবে কিছু, দায়িত্ব উহার
স্বহস্তে গ্রহিনু আমি। মন্ত্রির তনয়
সর্ব্বজন চক্ষে ঘৃণ্য সহ্য নাহি হয়।

"মেছুনী মাগীরা সরল" একথা যদ্যপি
গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়ে বলে দিব্য করি কেহ
প্রত্যয় না করি আমি। বালক বলিয়া
ক্ষম এরে এইবার মিনতি আমার।

কালকেতু। চ'লে যাও ভাঁড়ু দত্ত রাজ্য হতে মোর,
নাহি চাই পরামর্শ তব।
নাগরিকগণ! যাও সবে আপন ভবন,
ভাড়ুদত্ত মন্ত্রী নহে মোর।
কালি যদি হের তারে রাজ্যের মাঝারে
আনি দিয়ো বন্দী করি আমার সমীপে।

(প্রস্থান)।

ভাড়ুদত্ত। (হতাশ হইয়া) হায় রে হায় কলিকাল! বলে "যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!" ঘোর কলিকাল! নৈলে যার বাপের আমল থেকে তিনটি বাণ আর একখানা বাঁশ সম্বলের সেরা সম্বল, সেই বেটা হোল কি না মহারাজ! আচ্ছা আমি যদি জয় দত্তের নাতি হরিদত্তের বেটা হই, তবে এর প্রতিফল শীগ্‌গির পাবি। (সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য—ভাঁড়ুদত্তের ঘর।

(ভাঁড়ুদত্ত একাকী চিন্তা করিতেছেন।)

ভাড়ু। ছিঃ ছিঃ! অপমানের বিষে অঙ্গ জ্বলে গেল। পিপঁড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে। কালকেতু হলো মহারাজ। শালার ব্যাধের বেটার কি ছিলো? তিনগোটা কঞ্চির তীর আর একখানা ধনুক। ফুল্লরা বেটী হাটে হাটে মাংস বেচ্‌তো। বলে "নির্ধনের ধন হয় দিনে দেখে তারা।" তখনকে আমার বেত পেটা কর্‌লে। মন্ত্রীর ছেলে—তার মান সম্ভ্রম রাখ্‌লে না। আচ্ছা, দেখ্‌ছি ব্যাধের বেটার কেরদানি, আমার বুদ্ধির একরতি পায়নি, বেটা হোলো মহারাজ! ধিক্ ধিক্, জীবনে ধিক্! তাহ'লে দুর্গা বলে

যাত্রা করি, কেমন ? হাঁ, শুভস্য শীঘ্রং, আর বিলম্বে কাজ কি ? হায়, হায়, পাতা ঘরকন্না ছেড়ে যেতে হোল।

(গেঁড়ার প্রবেশ)

গেঁড়া। বাবা ! তাহ'লে তার কেন ? চল কলিঙ্গ রাজ্যে যাই। এ রাজ্যের কেমন রাজা তা ত দেখ্‌লে বাবা ! এখন যেখানে মান থাকে সেইখানেই চল।

ভাঁড়ু। ওরে হতচ্ছাড়া বেটা ! তোর জন্যেই ত এত কাণ্ড হোলো ! নৈলে আমাকে তাড়ান কি ব্যাধের বেটার সাধ্য ? চল্ এখন তল্পিতল্পা বেঁধে নিয়ে পালিয়ে যাই।

(ভাড়ুর স্ত্রীর প্রবেশ)

ভাঁ-স্ত্রী। কোথায় পালিয়ে যাবে গা ? কেন, এখানে কি অসুবিধা হলো, যে পালিয়ে যাবে ?

ভাঁড়ু। দেখ তপনের মা, এরাজ্যে মহা মড়ক উপস্থিত। প্রত্যহ দশটি বারটি করে চল্‌ছে। এখানে থেকে কি অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দেবে ? তাই আমরা কলিঙ্গ রাজ্যে পালিয়ে যাচ্ছি। চল চল, তোমার সাধের দোক্তার কৌটাটি সঙ্গে নেও, চল।

(শিবাদত্তের প্রবেশ)

শিবাদত্ত। দাদা আমাল্ বি—বি—বিয়েটা হ'য়ে যা—যাক্ না। এখন কু—কুথায়—যাবেন ? ধ—ধ—ধর—ব—ব—বয়েসটাও কম—হ—হয়নি। পা—পা—পায়ের গো—গোদ—টাও বে—বে—বেড়ে যাচ্ছে— আর কি—ধর—বি—বি—বিয়ে হবে ?

ভাঁড়ু। ওরে শিবা, ভাড়ুদত্তর কানে কলম থাক্‌লে সবই বজায় থাক্‌লো ! এবার একটা চাক্‌রী পেলেই তোর বিয়ে দেব, ভয় কি ? এখন এক কাজ কর। শালা গোবরাকে দিয়ে হবে না। বড় ফচ্‌কে ছোড়া। এক কাঁদি কাচ্‌কলা, এক ঝুড়ি পুইশাক আর মত্তমান কচু, আর গোটা দশ মোচা কিনে রেখেছি ; ওগুলি মাথায় করে আমার সঙ্গে আয়।

ভাঁড়ু-স্ত্রী। হ্যাঁগা, শিয়ালের মত আজ এখানে কাল ওখানে কত বেড়াবে। এক জায়গায় সুস্থির হয়ে বোস। তপনের বে দাও, বৌ ঘরে

আন, বৌএর মুখ দেখ। তা নয়, আজ অঙ্গ-কাল বঙ্গ-পরশু কলিঙ্গ এম্‌নি করে বেড়াচ্ছ। মড়ক টড়ক ওসব মিছে, তোমার বুদ্ধির দোষে চাক্‌রীটি খোয়ালে। আমার বড়ই আশা ছিল যে এবার একগাছি হার নেবো। কপাল !

ভাঁড়ু। এবার কপালে রাজটীকা নাচ্‌ছে। কলিঙ্গরাজ মহা জ্ঞানী ! তাঁর রাজ্যে মুড়ি মিছরির একদর নয়। এবার চাক্‌রী পেলেই হার গড়িয়ে তবে জল গ্রহণ। চল চল, আর বিলম্ব করো না ! অই দেখ ভোর হ'য়েছে। বৈষ্ণবেরা টহল দিচ্ছে।

(সকলের প্রস্থান)

বৈষ্ণবগণের প্রস্থানী গান।

বৈষ্ণবগণ। জয় রঘুনন্দন, চরাচর-বন্দন, দুষ্ট নিকন্দন হরে !
জয় জয় রাম, নয়নাভিরাম, অভিনবশ্যাম হরে !
জয় জয় কেশী-কংস-বিমর্দ্দন,
জয় জয় কৃষ্ণ, ধর হে গোবর্দ্ধন
জয় জয় কেশব কালীয়দমন নন্দগোপসুনু হরে !
বল বল উচ্চে রাম নারায়ণ
কমলাকান্ত কৌস্তুভভূষণ
ভূভারহারী, জয় দৈত্যারী ধনুর্বংশীধারী হরে।

(বৈষ্ণবগণের প্রস্থান)

ক্রমশঃ।

রাস-ক্রীড়ায় সৃষ্টিতত্ত্ব।

(পৌরাণিক)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

কাব্যরত্নাকর।

শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন, "পুত্র যেমন পিতার (মাতার) মহিমা, শক্তি, স্বরূপাদি বোধে অসমর্থ, ঈশ্বরসৃষ্ট জীবও (মানব) তেমনি ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম। লবণের পুতুল সমুদ্রের জল মাপিতে গিয়া ফিরিয়া আসে নাই।" তাঁহার অমূল্য উক্তির যথার্থ-তত্ত্ববোধে অক্ষম, এই কীটানুকীটের বড় বড় তত্ত্বকথার আলোচনা করা নিতান্ত বাতুলতা, বাচালতা ও ধৃষ্টতা মাত্র। তথাপি একটি কথা মনে হয়—

"মধুভাণ্ড লয়ে যদি নাড়াচাড়া করে।
কখনও কিঞ্চিৎ লব্ধ হইবে তাহার॥"

সাধারণতঃ সকলের বিশ্বাস এই যে, দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইয়া গোপ-কুলে গোপ-গোপীসহ লীলা করিয়াছিলেন। অবতার সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন, "যেমন অনন্ত সমুদ্রের জল খানিকটা জমিয়া ভাসিতেছে। অথণ্ড সচ্চিদানন্দের খানিকটা ঐ অবতার। অনন্তকে ধরা ছোঁয়া যায় না কিন্তু অনন্তের অংশকে ধরা ছোঁয়া যায়।"

কেবলমাত্র দশটিই অবতার নহেন; অবতার অসংখ্য। তিনি যুগে যুগে নানারূপে মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হন। তিনি নিজ রস নিজে আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হন না, তাঁহার সৃষ্ট ভক্তগণকেও আস্বাদন করান। রসময়ের এই লীলার নাম রাসক্রীড়া বা রাসলীলা। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে শুকদেবমৈত্রেয়-সংবাদে লিখিত হইয়াছে—

"ভগবানেক আসেদগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মানানামত্যুপলক্ষণঃ॥

সৃষ্টির অগ্রে পরমাত্মা ভগবান মাত্র একই ছিলেন, কিরূপ ছিলেন? জীবের আত্মা স্বরূপ। অন্য দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাত্মক কিছুই ছিল না। আত্মেচ্ছা অর্থাৎ

মায়া তাহার অনুগত (লয়) হইয়া। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখিতে পাই—

যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জ্জগত্যেকার্ণবী কৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভু॥

অর্থাৎ প্রলয়কালে যখন সমস্ত জগৎ একার্ণব অর্থাৎ জলময় হইয়া যায়, তখন ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক অনন্ত শয্যায় শায়িত থাকেন। এই যে থাকা তাহা একবার নহে; অনেক বার অনেককাল। যোগনিদ্রাই মায়া শক্তি! শ্রীভগবান উহাঁর দ্বারাই সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস করিয়া থাকেন। তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা। যথা (চণ্ডীটীকাধৃত) নারদীয়ে—

তস্য শক্তিঃ পরা বিষ্ণোর্জ্জগৎ কার্য্য পরিশ্রয়া।
ভাবাভাব স্বরূপা যা বিদ্যাবিদ্যেতি গীয়তে॥
যদা বিশ্বং মহাবিষ্ণোর্ভিন্নত্বেন প্রতীয়তে।
তদা হ্যবিদ্যা সংসিদ্ধা ভেদাদ্দুঃখস্য সাধনম্॥"

তস্য বিষ্ণোর্শক্তিঃ মায়া, জগৎ-কার্য্যের আশ্রয়স্বরূপা। যিনি কার্য্য-কারণ-স্বরূপা এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা (বন্ধমোক্ষকরা) বলিয়াও কথিত হন। যখন এই বিশ্ব এবং বিষ্ণু ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তখন অবিদ্যাশ্রিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। দুঃখের সাধন এই মায়া। অন্যত্র, শ্রীচণ্ডীতে দেখিতে পাই—

মহামায়া প্রভাবেন সংসার স্থিতিকারিণঃ
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্য যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥

মহামায়ার প্রভাবেই সংসার-স্থিতি ঘটে। অতএব জগৎ যে মহামায়া কর্ত্তৃক মোহিত হইতেছে, এ বিষয়ে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই; কেননা জগৎ-কর্ত্তা হরিও মহামায়াপ্রভাবে যোগনিদ্রামুগ্ধ।

যোগ রূপা নিদ্রা—যোগনিদ্রা, যোগ, সংযোগ, মিলন। অতএব পরমানন্দময়ী শক্তি; মাগো, আনন্দময়ি, তোমার মহিমার পার নাই। জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মা, জগৎ-পালক হরি, জগৎ-সংহারকারী ত্রিশূলী, ইহারা সকলেই তোমার প্রভাবেই মুগ্ধ। ওমা সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্যোতনশীলা ভগবতী অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যশালিনি! আপনার পাদ-পদ্মের রেণু নতকন্ধর প্রণত অধমের মস্তকে প্রদান করো মা। হে মহামায়ে! তোমার মায়ায় জগৎ মুগ্ধ সুতরাং আমিও মুগ্ধ, আমায় ক্ষমা কর দেবি!

শ্রীভগবান শক্তিস্বরূপিণীর সাহায্যেই জগদ্রক্ষা করেন। তাঁহার কারণ শক্তি ও কার্য্যশক্তি ঐ মহামায়া রাধিকাদেবী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে এই শক্তিময়ী

শ্রীরাধিকার কথা লিখিত আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বা বিষ্ণুপুরাণে যে রাধিকার নাম গন্ধ নাই ‡ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত তাঁহার স্বরূপ বিশেষ ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

স কৃষ্ণঃ সর্ব্ব সৃষ্ট্যাদৌ সিসৃক্ষুরেক এব চ।
সৃষ্ট্যুন্মুখস্তদংশেন কালেন প্রেরিত প্রভুঃ॥
স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়া চ দ্বিধারূপো বভূব হ।
স্ত্রীরূপা বামভাগাংশা দক্ষিনাংশঃ পুমান্ স্মৃতঃ॥
তাং দদর্শ মহাকামী কামাধারঃ সনাতনঃ।
অতীব কমনীয়াঞ্চ চারুচম্পক সন্নিভাম্॥
দৃষ্টি মাত্রং তয়া সার্দ্ধং রাসেশো রাসমণ্ডলে।
রাসোল্লাসে সুরহসি রাসক্রীড়াং চকার হ॥

অনেকে পুরাণের এই সকল বচনকে অন্য প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া প্রবঞ্চনা করিয়া থাকেন। তিনি ইচ্ছাময়। তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি হইল ইহা বলিতে লজ্জাই বা কি তাহা ত বুঝি না। শ্রীকুলদা প্রসাদ মল্লিক মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাকে ইংরাজগণের "বলনাচের" সহিত তুলনা দেন। অনেক বৈষ্ণব "কামগন্ধহীনতার" পক্ষপাতী আবৃত্তি করেন। তাঁহাদের রুচি দেখিয়া হাসি পায়। শ্রীগীতায় যে "প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্প" কথাটি আছে তাঁহারও রূপক-ব্যাখ্যা হইবে না কি? তিনি স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা। মিথুন ধর্ম্মেই হৌক আর মনে মনেই হউক তিনি সৃষ্টি করেন। আর "তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং" ইহাও বলিয়াছেন।

শ্লোকটির অর্থ এই—

"এই রূপে শ্রীভগবান শ্রীরাধিকার গর্ভাধান করিলেন। শত মন্বন্তরাতীত হইলে দেবী বিশ্বের আধার স্বরূপ একটি স্বর্ণ ডিম্ব প্রসব করিলেন। বিষ্ণু পুরাণে

‡ সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে তদীয় "শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব" গ্রন্থে রাধা-শূন্য শ্রীকৃষ্ণের কথা প্রচার করেন। কিন্তু রাধা-শূন্য কৃষ্ণকথা বৈষ্ণবগণের বক্ষে শেল সম বিদ্ধ হয়। তজ্জন্য তৎপরবর্ত্তী কালে অনেক বৈষ্ণব ভাগবতে রাস ক্রীড়াধ্যায়ে রাধিকার অন্বেষণ করেন এবং দশমের বিংশ অধ্যায়ে "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো-যামনয়দ্রহঃ॥" এই শ্লোকে তাঁহার আভাস দেন। বীরভূমি সম্পাদক পূজনীয় শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয় "বীরভূমি" পত্রিকায় শ্রীরাধার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

প্রথমাংশে সৃষ্টি প্রকরণে এইরূপ দেখিতে পাই, যথা—

হে মহাবুদ্ধে! ব্রহ্মরূপ বিষ্ণুর (কৃষ্ণের) উত্তম সংস্থানভূত জল-বুদ্‌বুদ্‌বৎ বর্ত্তুলাকার উদকেশয় ঐ প্রাকৃত অণ্ড ভূতগণের সাহায্যে ক্রমে বিবৃত্ত হইল। অব্যক্তরূপী জগৎপতি বিষ্ণু ব্যক্তরূপী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ ঐ অণ্ডে ব্যবস্থিত হইলেন। মেরু তাঁহার উল্ব, অন্যান্য পর্ব্বত জরায়ু এবং সমুদ্র সকল মহাত্মার গর্ভোদক হইল। হে বিপ্র! ঐ অণ্ডে সপর্ব্বত দ্বীপ, সমুদ্রসকল এবং দেবাসুর মানব সজ্যোতিঃ লোকসকল উৎপন্ন হইল।

ঐ স্বর্ণ ডিম্ব দেবী রাধিকা গোলকস্থিত কারণ জলে বিসর্জ্জন করিলেন। এই রূপে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইল। রাধিকা কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত ঐ অণ্ড দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ হাহাকার করিতে করিতে শ্রীমতি রাধিকা দেবীকে অভিশাপ প্রদান করিলেন—

যতোঽপত্যং ত্বয়া ত্যক্তং কোপশীলে সুনিষ্ঠুরে।
ভব ত্বমনপত্যাপি চাদ্য প্রভৃতি নিশ্চিতম্॥
যা যা স্বদংশরূপাশ্চ ভবিষ্যন্তি সুরস্ত্রিয়ঃ।
অনপত্যাশ্চ তাঃ সর্ব্বাস্তৎসমা নিত্যযৌবনাঃ॥

হে কোপনে! নির্দ্দয়ে! যেহেতু তুমি স্বীয় অপত্য ত্যাগ করিলে সেইহেতু তুমি অনপত্যা হইবে। যে সকল সুরকামিনী তোমার অংশে উৎপন্ন হইবে তাহারাও অনপত্যা হইবে।

এমন সময়ে রাধিকা দেবীর জিহ্বাগ্রভাগ হইতে শুক্লবর্ণা বীণা-পুস্তক-ধারিণী পীতাম্বর-পরিধানা, নানারত্নালঙ্কারভূষিতা মনোহরা এক দেবী উৎপন্ন হইলেন।

দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীতে প্রাধানিক রহস্যেও সরস্বতী দেবীর উক্তরূপে উৎপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে।

অথ কালান্তরে সা চ দ্বিধারূপা বভূব হ।
বামার্দ্ধাঙ্গা চ কমলা দক্ষিণার্দ্ধা সরস্বতী॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে।

কালান্তরে তিনি (রাধিকা) দ্বিধামূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বামার্দ্ধাঙ্গে কমলা (লক্ষ্মী) দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গে সরস্বতী হইলেন। এই সময় শ্রীকৃষ্ণও দুইরূপ ধারণ করিলেন। দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গে দ্বিভুজ কৃষ্ণ ও বামার্দ্ধাঙ্গে চতুর্ভুজ বিষ্ণু। শ্রীকৃষ্ণ (গোলকাধিপতি মূল কৃষ্ণ) বাণীকে (সরস্বতীকে) বলিলেন "তুমি এই

দ্বিভুজধারী পুরুষের কামিনী হও।" তদনুসারে ভারতী দেবী কৃষ্ণবল্লভা হইলেন। ইনি—বিষ্ণুঃ কৃষ্ণঃ হৃষীকেশঃ বাসুদেবঃ জনার্দ্দনঃ।

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ খিলাংশে প্রাধানিক রহস্যে দ্রষ্টব্য)

এই প্রকারে রাধাঙ্গসম্ভবা লক্ষ্মীদেবীকে চতুর্ভুজধারী নারায়ণের করে সমর্পণ করিলে তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। বৈকুণ্ঠের উপরে শ্রীগোলকধাম। এই ধামের রাধাকৃষ্ণই জগৎ সৃষ্টি করিলেন। রাধাঙ্গসম্ভবা লক্ষ্মী সরস্বতীর সন্তান নাই।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রাধানিক রহস্যেও ইহার আভাস পাই, যথা—

"সর্ব্বস্যাদ্যা মহালক্ষ্মী স্ত্রিগুণা পরমেশ্বরী।
লক্ষ্যালক্ষ্যস্বরূপা সা ব্যাপ্য কৃৎস্নং ব্যবস্থিতা॥

অর্থ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণাত্মিকা মহালক্ষ্মী দেবী; তিনি কখন লক্ষ্য কখন অলক্ষ্য স্বরূপা। তিনি এই জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। অথবা লক্ষ্যা শব্দার্থ সগুণা (গুণাত্মিকা), অলক্ষ্যা নির্গুণা, গুণের পারে অবস্থিতা।

সেই মহালক্ষ্মী প্রলয়কালে চিন্মাত্র রূপে ব্যাপ্ত ছিলেন। পরে শূন্যময় পৃথ্বী দর্শনে তিনি মহাকালী রূপে অবতীর্ণা হইলেন। তিনি কেমন?

"সা ভিন্নাঞ্জনসঙ্কাশা দংষ্ট্রাঙ্কিত বরাননা।
বিশাললোচনা নারী বভূব তনুমধ্যমা॥
খড়্গ-পাত্র-শিরঃ-খেটৈরলঙ্কৃত-চতুর্ভুজা।
কবন্ধহারমুরসা বিভ্রাণা শিরসা স্রজম্॥

তাঁহাকে মহালক্ষ্মী বলিলেন, "তোমার নাম হইল মহামায়া, মহামারী ক্ষুধা-তৃষ্ণা, নিদ্রা, একবীরা ও দুরত্যয়া।" এই বলিয়া মহালক্ষ্মী দেবী আর একরূপ ধারণ করিলেন। যথা—

"তামিত্যুক্ত্বা মহালক্ষ্মীঃ স্বরূপমপরং নৃপ।
সত্ত্বাক্ষেনাতি শুদ্ধেন গুণেনেন্দুপ্রভং দধৌ॥
অক্ষমালাঙ্কুশধরা বীণা-পুস্তক-ধারিণী।
সা বভূব বরানারী নামান্যস্যৈ চ সা দদৌ॥
মহাবিদ্যা মহাবাণী ভারতী বাক্ সরস্বতী।
আর্য্যা ব্রাহ্মী কামধেনু বেদগর্ভা চ ধীশ্বরী॥

ক্রমশঃ।

জন্মভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৬শ বর্ষ } ১৩৩৭ সাল, ফাল্গুন { ১১শ সংখ্যা।

শ্রীমদ্ বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীগুরুদেবের সাধনা ও শিক্ষা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

সাধু মহাত্মাগণের সাধনাপ্রণালী কিরূপ ভাবে আরম্ভ হইয়া কিরূপ ভাবে পর্য্যবসিত হয় বা পরাকাষ্ঠা লাভ করে ইহা জানিবার জন্য অনেকেই উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন। বাস্তবিকই ইহা জানিতে পারিলে অনেকের উপকারও সাধিত হইতে পারে। আমরা ইহা জানিবার জন্য গুরুদেবকে সময়ে সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। এরূপ করিয়া যতদূর জানিয়াছি তাহাতে সম্যক্ প্রকারে পাঠকের পরিতৃপ্তি প্রদান করিতে পারিব না। ইহার কারণ হইতেছে যে, তাঁহার এ সাধনা আরম্ভ হইয়াছিল বহু বৎসর পূর্ব্বে। এজন্য এত দীর্ঘ কালের ঘটনা এক্ষণে একটির পর আর একটি স্মরণ করিয়া বিবৃত করা তাঁহার পক্ষে অতি সুকঠিন। পুনরায় এ সাধনা ব্যাপার অতি গোপনীয় বিষয়। এবং কেবল গুরু ও শিষ্য বা সমঅবস্থাপন্ন সঙ্গী যদি কেহ থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেই ইহা বিদিত থাকে। অপরের নিকট ইহার গোপনীয়তা ভঙ্গ করা নিষেধ। গুরুদেবের এ সনসাময়িক সঙ্গী আমরা দর্শন করিতে পাই নাই। পুনশ্চ এক একটি সাধনা ক্রিয়া বহুদিন

ধরিয়া অভ্যাস করিতে করিতে তাহাতে সুপ্রবিষ্ট হইলে তবে অপর একটি আরম্ভ করিতে হয়। এজন্য আমরা আভাস ইঙ্গিতে যতটুকু জানিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিতেছি। ইহার বহুল অংশ পরের উপদেশাবলিতে জানিতে পারা যাইবে।

সাধু-সমাজে আমাদের গুরুদেব একজন বিশিষ্ট যোগী পুরুষ বলিয়া বিদিত আছেন। এ যোগ যে কি তাহা যাঁহারা আধ্যাত্মিক যোগশাস্ত্র কিছু আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা কতক কতক বুঝিবেন। সংস্কৃত ভাষায় এ যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আছে। ইহার মধ্যে পাতঞ্জল দর্শন, দত্তাত্রেয় সংহিতা, হঠ-দীপিকা, হঠযোগ, ঘেরণ্ড সংহিতা, যোগীযাজ্ঞবল্ক, গোরক্ষ সংহিতা, যোগসার, শিবসংহিতা প্রভৃতি কয়েক খানির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে এ সকল পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ কিছু ফল নাই। ইহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়া গুরু শিষ্যের মধ্যেই বক্তব্য ও শিক্ষনীয়। শ্রুতিতেও এ যোগ ক্রিয়া আভাসে ব্যক্ত হইয়াছে যথা—

(১) ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং ইত্যাদি
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(২) বিবিক্তি দেশেচ সুখাসনস্থ ইত্যাদি
কৈবল্যোপনিষৎ।

(৩) "ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যং। অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি
শুভ্রো যং পশ্যতি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।
মুণ্ডকোপনিষৎ।

(৪) শতঞ্চৈকাচ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাম্মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা
ইত্যাদি কঠোপনিষৎ।

"(৫) ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি অথবা পদ্ম কোষং প্রতীকাশং
শুষিরাঞ্চপ্যধোমুখং

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে এ সব যোগ-প্রক্রিয়া ভারতের ঋষিগণের মধ্যে বহু প্রাচীন কাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। "ব্রহ্মসূত্রং ধারয়েদং যোগী যোগবিৎ তত্ত্ব দর্শিবান"।

গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবান এ যোগ সম্বন্ধে নানাভাবে উপদেশ দিয়াছেন; যথা

(১) তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানীভ্যোঽপি মতোধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥

(২) যৎ সাংখ্যৈ প্রাপ্যতে স্থানং তদযোগৈরপি গম্যতে।

(৩) সাংখ্য যোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।

যোগের এইরূপ শ্রেষ্ঠতা জানাইয়া তিনিই শুনাইয়াছেন—

(১) অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।

(২) যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং

(৩) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

এ যোগ সাধারণতঃ "হঠযোগ" ও "রাজযোগ" বলিয়া বিদিত আছে। আমাদের মহারাজ সাধু-সমাজে একজন বিশিষ্ট হঠযোগী বলিয়া বিদিত আছেন। এ হঠযোগের নাম শুনিয়াই পাঠকগণ চমকাইবেন না। অনেকের ধারণা আছে যে, রাজযোগই যোগ, আর হঠযোগ একটা কসরত মাত্র। ইহা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এইরূপ উক্তি আছে,

"হঠং বিনা রাজযোগং রাজযোগং বিনা হঠঃ।
ন সিধ্যতি তত যুগ্মমানিষ্পত্তে সমভ্যসেৎ"॥

হঠযোগ-প্রদীপিকা

অর্থাৎ হঠ বিনা রাজ যোগ বা রাজ যোগ বিনা হঠযোগ সিদ্ধ হয় না। এজন্য এ দুইটিরই সম্যক্ প্রকারে অভ্যাস করা প্রয়োজন।

এ হঠযোগ সর্ব্বদা গোপনীয় ভাবে করিবার নিয়ম, কারণ—

"হঠবিদ্যা পরং গোপ্যা যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা।
ভবেদ্বীর্য্যবতী গোপ্যা নির্বীর্য্যাতু প্রকাশিতা"॥

অর্থাৎ গুপ্তভাবে রাখিলে তবে ইহা বীর্য্যবতী হয়। প্রকাশ করিলে নির্বীর্য্য হয়, অর্থাৎ ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশযোগ্য নহে।

যোগশাস্ত্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইতেছে পাতঞ্জল দর্শন, কারণ ইহার উপদেশ সকলের প্রতিই সমভাবে প্রযুজ্য ও ইহার উপদেশাবলি একটি ক্রমিক পদ্ধতিতে সন্নিবিষ্ট। ইহার মধ্যে ক্রিয়াযোগ বা সাধনপাদ বুঝাইতে গিয়া পতঞ্জলি মুনি বলিলেন "তপঃ স্বাধ্যেশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ" অর্থাৎ স্ব স্ব আশ্রমানুযায়ী ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠান, প্রণব বা মূলমন্ত্রের রূপ বা নাম কীর্ত্তন, বেদপাঠ বা অধ্যাত্ম শাস্ত্রের পাঠও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরে চিত্তার্পণ—হইতেছে ক্রিয়াযোগ। এ সমুদয় ক্রিয়াযোগের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিলে অবিদ্যানাশ হইয়া বিবেক-খ্যাতি নামক জ্ঞান উদিত হয়। এজন্য উক্ত মুনি শুনাইয়াছেন যে "যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদ-বিশুদ্ধিক্ষয়েবিবেক-খ্যাতে" —অর্থাৎ যোগাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তের মলিনতা দূর হইলে জ্ঞানের দীপ্তি হইতে হইতে বিবেকখ্যাতি নামক পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হয়। এ যোগাঙ্গানুষ্ঠানের আটটি ক্রমিক রূপ তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যথা, যম,

নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ও ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। ইহার মধ্যে প্রথম ৫টী প্রধানতঃ হঠযোগের অন্তর্গত ও শেষোক্ত তিনটী রাজযোগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট। পূর্ব্বোক্ত ক্রমিক ধাপ অনুসারে যদি কেহ শেষোক্ত তিনটিতে পরাকাষ্ঠা-লাভের ইচ্ছা করেন বা পূর্ণভাবে রাজযোগী হইবার ইচ্ছা হয়, তবে প্রথমে প্রথমোক্ত ৫টী অনুষ্ঠান দ্বারা পূর্ব্বে হঠযোগী হইতে হইবে।

শ্রীভগবানও এজন্য গীতাশাস্ত্রে বলিলেন যে, "অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ্য ইতি মে মতিঃ।" গীতাশাস্ত্রে এ যোগসিদ্ধির জন্য তিনি বহুবিধ উপদেশ দান করিয়াছেন, যথা—আহার-সংযম, বাক্য-সংযম, মনঃ-সংযম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান ও ধারণা। ইহার প্রথমোক্ত ৫টী হইতেছে এই হঠযোগেরই অন্তর্গত।

পুনরায় অদ্বৈত চূড়ামণি ভগবান শঙ্কর বেদান্ত জ্ঞানের কে অধিকারী তাহা বলিতে যাইয়া "উত্তর মামাংসা" নামক বেদান্ত-দর্শনের প্রথম শ্লোক "অথাতো-ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইহার "অথ" শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভাষ্যে বর্ণনা করিলেন যে, প্রথমেই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইতে হইবে। ইহাদের মধ্যে শমদমাদি যে ষট্ সম্পত্তি সাধন তাহাই হইতেছে পূর্ব্বোক্ত যোগ ক্রিয়ার অন্তর্ভূত হঠযোগ-সাধন।

এই যোগ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান শুনিয়া কেহ কেহ কয়েকটী প্রশ্ন উঠাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, ভগবানের উক্তি আছে, "কলৌ নামৈব কেবলং।" পতঞ্জলি মুনি বলিয়াছেন যে "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" "তদ্ধপতদর্থ ভাবনং।" আর দেখাও গিয়াছে যে বহু মহাপুরুষ পূর্ব্বোক্ত যোগ ক্রিয়ার পূর্ণ অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল ঈশ্বরে ভক্তি, মন্ত্রজপ বা নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং এরূপ সহজ উপায় থাকিতে হঠযোগের কঠিনতা অবলম্বনের প্রয়োজন কি? ইহার বিচার উঠাইবার স্থান এ নহে। তথাপি কথাটা যখন উঠিয়াছে তখন এ সম্বন্ধে ২।৪টী কথা বলিব মাত্র।

এ প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসা করিবে যে, দক্ষিণেশ্বরে কালীমাতার বিগ্রহ বহু-দিন হইতেই তো বিরাজিত ছিলেন। অনেকে পরমহংস দেবের পূর্ব্বে তাঁহার পূজায় অবশ্যই ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু পরমহংসত্বরূপে সিদ্ধি অপর কাহারও হইয়াছে কি? কেশব ভারতী অবশ্যই অন্যান্য বহু ব্যক্তিকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মত আর কি কেহ নাম-কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন? তুলসীদাসের মত রাম নামের জপে অপরকে সিদ্ধি পাইতে শুনিয়াছেন কি? শঙ্করাচার্য্যের মত ৩২ বৎসর মধ্যেই জ্ঞানমার্গে

সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে শুনিয়াছেন কি? এ সমুদয় দৃষ্টান্ত দিবার হেতু এই যে, মহাপুরুষগণের বিষয় লইয়া সাধারণের আলোচনা করা উচিত নয়। ইহার কারণ এই যে, এমন মহাপুরুষগণকে বিবেচনা করিবে যে তাঁহারা দেব-অংশ অথবা তাঁহারা পূর্ব্বজন্মের যোগসিদ্ধ। ইহাঁদের সম্বন্ধে শ্রীভগবান গীতায় শুনাইয়া-ছেন যে এ সকল যোগসিদ্ধগণ "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টো অভিজায়তে অথবা যোগীনামেব কুলে ভবতি ধীমতাং" আর এরূপ জন্ম লাভ করিবার পর "পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।"

অপর উত্তর এই হইতেছে যে, সূর্য্যও সমভাবেই আকাশে বিরাজিত আছেন; কিন্তু তাঁহার প্রতিবিম্ব কি একভাবে সকল দ্রব্যে প্রতিফলিত হয়? শ্রীভগবান সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু তাঁহার এ ব্যাপীত্ব-জ্ঞান কি সকলে একভাবে ধারণা করিতে পারে? ইহার কারণ এক এক বস্তু বা ব্যক্তির জাড্যতা-দোষ অতি বিভিন্ন। মনুষ্য দেহের এ জাড্যতা-দোষ মল, বিক্ষেপ ও আচরণ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উৎপন্ন হয়। এ জাড্যতা দোষ যাহার যেরূপ দূরীভূত হইবে, তাঁহার পক্ষেই পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরের প্রণিধান তাঁহার ধ্যান ধারণা ও তাঁহার মন্ত্র-শক্তির আলাপন সেইরূপ প্রস্ফুটিত হইবে। সাধারণতঃ সকলকে এ মানব দেহ লইয়াই উক্ত প্রকার কার্য্য করিতে হইবে। এজন্য ঘেরণ্ড-সংহিতা শুনাইলেন—

"আমকুম্ভ মিবম্ভস্থো জীর্য্যমানঃ সদা ঘটঃ
যোগানলেন সংদহ্য ঘটস্তদ্ধং সমাচরেৎ"

অর্থাৎ এ মানব শরীর হইতেছে কাঁচা মাটীর নির্ম্মিত একটী ঘটের মত, কাঁচা ঘটে জল রাখিলে ঘটের সহিত জল নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু সেই ঘটকে অগ্নির উত্তাপে পুড়াইলে তাহাতে জল বহুদিন সুশীতল ভাবেই রক্ষা করা যায়। এজন্য এ দেহরূপী ঘটকে সপ্ত প্রকার সাধন দ্বারা পাকা করিতে হয়। যথা—

"ষট্ কর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ঃ
মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি"

অর্থাৎ ষট্‌কর্ম্ম (ধৌতি, বস্তি, নেতি, লোলীকী, এটি ও কপালভাতি) দ্বারা শোধন; মুদ্রা (মহামুদ্রা, খেচরী, যোনী, শাম্ভবী প্রভৃতি) দ্বারা স্থৈর্য্য; আসন (পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, বীরাসন, উৎকট ইত্যাদি) দ্বারা দার্ঢ্য, নানারূপ প্রাণায়াম দ্বারা লঘুতা, ধ্যান দ্বারা ধ্যেয় পদার্থের দর্শন ও সমাধি দ্বারা অনির্ব্বচ-নীয় আত্ম-প্রকাশরূপ আনন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

মূলকথা যোগ সাধনার দ্বারা দেহের পরিশুদ্ধি লাভ হইলে তবে রাজযোগে পূর্ণাধিকারী হওয়া যায়। প্রথমোক্ত ক্রিয়াগুলি হইতেছে হঠযোগ। তবে সকলে ইহা জানিয়া রাখিবেন যে, এ উভয়েই সর্ব্বদা একটী অপরের সহিত ঘনিষ্ট-সূত্রে আবদ্ধ। অর্থাৎ একটীর ক্রিয়া আরম্ভ হইলেই অপরটী আপনা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইবে। তবে হঠযোগের ক্রিয়াভেদ শরীরভেদ অনুসারে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক ইহা করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য বা বীর্য্যধারণ যাহার যতদূর হইবে সে ততই ক্রিয়ায় অগ্রসর হইবে। আর উপযুক্ত গুরূপদেশ বিনা কেহ যেন এ সমুদয় অনুষ্ঠানের কল্পনাও না করেন।

এতক্ষণে হয়ত সকলে বুঝিলেন যে হঠযোগ-অভ্যাসী সাধু অতি বিরল কেন? এবং যে সাধু এ হঠযোগে পারদর্শী তিনি "রাজযোগে" অবশ্যই একজন বিশিষ্ট যোগী। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের গুরুদেব এ হঠযোগে একজন কৃতকর্ম্মা বলিয়া সাধুসমাজে যোগীরাজ রূপে বিখ্যাত আছেন। তিনি এ যোগমার্গে বিখ্যাত বলিয়া যে অন্যান্য সাধুদের মত উপেক্ষণীয়, ইহা যেন কাহারও ধারণা না হয়। এক এক মহাত্মা অধ্যাত্ম জগতের এক এক পদ্ধতি লোক সমাজে প্রচার জন্য জন্মগ্রহণ করেন। এক এক মনুষ্যও নিজ নিজ অধিকার ভেদে এক এক মহাত্মার পদানুসরণ করিয়া থাকেন।

আমাদের মহারাজ নবম বৎসর হইতেই ব্রহ্মচর্য্য লইয়া উপযুক্ত গুরুগণের সন্নিকটে অবস্থান করতঃ যোগবিদ্যায় বিশাল পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিবার পরই পথিমধ্যে প্রথমতঃ ধ্যানানন্দ নামক একটি সাধুর সহিত মিলিত হইয়া নর্ম্মদা পরিক্রমা আরম্ভ করেন। ইহাঁর নিকট হইতে পর্য্যটনকালীন কঠোরতাই শিক্ষা হয়।

এই পরিক্রমা আরম্ভের অল্পদিন পরেই, তিনি গঙ্গোনাথে আসিয়া পরম গুরুদেব ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হন। এ মহাত্মা কিরূপ এক সরল প্রাণের গুপ্ত সিদ্ধপুরুষ ছিলেন তাহা পূর্ব্বে সবিশেষ বিদিত হইয়াছে। আমাদের গুরুদেবই তাঁহার প্রথম শিষ্য। ইহা হইতেই সহজে বুঝিবেন যে, কিরূপ এক মহাসিদ্ধ পুরুষের কৃপা তাঁহার উপর প্রথমেই পতিত হইল। ব্রহ্মচারীর শিক্ষা আরম্ভ হইল এক অপূর্ব্ব ব্রহ্মচারী মহাপুরুষের নিকট। এ গুরু শিষ্যের একত্রে অবস্থান বা মিলন মধ্যে মধ্যে ভঙ্গ হইলেও ইহার ধারা পরম গুরুদেবের দেহরক্ষা পর্য্যন্ত প্রবাহিতা ছিল। নানাস্থান পর্য্যটনের অবসরে গুরুদেব গঙ্গোনাথে যাইয়া পরমগুরুদেবের নিকট কখনও অল্প বা কখনও অধিক কাল

অবস্থান করিয়াছেন ও তাঁহার নিকট বহুবিধ সাধনা ক্রিয়ার উপদেশ লইয়াছেন। অনেক বিষয়ে গুরুদেব তাঁহা হইতেও অগ্রসর হইয়াছেন ইহা আনন্দের সহিত তিনি জানাইতেন। কৃষ্ণচৈতন্য ব্রহ্মচারীকে হঠযোগের কোন কোন ক্রিয়া অবগত হইবার জন্য মহারাজের নিকট তিনিই প্রেরণ করেন। ইনি ৭ বৎসর কাল তপোবনে ও কেরাণীবাদে অবস্থান করিয়া বহুবিধ শিক্ষা লাভ করেন।

ইনি বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কেরাণীবাদের আশ্রমের কেশব পণ্ডিত তাঁহার নিকট হইতেই বেদপাঠ ও কর্ম্মকাণ্ড শিক্ষা করেন। নর্ম্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার সময় তিনি বড় মহারাজের সহিত আনীত বেদাচার্য্যগণের সহিত যজ্ঞ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করেন। পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে এই বড় মহারাজের ব্যবহারিক আদর্শ আমাদের গুরুদেব পূর্ণ মাত্রায় কেরাণীবাদে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গুরুদেবের শিক্ষা এখনও তাহাতে সম্পূর্ণ ভাবেই প্রস্ফুটিত আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ৭।৮ মাস অবস্থানের পর গুরুদেব নর্ম্মদা পরিক্রমায় বাহির হইয়া কৃপালাভ করেন গৌরী-শঙ্কর মহারাজের। ইনি কিরূপ এক প্রকট সিদ্ধ পুরুষ সে সময়ে বিদিত ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে জানাইয়াছি। ইহার নিকট ৭ বৎসর অবস্থান করিয়া গুরুদেব এ তরুণ ব্রহ্মচারী জীবনের যে সমুদয় কর্ত্তব্য তাহা পূর্ণ মাত্রায় শিক্ষা করেন। পরম গুরুদেব কেরাণীবাদে আসিলে গুরুদেবকে কি প্রকারে শিষ্যের সেবা করিতে হয় তাহা আমরা দেখিয়াছি। ইহা ভিন্ন অতিথি অভ্যাগত ও গৃহস্থগণের প্রতি কিরূপ করিতে হয় তাহা এখনও দেখিতেছি। এ সেবা-ধর্ম্ম তিনি এই গৌরীশঙ্কর মহারাজের নিকটই শিক্ষা করেন। গৌরীশঙ্কর মহারাজের নিকট হইতে ৭ বৎসর বনবাসের পর যখন বিচ্ছিন্ন হন তখন ইতস্ততঃ কিছুদিন পর্য্যটনের পর পুনরায় গুরুদেব নর্ম্মদা পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া তিনি মিলিত হন একটী হঠযোগী সাধুর সহিত। ইহাঁর নাম হইতেছে মার্কণ্ডেয় মহারাজ। ইহাঁর সহিত পর্য্যটন করিতে করিতে ইহাঁর নেতি, ধৌতি, নৌলী, বাতসার, বস্ত্রসার প্রভৃতি হঠযোগের ক্রিয়া দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট এ সকলের শিক্ষালাভ করেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এ সমুদয় ক্রিয়া অতি গোপনে সাধন করিতে হয়। কিন্তু নর্ম্মদা পরিক্রমাকালে এ সুবিধা তাঁহার উত্তমরূপেই মিলিয়াছিল, কারণ নর্ম্মদাতীরে প্রায়ই নির্জ্জনভাবে অনেক সময় তিনি পর্য্যটন করিয়াছেন। বস্তি ধৌতিতে বায়ু দ্বারা জল গুহ্য দ্বার দিয়া পরিপূর্ণ করিয়া তবে অন্তরস্থ ময়লা পরিষ্কার করিতে হয়। নর্ম্মদাতীরে প্রচুর পরিমাণেই এ জল

মিলিয়া যাইত। ব্রহ্মদণ্ড নামক কাষ্ঠ শলাকা দ্বারা অথবা অতি বিস্তৃত বস্ত্রখণ্ড মুখ-গহ্বর দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করাইয়া শ্লেষ্মাদি দেহমল দূর করিতে হয়। এ সকল দ্রব্য এখনও মহারাজের নিকট আছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক ডাক্তার সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী ইঁহার কোন কোন প্রক্রিয়া দর্শন করিয়া ইহারই সমফলদায়ী আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ২।৩ টী যন্ত্র মহারাজকে দিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহার মধ্যে "ডুস" ব্যবহারে এখন বস্তিক্রিয়া সময়ে সময়ে তিনি করিয়া থাকেন। গুরুদেব বাল্যকাল হইতেই নানারূপ মুদ্রা ও প্রাণায়াম অভ্যাসী ছিলেন। খেচরী, শাম্ভবী, ত্রাটক বিপরীতকরণী, মহামুদ্রা, যোনামুদ্রা প্রভৃতিতে তিনি সিদ্ধ বলিয়া বহু বহু সাধুগণও তাঁহার নিকটে এ বিষয়ে এখনও উপদেশ লইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার সুরেশ বাবু এক সময়ে মহারাজের সমাধি অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাঁর মত প্রাণায়াম অভ্যাসী যোগী অতি বিরল। দিবাভাগে সাধনা ক্রিয়ার সুবিধা না হইলে রাত্রিতে একান্তে বহুক্ষণ ধরিয়া যোগাভ্যাস ও জপ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে, ৺কাশীর ধ্রুবেশ্বর মঠের মণ্ডলেশ্বর রামগিরি স্বামীর সহিত অতি ঘনিষ্টভাবে গুরুদেব পরিচিত ছিলেন। কাশীতে অবস্থান-কালে এ মঠেরই দক্ষিণামূর্ত্তির প্রাঙ্গণেই অবস্থান করিতেন। এ স্বামীজী দেহ রক্ষা করিলে গুরুদেবই প্রধান উদ্যোগী হইয়া ইহাঁর শিষ্য সচ্চিদানন্দ স্বামীকে মণ্ডলেশ্বর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাঁর সহিতও মহারাজের অতিশয় সৌহার্দ্দ ছিল। ইহার পরে স্বামী রামানন্দ এক্ষণে মণ্ডলেশ্বর হইয়াছেন। ইনিও একবার কেরাণীবাদে আসিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত স্বামী রামগিরিকে মহারাজ গুরুবৎ মান্য করিতেন। উভয়ে সময়ে সময়ে অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়াছেন। ইনি বেদান্ত শাস্ত্রে পারদর্শী ও বিরক্ত সন্ন্যাসীই ছিলেন। ইহাঁর নিকট মহারাজ বেদান্ত শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ ও অন্যান্য বহু বিষয় শিক্ষা লাভ করেন।

ত্রিযুগী নারায়ণে তিনি এক সময়ে কেদারকল্প অভ্যাসী মনসাগিরি নামক এক মহাত্মার সহিত পরিচিত হন। ইহার বিবরণ পরে দেওয়া হইবে। এখানে ভৈরবমন্ত্র লাভ করেন।

গুরুদেব আমাদিগকে বহু বারই উপদেশ দিয়াছেন যে, "মধুমক্ষিকা হো যাও" অর্থাৎ মৌমাছির মত যেখানেই মধু পাইবে উঠাইয়া লইবে। তাঁহার নিজের জীবনে ইহা পূর্ণ মাত্রায় সম্পাদন করিয়াছেন। আমরাও কবির মুখে শুনিয়াছি "যেখানে দেখিবে ছাই, উঠাইয়া দেখিবে তায়। পাইলেও পেতে

পার লুকান রতন।" এ নীতি অনুসারে মহারাজ যখন যে মহাত্মার সঙ্গলাভ করিয়াছেন তাঁহার নিকট হইতেই কিছু প্রাপ্তব্য আছে কি না তাহার সন্ধান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। কাশীতে অবস্থানকালে এক সময়ে তিনি জানিতে পারেন যে, ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় প্রাণায়ামের কিছু কিছু সুগম ক্রিয়া অবগত আছেন। ইহা শুনিয়া একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিছু কিছু শিক্ষালাভ করেন। এজন্য এখনও কেহ কেহ রটনা করেন যে, তিনি উক্ত লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ শিক্ষালাভ যে তিনি কত স্থানে করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন কি সর্প, ব্যাঘ্র বা অন্য হিংস্রজন্তু বশীভূত বা দূরীকরণ বা ভূতের মন্ত্রও বহু স্থান হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

এইত গেল অধ্যাত্মজগতের শিক্ষা। এক্ষণে ব্যবহার জগতের কিছু শুনাইব। সাধু ও গৃহস্থ সমাজে তিনি নানারূপ দুঃসাধ্য পীড়ার ঔষধ প্রস্তুত করিতে অতিশয় নিপুণ, এরূপ প্রচারিত আছে। বাস্তবিক এ বিষয়ে তিনি সিদ্ধহস্ত। এ ঔষধ প্রণালী তিনি বহুস্থান হইতে শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার গুরুভ্রাতা নিত্যানন্দ মহারাজও এ বিষয়ে অতিশয় পটু ছিলেন। তপোবনে অবস্থান সময়েও তাঁহার ঔষধ-প্রস্তুতকরণ পূর্ণ মাত্রায় ছিল। কেরাণীবাদের আশ্রমে অবস্থানের পর হইতে নিজেদের ব্যবহারোপযোগী কয়েকটী ঔষধ প্রস্তুত ভিন্ন ইহা বন্ধ রাখিয়াছেন। এজন্য অনেকে আক্ষেপ করেন, কিন্তু মহারাজ বলিয়া থাকেন যে, ডাক্তার কবিরাজের ব্যবসায়ের অন্তরায় জন্য সাধুরা ঔষধ প্রস্তুত করেন না। ইহা নিজেদের ব্যবহার জন্যই প্রস্তুত হয়। পুনরায় একজন বহুদূর হইতে ঔষধ পাইবে এই আশায় উপস্থিত হইল। সে সময়ে ঔষধ প্রস্তুত নাই, এজন্য সে ব্যক্তি ঔষধ না পাইয়া মনে করিল যে, সাধু যখন ঔষধ দিলেন না তখন সে আরোগ্য হইবে না। অকারণে একজনকে তাপ দেওয়া হইল। পুনরায় স্থানীয় কোন ব্যক্তি এইরূপে একবার ঔষধ গ্রহণ করিবার পর এক বিপদ-জালের সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করিয়াছিল। এজন্য এক্ষণে ঔষধ নিজের বিশিষ্ট ভক্ত ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রদান করেন না।

মহারাজের জীবনের অন্য শিক্ষার বিষয় হইতেছে তাঁহার কার্য্য তৎপরতা ও নিরলসতা। বৃদ্ধ বয়সেও ঘড়ীর সময়ের মত যেন তিনি কার্য্য করিয়া যান। ভোজনের বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহার নিদ্রা অতি কম। রাত্রি ৩টা হইতেই জপে বসিয়া অতি প্রত্যূষে শৌচাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন ও সকলের সহিত অতি

প্রীতিপূর্ণভাবে সম্ভাষণ করেন। তাঁহার উপদেশাবলী যেন মধুমাখা ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ একই বিষয় বহুবার শুনিলেও তাহা সর্ব্বদাই মধুরিমাময় বলিয়া বোধ হইবে।

একটি বিষয় পূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়াছি। যোগ-শাস্ত্রে স্বরোদয় সাধনা অতিশয় অভ্যাসের বিষয়। এ স্বরোদয় হইতেছে নিজের শ্বাস প্রশ্বাসের গতির সহিত ব্যবহার ও সাধনা-কার্য্য নিবদ্ধ রাখা। গুরুদেব এ সাধনায় সিদ্ধহস্ত। ঘড়ির কাঁটার সহিত এ স্বরের মিল করাইয়া তাঁহার সর্ব্বক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। এ স্বরোদয় শাস্ত্রের বহুল গ্রন্থ আছে। ইহার উপদেশ গুরুমুখে বিদিত হইবার নিয়ম।

ঔষধ প্রস্তুত করণ ব্যতীত তাহার নিজ হস্তের রন্ধন, মিষ্টান্নাদি করণ, পশু প্রতিপালন, বৃক্ষাদিরোপণ ও সংবর্দ্ধন এত সুচারু রূপে তিনি করিয়া থাকেন যে আমরা অবাক হইয়া যাই। এ দিকে গৃহাদি প্রস্তুত করিতে তিনি পাকা ইঞ্জিনিয়ার। তপোবনের গুহাদি হইতে কেরাণীবাদের মন্দির যাহা প্রস্তুত হইয়াছে সে সকলই তাঁহার মস্তিষ্ক-প্রসূত। এ সমুদয় তাঁহার ফকীরী ভাবের জীবন হইতে কিরূপে শিক্ষা হইল আমরা বুঝিতে পারি না। এ সময়ে শ্রুতির উক্তি মনে পড়ে, "কস্মিন্নুভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি" অর্থাৎ কি জানিলে অন্যান্য সকল বিদ্যাই জানা যায়? ইহা ব্রহ্ম বিদ্যারই দ্বারা লভ্য ইহাই বুঝি।

তাঁহার দ্রুত ভ্রমণ আমরা দেখিয়াছি। আমরা যুবকেরা প্রায়ই দৌড়াইয়া তাঁহার সহিত চলিয়াছি। কেরাণীবাদ হইতে তপোবন প্রায় ৫ মাইল। ইহা তাঁহার ৪০।৪৫ মিনিটের ভ্রমণ মাত্র ছিল। তাঁহার জলে সন্তরণ ও শববৎ জলের উপর পড়িয়া থাকা দেখিয়াছি। মাঘ মাসের দারুণ শীতে নর্ম্মদা সন্তরণ দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। হাসি তামাসা করিতে করিতে বন্দুকের গুলিতে তাঁহার লক্ষ্যভেদ দেখিয়াছি। নাড়াজোল হইতে রাজার বড় অশ্বযুক্ত ঘোড়ার গাড়ী অনায়াসেই চালাইয়া লইয়া তিনি আসিয়াছেন। পরিশ্রমে ক্লান্তি দেখি নাই, সমস্ত দিন অনাহারে ঘুরিতেছেন এজন্য ভ্রুক্ষেপও নাই। প্রবল জ্বরে আক্রান্ত আছেন, অথচ সকলের সহিত বার্ত্তালাপ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। এ সকল অতিরঞ্জিত নহে। এখনও পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে ইহার বহুবিধ বিষয় নিজ চক্ষে দেখিতে পারিবেন। (ক্রমশঃ)

ঈশ্বর-আরাধনা ও সুখ।

লেখক — শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর।

মানবমাত্রেই প্রত্যক্ষবাদ ভালবাসে। যাহা চক্ষুর সমক্ষে মনোহারিণী মূর্ত্তিতে উপস্থিত হয়, প্রকৃতির বশে মানব সেই বস্তুই গ্রহণ করে। তখন ভাল মন্দের বিচার প্রায়ই হয় না। ক্ষুধার্ত্ত জীবকে অন্ন প্রদান করিলে, জীব অন্নের দোষ গুণ ও শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার না করিয়াই তাহা ভক্ষণ করে।

প্রত্যক্ষবাদী মানবের সুখস্পৃহা অত্যন্তই প্রবল; এই সুখ পৃথিবীর সুখ, ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখ। পঞ্চ-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, ষড়-রিপুর আস্বাদ্য পদার্থ সকলকে মূঢ় মানব সুখ মনে করে বটে, কিন্তু তাহা কি প্রকৃত সুখ? চুলকনা পীড়ায় চুল্‌কাইতে ইচ্ছা হয়। চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে আত্মদেহ ক্ষত বিক্ষত করিয়া শেষে ক্ষত-জনিত প্রবল জ্বালায় দগ্ধ হইতে হয়। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থনিচয়ের উপভোগে সেইরূপ সুখ উপস্থিত হয়। ঐ সুখ ক্ষণস্থায়ী—ক্ষণপ্রভার দীপ্তির ন্যায়।

তবে সুখ কোথায়? সুখের দেখা কোথায় পাই? নির্ম্মল সলিলাভিলাষী উদ্‌ভ্রান্ত মানবের সম্মুখে দিগন্ত-বিস্তৃত বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে, প্রচণ্ড তপন-কিরণে ঐ বালুকায় সলিল-তরঙ্গরাশি দৃষ্ট হইতেছে; উহাই জল মনে করিয়া দৌড়িয়া দৌড়িয়া মরিতেছি; নিকটে যাইতে সে অদূরে থাকে; আরো আরো নিকটে গেলে আবার দূরে যায়; হায় হায়! পথেরও শেষ নাই পিপাসায় প্রাণ যায়; এই ভাবে কতকাল ছুটিব দয়াময়! এইভাবে কতকাল ভ্রান্তিজালে বাঁধিয়া রাখিবে হরি!

অনেক ঘুরিয়াছি। চৌরাশী কোটী জন্ম হইয়া গিয়াছে। সেই রক্ত-পূঁজ-মলমূত্ররেতঃময় জরায়ু-কক্ষে বহুকাল আবদ্ধ রাখিয়াছ; আকাশ বাতাস আলো দেখিতে বা অনুভব করিতে পাই নাই, পারি নাই। এবার যে "মানুষ" নাম দিয়া মর্ত্ত্যধামে পাঠাইয়াছ হরি! মানুষের কাজ কি করাইতেছ? আহার, নিদ্রা, সন্তান-পালন ও বৃথা অটনেই যে অমূল্য সময় কাটিয়া গেল প্রভু! এইবার এস, আর দূরে নহে। কাছে এস; তোমার সেই অভয়বাণী শুনাও—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥
(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

শুনিতে পাইলাম, নিশান্তকালীন প্রসুপ্ত-মানবের কর্ণে বিহঙ্গ-কুজনবৎ, কমলিনী-বান্ধব মধুকরের মধুরগুঞ্জনবৎ ঈশ্বরের—পরমাত্মার—প্রত্যগাত্মার অভয়মন্ত্র শুনিতে পাইলাম। বক্ষে হাত দিয়া দেখি যে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে। প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে "হরি ওঁ সত্য" "হরি ওঁ সত্য" শুনিতে পাইলাম।

একদিন গুরুদেব বলিলেন, "প্রত্যেক জীব অবশে অবিধিপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিতেছে।"

আমি বলিলাম "অবশে ও অবিধিপূর্ব্বক—ইহার মানে কি ?"

গুরু। প্রকৃতির বশে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদনই অবিধিপূর্ব্বক প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম বিধি পূর্ব্বক করিতে পারিলে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি লব্ধ হয়।

আমি। সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি মানে কি ?

গুরু। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। শরীর আধার, এই আধার সুদৃঢ় না হইলে কোনও কার্য্যই হয় না। ধর্ম্মলাভেও কষ্ট সহ্য করিতে হয়। বাতাতপ সহ্য করিয়া দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু হইতে হয়।

আমি। "মোক্ষ প্রাপ্তিতে সুখ হয়" ইহা কিরূপে সম্ভব, কারণ সুখ দুঃখ বোধ করিবে কে ? তখন চিনি গলিয়া সরবৎ হইয়া গিয়াছে যে।

গুরু। ৺রামপ্রসাদ গাইয়াছেন, "চিনি হওয়া ভাল নয় মা! চিনি খেতে ভালবাসি।" ইহার মানে নির্ব্বাণ (আমিত্বের নাশ) চাই না, নির্ব্বাণ প্রাপ্তি জনিত সুখের আস্বাদই গ্রহণ করিতে চাই ; আত্মায় আত্মায় রমণ সুখই পরম ও চরম সুখ। এই বলিতে বলিতে গুরুদেবের পদ্মবর্ণ শ্রীমুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি গাইলেন—

কে জানে সে কালী কেমন।
কালী মূলাধারে সহস্রারে আত্মাসনে করে রমণ॥

আবার গাইলেন—

"বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে ?
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥

কেউ বলে ভূত হবি, কেউ বলে তুই প্রেত হবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে॥
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।

(ওরে) শূন্যেতে পাপ-পুণ্য গণ্য, মণ্য করে সব খেয়ালে॥ প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদানকালে। যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হ'য়ে সে মিশায় জলে।

জীবন সাঁঝে।

—গান—

লেখক—শ্রীযুক্ত জহরলাল বিশ্বাস।

আমার জীবন সাঁঝের বেলা।
তুমি দাড়িয়ো এসে বাঁশী নিয়ে
ও চিকণ কালা॥
সারাদিনই গৃহ মাঝে
রত থাকি কতই কাজে
বল শুনবো কখন তোমার বাঁশীর
সুরের খেলা ?
ওগো ও চিকণ কালা,
ও চিকণ কালা॥
তাই আশা মনে মনে
তোমার বাঁশীর সান্ধ্য-তানে
আমার পরাণ যেন চরণ চুমি'
হয় পাগল ভোলা ;
ওগো ও চিকণ কালা,
ও চিকণ কালা॥

রাস-ক্রীড়ায় সৃষ্টিতত্ত্ব।

(পৌরাণিক)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

অনন্তর মহালক্ষ্মী দেবী মহাকালী ও সরস্বতীকে বলিলেন, "তোমরা ভ্রাতৃ-ভগিনী যুগল উৎপন্ন কর।" ইহা বলিয়া মহালক্ষ্মী নিজে মিথুন সৃষ্টি করিলেন। যথা—

হিরণ্য গর্ভ রুচিরৌ স্ত্রী-পুংসৌ কমলাসনৌ।
ব্রহ্মন্ বিধে বিরঞ্চেতি ধাতরিত্যাহ তং নরম্।
শ্রীঃ পদ্মে কমলে লক্ষ্মীত্যাহ মাতা স্ত্রিয়ঞ্চ তাম্॥

ইহাদের ব্রহ্মা বিধি ধাতা বিরিঞ্চি ইত্যাদি এবং লক্ষ্মী শ্রী কমলা ইত্যাদি নামকরণ করিলেন।

মহাকালী এবং ভারতী যে ভ্রাতৃ-ভগিনী সৃষ্টি করিলেন, তাহার নাম নীলকণ্ঠ, রক্তবাহু শ্বেতাঙ্গ, চন্দ্রশেখর, রুদ্র, শঙ্কর স্থানু কপর্দ্দী ও ত্রিলোচন। আর নারীর নাম হইল ত্রয়ী, বিদ্যা, কামধেনু, ভাষা, স্বর ও অক্ষরা (ষোড়শ স্বর বর্ণা)। মহাসরস্বতী আবার বিষ্ণু, কৃষ্ণ, হৃষীকেশ, বাসুদেব, জনার্দ্দন নামধারী পুরুষকে এবং উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, সুন্দরী, সুভগা, শিবা নাম্নী স্ত্রীকে সৃষ্টি করিলেন।

মহালক্ষ্মী তৎপরে ব্রহ্মাকে সরস্বতী দান করিলেন, রুদ্রকে গৌরী এবং বাসুদেবকে লক্ষ্মী সম্প্রদান করিলেন। তাঁহাদের (মিথুনত্রয়ের) সংযোগে জগৎ সৃষ্টি হইল। মহালক্ষ্মী দেবীই সাক্ষাৎ রাধিকা; তাঁহার দ্বারা ঈশ্বরের সংসার হইল। ব্রহ্মা ও স্বর সংযোগে একটী অণ্ড উৎপন্ন হইল। ভগবান রুদ্র গৌরীর সহিত তাহা বিভক্ত করিলেন। তন্মধ্যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সংস্থিত ছিল। লক্ষ্মীর সহিত কেশব তাহা পালন করিতে লাগিলেন। গৌরীর সহিত মহেশ্বর তাহা সংহার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অনন্তকালে অনন্ত জগৎ সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, বিরাম নাই। সকল পুরাণেই এক কথা বলিয়াছেন। আমাদের বুদ্ধির তারতম্য জন্য বিভিন্ন অর্থ করিয়া ভ্রান্ত হই। নতুবা ঈশ্বরের কন্যা গমন, ইন্দ্রের অহল্যা হরণ, বৃহস্পতির মমতা গ্রহণ ইত্যাদির কদর্থ ধারণ করিয়া কষ্ট পাই কেন?

এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। তাঁহার লীলায় অনন্ত দেব-দেবীর উদ্ভব ও বিলয় ঘটিতেছে। কেবল তিনিই মাত্র অক্ষয়, অচ্যুত, নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জন। অনন্ত সমুদ্রের অনন্ত স্থানে অনন্ত বরফদ্বীপ জন্মিতেছে, কিছুকাল ভাসিতেছে, পরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া সেই অনন্ত সমুদ্রের কোলেই বিলীন হইয়া যাইতেছে।

মহাকবি কালিদাসের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

লেখক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এল।

ভোজরাজের সভামধ্যে কেহ শ্রুতিধর, কেহ বা দ্বি-শ্রুতিধর, কেহ বা ত্রি-শ্রুতিধর এমত কতকগুলি পণ্ডিত ছিলেন। রাজা তাঁহাদের পরামর্শে এরূপ পণ করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি নূতন কবিতা শ্রবণ করাইতে পারিবেন তিনি লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন। পরন্তু যে কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নূতন কবিতা রচনা করিয়া আনিতেন তাঁহারা সকলেই শ্রুতিধর দ্বি-শ্রুতিধর পণ্ডিতগণের প্রতারণায় উপহাসাস্পদ হইয়া পলাইতে লাগিলেন। এইরূপে রাজা যে কতশত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-মণ্ডলীর অবমাননা করিতে লাগিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। পরে একদিবস কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাস ইহা শ্রবণ করিয়া রাজ-সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! আমি একটী নূতন কবিতা রচনা করিয়া আনিয়াছি, শ্রবণ করুন। তখন রাজা বলিলেন, "আপনার কি নূতন কবিতা আছে বলুন।" ইহা বলিয়া রাজা শ্রুতিধর পণ্ডিতগণকে উহা শ্রবণ করিতে আদেশ করিলেন। তখন রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কালিদাস কবিতা পাঠ করিলেন।

স্বস্তি শ্রীভোজরাজ ত্রিভুবন বিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুতা কোটির্ম্মদীয়া।
তাং ত্বং মে দেহি তূর্ণং সকলবুধগণৈর্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ
নবা জানন্তি কেচিৎ নবকৃতিমিতিচেৎ দেহি লক্ষং ততোমে।

অনুবাদ—হে ভোজমহীপতি! আপনি ত্রিভুবন-বিজয়ী ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ, সত্য-পরায়ণ, আপনার মঙ্গল হউক। আপনার স্বর্গীয় পিতা মহাশয় আমার নিকট

নিরানব্বই কোটি মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা ত্বরায় আমাকে প্রদান করিয়া পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হউন। আমার একথা যে সত্য, তাহা আপনার সভাস্থ সমস্ত পণ্ডিত বিদিত আছেন। আর যদি উঁহারা অজ্ঞাত থাকেন তবে এ আমার নূতন কবিতা হইল,আপনার পণ অনুসারে আমাকে লক্ষ মুদ্রা প্রদান করুন। এই কথা শ্রবণ করিয়া সভাস্থিত সকল শ্রুতিধর পণ্ডিতগণ ও নৃপতি সকলেই অধোবদন হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার পৈতৃক একজন বৃদ্ধ অমাত্য (বা পণ্ডিত) বলিলেন, "মহারাজ ! আপনি চিন্তিত হইতেছেন কেন ? আপনার স্বর্গীয় পিতামহাশয়ের কৃত সেই তাম্র পাত্রে ক্ষোদিত কবিতাটি ইহাঁকে প্রদান করুন।" তখন রাজা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া তাহা আনয়ন পূর্ব্বক বলিলেন, "মহাভাগ ! আমার পিতৃদত্ত এই স্থাপিত সম্পত্তি তাঁহার ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত আপনি গ্রহণ করুন।" এই বলিয়া তাঁহাকে উহা অর্পণ করিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল—

"আমার রাজ ভবনের সম্মুখস্থিত উদ্যানের দক্ষিণাংশে যে একটি অতি প্রকাণ্ড তাল বৃক্ষ আছে তাহার মস্তকোপরি আষাঢ় মাসের মধ্যাহ্ন কালে আমি প্রচুর স্বর্ণ মুদ্রা রাখিলাম। আমার বংশে আমার যে কেহ উত্তরাধিকারী থাকিবেন তিনি ইহা গ্রহণ করিবেন।"

ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া কালিদাস কতিপয় লোক সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিলেন। সেই তাল বৃক্ষের মস্তকের ছায়া, আষাঢ় মাসের মধ্যাহ্নকালে কোন্ স্থানে পতিত হয় ইহা নির্ণয় করিয়া লোক দ্বারা সেই স্থান খনন পূর্ব্বক প্রচুর স্বর্ণ মুদ্রা পাইলেন। তখন কালিদাস তাহা গ্রহণ করিয়া রাজসভায় গমন করিলেন. নিরানব্বই কোটি মুদ্রা আপনি লইলেন এবং অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি রাজাকে প্রত্যর্পণ করিলে রাজা ও সভাসদ্‌গণ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

তখন কবিকুলতিলক কালিদাস, রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভোজেন্দ্র ! আপনি এইরূপে যে কতশত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর অবমাননা করিয়াছেন এবং কতশত কবিগণ আপনার সভা হইতে অবমানিত, অপ্রস্তুত হইয়া আপনাকে হেয় বোধে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক সজল-নয়নে অধোবদনে প্রস্থান করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার যে কত মহাপাতক হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, অতএব আপনাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য আমি স্বয়ং আপনার নিকট আসিয়াছি। আমার অর্থের লোভ নাই, আমি আপনার সমীপে এই সকল ধন, অনাথ দীন দরিদ্রদিগকে স্বহস্তে প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া

সেই সকল ধন রাজসমক্ষে অনাথদরিদ্রগণকে অকাতরে বিতরণ করিলেন। তখন রাজা তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "মহাত্মন্ ! আমি এতদিন এই শ্রুতিধর অতি-পণ্ডিতগণের প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া অতিশয় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, এক্ষণে আপনি আমায় উপদেশ প্রদান করুন যে আমি কি করিলে এ মহাপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিব।" তখন কালিদাস বলিলেন, "মহারাজ ! আপনি যে তজ্জন্য এক্ষণে অনুতাপ করিলেন এবং এতদিনের পর উহা যে দুষ্কর্ম্ম বলিয়া আপনার বোধ হইয়াছে তাহাতেই আপনার সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আপনি শ্রুতিধর পণ্ডিতগণের বিদ্যা বুদ্ধি সকলই জ্ঞাত হইয়াছেন তাহাতেই আমি যৎপরানাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতঃপর এইরূপ কর্ম্ম আর কখন করিবেন না। আর এই সমস্ত ধন আপনি দেশ-বিদেশস্থ সমস্ত পণ্ডিতগণকে অতি সমাদরে আমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া ভক্তি ও অনুনয় সহকারে সকলকে প্রদান করুন, তাহা হইলেই আপনি এই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।" তখন রাজা তাহাই করিলেন এবং কবিকুলচূড়ামণি কালিদাসের চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক বিধিমতে তাহার সন্তোষ সাধন করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। তিনিও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপ কিংবদন্তি আছে যে, আর এক সময় ভোজবংশীয় কোন রাজার সভাপণ্ডিত শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহাশয় রাজাকে এইরূপ সত্যে বদ্ধ করেন যে, কোন ব্যক্তি মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি অগ্রে আচার্য্য মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া রাজার সাক্ষাৎ পাইবেন না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সভাপণ্ডিত মহাশয়ের অপেক্ষা যিনি অল্প বিদ্বান্ তাহাকেই তিনি রাজার নিকট লইয়া যাইতেন, নচেৎ অপর কোন লোক বিদ্বান্ হইলেও রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইত না। এই কথা শ্রবণ করিয়া কবিকুলশ্রেষ্ঠ কালিদাস ছদ্মবেশে শঙ্করাচার্য্যের সান্নিধ্যে আসিয়া বলিলেন, "পণ্ডিতবর ! আমি একটী আশীর্ব্বাদ কবিতা রচনা করিয়া আনিয়াছি, আপনার অনুমতি হইলে ভোজ মহীপতির সহিত সাক্ষাৎ কার।" ইহা শ্রবণ করিয়া আচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "কি কবিতা আপনার আছে পাঠ করুন।" তখন ছদ্মবেশী কালিদাস নিম্নস্থিত কবিতা পাঠ করিলেন।

অস্থিবৎ দধিবচ্চৈব শঙ্খবদ্ধবলত্বথা।
রাজন্ তব যশো ভাতি পুনঃ সন্ন্যাসিদণ্ড বৎ॥

অনুবাদ।—হে ভোজ মহীপতি ! আপনার যশঃ অস্থির ন্যায়, দধির ন্যায়,

বকের ন্যায় এবং সন্ন্যাসীর দন্তের মত শোভা পাইতেছে।—এই কবিতা শ্রবণ করিয়া শঙ্করাচার্য্য মনে স্থির করিলেন যে, ইহার রচনা শুনিয়া বোধ হইতেছে, ইনি তাদৃশ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নহেন। অতএব ইহাকে রাজসমীপে লইয়া যাইতে বাধা কি আছে? এইরূপ চিন্তা করিয়া আচার্য্য মহাশয় তাহার সহিত কবিতা হস্তে রাজসভায় গমন করিলে তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল—

রাজন্নভ্যুদয়োঽস্তু শঙ্করকবে! হস্তে কিমাস্তে তব,
শ্লোকঃ কস্য তবৈব কীর্ত্তিরচনা তৎ পঠ্যতাং পঠ্যতে॥

অনুবাদ।—শঙ্করাচার্য্য বলিলেন. হে মহারাজ! আপনার শ্রীবৃদ্ধি হউক। রাজা বলিলেন, শঙ্করকবি! তোমার হস্তে উহা কি রহিয়াছে? শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, উহা শ্লোক। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, উহাতে কোন্ বিষয় লিখিত আছে? শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, ভবদীয় কীর্ত্তি রচনা। রাজা বলিলেন, তবে পাঠ কর। ইহা শ্রবণ করিয়া ছদ্মবেশী কালিদাস রাজসমীপে অগ্রসর হইয়া "আমি পাঠ করিতেছি" এই কথা প্রয়োগ পুর্ব্বক অধস্তন কবিতা পাঠ করিলেন।

কিন্তাসামরবিন্দ সুন্দর দৃশাং দ্রাব চামরান্দোলনা
দুদ্বেল্যদ্ভুজবল্লি কঙ্কণরণকোরক্ষণং বার্য্যতাং॥

অনুবাদ।—কালিদাস বলিলেন হে ভোজেন্দ্র! আমি কবিতা পাঠ করিতেছি কিন্তু আপনার এই চামর-বীজনকারিণী কমল-লোচনাগণের বাহুলতা বীজন কালে আন্দোলিত হওয়াতে কঙ্কনাভরণাদির যে শ্রুতিসুখকর মনোহর-ধ্বনি হইতেছে উহা ক্ষণকাল নিবারণ করুন।

রাজার আদেশ অনুসারে চামর-ব্যজনকারিণীগণ ক্ষণকাল বিশ্রাম করিল। ছদ্মবেশী কালিদাস অধস্তন কবিতা পাঠ করিলেন।

মহারাজ শ্রীমন্ জগতি যশসা তে ধবলিতে
পয়ঃ পারাবারং পরমপুরুষোঽয়ং মৃগয়তে।
কপর্দ্দী কৈলাসং করিবর মথোঽয়ং কুলিশভৃৎ
কলানাথং রাহুঃ কমল ভবনোঽয়ং সমধুনা॥ ৮৯॥১৭৩॥

অনুবাদ।—হে শ্রীমন্ মহারাজ! আপনার যশেতে সংসারস্থিত সকল বস্তু শ্বেতবর্ণ হইলে সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আপনার ক্ষীরোদ সমুদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কারণ তখন সকল সাগরই শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। জটাধারী মহাদেব ভ্রমবশতঃ আপন রজতগিরি কৈলাসের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কুলিশধারী দেবরাজ আপন শুভ্রবর্ণ ঐরাবত হস্তীকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

রাহু কলানিধি চন্দ্রকে এবং পদ্মযোনি ব্রহ্মা হংস-বাহনকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অতএব মহারাজ! অন্যের কথা আর কি বলিব, ইন্দ্রাদি দেবগণের এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে।

তখন রাজা পূর্ব্বমুখে ছিলেন, কবিতা শুনিয়া পশ্চিমাভিমুখ হইলেন, কালিদাসও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া পুনর্ব্বার কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন।

নীরক্ষীরে গৃহীত্বা সকল খগপতিং যাতিনালৈকজন্মা,
তক্রং ধৃত্বা করাব্জে সকল জলনিধিং চক্রপাণির্মুকুন্দঃ।
সর্ব্বানুদ্ধৃত্য শৈলান্ দহতি পশুপতি র্ভালনেত্রেনপশ্যন্
ব্যাপ্তৈতৎকীর্ত্তিরাশৌ সকল বসুমতীং ভোজরাজক্ষিতীন্দ্র!

অনুবাদ। হে ক্ষিতীন্দ্র ভোজমহীপতি! আপনার কীর্ত্তি-রাশিতে সমস্ত বসুমতী ব্যাপ্ত হইলে দেবগণ স্ব স্ব বাহনাদি নির্ণয়ে অসমর্থ হইলেন, তখন কমল-যোনি ব্রহ্মা স্বকীয় বাহন হংসকে নির্ণয় করিবার মানসে দুগ্ধ জল মিশ্রিত করিয়া ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় পক্ষীগণের মুখে এই অভিপ্রায়ে ধরিতে লাগিলেন যে, যে তাঁহার বাহন হইবেক, সেই জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে অক্লেশে দুগ্ধ ভাগ আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিতে পারিবেক, অন্যে পারিবেক না, তাঁহার হংসের এই একটী অসাধারণ গুণ ছিল। আর চক্রপাণি মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ আপন করপদ্মে তক্র (দম্বল) লইয়া যাবতীয় সমুদ্রে এই অভিপ্রায়ে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার শয়ন স্থান ক্ষীরোদ সাগর দম্বল ক্ষেপণ করিবামাত্র জমিয়া যাইবে। অপিচ পশুপতি আপন কৈলাসপর্ব্বত নির্ণয় করিবার মানসে সকল পর্ব্বতকে উদ্ধৃত করিয়া এই অভিপ্রায়ে ললাট-নেত্রে দর্শন করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিলেন যে তাঁহার কৈলাসপর্ব্বত রজতনির্ম্মিত সুতরাং ধাতুময় বস্তু অগ্নি-নেত্রস্পর্শে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় ভস্ম না হইয়া দ্রবীভূত হইবে তাহা দেখিয়া তিনিও কোন্ পর্ব্বতটী কৈলাস তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন।

তখন রাজা উত্তর মুখে উপবেশন করিলে কালিদাসও তদভিমুখে গমন পুর্ব্বক পুনরায় নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিলেন।

শ্রীমদ্রাজশিখা মনে তুলয়িতুং ধাতা ত্বদীয়ং যশঃ
কৈলাসঞ্চ নিরীক্ষ্য তত্র লঘুতাং তৎ পূর্ত্তয়ে পর্য্যধাৎ।
উষ্ণানং তদুপর্য্যমা সহচরং তন্মূর্দ্ধ্নি গঙ্গাজলং
তস্যাগ্রে ফণিপুঙ্গবং তদুপরিস্ফারন্ সুধাদীধিতিং॥

অনুবাদ।—হে শ্রীল রাজচূড়ামণি! বিধাতা আপনার অনুপম যশ পরিমাণ করিবার মানসে তুলাদণ্ড আনায়ন পূর্ব্বক এক প্রান্তে আপনার যশোরাশি আর অপর প্রান্তে প্রথমে রজতময় কৈলাস পর্ব্বত স্থাপিত করিয়া দেখিলেন যে তাহাও অত্যন্ত লঘু বোধ হইল তাহা পূরণ করিবার জন্য তদুপরি শ্বেতবর্ণ বৃষ স্থাপন করিলে তাহাও লঘু বোধ হইল, পরে তদুপরি উমাসহ শ্বেতবর্ণ মহাদেবকে স্থাপন করাতে লঘু বোধ হইল। পরে তাঁহার মস্তকোপরি শুভ্রবর্ণ গঙ্গাজল তাহাও লঘু বোধ হওয়াতে তাঁহার অঙ্গে ধবলবর্ণ ফণিগণকে স্থাপিত করিলেন তাহাও লঘু বোধ হওয়াতে তাঁহার ললাট দেশে শুভ্রবর্ণ সুধাংশু মণ্ডলকে স্থাপন করিলেন, তাহাও আপনার যশোরাশির তুল্য হইল না।

তখন রাজা দক্ষিণাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিলে কালিদাসও তদভিমুখে গমন করিয়া পুনরায় এই কবিতাটী পাঠ করিলেন।

অতারি কপিনা পুরা পুনরমারি মর্য্যাদয়া,
অপায়ি মুনিনা পুরা পুনরদাহি লঙ্কারিণা।
অমিন্থ সুরবৈরিণা পুনরবন্ধ রক্ষোরিণা,
ক্ব নাম বসুধাপতে তব যশোঽম্বুধিকাম্বুধিঃ॥

অনুবাদ। হে বসুধাপতি ভোজেন্দ্র! আপনার যশোরূপ মহাসাগরই বা কোথায়, আর সামান্য সাগরই বা কোথায়? কারণ, আপনার যশঃ-সাগরের সহিত এ সাগরের তুলনা হইতে পারে না, কেননা অতি সামান্য জীব বানরও পূর্ব্বে যাহাকে অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করিয়াছিল, এবং সীমা নির্ণয় পূর্ব্বক পরিমাণ স্থির করিয়াছিল, অতি পূর্ব্বকালে মহর্ষি অগস্ত্য গণ্ডুষ দ্বারা ইহাকে পান করিয়াছিলেন, অসুরেরা ইহাকে অনায়াসে মন্থন করিয়াছিল এবং রাক্ষস-বৈরী রামচন্দ্র ইহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন।

কালিদাসের মুখে এইরূপ সুধাময় চারিটী কবিতা শ্রবণ করিয়া রাজা অধোমুখ হইয়া রহিলেন, এবং কবিকুল-কেশরী কালিদাস মনে করিলেন যে "বোধ হয় আমার এই অমৃতময় শ্লোকগুলি রাজার মনোরঞ্জক হইল না, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কবিতা শ্রবণ করিলে অর্থ প্রদান করিতে হয় এই অভিপ্রায়ে বুঝি রাজা অধোবদন হইলেন, নচেৎ অধোবদনের কারণ কি? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" মনে মনে এইরূপ নানা তর্ক বিতর্ক করিয়া পুনরায় নিম্নলিখিত কবিতা পাঠ করিলেন।

মা গাঃ প্রত্যুপকার-কাতরতিয়া বৈমুখ্যমাকর্ণয়,
শ্রীভোজেন্দ্র বসুন্ধরাধিপ সুধাসিক্তানি সূক্তানি মে।
বর্ণন্তে কতিনাম চার্ণবে নদী ভূগোল বিন্ধ্যাটবী,
ঝঞ্ঝা মারুত শচন্দ্রমা প্রভৃতয়স্তেভ্যঃ কিমাপ্তং ময়া॥

অনুবাদ।—হে পৃথিবীপতি শ্রীভোজেন্দ্র! অমৃত রসাভিসিক্ত আমার কথিত অতি সুন্দর বাক্যগুলি শ্রবণ করুন, প্রত্যুপকার করিবার ভয়ে কদাচ বিমুখ হইবেন না, কারণ আমরা কবি, আমাদের স্বভাব এই যে আমরা সমুদ্র, নদী, পৃথিবী, বিন্ধ্যাটবী, ঝড়, বায়ু, চন্দ্রমা প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া থাকি। তাহাদের নিকট আমরা কি প্রাপ্ত হই? আপনি দান করিবার ভয়ে অধোবদনে রহিলেন কেন! আমি আপনার নিকট কিছুই প্রার্থনা করিতেছি না। আপনি মস্তক উন্নত করুন। এই কথা বলিবামাত্র তখন ভোজ-রাজ কালিদাসের চরণ বন্দনাপূর্ব্বক বলিলেন, "হে কবিকুলাগ্রগণ্য! আমি সেজন্য অধোবদন হই নাই। আমি যে জন্য অধোমুখে রহিয়াছি তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। প্রথমে আমি যখন আপনার কবিতা শ্রবণ করিয়াছিলাম তখনই আমি যে মুখে বসিয়াছিলাম আমার সম্মুখস্থ যাবতীয় ভূমি সম্পত্তি সমস্তই আপনাকে অর্পণ করিলাম সুতরাং দত্ত সম্পত্তিতে দাতার অধিকার নাই ভাবিয়া পুনর্ব্বার মুখ ফিরাইলাম। এইরূপে আপনার সুধাসম কবিতারসে বিমোহিত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ আমার অধিকারস্থিত সমস্ত ভূমি সম্পত্তিই ক্রমে ক্রমে আপনাকে প্রদান করিয়া দেখিলাম যে আর আমার দেয় সম্পত্তি কিছুই নাই সুতরাং অধোবদন হইলাম। এক্ষণে আমি আপনাকে স্বরূপ জানাইতেছি যে ইহার পূর্ব্বে এইরূপ সুধাময় শ্লোক কদাচ আমার কর্ণগোচর হয় নাই, জগতে আপনিই একমাত্র অদ্বিতীয় কবি এবং কবিত্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে ক্ষমা প্রদর্শন পূর্ব্বক অধীনের চির অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি আর আচার্য্য মহাশয়ের প্রবঞ্চনায় কদাচ প্রতারিত হইব না, আপনার নিকট শপথ করিতেছি। তখন কবিকুলতিলক কালিদাস রাজবাক্যে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন॥

———

সংসারীর প্রতি আশার ছলনা।

লেখক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সুখের আশায় সংসার কাননে
আশার ছলনে ছুটে বেড়াই।
রোগ শোক দুঃখ— সিংহ শার্দ্দুলের
চারিদিকে ধ্বনি শুনিতে পাই॥
সর্ব্বাঙ্গ আমার কণ্টকে আকীর্ণ,
দর দর বহে নয়নে জল।
তথাপি ভ্রুক্ষেপ নাহিক আমার,
সুখের আশায় ছুটি কেবল॥
নিবিড় তিমিরে বিজলীর প্রায়,
মাঝে মাঝে আলো হেরি তথায়।
সুখ ভাবি তারে ছুটি তার প্রতি,
পরিশেষে পড়ি দুঃখ-গুহায়॥
ধন্য মহামায়া! কুহক তোমার,
মনের বিকার দিয়াছ বেশ।
পর্ব্বত নেহারি ভাবি মহাসিন্ধু,
সাগরে নেহারি মরুর দেশ॥
বোঝালে বুঝি না শোনালে শুনি না
নাহি সুখ ভবে মানে না মন।
অমৃতের ভাণ্ড ভাবি এ সংসার
সহি দুঃখ, দেখি সুখ স্বপন॥
সুখ বলি কিছু আছে কি জগতে,
ভ্রম এ ধারণা, কিছুই নাই।
ক্ষণেকের তরে দুঃখ অবসান
হয় যদি, কহি সুখ তাহাই॥

নূতন ও পুরাতন।

লেখক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

এস, এস নূতন! তোমাকে নবীন উদ্যমে, পুরাতনকে বিদায় দিয়া, অভ্যর্থনা করিতেছি। তোমার আবির্ভাবে সকলে পুলকিত হইয়া নানাবিধ আয়োজন উদ্যোগ করিয়া তোমাকে বরণ করিতেছে। তোমার আদর, অভ্যর্থনা, যত্ন, খাতির দেখিয়া কত লোকের মনে কত কি হইতেছে। আজ তুমি নূতন বলিয়াই তোমার জন্য এত বিপুল আয়োজন, কিন্তু কাল হইতেই তোমার যত্ন খাতির মর্য্যাদা সম্মান দিন দিন ক্ষুণ্ণ হইয়া বর্ষশেষে তুমি পুরাতন বলিয়া পরিগণিত হইয়া অনন্ত কালস্রোতে বিলীন হইবে। তোমার মতই এম্‌নি যত্ন এম্‌নি খাতির এম্‌নি আদর যত নূতনের প্রারম্ভে ঘটিয়াছিল, আজ সেই নূতন পুরাতনে পরিণত হইয়া অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়াছে। যে রবি যে চন্দ্র পূর্ব্বে গগনে উদিত হইয়াছিল, সেই রবি সেই চন্দ্র ঠিক্ তেমনি ভাবে উদয় ও অস্ত হইবে সত্য, কিন্তু একটু বিভিন্ন রকমের একটু বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ধারায়, তফাৎ এইমাত্র। আজ পুরাতন বিদায় লইয়া নূতনের আবির্ভাব হইল। উদয় ও বিলয় লীলাময়ের রাজ্যের চিরন্তন শাশ্বত প্রথা, নিয়ম বা প্রণালী। ইহা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, চলিয়াছে ও চলিবে। এ নিয়ম পরিবর্ত্তন হইবার নয়।

পুরাতন চলিয়া গিয়াছে সত্য কিন্তু প্রতি পল, দণ্ড, দিন, সপ্তাহ, মাস ও ঋতুতে তাহার কার্য্যের পরিস্ফুট চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এক একটা দিনের কথা মনে হইলে প্রাণ ফাটিয়া অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়, এখনও প্রাণের অন্তস্তলে মর্ম্মন্তুদ যাতনায় অধীর করিয়া ফেলে। এক একটি কথা মনে পড়িলে স্বতঃই মনে প্রশ্ন উদয় হয়, কে এই সকল কর্ম্মের নিয়ন্তা, কিসে এই সকল কর্ম্মভোগ করিতে হয়, কি করিলে এই সকল কর্ম্মের তীব্র তাড়না হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। এক কথায় কিসে কর্ম্মফলখণ্ডন হয়। অনেক কথাই মনে আসে, পুঞ্জ পুঞ্জ ভাব আসিয়া প্রবল তরঙ্গের ন্যায় হৃদয়ে আঘাত করে, শান্ত মনকে অশান্ত করিয়া তোলে। কেন এমন হয়, কিসে এমন হয়, কিছুই স্থির করিতে পারি না। দীনবন্ধো! প্রাণবন্ধো! কৃপাসিন্ধো! কৃপা করিয়া এ সংশয় ছেদন করিয়া দাও। তোমার কৃপা না হইলে কিছুতেই এ জটিল সমস্যার মীমাংসা হইবে না, চিরকাল এই সংশয়ভার বহন করিয়া জীবন কাটাইতে হইবে। এরূপ অপদার্থ জীবনের কি সার্থকতা, প্রভো! তা তুমিই জান।

মানুষ ভাবে অনেক, চিন্তা করে বিস্তর, আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণের স্বপ্ন দেখে প্রতিনিয়ত, কিন্তু তাহার সার্থকতা কিসে ও কোথায় তা সে নিজেই জানে না, বুঝে না, তা অপরকে কি জানাইবে বুঝাইবে। অনেক সময় সে সবজান্তা হইয়া তোমার অনন্ত অসীম অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিবার প্রয়াস পায়, এতটা স্পর্দ্ধা মানুষ করে। এতটা স্পর্দ্ধা সে রাখে, ইহাও তোমারি লীলা। এ লীলার রহস্য, এ লীলার গূঢ় প্রহেলিকা ভেদ করিতে পারে এমন সাধ্য কার আছে দয়াময়। ইহা বড়ই জটিল সমস্যা, ইহার সমাধান করিবার জন্য ষড়-দর্শন কুল নির্ণয় করিতে অক্ষম। অনন্ত শাস্ত্রের সামর্থ্যে কুলায় না, তা ক্ষুদ্র জ্ঞান-গরিমা ভূষিত মানবে কি করিবে।

হে অনাদ্যনন্ত দেব। তোমার অনন্ত বিশ্বে অনন্ত লীলা প্রতিনিয়ত প্রবাহিত। ঊর্ম্মির পর ঊর্ম্মি, তার পর ঊর্ম্মি, আবার তারপর ঊর্ম্মি, কে তাহার নির্ণয় করে? তুমি কৃপাকণা বিতরণ না করিলে কিছুই বুঝিবার সাধ্য নাই। চাহি না কিছু বুঝিতে, চাহি না কিছু জানিতে, যাহাতে একবিন্দু কৃপালাভ করিতে পারি তাহার উপায় করিয়া দাও দয়াময়। তোমার দয়ায় সকলি সম্ভবে। তাই কৃতাঞ্জলিপুটে দীনাতিদীন অধম কৃপাকণা যাচিতেছে, দয়া করিয়া অধমের প্রার্থনা পূর্ণ কর দয়াময়! তোমা ভিন্ন আর কেউ নাই, তুমিই একমাত্র অগতির গতি, অশরণ-স্মরণ। জয় জগদীশ হরে।

গীত।

বিভাস—একতালা।

কি বলিব আর তুমি হে আমার, একমাত্র সহায় এ বিপদে,
কারেও দেখি না, কেহ যে আসে না, ভাসি আমি একা সমুদ্রে।
তোমার সেবায় হ'লে আমার মতি, চলে যাবে সব ভাবনা ভীতি,
আনন্দে রব, কারেও না ডরাব,
চিরদিন থাকিব তোমার অভয় পদে।
ক্ষুদ্রতা সব চলে যা'বে, সকল মানুষ আপনার হবে,
ভূমানন্দে প্রাণ ভাসিবে, সকলেই আমায় হাঁসাবে,
কত সুখ শান্তি আসিবে এ হৃদে।
এবার তোমার চরণ নিত্য পূজিব, কার কথা আর না শুনিব,
সদা তোমারে দেখিব, তোমায় লয়ে থাকিব,
সঁপিব এ প্রাণ তোমার শ্রীপদে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গল বা কালকেতু।

চতুর্থ অঙ্ক।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ কুটীর। শান্তশীল ও সদানন্দ।

শান্তশীল। গুরুদেব। আর কত দিন রবে দীন আশায় আশায়?
দিন চলে যায় প্রবাহিনী-প্রবাহ যেমন
হ'ল না ত ব্রহ্ম দরশন!
বৃথা আর জীবন ধারণ কেন? হেরিতে হেরিতে
তব চরণ কমল, প্রাণত্যাগ করিব এখন।

সদানন্দ। শান্ত হও শান্তশীল!
ত্যজ দুঃখ—পাবে দরশন।
একমনে মহামন্ত্র জপ নিশিদিন,
পাবে তাঁর জ্যোতিঃ-বিন্দু ক্ষণিক আলোক
ভ্রূর মাঝে। আজ্ঞা চক্র তথা, মন রাখ অনুক্ষণ তায়।

শান্ত। ক্ষণিক আলোর রেখা করেছি দর্শন
ভ্রূর মাঝে। কিন্তু তথা নাহি মদনমোহন রূপ!
দয়াময় কৃপা করি দেখাও তাঁহারে
এ মিনতি চরণে তোমার (পদ ধারণ)।

সদা। জাগ মা জাগ মা কুণ্ডলিনি!
প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা স্বয়ম্ভুবেষ্টিতা
উঠ ঊর্দ্ধে আরো ঊর্দ্ধে আজ্ঞা চক্র মাঝে।
(শিষ্যের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া)
হের বৎস মদনমোহন!

শান্ত। আহা মরি মরি কিবা অপরূপ রূপ!
রূপের আলোকে আঁখি ধাঁধিছে কেবল!
নব-জল-ধর-কান্তি শান্ত সুশোভন!
চরণে বাজিছে কিবা মধুর নূপুর!

গলে দোলে বনমালা শিরে শিখীপাখা !
অলকা তিলকাবলি শ্রীমুখেতে আঁকা !
বাজাও মধুর বাঁশী রাধা রাধা বলি
আনন্দের সিন্ধুমাঝে ডুবে যাক্ মন।

(নয়ন মুদিয়া অবস্থান)

সদানন্দ। থাক বৎস এইভাবে সমাধি-মগন।
আনন্দের সিন্ধুমাঝে থাক নিমজ্জিত।
ইন্দ্রিয়নিচয় হোক লয় রূপের সাগরে,
সমাধির পরে যদি পাও পুনঃ মন
যথায় বিষয়-বুদ্ধি, ভেদ-দরশন—
ব্রহ্মে জীবে, তবে যেয়ো ভ্রান্তি নিরসনে
কলিঙ্গভবনে, পাবে দেখা সাকারা জননী।

(এস্থান)।

ব্যাধ-বালিকা বেশে ভগবতীর প্রবেশ।

গান।

ভগবতী। আমার রূপে আমি ভুলি, ভুলাই আমি জগৎ-জনে।
কভু শ্যামা অতি ভীমা, কভু থাকি রাধা সনে ॥
একা আমি অদ্বিতীয়া
কে জানে আমার মায়া
নানাভাবে ধরি কায়া পুরুষ প্রকৃতিগণে।
অস্তি ভাতি প্রিয় আমি,
সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ নামী
জগৎ-কারণ-স্বামী প্রকাশিত যোগীর মনে ॥

(শান্তশীল গান শুনিয়া নয়ন উন্মীলন করিলেন, এবং একদৃষ্টে বালিকারূপ দেখিতে লাগিলেন)।

শান্ত। একি একি কোথা সেই রূপ ?
শ্যাম-জলধর কান্তি কোথায় লুকাল ?
পরিবর্ত্তে তার—

আহা মরি মরি ! সর্ব্বরূপসার
যার নাহি উপমা ভাষায়,
ধরা ভেসে যায় রূপ স্রোতে
সেই রূপ সম্মুখে বিরাজে।
অন্তরেতে সাজে
শ্যাম নটবর কান্তি ভুবনমোহন।
(প্রকাশ্যে) কে তুমি ?

বালিকা। (সুরে) চিনে নাও জ্ঞানের চোখে,
কত বলে কতই লোকে,
কভু পুরুষ কভু নারী—
ধাঁধা লাগাই লোকের মনে।
আমার রূপে আমি ভুলি, ভুলাই আমি জগৎ-জনে।

শান্ত। এ কি স্বর ? এ কি সুমধুর স্বর ?
সপ্তস্বরা শুনিয়াছি কাণে,
শুনিয়াছি বসন্তের কৌমুদী নিশিতে
রসাল কুঞ্জের মাঝে কোকিলের গান,
কিন্তু প্রাণ মন কাড়ি লয় এ গানে,
কি জানি কি অলসতা আনে
সকল ইন্দ্রিয় লুপ্ত সঙ্গীতে বালার।
(প্রকাশ্যে)
তুমি কি নারী না নর ? তোমার স্বরূপ দেখাও দেখি ?

বালিকা (সুরে) আমার স্বরূপ কেবা জানে ?
অরূপের রূপ হের প্রাণে,
নারী কি নর বুঝি না তাই
নানা বেশে ত্রিভুবনে।
আমার রূপে আমি ভুলি, ভুলাই আমি জগৎ-জনে।

(অন্তর্দ্ধান)।

শান্ত। তা বটে, তা বটে মা ! তোমার স্বরূপ কে জানে ? তুমি কখন দক্ষরাজ-দুহিতা সতী, কখন হিমবদ্দুহিতা গৌরী উমা, কভু

শ্যাম, কভু শ্যামা। ওমা হররমা ! তোমার বিশ্ব-বিমোহিনী মায়ায় জগৎ মুগ্ধ, আমি কোন্ কীটাণুকীট তোমার স্বরূপ বোঝ্‌বার কি সাধ্য দেবি !

(আকাশবাণী শুনিয়া)

কি বলিলে ? কি বলিলে ?
সাকারা জননী রাজে কলিঙ্গভবনে ?
ধন্য ধন্য কলিঙ্গ ঈশ্বর
ধরাধামে পুণ্যবান নর
তাই মাতা বিরাজিতা কলিঙ্গভবনে।
যাব তথা হেরিতে জননী
দেখা দিও দয়াময়ি ! শঙ্করমোহিনি ! (প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

কলিঙ্গ রাজসভা।

রাজা, মন্ত্রী, বিদূষক প্রভৃতি স্ব স্ব স্থানে আসীন।

নর্ত্তকীগণের গান।

নয়নে নয়নে, রেখেছি গোপনে,
তুমি দেখ সখা, আমি দেখি।
নিয়েছ সরবস, করেছ অবশ,
আমার বলিতে কি আছে বাকি ॥
দরশে হয়েছ হৃদয় মন, পরশে অবশ ইন্দ্রিয়গণ,
আগে ত এমন হত না বেদনা,
যে জ্বালায় জ্বলিয়া মরিয়া থাকি ॥

(বিদূষক নানাবিধ ভঙ্গী করিতেছে)

কি বলে বুঝাব হৃদয় যাতনা
তুমিত বুঝিবে না আমার এ বেদনা
বলহে সখা, শুধু মন রাখা "ভালবাসি" কথা বল নাকি ?

বিদূষক। আরে তাও কি হয় ? প্রকৃতই ভালবাসি। চলুক চলুক—

মন্ত্রী। নর্ত্তকীগণ। তোমরা বিদায় লাভ কর। এখন রাজকাজ আরম্ভ হবে।

বিদূষক। এই রাজকাজের চাপে মারা গেলাম। এক দণ্ড সুস্থ মনে রমণীসনে প্রেমালাপনে কালযাপন কর্ত্তে পেলেম না।

(শিবাদত্তর মাথায় কাঁচকলা, পুঁইশাক কচু প্রভৃতি দিয়া ভাঁড়ুদত্তর প্রবেশ)

এই যে ! আগচ্ছ আগচ্ছ কাঁচা রম্ভা—ভাগ্যে আজ অষ্টরম্ভা।

ভাঁড়ুদত্ত। জয় পৃথ্বীপতি কলিঙ্গনাথের জয়।

শিবাদত্ত। (ঝুড়ি নামাইয়া) ম—ম—ম মহামহিম—মহিমার্ণব—

বিদূষক। শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীশ্রী—ব'লে যাও।

শিবাদত্ত। ক—ক—ক—কলিঙ্গনাথের জয় হোক্।

বিদূষক। এরই মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ ফেল্‌লে হে ! এখনও যে বহুৎ বাকী রৈল ? প্রবল প্রতাপান্বিত সর্ব্বগুণ-বিমণ্ডিত বল।

শিবাদত্ত। প্র—প্র—প্র—প্র—

বিদূষক। প্র পরা অপ সম নি অব নির দুর্—বলে যাও কুড়িটি উপসর্গ। তোমার ঝুড়িতে রাজভেট আছে বুঝি ?

ভাঁড়ুদত্ত। আজ্ঞে হাঁ, সামান্য কিঞ্চিৎ ফলমূল।

বিদূষক। তা বেশ করেছ, কয়দিন ধরে রাজার পাত্‌লা দাস্ত হচ্ছে, কাঁচকলার ঝোলেই দাস্ত আঁটিবে মনে হয়। কিন্তু ঐ সঙ্গে এক কাঁদি মর্ত্তমান পাকা রম্ভা আন্‌লে ব্রাহ্মণ ভোজনে লেগে যেত।

শিবাদত্ত। ক—ক—কলার ম—ম—মধ্যে ম—ম—মর্ত্তমান কলাই ভা—ভা—ভালো ম—ম—মশায়।

বিদূষক। যদি দই মণ্ডার সঙ্গে সরু মর্ত্তমান চিপিটক যোগ হয়, তা ভাঁড়ুদত্তের ইচ্ছাই সব হয় কি বল হে দত্তজা ?

ভাঁড়ুদত্ত। আজ্ঞে ওতো সামান্য কথা। বর্ত্তমানে অধীনস্থ দুস্থ বিপর্য্যয়স্ত ভাঁড়ুদত্ত যদি মহামহিমের কৃপা করুণায় এই রাজ্য মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত সন্নিহিতো ভব হন, তবেই এর কথা।

রাজা। কিবা অভিপ্রায় তব বল প্রকাশিয়া।

ভাঁড়। বহুদিন তব রাজ্যে করিছি ভোজন
সৈন্ধব লবণ গুঁড়া ; তাই প্রভু আজি
আসিয়াছি মনোব্যথা প্রকাশ করিতে
তব পদে। একচ্ছত্র রাজা মহারাজ!
কে না জানে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মধ্যেতে
কলিঙ্গ রাজের কথা? কিন্তু এক ব্যাধ,
যার বাপ পিতামহ রেখেছিল এক
ধনুঃ, আর তিন কাঁড়, সেই হল হায়,
একচ্ছত্র মহারাজ গুজরাট বনে
কারে নাহি গণে ধনমদে।

রাজা। এ কি শুনি মন্ত্রিবর! গুজরাট বনে
ব্যাধ রাজা হইল কেমনে?
সংবাদ কি সত্য ভাঁড়ু? অসম্ভব এ যে।
একচ্ছত্র মহারাজ আমি বর্ত্তমানে?

ভাঁড়ু। নিমক ভোজীর দলে আছে বহুজন
কিন্তু মহারাজ! নিমকের মান রাখে
হেন ভৃত্য নাহি একজন রাজ্যমাঝে।
নতুবা নিকটে এত বিভ্রাট ঘটিল
কেহ নাহি খবর লইল একবার?
ছারখার করিবে কলিঙ্গ মহারাজ!
এ অগ্নি প্রবল হলে, এখনও সতর্ক
থাকি করুন রক্ষণ।

রাজা। ছিঃ ছিঃ মন্ত্রি! একি কথা শুনিলাম এবে?
রাজ্যে নাহি একজনও বিশ্বাসী কিঙ্কর?
কেন এত দ্বারবান, পদাতিক, চর
রাজ্যের সংবাদ নাহি রাখে কোনজন?

বিদূষক। ওরা খায় জলরুটি নিমক, মরিচ
জেরাইসা দহি সঙ্গে ; মনোরঙ্গে
খাটিয়া পাতিয়া সুর করি বলে সবে
"কাঁহা মেরী হনুমতী জরু"— (সুর করিয়া গাইল)

ভাঁড়ু। রাজ-দত্ত বৃত্তিভোগী কোটালের দল
সমস্ত রজনী যাপে প্রেয়সীর কোলে।
ভোর বেলা রণগস্তি হুই হাই করি
জানায় সজাগ কত হায় রে কোটালী!

মন্ত্রী। (ভাঁড়ুর প্রতি)
গুজরাটে কোন্ ব্যাধ স্থাপিল নগর?
কেবা সেই মহাবীর কহ বিবরিয়া।

ভাঁড়ু। ধর্ম্মকেতু নামে ব্যাধ ছিল গুজরাটে
অত্যন্ত ধার্ম্মিক, শান্ত, তাঁহার তনয়
মহাবীর কালকেতু হ'ল ধনবান্
রাতারাতি ; কাটিয়াছে গুজরাট বন
বসিয়াছে বহু প্রজা তাহার নগরে।
এক রাজ্যে দুই রাজা শোভা নাহি পায়।
বিশেষতঃ এ রাজার খ্যাতি পৃথ্বীময়
ছুটিয়াছে। একচ্ছত্র কলিঙ্গ ঈশ্বর
তাঁর প্রতিবাদী ব্যাধ কালকেতু?
যার বাপ্ জালদাড় ধনুঃশর লয়ে
মারিত বিহঙ্গগণে। তার পুত্র আজ—
অহঙ্কারে সরা জ্ঞান করিছে ধরণী।

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি)
সন্ধান করিয়া এর কর প্রতীকার
মন্ত্রীবর! অবহেলা করিলে ইহারে
ভবিষ্যতে কলিঙ্গেতে আসিবে নিশ্চয়।
(ভাঁড়ুর প্রতি)
পরম সুহৃদ্ তুমি, শুনায়ে আমায়
এ সংবাদ, উপকার করিয়াছ, যাও
তোমা পাত্র মধ্যে করিয়া গণন
স্থান বৃত্তি জায়গীর করিনু প্রদান। (রাজার প্রস্থান)

ভাঁড়ু। কৃতার্থ হইনু প্রভু অপার করুণা

দেখাইলে মোর প্রতি। প্রাণপণে আমি
যথাসাধ্য রাজকার্য্যে স পিনু এ মন!

বিদূষক। কাঁচকলাগুলো কি হবে হে! এমন উপাদেয় রাজভেট ত আমি দেখিনি। আর এই পঞ্চমুখী কচু; এ যেন সেই সমুদ্র মন্থনে স্বয়ং ধন্বন্তরি প্রভু যে দগ্ধ কচু ভাণ্ড কাঁধে নিয়ে উত্থিত হয়েছিলেন তারই বংশধর! এঁর সম্বন্ধে আমার কবিতা দেবী কণ্ঠ পর্য্যন্ত আগমন করেছেন বলব?

শিবা। ব—ব—ব—বলুন কে—কেন্‌নে—শু—শু—নি।

বিদূষক। (সুরে) ও মন কচু পুঁই চিন্তা কর অনুদিন।
আর ওর সঙ্গে মিশিয়ে দাও কিছু কিঞ্চিৎ চিংড়ি মীন॥
কচুর সঙ্গে কলা পোড়া, এ ব্যঞ্জনের নাইকো জোড়া
ভাত উড়ে যায় সরা সরা

(শিবাদত্তর দন্ত বিকাশ ও নৃত্য)

বাহবা বাহবা ভাই!
ও মন ভাত উড়ে যায় খোরা খোরা
একটুকুও রয় না চিন্।

মন্ত্রী। (সহাস্যে) ধন্য ব্রাহ্মণ! আপনার কবিত্ব!

বিদূষক। মন্ত্রী মশায়! কবিতা আর বনিতা কিনা ইস্ত্রী, এরা নিজে থেকে না এলে সুখ শান্তি থাকে না। বল পুর্ব্বক এদের আন্‌লে "ধৃষ্টা ঘৃষ্টা বিমর্দ্দিতা।" আমার কবিতা স্বভাব সুখে আসেন কিনা, তাইতে এত মিষ্টি!

শিবা। তা—তা—বটে! এ—এ—এমন গা—গা—গান, আ—আ—আমি জন্মে শু—শু—শুনিনি।

বিদূষক। আবার নাচ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে নাকি?

শিবা। (হাসিয়া) এ—এ—এজ্ঞে।

মন্ত্রী। না না আর নয়। ওহে কোটালগণ, তোমরা অদ্যই ছদ্মবেশে গুজরাটে গমন কর। এবং কালকেতুর রাজ্য পরিদর্শন করে যথাযথ সংবাদ জ্ঞাপন করবে। যাও অশ্বারোহণে সত্বর প্রস্থান কর। (কোটালগণ "জয় কলিঙ্গ মহারাজের জয়" বলিয়া প্রস্থান করিল)। চলহে বিদূষক, আমরাও প্রস্থান করি।

(সকলের প্রস্থান)।

(ক্রমশঃ)

জন্মভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৬শ বর্ষ } ১৩৩৭ সাল, চৈত্র { ১২শ সংখ্যা।

শ্রীমদ্‌বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পর্য্যটন কালের ঘটনা।

নর্ম্মদা-পরিক্রমা।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

এ নর্ম্মদা-পরিক্রমা কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এ পরিক্রমা গুরুদেব যে বহুদিন ধরিয়া করিয়াছেন তাহাও পূর্ব্বে জানান হইয়াছে।

আমাদিগকে তিনি শুনাইয়াছেন যে, এ পরিক্রমা সময়ে একবার এক সাহেবের জন্য তাঁহার প্রাণ যাইবার মত হইয়াছিল। এ সাহেবটী হইতেছেন উক্ত প্রদেশের এক কমিশনার। নানাস্থানে চুরী, খুন ও অত্যাচার হইতেছিল, ইহা শুনিয়া কিরূপে এ সকল নিবারণ হইতে পারে স্থির করিবার জন্য তিনি সফরে বাহির হইয়াছিলেন। এইরূপে বাহির হইয়া তিনি নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী এক ডাকবাঙ্গালায় সপরিবারে অবস্থান করিতেছিলেন। এ ডাক বাঙ্গালা হইতেছে মাণ্ডলা নামক স্থানে। গুরুদেবের বয়স এ সময়ে ছিল প্রায় ১৮।১৯ বৎসর। তাঁহার সহিত একটী উদাসী সাধু ছিলেন। উভয়ে এক সঙ্গেই কিছুদিন পর্য্যটন

করিতেছিলেন। মহারাজের সহিত ছিল একখানি ছোট সাবল ও একখানি টাঙ্গি বা কুড়ালী। ইহা ভিন্ন একখানি চর্ম্মের আসন ছিল, সামান্য সামান্য বস্ত্র ও কম্বল এবং একটী ঝোলা। এ ঝোলার ভিতর ছিল বিভিন্ন পুটলীতে বাঁধা সামান্য সামান্য আটা, ডাউল, নিমক ও হলুদের টুকরা। এ ঝোলার ভিতর অপর দুইটী পুটলীতে বাঁধা ছিল খানিকটা গাঁজা ও শঙ্খবিষ বা Arsenic. নর্ম্মদা তীর ভ্রমণ সময়ে এ শেষোক্ত দ্রব্য দুইটী তাঁহারা সময়ে সময়ে ব্যবহার করিতেন। যে ডাকবাঙ্গালার নাম পূর্ব্বে বলা হইল, উহার কিছু দূর দিয়া তাঁহারা উভয় সাধু চলিয়া যাইতেছিলেন। এরূপ সময়ে উপরোক্ত সাহেব চাপরাশীর দ্বারা তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন। মহারাজের বয়স কম থাকায় ও এরূপ ভাবে কোন সাহেবের সংস্পর্শে পূর্ব্বে আইসেন নাই বলিয়া সাহেব তাঁহাদিগকে ডাকিতেছেন ইহা শুনিয়াই যেন একটু ভয় পাইলেন। পুনরায় সাহেবের নিকট যাইবামাত্রই তাঁহাকে যুবাবয়স্ক দেখিয়া সাহেব যেন তাঁহাকেই অধিক ধম্‌কাইতে লাগিলেন। সাহেব বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহারাই নানাস্থানে চুরি ও হত্যা করিয়া বেড়াইতেছেন। নানারূপে তাঁহারা সাহেবকে বুঝাইতে লাগিলেন যে তাঁহারা এরূপ কোন কাজই করেন না। তাঁহারা পরিক্রমাকারী সাধু। সাহেব মহারাজকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তবে তাঁহার হাতে সাবল কেন? তিনি বুঝাইলেন যে বন-জঙ্গল হইতে কন্দ-মূল উত্তোলন ও ছোট ছোট পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণ জন্য ইহার প্রয়োজন হয়। আর জঙ্গল ও বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ জন্য টাঙ্গিরও আবশ্যক আছে। সাহেব ইহা না বুঝিয়া বলিতে লাগিলেন যে, "নাহি, তোম্‌লোক মোকাম তোড়্‌তে হৈ, সিঁদ দেতে হৈ, আসামীকো ঘাল কর্‌তে হো, এ আস্তেই ই সব রাখ্‌দিয়া।" সাহেব এরূপ ধমক দিতে দিতে মহারাজকে ঝোলা খুলিয়া দেখাইতে বলিলেন। গুরুদেব এক একটী করিয়া ভিতরকার পুটলী খুলিয়া দেখাইতে লাগিলেন। আটা প্রভৃতির পুটলী দেখিয়া সাহেব কিছুই বলিলেন না। ক্রমে গাঁজার পুটলটী খোলা হইল। ইহা দেখিয়া গাঁজা কি জন্য রাখা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায় মহারাজ বুঝাইলেন যে, নদীর উন্মুক্ত তীরে রাত্রিবাস করিতে হয়, এজন্য শীত নিবারণ জন্য সময়ে সময়ে ইহা তাঁহারা ব্যবহার করেন। নিকটে কয়েক দিন গাঁজা মিলিবে না এজন্য কয়েক দিনের ব্যবহার মত ইহা রাখিয়াছেন। ইহার পর অন্য পুটলী হইতে শঙ্খ-বিষ বাহির হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়াই সাহেব বলিলেন যে উহা ত বিষাক্ত পাথর, ইহা লোককে খাওয়াইয়া মারিবার

জন্য রাখা হইয়াছে। মহারাজ ইহারও প্রয়োজন, পূর্ব্বোক্ত শীত ও কষ্ট নিবারণ জন্য ব্যবহার করেন জানাইলেন। সাহেব তখন খুব ধমক দিতে দিতে বলিলেন, যে যখন গাঁজা ও শঙ্খ-বিষ মিলিয়াছে তখন এজন্যই তিনি তাঁহাকে তিন বৎসর কয়েদ দিবেন। নিজেরা শীত নিবারণ জন্য উহা ব্যবহার করেন শুনিয়া সাহেব বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন "বেশ, উহা খাও দেখি।" ইতিপূর্ব্বে শুনিলেন যে গাঁজা ও শঙ্খ-বিষের জন্য তিন মাস কয়েদ হইবে। ইহা ভাবিয়া স্থির করিলেন যে জেলে যাওয়া অপেক্ষা জীবন ত্যাগ করাই ভাল। এই স্থির করিয়া প্রায় ছয় আনা ওজনের শঙ্খ-বিষ সাহেবের সম্মুখেই খাইয়া ফেলিলেন। এত অধিক পরিমাণে এ দ্রব্য পূর্ব্বে তিনি কখনও ব্যবহার করেন নাই। এ সব হইবার পর সাহেব তাঁহাদিগকে বাঙ্গালার অদূরে এক গাছতলায় বসিয়া থাকিতে আদেশ করিলেন। এখানে যাইয়া মহারাজ তাঁহার সঙ্গী উদাসী সাধুটীকে বলিলেন, যে সাহেব যখন জেল দিবে বলিলেন, তখন মরণই ভাল মনে করিয়া তিনি অত অধিক পরিমাণে শঙ্খ বিষ খাইয়াছেন। সম্ভবতঃ এজন্য তিনি খানিক পরে মরিয়া যাইবেন। এজন্য তাঁহার প্রতি এই অনুরোধ রহিল যে, তিনি মরিয়া গেলে তাঁহার দেহটী যেন নর্ম্মদার জলে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যান। এইরূপ বলিয়া সেখানে যে একটী বড় বৃক্ষ ছিল তাহার গুঁড়ীতে মহারাজ এরূপ ভাবে ঠেস দিয়া বসিলেন যে, মাটীতে যেন পড়িয়া না যান। এইরূপে আসন লইয়া একমনে মাতা নর্ম্মদা দেবীকে কেবল ধ্যান করিতে লাগিলেন। অপর সাধুটী তাঁহার পার্শ্বেই বসিয়া রহিলেন। মহারাজ শুনাইয়াছেন যে এরূপ ভাবে খানিকক্ষণ বসিবার পরই তাঁহার জিহ্বা যেন শুষ্ক হইয়া আসিল ও পরে বাহ্য চৈতন্য হারাইলেন। তবে অন্তরাকাশে নর্ম্মদা দেবী আবির্ভূতা হইয়া যেন অভয় দিতে লাগিলেন। কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিলেন স্মরণ হয় না।

যখন এই অবস্থায় তিনি আসীন ছিলেন, তখন সাহেবের বাঙ্গলায় এক বিচিত্র শোচনীয় ব্যাপার উপস্থিত হইল। সাহেবের পূর্ণ বয়স্ক এক পুত্র ঘোড়ায় চড়িয়া কতিপয় সঙ্গীর সহিত শিকারে বাহির হইয়াছিল। কিছু পূর্ব্বে সে বাঙ্গলায় ফিরিয়া আইসে ও অন্যান্য সঙ্গীগণের সহিত একত্রে চা পান করে। আর কাহারও কিছু হয় নাই, কিন্তু সাহেবের এ পুত্রটীর অকস্মাৎ ভেদ বমি আরম্ভ হয়। ইহাতে ভীত হইয়া নিকটে যে ভাল ডাক্তার ছিল তাঁহাকে আনয়ন জন্য লোক ছুটিয়া যায়। কিন্তু এ ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বেই সাহেবের ছেলেটী মারা পড়ে। সাহেবের ছেলে পীড়িত হইয়াছে শুনিয়া নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী একটী গ্রামের

কোন ভদ্র ব্যক্তি দেখিতে আসিতেছিলেন। এ ভদ্র লোকটী পরিক্রমাকারী সাধুগণকে নানারূপে সৎকার করিতেন। যে বৃক্ষমূলে মহারাজ অচৈতন্য হইয়া বসিয়া আছেন ইনি তাঁহার পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় ইহার কারণ নিকটে উপবিষ্ট উদাসী সাধুটীর মুখে অবগত হইলেন। উদাসীটী আরও জানাইয়াছিলেন যে সাহেব তাঁহাদিগকে আট্‌কাইয়াছেন। এ ভদ্র লোকটী সাহেবের বাঙ্গালায় যাইয়া দেখিলেন যে সাহেবের পুত্রটী মারা পড়িয়াছে ও ডাক্তার আসিয়াছে। তিনি ডাক্তারকে শঙ্খ-বিষ খাইয়া মহারাজের অজ্ঞানের বিষয় বলিয়া তাঁহাকে চিকিৎসা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন ও সাধু দুইজনকে ছাড়িয়া দিবার জন্য সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার আসিয়া কি করিয়াছিলেন ইহা মহারাজের মনে নাই, তবে তাঁহার ঔষধ সেবনের পর অনেকটা বমি হইয়া যায় ও ইহার পর তিনি অনেকটা সুস্থতালাভ করেন ইহা মনে আছে। ইহার পর উপরোক্ত ভদ্র লোকটী তাঁহাদিগকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া বেশ যত্ন করেন ও ইহার দুদিন পরে বেশ সুস্থ হইয়া তাঁহারা পরিক্রমা আরম্ভ করেন।

এ ঘটনার কিছুদিন পরে মহারাজ অমরকণ্টক ঝাড়ির সন্নিকটে আসিয়া নদীর তীরে একটী পর্ণ-কুটীর তৈয়ার করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। ঐ স্থানের কিছু দূরে পূর্ব্বোক্ত সাহেবটী এক তাঁবুতে অবস্থান করিতেছিলেন, ইহা মহারাজ জানিতেন না। একদিন তিনি সাবল ও টাঙ্গি লইয়া জঙ্গলে গিয়াছিলেন ও সেখান হইতে কতকগুলি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া স্কন্ধে লইয়াছিলেন ও কতকগুলি কন্দমূল ঝোলায় লইয়া ধুলা ও মাটী সমেত পর্ণ-কুটীরে ফিরিবার সময় দেখিলেন যে, পথে কতকগুলি লোক সাহেব দেখিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইত্যবসরে দেখিলেন যে, এক সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছে, মহারাজ সাহেবকে চিনেন নাই কিন্তু সাহেব ঘোড়া দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনিই সেই মাণ্ডলার শঙ্খ-বিষ ভক্ষণকারী সাধু কি না। মহারাজ "হাঁ" বলিলে সাহেব তাঁবুর দিকে চলিয়া গেলেন। ইহার ২।৩ দিন পরে মহারাজ জঙ্গলে গিয়া প্রায় এক কোমর গর্ত্ত করিয়া কন্দমূল উঠাইতেছেন, এমন সময়ে ঐ সাহেবটী তাঁহার এক কায়স্থ কর্ম্মচারীর সহিত শিকারে বাহির হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, ও কিরূপে কন্দমূল উঠাইতেছেন দেখিতে লাগিলেন। মহারাজ সাহেবকে কিছু কন্দমূল দিতে চাহিলে তিনি উহা "বিষ হ্যায়" বলিয়া হাসিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। কায়স্থ সঙ্গীটী কিছু লইল। এ সময়ে মহারাজ একটু সাহস পাইয়া ও মাণ্ডলার কথাগুলি স্মরণ করতঃ বলিলেন, "সাহেব! কেছা

জঙ্গলমে হাম্ লোক মোকাম তোড়্‌তে হু, আপ্‌তো আজি দেখ্‌লিয়া।" পূর্ব্বের আচরণ স্মরণ করিয়া সাহেব যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন ও ইহার পর মহারাজ কোথায় আছেন জানিতে চাহিলেন। তিনি তাঁহার পর্ণ-কুটীর নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ইহার পর এ সাহেবটী ২।৩ বার করিয়া তাঁহার নিকট আসিতেন ও তাঁহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতেন। এ সব প্রশ্নের বিষয় ছিল, কি প্রকারে তিনি ভোজন দ্রব্য তৈয়ারী করেন, কি প্রকার আসনে রাত্রিতে নিদ্রা যান, কি প্রকারে শীত নিবারণ হয়, ব্যাঘ্র, ভল্লুক পরিপূর্ণ জঙ্গলে কোনরূপ ভয় হয় কি না যদি তিনি পর্ণ কুটীরের পরিবর্ত্তে একখানি ছোট ঘর করিয়া দেন, তবে তিনি থাকিবেন কি না? ইত্যাদি ইত্যাদি বহু প্রকার প্রশ্ন করিতেন। মহারাজ বলিয়াছিলেন তাঁহার কিছুরই প্রয়োজন নাই। পর্ণ কুটীরে তিনি শয়ন করেন না, কেবল তৈয়ারী রুটি প্রভৃতি রাখেন মাত্র। তিনি কাহাকেও হিংসা করেন না এজন্য হিংস্র জন্তুরা কোন উপদ্রব করে না। শীত নিবারণ হয় প্রধানতঃ ধুনীর আগুণ দ্বারা, এজন্য সময়ে সময়ে গাঁজা ও শঙ্খ-বিষ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। সাহেব এ সব বিষয় শুনিয়া যেন অবাক হইয়া যাইতেন। কয়েক দিন পরে সাহেব যে দিন তাঁবু উঠাইয়া চলিয়া যাইবেন স্থির হইয়াছিল, সেদিন তিনি পাঁচটি টাকা লইয়া মহারাজকে দিতে আসিলেন। তিনি সাহেবকে বুঝাইলেন যে টাকার তাঁহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বরং উহা সঙ্গে থাকিলে নানারূপ দস্যু তস্করের ভয় হইবে। তাঁহারা অর্দ্ধশূন্য হইয়া নির্ভয়ে উন্মুক্ত স্থানে রাত্রি যাপন করেন। জঙ্গলে কিছু খরিদ করিতেও মিলিবে না। সুতরাং টাকা লইয়া কি করিবেন? সাহেব বলিলেন যে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া গাঁজা খরিদ জন্য এ টাকা দিতেছেন। মহারাজ বলিলেন যে জঙ্গলে গাঁজাও মিলিবে না। এ সকল কথা শুনিয়া তখন সাহেব টাকা উঠাইয়া লইলেন। তবে যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে যদি মহারাজগঞ্জে যাইয়া তাঁহার সহিত মহারাজ সাক্ষাৎ করেন তাহা হইলে তিনি উত্তম উত্তম কম্বল, বাঘাম্বর ও গাঁজা দিবেন। এ সাক্ষাৎ কিন্তু আর তাঁহার সহিত হয় নাই। তবে মহারাজ জানিতে পারিয়াছিলেন যে এ সাহেব পরিক্রমাকারী সাধুদিগকে লোটা, কম্বল, কাপড়, আটা ও গাঁজা বা অর্থ দান করিয়া বহু প্রকারে সৎকার করিতেন।

পাঠক! এ গল্পটি পড়িয়া অবশ্যই বুঝিলেন যে, সাধুগণকে অন্যায় রূপে নির্য্যাতন করিতে যাইলে নিজের অমঙ্গল সত্বই উপস্থিত হয়। পুনরায় এ গল্পটি জানাইয়া দিল যে সময়ে সময়ে অশুভ কর্ম্ম হইতেও শুভের উৎপত্তি হয়। এ সাহেবের সাধুদিগের প্রতি মতিপরিবর্ত্তন ইহার এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

নর্ম্মদা তীর।

নর্ম্মদা-পরিক্রমাকারী সাধুগণের বিশ্বাস আছে যে, মাতা নর্ম্মদা দেবী সদাই তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন ও নানাভাবে তাঁহাদিগকে সময় সময় দর্শন দিয়া থাকেন। পরিক্রমাকারী সাধুরা হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক বিপন্ন হইয়াছেন, ইহাও প্রায় কেহ শুনে নাই। এ সম্বন্ধে ২।১টী ঘটনা শুনাইতেছি।

এ পরিক্রমাকালে গুরুদেব এক সময়ে আরও ১০।১২টি সাধুর সঙ্গলাভ করিয়া পর্য্যটন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে ভীলগণ সময়ে সময়ে কিরূপ অত্যাচার করে তাহা পূর্ব্বে জানান হইয়াছে। শূলপাণির বাড়ীতে তাঁহারা পৌঁছিবামাত্রই উহাদের অত্যাচার আরম্ভ হইল। একজন ভীল তীরধনুক ও তীক্ষ্ণধার টাঙ্গি ও অস্ত্র লইয়া উপস্থিত হইল ও তাঁহাদের নিকট যাঁহার যে লোটা, কম্বল বা ঝোলা ছিল বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করিল। তাহাদের সহিত বল প্রয়োগ বা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কোনরূপ ফল নাই বুঝিয়া তাঁহারা জঙ্গলে চলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বোক্ত সঙ্গীদিগের মধ্যে একজনের আফিং খাইবার অভ্যাস ছিল। তাহার আফিংএর ডিবা ঝোলার মধ্যে ছিল ও আফিং সহিত এ ঝোলা ভীলগণ লইয়া পলাইয়া ছিল। এজন্য এ সাধুটী আফিং খাইতে না পাইয়া চলিতে অসমর্থ হইলেন। এ অবস্থায় কতক সঙ্গী অগ্রে চলিয়া গেলেন, মহারাজ ও অপর কয়েকজন ভাবিলেন যে এরূপ অসমর্থ ও অসহায়াপন্ন সাধুটিকে সে জঙ্গলে একাকী ফেলিয়া যাওয়া অকর্ত্তব্য। এজন্য উক্ত আফিংখোর সাধুটিকে নিজেদের স্কন্ধে ভর করাইয়া চলিতে লাগিলেন। এরূপ ভাবে চলিতে চলিতে জঙ্গলের মধ্যে পথিমধ্যে একটি ডিবা কুড়াইয়া পাইলেন। ইহা পাইয়া খুলিবা মাত্রই দেখিলেন যে তাহাতে আন্দাজ ২ ভরি আফিং রহিয়াছে। উপরোক্ত সাধুটি বড়ই আনন্দিত হইলেন ও ইহা নর্ম্মদা মাতার একান্ত কৃপা ইহা সককেরই ধারণা হইল। অসমর্থ সাধুটি আফিং খাইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিন্তু তাঁহারও অসাধারণ মনের বল দেখা গিয়াছিল। তিনি ব্যবহারোপযোগী আফিং সেবন করিয়া বাকি আফিং সহিত ডিবাটি নর্ম্মদার জলে নিক্ষেপ করিলেন ও বলিলেন, "মাতা আজ কৃপা করিয়া যখন সন্তানের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন তখন প্রত্যহই এরূপ করিবেন। বাস্তবিক তাহাই হইল, সে জঙ্গল উত্তীর্ণ হইতে ৫।৬ দিন লাগিয়াছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে সে সাধুটি কোন না কোন উপায়ে আফিং পাইয়াছিলেন। জঙ্গল হইতে বাহির হইবার পর যখন লোকালয়

মিলিয়াছিল তখন পূর্ব্বোক্ত সুযোগ যেন আপনিই চলিয়া গেল।

ইহার পরের ঘটনা আরও বিচিত্র। প্রথম দিনে আফিং পাইবার পর সন্ধ্যায় কিছু পূর্ব্বে তাঁহাদের অগ্রবর্ত্তী সাধুগণের সহিত সকলে নর্ম্মদাতীরে পুনরায় একত্রিত হইলেন। সকলে ক্লান্ত হইয়া নর্ম্মদাতীরে আসন লইলেন। লোটা, কম্বল ও সামান্য রকমের আহারীর দ্রব্য সঙ্গে যাহা ছিল তাহাও ভীলগণ লইয়া গিয়াছিল। একজনের সহিত জল আহরণ জন্য একটি লাউএর তুম্বা মাত্র ছিল। এটি না থাকিলে করপাত্র ভিন্ন জল খাইবারও ভরসা ছিল না। সে স্থান হইতে লোকালয় দূরে ছিল। ইহার উপর সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে এজন্য ভিক্ষায় যাইবেন তাহারও উপায় ছিল না। সকলে সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন। এজন্য কি করিবেন সকলেই ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন যে এক বৃদ্ধা ভীল মায়ী (স্ত্রীলোক) একটি গাভী ও ২।৩টি বৎস লইয়া নর্ম্মদায় জল খাওয়াইবার জন্য নামাইয়াছেন। ২।৩টি সাধু তাহার নিকট যাইয়া নিজেদের দুরবস্থার বিষয় জানাইলেন ও বলিলেন যে তাঁহারা পরিক্রমাকারী সাধু, বড় "ভুখা" বোধ করিয়াছেন ও নিকটে কোন গ্রাম আছে কি না ও সেখানে যাইলে দুধ বা অন্য কিছু মিলিবে কি না জানিতে চাহিলেন। দুধের কথা শুনিয়াই সে মায়ীটি বলিলেন যে কোনরূপ "বর্ত্তন" বা পাত্র আনিয়া দিলে দুধ এখনি তাহার নিকট হইতে মিলিবে। ইহা শুনিয়াই একটি সাধু তাড়াতাড়ি সেই লাউএর তুম্বাটি লইয়া আসিলেন। মায়ী গাভী হইতে দুধ দোহন করিয়া তুম্বাটি পরিপূর্ণ করিলেন। যেমন ইহা পরিপূর্ণ হইল অমনি মহারাজ ও তাহার সঙ্গী সাধুগণ কখনও একজনে বা দুই তিন জনে উক্ত দুগ্ধ পান করিয়া তুম্বাটি খালি করিতে লাগিলেন ও মায়ী পুনরায় দুগ্ধে পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। কয়েকবার এরূপ করিতেই সকল সাধু পরিতোষ পূর্ব্বক দুগ্ধ পান করিলেন। দুগ্ধপান শেষ হইলে মায়ী গাভী ও বৎস সহিত জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণ নর্ম্মদা দেবীর মায়ায় তাহারা যেন আচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের পরই সকলের চমক ভাঙ্গিল যে এ তো দেবী নর্ম্মদারই কৃপা। তিনিই ভীল মায়ীর বেশে দেখা দিয়াছিলেন। নতুবা একটি গাভী হইতে এত দুগ্ধ হওয়া অসম্ভব। তাঁহারা আকণ্ঠ পান করিয়া উত্তম রূপে পরম তৃপ্তি পাইয়াছেন। পুনরায় এ সন্ধ্যাকালে এরূপ এক বৃদ্ধা কেন জঙ্গল হইতে আসিবে। দিবাভাগে জঙ্গলে আফিংএর ডিবা মিলিয়া গেল। পুনরায় এ দুগ্ধ-দান ইহা এ দেবীরই কৃপা। এক্ষণে চমক ভাঙ্গিবার পর সে বৃদ্ধা কোন

দিকে গেলেন দেখিবার জন্য তাহারা ইতস্ততঃ বহুদূর পর্য্যন্ত তল্লাস করিলেন। কিন্তু সে ভীলমায়ী বা গাভী আর দর্শনে পড়িল না। তখন নর্ম্মদা দেবীকে প্রণাম করিয়া সেই নদী তীরে সকলে মহানন্দে আসন গ্রহণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)।

সাধক-সঙ্গীত।

লেখক—শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ।

কুপোকাৎ।

সকল কুপোই কাৎ হ'বে ভাই কেউ রবে না সোজা।
নেশার ঝোঁকে পড়ে সবাই বইছে কেবল ভূতের বোঝা॥
নয় তো রে সে কথার কথা,
"মাথা নেই তার মাথা ব্যথা"
(ও ভাই) কুপো ধরে সমিষ্যেটা তেবে দেখ কি মজা॥
গড়ন পেলেই ভাঙন বুঝ্‌বে ভাই!
তিনির খেলার মেলার মাঝে কাৎ হ'বে খাড়াই।
হাঁপাই ঝাঁপাই সার শুধু তোর, "হং" সাজা এ সংসাজা॥

নিজ-নিকেতন।

লেখক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

সুমিষ্ট সে শান্তিপূর্ণ আপন আলয়।
অপরের অট্টালিকা কভু সম নয়॥
আপন ইচ্ছায় কাজ আপন ভবনে।
পরের ইচ্ছায় কাজ হয় পরস্থানে॥
সে কারণ স্বাধীনতা অছে নিজালয়ে।
পরাধীন হয়ে থাকা বিভিন্ন আলয়ে॥
বিধাতার প্রিয় সৃষ্টি নিজের সদন।
তথায় বিরাজে শান্তি যখন তখন॥
অতএব মনে বুঝে দেখহ সুজন।
বটে কিনা বটে শান্তি নিজ নিকেতন॥
একবার খাও বা না খাও নিজালয়ে
তথাপি মনের শান্তি নিশ্চয় মিলয়ে॥

জ্ঞান ও দুঃখ।

লেখক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

জ্ঞান দুঃখকে বিনাশ করে, ইহাই মুনিগণের বাক্য। কিন্তু সংসারে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় দুঃখই জ্ঞানকে বিনাশ করিয়া থাকে। বিমল জ্ঞান অতি বিরল, কিন্তু দুঃখময় সংসারে দুঃখের অভাব নাই। অভাব, ব্যাধি, বিরহ প্রভৃতি দুঃখের উৎপত্তিস্থান। অতএব দুঃখের অভিধান বা নামকরণ নিতান্ত কঠিন। তন্মধ্যে ব্যাধি ও বিরহ জনিত দুঃখ দুঃসহ। দুঃখ হইতে মোহ উপস্থিত হয়, মোহ জ্ঞানকে বিনাশ করিয়া থাকে। বিমল জ্ঞান সংসারে অতি দুর্লভ, তাই মহাত্মা সাধককবি রামপ্রসাদ সেন গাহিয়াছেন, "ঘুড়ী লর্ক্ষে দুটো একটা কাটে, হেসে দেন মা হাত চাপুড়ী।" সেই প্রকৃত প্রজ্ঞা লাভের উপায় ঈশ্বরে পরানিষ্ঠা। তাহাও আবার জন্মান্তরের সুকৃতিসাধ্য। সেইজন্য অধিকাংশ স্থলেই দুঃখই জ্ঞানবিনাশের হেতু হইয়া থাকে।

বুঝিলাম বিজ্ঞান ও চিরশান্তিলাভ নিতান্ত দুর্লভ। তবে কি মানব নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগই করিবে? কখন সুখ ও শান্তি লাভের চেষ্টা করিবে না? তাহা নহে। মনীষীগণ তাহারও উপায় বিধান করিয়াছেন। দেব ভগবান বুদ্ধদেব জীবের জরা, মৃত্যু ও নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ দেখিয়া ব্যথিতহৃদয়ে রাজসুখ ও স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরশান্তির উপায় আবিষ্কারের জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন ও কঠোর তপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অহিংসা ও সৎকর্ম্ম তাঁহার মতে শান্তির উপায়। আর্য্য ঋষিগণ ভাব সাগরে ডুবিয়া রত্নগর্ভ শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য সংসারের এই দুঃখ মোচন, দুঃখমোচনের একমাত্র উপায় বিমল জ্ঞান। জ্ঞানসুধা-পিপাসু মানব ঋষিগণ-প্রবর্ত্তিত পথের অনুসরণ করিয়া যথাশক্তি জ্ঞান সঞ্চয় পূর্ব্বক দুঃখ বিনাশে সমর্থ হইবে শাস্ত্র সকলের ইহাই উদ্দেশ্য। যেমন পর্ব্বত শৃঙ্গে উঠিয়া প্রকৃতি মণ্ডলের চতুর্দ্দিকস্থ পবিত্র শোভা সন্দর্শন করিবার ইচ্ছা হইলে পর্ব্বত-পাদদেশ হইতে স্তরে স্তরে উঠিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া দুঃখ বিনাশ করিতে হইলে জ্ঞানের প্রথম স্তর ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিতে হয়। এই ধর্ম্ম কি? ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র সকল বিষদ ভাবে তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম দশ প্রকার, ধৃতি, ক্ষমা, দম, আস্তেয়,

শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধীবিদ্যা, সত্য, অক্রোধ। এই দশবিধ ধর্ম্মেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞানলাভ করিয়া দুঃখ-বিনাশের জন্য এই দশবিধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও অভ্যাসের উপদেশ দিয়াছেন। এই ধর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভগবদ্ভক্তি আইসে। এই ভগবদ্ভক্তি ভিন্ন বিমল জ্ঞানলাভ ও দুঃখ বিনাশের আর উপায় নাই। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন, "অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান হইতে ত্যাগ ও শান্তি আইসে।" ধর্ম্ম সকলের অভ্যাস হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে ভক্তি হয়, বিমলা ভক্তিই সর্ব্ব দুঃখ বিনাশের কারণ। এইরূপ ভক্তি হইতে ভগবানে আত্মসমর্পণ হয়। আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিলে দুঃখ হইতে ভয় থাকে না। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে আত্ম-সমর্পণে অভ্যস্ত হয়, দুঃখ ভোগও তাহার সেই পরিমাণে কম হইয়া থাকে। সেই জন্য সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছেন, "যে দিন যেমন বিধির লিখন সেইরূপে যাবে সে দিন। ঘটিবে প্রমাদ, পাইবে বিষাদ, কালী না ভজিবে যে দিন!" অতএব মানব মাত্রেরই সাধ্যানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান, ভগবানের সেবা, তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ ও জ্ঞানলাভ করিয়া দুঃখ বিনাশ করিবার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

হরির লীলা।

লেখক—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

(কমিক)

(১)

হরি হে! বুঝতে নারি তোমার লীলা।
(তুমি) গড়্‌তে পার, ভাঙ্গতে পার
খেল্‌তে জান কতই খেলা॥

(২)

কারো ভাগ্যে লুচি কচুরি,
কেউ বা খায় গো চোঁয়া মুড়ি,
(আবার) কারো ভাগ্যে তাও জোটে না
উপবাসী দুটী বেলা॥

(৩)

কেউ বা চড়ে যুড়ি গাড়ী,
ঝুলিয়ে সোণার চেন ঘড়ি,
আছে সুখে রাজার হালে
বাড়ী তুলে দোতালা॥

(৪)

কেউ বা মরে টানাটানি,
জোটে না কো ছেঁড়া কানি,
ঘরবাড়ী তো চুলোয় যাক্
আশ্রয় যে গাছতলা॥

(৫)

কেউ বা খেটে রোজগার করে,
মাথার ঘাম পায়ে পড়ে
জোটাতে পেটের ভাত—
দুই সন্ধ্যা দুই বেলা॥

(৬)

কেউ বা বসে আরাম করে,
আপনি টাকা আসে ঘরে,
আছে সদাই মনের সুখে
নিয়ে নস্ত টাকার ছালা॥

(৭)

কেউ বা খেতে পায় না মুড়ি,
ছেলে মেয়ে ছড়াছড়ি,
কারো ভাগ্যে নাইকো ছেলে
ঠাকুরতলায় বাঁধে ঢেলা॥

(৮)

কেউ বা বসে নভেল পড়ে,
চাকর দাসী সেবা করে,
কেউ বা মরে খেটে খেটে
সময় পায় না—একি জ্বালা॥

(৯)

কেউ বা পরে পার্শী শাড়ী,
দুহাত বোঝাই সোণার চুড়ি,
কাঁচের চুড়ি কারো জোটে না,
কারো হাতে সোণার বালা ॥

(১০)

কেউ বা খায় সন্দেশ রাবড়ি,
তপ্‌সে মাছ গল্‌দা চিংড়ি,
কারো ভাতে ঘি-মর্ত্তমান
কেউ বা পায় না বীচেকলা ॥

(১১)

কারো আছে পুকুর বাগান,
গোলা বোঝাই কারো ধান,
কারো আবার চালচুলো নেই,
সবই হরি তোমার খেলা ॥

(১২)

কবি নরেন দেখে শুনে,
ডাকে তোমায় মনে মনে,
বলে হরি! একি বিচার
বংশীধারী চিকণকালা ॥

———

গুরু-দর্শন।

লেখক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

গুরু-দর্শনের মত পুণ্যকর্ম্ম কিছুই নাই, কিন্তু পুনঃপুনঃ দর্শন করিতে গেলে গুরুকে বিরক্ত করা হয় এবং দর্শন পাইতে অযথা বিলম্ব ঘটিলে শিষ্যের প্রাণেও বিলম্বের কষ্ট হয়। সেই কারণ শাস্ত্রে উপদেশ আছে, গুরুকে সর্ব্বদা স্মরণ করাই

সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যেখানে শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তির কারণ উপস্থিত হইয়া মনকে আলোড়িত করে, সেখানে সাবধান ও সংযত হইতে চেষ্টা করা উচিত। গুরুর সমক্ষে বেশী কথাবার্ত্তা বলাও ঠিক নহে, কারণ তাহাতে হয়ত অতর্কিত ভাবে অনেক প্রিয় অপ্রিয় উভয়বিধ কথার প্রসঙ্গ হইতে পারে। জিহ্বাকে যত বেশী সংযত করিবার চেষ্টা করা যাইবে ততই মঙ্গলজনক। অনেক সময় বিনা কারণে ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া মান অভিমান উপস্থিত হইয়া সাধন পথের বিশেষ বিঘ্ন করে। আবার সময়ে সময়ে অনেকের মনে বেশী কম ভালবাসা লইয়া চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়; কিন্তু সে ক্ষেত্রে গুরুদেব হয়ত সকলকে সমান চক্ষে দেখেন। অথবা যে যেরূপ সাধন-পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহাকে তদনুযায়ী দেখিয়া থাকেন। এ সকল বিষয় লইয়া শিষ্যের কোন বিচার বা তর্ক বিতর্ক করা কোনমতেই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত নহে। সর্ব্বদা মনে স্মরণ রাখা উচিত "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" আমরা অনেক সময় অনেক বিষয়ে বিষম ভুল করিয়া বসি। তজ্জন্য আমাদিগকে অপরাধগ্রস্ত হইতে হয়। ভবপারের কর্ণধার যে গুরু তাঁহাকে মানব-দেহধারী বলিয়া আমরা নিজ নিজ মাপকাটি লইয়া বিচার করিয়া থাকি। সেইখানেই আমাদের দারুণ ভ্রান্তি। **গুরু, মন্ত্র, ইষ্ট** তিনকে এক করিতে না পারিলে যখন আমরা প্রকৃত সাধন পথের পথিক হইতে পারিব না, তখন আমাদের পদে পদে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। "গুরু" শব্দের অর্থ গুরুত্ব যাহাতে আছে। সাক্ষাৎ জীবন্ত জাগ্রত দেবতা গুরুদেব। সেই গুরুর ছায়া লইয়া আমরা ব্যবহারিক জগতে "গুরুজন" শব্দ ব্যবহার করিয়া তদনুযায়ী মর্য্যাদা করিয়া থাকি। অতএব গুরুকে লইয়া তামাসাসূচক জল্পনা কল্পনা যাহারা করিয়া থাকে তাহারা ঘোরতর নিরয়গামী হয়, তাহাদের ইহকাল পরকাল নাই।

এই গুরুর প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে যেরূপ আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা কোন দেশে কোন স্থানে নাই। কিন্তু কাল প্রবাহে নানা কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সে সকল কারণের উল্লেখ করা আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তত্রাপি দুই একটি কারণের কথা উল্লেখ করিলেও নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

যে গুরুকে আমরা সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি, যে গুরুকে আমরা প্রাণ ভরিয়া ভক্তি করিয়া থাকি, যে গুরুই আমাদের একমাত্র মুক্তির কারণ, সেই পবিত্র আদর্শ গুরুপথকে কতিপয় তথাকথিত গুরু-অধ্যাধারী লোভী ধর্ম্ম-

জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি ব্যবসা মনে করিয়া অযথা ব্যবহার দ্বারা লোকের মনে দারুণ আঘাত দিয়া গুরুপথকে পঙ্কিলতাপূর্ণ করিয়াছে। এই ব্যবসাদার গুরুরা শিষ্যের মঙ্গলকামনা করা বা শিষ্যকে উপদেশ দেওয়া দূরের কথা, সদাসর্ব্বদা কেবল স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত। এতদ্ব্যতীত আর এক সম্প্রদায়ের গুরু আছেন, যাঁহারা অসঙ্কোচে শিষ্যের কুলে কালিমা লেপন করিতে দৃকপাত করেন না। অধিকন্তু স্বীয় কীর্ত্তির কথা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ শ্লাঘার পরিচয় দিয়া থাকেন। এই সকল এবং আরও অনেক কারণে গুরুপথকে লঘুতে পরিণত করিয়া জগতের অশেষবিধ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, এবং সেই কারণে লোকের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। গুরুবংশ হইতে মন্ত্র না লইলে বংশ ধ্বংস হইবে এই আশঙ্কায় অশিক্ষিত কদাচার-সম্পন্ন গুরুবংশের লোকের নিকট অনেকে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া অধঃপতিত হইতেছে। যত-দিন না ইহার প্রতীকার হইবে ততদিন দেশের প্রকৃত মঙ্গল সুদূরপরাহত। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পুর্ব্বে গুরুকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া লইবে, এবং গুরুও শিষ্যকে বিশেষভাবে দেখিয়া শুনিয়া বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া মন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন। উভয় পক্ষ উভয়কে দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া না লইলেই বিপদ অনিবার্য্য।

এখন কথা হইতেছে, গুরু নির্ণয় করিবার উপায় কি? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উভয়ের ভাব আদান প্রদান করিয়া উভয়ে সন্তুষ্ট হইলে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপন করা কর্ত্তব্য। নতুবা একটা ঝোঁকের মাথায় খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া যাহাকে তাহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া অনুতপ্ত হওয়া কোন মতেই উচিত ও সমীচীন নহে। সাধকপ্রবর তুলসী দাস তাই বলিয়াছেন, "গুরু মিলে লাখেলাখ, চেলা নাহি মিলে এক।" উপযুক্ত শিষ্য ও উপযুক্ত গুরু এ জগতে বড়ই দুর্লভ। যে গুরু উপযুক্ত শিষ্য পাইয়াছেন তিনি ধন্য হইয়াছেন। আবার যে শিষ্য ভাগ্যবলে উপযুক্ত গুরু পাইয়াছেন তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিবলে তিনি কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। তাঁহার বংশ পবিত্র হইয়াছে, ঊর্দ্ধতম সপ্তপুরুষ তাঁহার সদ্গতি লাভ করিয়াছেন।

তাই বলিতেছিলাম রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, শুক্রসহ দেহ বিশিষ্ট মনুষ্যই গুরু নহে। গুরু-গোবিন্দে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এমন পরমারাধ্য পতিতপাবন অধমতারণ গুরুদেব যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি বহু পুণ্যবান্ ও ভাগ্যবান্, তাঁর পদরেণু স্পর্শেও লোক ধন্য হইয়া যায়।

সকল বিষয়ের শিক্ষাদাতা গুরু। সকল প্রকার আদর্শের শ্রেষ্ঠ আদর্শ গুরু। বিপদে, সম্পদে, সুখে, দুঃখে, শান্তিতে, অশান্তিতে ছায়ার ন্যায় শিষ্যের সঙ্গে গুরু বিরাজ করেন। গুরু নিজ স্বার্থ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া পরার্থে জীবন, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। খোঁজ, অনুসন্ধান কর, ভগবানের নিকট প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা কর, তিনি অবশ্যই মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন। বাঞ্ছা-কল্পতরু তিনি, কাহার বাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। যদি এইরূপ গুরুলাভ করিতে পার, একবার দর্শন করিলে মূর্ত্তি চিরদিনের জন্য হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যাইবে, বারম্বার দর্শনের বাসনা থাকিবে না। সকল ক্ষোভ, সকল দুঃখ, সকল অভিমান দূরে পলায়ন করিবে, পূর্ণানন্দে বিরাজ করিতে থাকিবে। মন নির্ম্মল হইবে, প্রাণ শীতল হইবে, হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইবে। তখন অহরহঃ বলিবে "গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্।"

সাধু ভবানাস্তাম্।

লেখক—শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ কাব্যতীর্থ।

কে তুমি মহান্! হে অরুণোজ্জ্বল-তনুরুচি, অনিন্দ্যতেজঃ-প্রতিভায় তৃণীকৃত-জগত্রয়! সুমহদ্-গাম্ভীর্য্য-বীর্য্য-সম্পদে অনভিগম্য রমণীয়দর্শন কে তুমি? প্রগাঢ় অধ্যবসায়ি তপঃপ্রতিভায় হরিহরবিরিঞ্চি-বিজয়ী কে তুমি? ন্যায়-ধর্ম্ম-কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় রূপান্তর-পরিগ্রহী মূর্ত্তিমান্-ধর্ম্ম কে তুমি? সেই কি তুমি ব্রাহ্মণ—যাঁর মধুকণ্ঠ-বিনিঃসৃত মধুময় প্রণবগাথায় অম্বরতল মুখরিত, ত্রিভুবন পুলকিত; যাঁর পবিত্রবংশসম্ভূত মুণ্ডিতশিরস্ক, স্বাধ্যায়নিরত বটুকুলের সমস্বর কর্ণামৃত-নিঃস্যন্দি সামধেনীর আভোগে চরাচর স্তব্ধ, আব্রহ্মস্তম্ভ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শান্তিধারে পরিপ্লুত সেই কি তুমি ব্রাহ্মণ? ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-চতুর্ব্বর্গ-নিষ্কাম-কর্ম্ম-যোগী, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতির যথোপযুক্ত শাসনে ত্রিভুবন যাঁর উদ্যত তর্জ্জনীর অধীন, বিষয়ে অনাসক্ত, ভোগে বিরাগী, রাজৈশ্বর্য্যে নিস্পৃহ, সদাসন্তুষ্টচেতা, ব্রহ্মানন্দরসে বিভোর, ভূমিদেবতা ব্রাহ্মণ, ঐহিক সুখ লালসা নাই, আশার কণ্ঠশোষি-তৃষা নাই, উদ্যমবিনাশি আলস্যের নিদারুণ প্রভাব নাই, ন্যায়, সত্য, ধর্ম্ম ব্যতিরেকে ত্রিভুবনমণ্ডলে ভীতির বস্তু নাই, প্রমত্ত ইন্দ্রিয়করীর দুর্দ্দম্য অঙ্কুশ, জগদ্বিধ্বংসিনী মিথ্যা-রাক্ষসীর সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ,

ব্রহ্মানন্দবিধাতা প্রাণারাম সত্যের চিরবন্ধু, ন্যায়ধর্ম্মের মহাবলে বলীয়ান্ হইয়া যে মহাপুরুষকুল—

"আস্তাম্ অকণ্টকমিদং বসুধাধিপত্বং,
ত্রৈলোক্যরাজ্যমপি নৈব তৃণায় মন্যে।
নিঃশঙ্ক-সুপ্ত-হরিণী-কুল সঙ্কুলাসু,
চেতঃ পরং বসতি শৈল-বনস্থলীষু॥"

অর্থাৎ—"সসাগরা বসুন্ধরার অসপত্ন ইন্দ্রত্ব ছার, নিখিল ত্রিলোকীমণ্ডলের একাতপত্র অধীশ্বরত্বও তৃণের চক্ষে দর্শন করি। নিঃশঙ্ক-শয়ান-মৃগকুল-সঙ্কুল শৈল বনস্থলীর প্রতিই চিত্ত সতত প্রধাবিত হইতেছে।"

এই মহাবাক্য শিরেধারণ পূর্ব্বক জগদ্ধিতার্থে আত্মোৎসর্গ করতঃ আজীবন তপোব্রত হইয়া ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, "বসুধৈব কুটুম্বকং" শব্দে আপামর দেবতায় সমদর্শি হইয়া, ত্রিভুবনমণ্ডলে বিশ্ব জনীন প্রীতির শান্তিময় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই কি তুমি ব্রাহ্মণ?

হা বিধাতঃ! তবে এ কি? এ কি ভাগ্য বিপর্য্যয়? কুটিল কালের অনলস চক্রের ভীমাবর্ত্তনে, হা বিধাতঃ! আজ একি দশা ঘটিল? অবনীর শিরোমণি ব্রাহ্মণ, গোলোকমণি-হৃদাম্ভোজমণি কৌস্তুভমণিও একদিন যে পদতাড়নে বিক্ষুব্ধ, সে ব্রাহ্মণের আজ এ দশা কেন? বেদ-বিদ্যাবর্জ্জিত, সত্য-বর্জ্জিত, ন্যায়-বর্জ্জিত। দম নাই, শৌচ নাই, ব্রত নাই, আস্তিক্য নাই, আচার-হীন উদ্যম-হীন শ্রুতিস্মৃতিশাসিত নিয়মবিহীন।

বল বল, ব্রাহ্মণ! ধরিত্রী দেবতা তুমি, কোন্ মহাপাপে তোমার এ দশা-বিপর্য্যয় ঘটিল? সন্তুষ্টির শান্তিময় ক্রোড় পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দের স্বর্গসুখ হারাইয়া ভোগতৃষ্ণার ঘোর নিরয়ে আজ তুমি কেন হাবুডুবু খাইতেছ?

হায় হায়! কি দুর্দ্দৈব না ঘটিয়াছে! ভূমিদেব আজ দাসত্বের দাস হইয়া বহুরূপী সাজিয়াছে। একদিন যে ভারতের নির্ম্মল ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ত্যক্ত-শয়নীয় বটুকুল স্বাধ্যায়নিরত থাকিত, আজ সেই ভারতের সেই প্রাতঃকালের সেই অরুণালোকে গায়ত্রীবর্জ্জিত ব্রাহ্মণকুমার গুরুগৃহ গমন-পরিবর্ত্তে দেখ দেখ, আজ কি অপূর্ব্ব গৃহে সমবেত। ভাগীরথীপ্রবাহবৎ উন্মুক্ত রাজবীথিকার উভয় পার্শ্বে বহুধাবিনির্ম্মিত সৌধমালা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান; কোনটী পুস্তকাগার, কোনটী আতুরাশ্রম, কোনটী বিদ্যামন্দির, কোনটি স্মৃতিমন্দির, কোনটি শিবমন্দির। ভূদেবকুমারের অনলোজ্জ্বল নয়নযুগল, (সম্প্রতি ক্ষীণবল

কোটরগত) ইতোমধ্যে সর্ব্বথা অপতিত থাকিয়া অদূরে শতছিদ্র পর্ণোটজ-প্রাঙ্গনে পয়োনালীপার্শ্বস্থিত লৌহ-চুল্লিকোপরি ধূমায়মান ক-তোলীর (কেট্‌লী) প্রতি প্রীতিনিবদ্ধ হইয়া বেদ-নিয়ন্তার লোকপূজিত-রেণু চরণকমল উক্ত বিশিষ্ট গৃহে দ্রুত চালিত করিতেছে। উহাই অধুনাতন নব্যযুগের সভ্যতার শিরোমণি চা-বিপণি।

কি অভূতপূর্ব্ব রমণীয়দর্শন! চতুর্ব্বর্ণের শুদ্ধ্যশুদ্ধির অধিকরণিক, পাপ-পুণ্যের ন্যায়ানুগত প্রদর্শয়িতা, বহু যুগযুগান্তের পর এতদিনে আজ সার্ব্বজনীন একতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছেন। আ-ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশাম্ভুজ আজি নব যুগের নবীন শিক্ষা প্রভাবে জাতিভেদের কদর্য্য প্রথায় জলাঞ্জলি দিয়া আপামর ব্রহ্মসহযোগে সমাসনে, সমপাত্রে পান ভোজনে কৃতার্থ হইতেছেন। হা চৈতন্য! হা রামকৃষ্ণ! আজনম জীবনান্তিক পরিশ্রমে যে প্রীতি সম্মেলনে জগদ্বন্ধনে তোমরাও অকৃতার্থ হইয়া গিয়াছ, একবার ইহলোকে পুনঃ পদার্পণ করিয়া দেখ, কি অদ্ভুত মন্ত্রে আজ সভ্যযুগে "গেয়ালাবতারে" তাহা ভাবান্তরে সিদ্ধ করিয়াছে! মৃগ, কাক, শৃগাল, সিংহ সবই এক দড়িতে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। আমিক্ষীয়, দধি, ক্ষীর, পায়স, নবনীতাদি হৃদয়তর্পণ স্বাস্থ্যকর আহারীয়ে পরিপুষ্ট তোমার রসনায় হে ব্রাহ্মণ! এ অদ্ভুত রুচি কেন?

শুধু আহারেই কি রুচি বিপর্য্যয়? আহার, বিহার, ব্যবসায়, বিষয়, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সর্ব্বত্রই বিপরিণাম! অধর্ম্মে অনুরাগ, অকর্ম্মে প্রবৃত্তি, অনর্থে লীপ্সা, অবিদ্যায় মতি। ধ্যান—অর্থে, ইষ্টদেবার্থে নহে, জ্ঞান—স্বার্থে, শাস্ত্রমর্ম্মার্থে নহে; ধারণা—অভিনয় ও আলোকচিত্র দর্শনে, ব্রহ্মোপাসনে নহে, দান—সংবাদ পত্রে যশো অর্জ্জনে, দরিদ্র-ভরণে নহে; দণ্ডধারণ রাজপথে করকমলশোভার্থ, আম্নায়োক্ত সংযমশিক্ষার্থ নহে; মস্তকাবরণ শ্বেতাঙ্গপদানুসরণে, ব্রহ্মজ্ঞার্থ উষ্ণীষ ধারণে নহে। বেতনবৃদ্ধিতে ভূরিভোজন, পিতৃকৃত্যে শ্যালকমাত্র নিমন্ত্রণ; বিপদে ভগবদ্ভক্তি সম্পদে ক্ষীণাশক্তি; আচরণীয় কদাচার; বরণীয় কুসমাজ; করণীয় পরনিন্দা এবং স্মরণীয় পরছিদ্র হইয়াছে।

সর্ব্বযজ্ঞ-মূলীভূত আচার্য্যদত্ত নবগুণ যজ্ঞসূত্র, যার প্রভাবে একদিন সসাগরা ধরণীশ সকলেই কম্পমান হইয়াছিল, শতক্রতু অমরাধিপতিও ভ্রষ্টশ্রীক হইয়া স্বর্গ-চ্যুত হইয়াছিলেন, সে নবগুণ যেন আজ অভিনব গুণশালী হইয়া রং চড়াইয়াছে। তাই কবীন্দ্র রবীন্দ্র বড় দুঃখেই গাহিয়াছিলেন—"স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা, তেজোহীন ব্রহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলোস! তবু দৈব করুণায় "পৈতেখানা

স্কন্ধে ঝোলা" অবস্থায় কবিচক্ষে আপতিত হইয়াছিল, নতুবা "ব্রহ্মণ্যের সে খোলোস" আজ স্কন্ধের পরিবর্ত্তে বহু বসতিবিস্তার করিয়াছে। কাহারও বা শিরাল দীর্ঘকণ্ঠে দোদুল্যমান হইয়া হারের শোভা করিয়াছে, কাহারও বা নির্ম্মাংস নিতম্বে আসিয়া মেখলা মূর্ত্তি ধরিয়াছে, লম্বসার্টপটাবৃত কোন মহাশয়ের ছিন্ন-বন্ধনী (বোতাম) সার্টখণ্ডের গ্রন্থি বন্ধনে ব্যাপৃত ; আবার শতগ্রন্থি হইয়া কাহারও বা বসনাঞ্চলে লুক্কায়িত।

এতদিন যে জাতি ব্যসনাষ্টক ঘোরপাপজনক বলিয়া গম্ভীরতূর্য্য-নিঃস্বনে জগৎকে সাবধান করতঃ নিজ নেতৃত্বাধীনে রাখিয়া "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আজ সে জাতি স্বয়ং ব্যসনবিলাসী, দেবধর্ম্মে স্বয়ং অনাস্থাবান্, বেদ পুরাণে স্বয়ং অবিশ্বাসী ; নারকী নাস্তিকমণ্ডলীর নেতৃত্বে অহমহমিকায় অগ্রগামী হইয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের "গোড়ায় গলদ" জন্মাইতে বসিয়াছেন। কাজেই গুরু যদি অধঃপাতে যাইলেন, তবে শিষ্যের মুক্তিপথ কে দেখাইবে? সুতরাং শিষ্যরূপী তদবশিষ্ট বর্ণত্রয়ও কর্ণধারবিহীন পোতের ন্যায় সংসারসমুদ্রবক্ষে যথেচ্ছাচারী হইল। ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুর প্রভাব যখন যেদিকে ফিরিতে লাগিল, সুবিশাল ত্রিবর্ণপোত তখন তদভিমুখেই দেহভার ভাসাইল। সমাজের গুণবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইল ; জাতীয় পবিত্রতার দৃঢ়শৃঙ্খল ভগ্ন হইল। পরিচালক শিরোমণি বিলাস-ভ্রমি মধ্যে বিকলমতি হইয়া আপন ওজন ভুলিয়াছে। উত্তাল তুফানের তীব্র বেগ কে রোধ করে? ফলে; কৃষিবণিজ ব্যবসায়ী বৈশ্য সঙ্গে সঙ্গে স্বকর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক কর্ম্মান্তরপরিগ্রহী. বিকৃতি শিক্ষার বিকট করুণায় প্রভাবে সমাসনে বিপ্র-সহাধ্যায়ী হইয়া কুক্কুর-বৃত্তি নিরত ব্রাহ্মণ সমব্যবসায়ী প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উপহাস-পরায়ণ, আর শূদ্র? তারই "পোয়া বারো", সে আজ কতিপয় অর্থলোলুপ দ্বিজাপসদ প্রতিভায় ধৃতোপবীত হইয়া ময়ূরপিচ্ছধারী বায়সের ন্যায়, "কি ছিনু কি হনু রে"? জ্ঞানে সকলের মুণ্ডে সাহঙ্কারে পদাঘাত করিতে করিতে পুণ্যময়ী মেদিনীবক্ষে বীভৎস তাণ্ডবে উৎফুল্ল। সাধক মহিমানাথ একদিন হৃদয়-পটে এ চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াই হর্ষবিষাদ বিহ্বলহৃদয়ে বলিয়াছিলেন, "দেখ ভাই ক'রে বিচার এ দুনিয়ার কি তামাসা, (সব) বামুনগুলো মুখ্যু হ'ল, বেদ বেদান্ত পড়ে চাষা।"

হে ব্রাহ্মণ! এ যাবতীয় অধঃপতনের মূলও তুমি এবং এতন্নিমিত্তক ন্যায়ানুগত দণ্ডার্হও তুমি। আজ ব্রাহ্মণ যদি অসংযমী না হইত, লোভপরায়ণ হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিত, ব্রাহ্মণ যদি বিলাসিতার মোহে ভুলিয়া দ্বিফাল চিকুর

লুঙ্গীধারী না হইত, অর্থলোভে কুক্কুরবৃত্তিনিরত হইয়া জীবিকার্জ্জন না করিত, তাহা হইলে এরূপ সার্ব্বজাতিক অধঃপতন কখনই ঘটিত না।

আজ ব্রাহ্মণের অধঃপতনেই সমাজে একাকার! "ছাতুর হাঁড়ীতে বাড়ী পড়িয়াছে।" জন-সমাজ দেবধর্ম্মে অবিশ্বাসী হইয়া নাস্তিকতার ঘোর হুলুস্থুল বাধাইয়াছে।

"অগ্নৌ প্রস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে
আদিত্যাদ্ জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।
অন্নাদ্ ভবতি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ॥"

অর্থাৎ—"অগ্নিমুখে মন্ত্রঃপুত হবি নিহিত হইলে তাহা আদিত্যে উপনীত হয় ও আদিত্যের তেজোবৃদ্ধি করতঃ মেঘোৎপাদন করে, এবং মেঘ হইতে বৃষ্টি ও বৃষ্টি হইতেই জীবনিকরে জীবন রক্ষিত হয়। অন্ন হইতে জীবরক্ষা, সে অন্নের উৎপত্তি পর্জ্জন্য হইতে এবং যজ্ঞই পর্জ্জন্যের বিধাতা ও সে যজ্ঞ কর্ম্ম ব্যতীত সম্ভবপর নহে।" একথাও ভগবান্ গীতায় স্বয়ং বলিয়াছেন। এ শাস্ত্রবচন অভ্রান্ত সত্য, নিঃসন্দেহ সুফলদায়ী, কিন্তু হায়! আজ ব্রাহ্মণের যে দুরবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বসুখনিধান বহ্নিমুখে সে আহুতি দেয় কে? কে যজ্ঞ করে? সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আজ অগ্নিকুণ্ড উপবীত ধারণের পর মুহূর্ত্তেই সদ্যঃ সদ্যঃ দণ্ডের সহিত কালীক্ষেত্রে জাহ্নবীনীরে ডুবাইয়া রাখিয়া পর্পটী চর্ব্বণ সহকারে যজ্ঞবেদী প্রেতভয়ভীত সুকুমার শিশুর ন্যায় দূরে ফেলিয়া কলি রাজধানী কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে নটীর লাস্য দর্শনে আজীবন অন্যমনস্ক হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভে কৃতার্থ। বহ্নিমুখে আহুতিলোপে ভূলোকে বারিদ বিমুখ; পর্য্যাপ্ত সলিলাভাবে বসুন্ধরা অনুর্ব্বরা। ফলে অন্নাভাবে রোগ, শোক, অকালমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, মহামারী বিকট দংষ্ট্রাস্ফালনে করাল বদন ব্যাদান সহকারে মহোল্লাসে ঘোর তাণ্ডবে সৃষ্টি ধ্বংস করিতেছে। হা ব্রাহ্মণ! তোমার "মধুর" ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে, "কেমনে ভুলিলে কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে?"

যাহাই হউক, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি পাবনশক্তি হারায় না; মহোরগ মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য হইলেও বিষবিহীন হয় না। লোকলোচনের ঘনচ্ছন্নতা নিবন্ধন, ভাস্করের নিষ্করতা কখনই সম্ভবে না। তদ্রূপ আধেয়বস্তু ব্রাহ্মণ মাত্রে সদোষতা নিবন্ধন, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত চরাচর বিশ্বের আশ্রয়ীভূত সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মণ্যদেবের অস্তিত্ব লোপ কখনই সম্ভবে না। তিনি সেই অনাদিকাল হইতে

সমান ভাবে আজ পর্য্যন্ত বিরাজমান আছেন, এবং পরে প্রলয়ান্তেও এমনই বিরাজমান থাকিবেন। কত যুগ যুগান্তর অতীত হইয়াছে, কত সমাজ বিপ্লব, ধর্ম্ম বিপ্লব, রাষ্ট্র বিপ্লবের মহোর্ম্মিমালা সংসার-পারাবার তটে ভীমবেগে আপতিত হইয়া কত ভাঙ্গিয়াছে; কিন্তু পরম কারুণিক, পরম পুরুষ সেই পরব্রহ্ম চিরদিন অজর অমর হইয়া সমুদয় বিপ্লবে বক্ষ পাতিয়া বসুন্ধরাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আজিও এ ঘোর দুর্দ্দিনে উচ্ছৃঙ্খল ব্রাহ্মণসমাজকে আবার তিনিই সংযত করিবেন। ধর্ম্মের পূতপ্রবাহে পাপ-মলিমা বিধৌত করিয়া জগতে পুণ্য সমাজের সুপ্রতিষ্ঠা করতঃ ভূস্বর্গ ভারতে নিত্যশান্তির চিরসুখময়ী সমাজ আবার সুপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

এক্ষণে উপসংহারে বক্তব্য এই যে, হে ভূদেবকুমার! সে পুণ্য-হিন্দু সমাজের উপলক্ষমাত্র হইয়া তুমি একবার জাগ্রত হও, পিতৃপুরুষগণকে একবার স্মরণ কর; দেখ, কি ছিলে হলে বা কি?” এই ভাবিয়া অধ্যবসায়ের প্রগাঢ় প্রতিভায় বিলাসিতার ছার ভস্ম উড়াইয়া দাও। হিন্দু সমাজ দৃঢ়শক্তির তীব্র প্রতিঘাতে তোমার হৃদয়ের মোহশল্য দাসত্বের সমূলখাত উৎখাত সাধন করতঃ আত্মব্রতে রত হও, ন্যায়-সত্য-ধর্ম্মের ত্রিধারসম্বলিত শক্তিতে শক্তিমান হইয়া মহাশক্তির পুনরুদ্বোধন কর। তোমার জীবনান্তীকি জড়তার ঘনঘটা অচিরে বিদূরিত হইবে চিরারামদায়ী জ্ঞান-প্রভাকরের অবদাত-কিরণে পরিস্নাত হইয়া পরমানন্দ-লাভে তুমি কৃত-কৃতার্থ হইবে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীমঙ্গল বা কালকেতু।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

কাব্যরত্নাকর।

চতুর্থ অঙ্ক।

অষ্টম দৃশ্য।

কলিঙ্গ রাজ্যে শান্তশীলের আগমন।

শান্ত। এই কলিঙ্গ রাজ্য! এখানেই মা আমার মানবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে কলিঙ্গ রাজ্য ধন্য করেছেন। আহা হা মরি মরি কি সুন্দর

পুষ্পোদ্যান! নানাবিধ কুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছে। জাতী, যূথি, মল্লিকা, মালতী, করবীর, কাঞ্চন, লোহিতবর্ণ জবাপুষ্প জগদম্বার অতি প্রিয় বস্তু। আজ অষ্টমী তিথি, মঙ্গলবার, জগন্মাতা চণ্ডিকার অর্চ্চনার উত্তম বাসর। কিছু পুষ্প চয়ন করি। (পুষ্প চয়নে নিযুক্ত এমন সময় কোটালের আগমন)।

কোটাল। (স্বগতঃ) কয়েক দিন হতে ফুল চুরি যাচ্ছে, মালীর সে দিকে হুঁস নাই। আজ চোর শালার দেখা পেয়েছি। অই যে গুড়ি গুড়ি এইদিকেই আগমন হচ্ছেন। সাহস ত কম নয়! আচ্ছা, মজা দেখাচ্ছি। (অগ্রসর হইয়া শান্তশীলকে ধারণ পূর্ব্বক) কেমন? এইবার কি হয় মহারাজ? নিত্যই ফুলগুলি চুরি কর, আজ ধরা পড়েছ ত? চল এখন রাজার কাছে।

শান্ত। (স্বগতঃ) হায় মাতঃ জগদম্বে! এই কি আমার অদৃষ্টে ছিল? তোমার পূজার জন্য ফুল চয়ন কর্ত্তে এসে চোর ব ধৃত হলাম। হায় হায়! কর্ম্মফল কেহই এড়াতে পারে না। ার কর্ম্মের ফল ভোগ কর্ত্তেই হবে। (প্রকাশ্যে) রাজদূ আমি চোর নই, ঈশ্বর পূজার্থ কয়েকটি ফুল নিয়েছি মাত্র। অ.ায় ক্ষমা কর।

কোটাল। ক্ষমার মালিক আমি নই। মহারাজের নিকট ক্ষমা চেয়ো। এখন চল রাজার দরবারে।

শান্ত। চল। (উভয়ের প্রস্থান)।

মালী ও মালিনীর প্রবেশ এবং উভয়ের গান।

মালী। ক্যামনে ফুল যোগাব রাজার কাছে,
নিতুই কামিনী ফুল চুরি যায় বিলকুল
ডাল মূল কোন্ চোর ছিঁড়ে ফেলেছে?

মালিনী। হুঁসিয়ার নও তুমি নিদে বিভোরা,
কোলের কাছের ফুল নিতেছে চোরা;
যে জন সুজন মালী
নাহি রয় কোল খালি
মিছে কেন দাও গালি বলি “চুরি করেছে।”

মালী। যামিনী গভীর হ’লে কামিনী যায় চলে
কে এমন হুঁসিয়ার জগতে আছে?

মালী ও মালিনী। তুমি মোর ফুলবধূ যোগাও মধুর মধু
শুধু রহ মোর পাশে, "রহিত কাছে ॥"
তবু তুমি অবিশ্বাসী. নিজে কাঁদ আমি হাসি
তুমি দাস, আমি দাসী, মিলে গিয়েছে ॥

চতুর্থ অঙ্ক।

নবম দৃশ্য—রাজান্তঃপুর।

রাজা ও রাণী।

রাণী। কেন হেন চিন্তাকুল বদন তোমার ?
রাজ্যের কি অমঙ্গল হেরিয়াছ নাথ ?

রাজা। মঙ্গলময়ীর রাজ্যে নাহি অমঙ্গল,
কিন্তু প্রিয়ে! একচ্ছত্র ভূপতি হইয়া (ও)
শান্তি নাই এক তিল। শুনিলাম আজি
কাটিয়া গুজরাট-বন, ব্যাধ কালকেতু
নির্ম্মিয়াছে নগর সুঠাম।
প্রজাগণ একে একে যায় গুজরাটে।
ঘাটে বাটে মাঠে
সর্ব্বত্র সুনাম তার।

রাণী। রাজচক্রবর্ত্তী তুমি কলিঙ্গ-ঈশ্বর
এত কেন ডর দমিতে সামান্য ব্যাধ ?
জান ত্বরা ধন-জনবল
কেমনে সে হয়েছে প্রবল ;
তারপরে যথাকালে করিবে দমন তায়।
শঙ্কা কিবা তায় ? মঙ্গলার দাস তুমি।

(মঙ্গলার প্রবেশ।

মঙ্গলা। বাবা বাবা, তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন ?

রাজা। এস মা, তোমাকেই ত শুক্‌নো দেখাচ্ছে মা, তোমার বুড়ো বাপের কিছু হয়নি।

মঙ্গলা। হ্যাঁ মা, তুমি কি কিছুই জান না ? দেখ্‌ছো না বাবা অনেক

কথাই লুকুচ্ছেন। বল বাবা, কি জন্যে তোমার বিষণ্ণ বদন ?

রাণী। মঙ্গলা, তুমি ত অনেক সময় আমার মুখ দেখে অনেক কথা বলে দাও বল দেখি কি হয়েছে ?

রাজা। (সহাস্যে) বটে বটে! মঙ্গলা মা, আবার গণককার হয়েছে নাকি ? আচ্ছা, বল দেখি মা আমার কি হয়েছে ?

মঙ্গলা। বল্‌বো বাবা ? তুমি রাগ করবে না ?

রাজা। কবে তোর কথায় রাগ করেছি মা ? তোমার চাঁদমুখ দেখেই আমার সুশীলা হয়েছে। তুই যে আমার হারানিধি মঙ্গলময়ী মঙ্গলা মা, বল্ নির্ভয়ে বল।

মঙ্গলা। তোমার রাজ্যের মধ্যে আর একটি রাজা প্রবল হয়েছে, সেই সংবাদ একজন প্রজার কাছে শুনে অবধি তুমি বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছ। কেমন বাবা, সত্য কি না ?

রাজা। (সহাস্যে) অন্তরালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিস্ বেটী, তাই গণককার হয়ে সকল সংবাদই শুনিয়ে দিলি কেমন ?

মঙ্গলা। না বাবা, তুমি বিশ্বাস কর না, আমি কিন্তু কারুর কাছেই এ সংবাদ শুনিনি।

রাণী। আচ্ছা, তার পরে কি ঘট্‌বে বলে দে ত মা!

মঙ্গলা। তার পরে ? তার পরে বাবা লড়াই কর্ত্তে যাবেন।

রাজা। লড়াইএর পরিণাম কি ?

মঙ্গলা। অত কি আমি জানি বাবা! তবে এ লড়াই না করাই তোমা উচিত বাবা!

রাজা। কেন মা ?

মঙ্গলা। সে রাজা ধার্ম্মিক। প্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসেন, তাঁর যে রাণী সে অপূর্ব্ব সুন্দরী আর বুদ্ধিমতী। তার ভক্তিগুণে ভগবতী মঙ্গলচণ্ডী বাঁধা রয়েছেন। তাই বল্‌ছি এ রাজার সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে যেয়ো না বাবা!

রাজা। তোর বাবার একাধিপত্যে বাধা দিতে এক ব্যাধ এসেছে, তাকে দমন না কর্‌লে আমার সুনামে ও বীরত্বে যে কলঙ্ক আরোপিত হবে মা! আমার যশের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে তোর কি আনন্দ হবে মঙ্গলা ?

মঙ্গলা। না বাবা, তা হবে না। তোমার যশের বাদ্য ত্রিলোক ব্যাপ্ত হউক, এই আমার একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু অকারণে প্রাণীহত্যা ভাল নয় বাবা!

রাণী। হ্যাঁ, এ বিষয়ে মায়ের সঙ্গে আমিও একমত। বেশ বলেছিস্ মা! তোর কথাগুলি প্রবীণ অমাত্যের ন্যায়ই সারগর্ভ এবং যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু মা মঙ্গলা তুই নেহাৎ কচি মেয়ে, এ সব কি করে শিখ্‌লি?

মঙ্গলা। (রাজার অত্যুজ্জ্বল মুকুটখানি নাড়িয়া) হ্যাঁ বাবা! এটা কেমন করে তৈরী করেছ? এগুলি কি বাবা?

রাজা। এই প্রবীণের মত যুক্তি দিচ্ছিল, আবার বালিকাসুলভ চাঞ্চল্য লক্ষিত হল। এ—কে? এ কি মঙ্গলা?

মঙ্গলা। বাবা! আর আমি থাক্‌তে পার্‌ছি না, ঐ শোন, ঘণ্টাবাদ্য হচ্ছে নয়? যাই মা, আবার এখনি আস্‌ছি। (প্রস্থান)

রাজা। এই সরলতার প্রতিমা, চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় চপলা এ কে রাণী! কখন কখন তার বিশুষ্ক বিষণ্ণ বদনমণ্ডল দর্শন করে হৃদয় দ্রব হয়ে যায়, আবার কখন কখন তার প্রতিভা-সমুদ্দীপ্ত তেজোময়ী মূর্ত্তিখানি দর্শন করে নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই। রাণী! এ কি ছলনাময়ী কোনও দেবী? (উভয়ের প্রস্থান)।

চতুর্থ অঙ্ক।

দশম দৃশ্য।

রাজদরবারে বন্দী অবস্থায় শান্তশীল ও কোটাল।

রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি আসীন।

রাজা। মূর্ত্তি হেরি মনে হয় শান্ত সদাচারী।
(প্রকাশ্যে) কি হেতু কোটাল করিয়াছ বন্দী এঁরে?

কোটাল। রাজোদ্যানে অনুমতি বিনা
করিয়াছে প্রবেশ এ জন।
তার পর পুষ্পচয় করিয়া চয়ন
শ্রীভ্রষ্ট করেছে সব,

যাহা ইচ্ছা কর দেব! কর্ত্তব্য আমার
করিয়াছি সম্পাদন।

রাজা। এ বিষয়ে তোমার কি বক্তব্য আছে?

শান্ত। শাস্ত্র বলে "দেবপূজা হেতু বিনা অনুমতিতেও পুষ্প নিলে অপরাধ হয় না।" আমি দেবীপূজার নিমিত্ত কয়েকটি পুষ্প চয়ন করেছি, মহারাজ!

রাজা। আপনি ব্রাহ্মণ?

শান্ত। আজ্ঞা হাঁ।

রাজা। কোটাল! এঁর বন্ধন মোচন করে দাও।

(কোটাল কর্ত্তৃক শান্তশীলের বন্ধন মোচন)

এখন আপনি স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন কিংবা অভিলাষ হলে দেবীমন্দিরে থাক্‌তে পারেন।

শান্ত। (স্বগতঃ) যেমন শুনেছিলাম তেমনি দেখ্‌লাম। এমন ধার্ম্মিক বিপ্রভক্ত রাজার রাজ্যে মা মঙ্গলময়ী যে বিরাজ কর্ব্বেন তাতে আর সন্দেহ নাই। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আমার চিরদিনের আশা, আপনার প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলচণ্ডী মায়ের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে ধন্য হব, এবং কিছুদিন অবস্থান কর্‌বো।

রাজা। আপনার যতদিন অভিপ্রায় এখানে অবস্থান করুন (মন্ত্রীর প্রতি) অমাত্যবর! আপনি স্বয়ং এঁর অবস্থানের স্থান নির্দ্দেশ করে দিয়ে আসুন।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা। (শান্তশীল "জয়োস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে রাজা প্রণাম করিলেন। পরে মন্ত্রীর সহিত প্রস্থান করিলেন।।

রাজা। (সেনাপতির প্রতি) সেনাপতি! অদ্যই সৈন্যসজ্জা করুন। ব্যাধ-নন্দন কালকেতুর এত বড় সাহস যে কলিঙ্গরাজকে কর প্রদান না করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে? একছত্র রাজাধিরাজের শাসনযন্ত্র কি বিফল হয়েছে? এ রাজ্যের কি সৈন্যবল নাই?

সেনাপতি। জয় কলিঙ্গাধিপতির জয়।

সকলে। জয় কলিঙ্গাধিপতির জয়।

(একজন বালকের প্রবেশ)।

বালক। তোমরা কার জয়ধ্বনি কর্‌চো হে !

সেনাপতি। কে তুমি ? কাকে খুঁজ্‌ছ ? কি নাম তোমার ?

বালক। থাম থাম, বেশী জ্যাঠামি করো না। তোমার প্রশ্নগুলি ত নির্গত হলো জলের মত। এখন উত্তর শোন্‌বার আগে বল দেখি তুমি কে ?

সেনাপতি। আমি সেনাপতি বীরসিংহ।

বালক। তুমি সেনাপতি বীরসিংহ ? আমি মনে করেছিলাম বীর শৃগাল রত্ন। ওহে ! কোন্ সাহসে মা মঙ্গলচণ্ডীর বরপুত্র মহাবীর কালকেতুর সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন কর্‌ছো ?

সেনাপতি। তুই বুঝি গুপ্তচর ? ওরে ধর্ ধর্ ধর্, বন্দী কর এরে।

(ধরিতে উদ্যত ও বালকের বিকট হাস্য)।

বালক। হাঃ হাঃ হাঃ—
পিপীলিকার পক্ষোদ্গম মৃত্যুর কারণ।
শৃগাল হইয়া সাধ কেশরীর সনে
দিতে রণ। হাঃ হাঃ হাঃ আমি কে জানিস্ ?
ধর অস্ত্র কর যুদ্ধ বালকের সনে।

(বালকের যুদ্ধে সেনাপতির পরাজয়)

এই বলে করিস্ গৌরব ? হা ধিক্
হা ধিক্ তোমা কলিঙ্গ-ঈশ্বর !
শৃগাল লইয়া রাজ্য শাসিছ দুর্ব্বল ?
বীরসিংহ ! এই তব অসি লয়ে চলিনু এখন
পুনরায় দেখা হবে সমর-প্রাঙ্গনে।

(বিকট হাসিয়া প্রস্থান)।

রাজা। (আতঙ্কে) একি ? একি ? অনর্থ ঘটিল কিবা ?
কেবা এই বালক সাহসী ?
হাসি হাসি অট্টহাসি শঙ্কাতুর
করিল সবারে। বুঝিতে না পারি কিছু ;
এ প্রপঞ্চে রক্ষ মা মঙ্গলা !

(মঙ্গলার প্রবেশ)

মঙ্গলা। কেন বাবা আমায় ডাক্‌ছ ?

রাজা। তোমাকে ত ডাকিনি মা, একি ? এমন বেশে প্রকাশ্য রাজ-সভায় কেন এসেছ তুমি ? একি ? অপূর্ব্ব মুখের সাদৃশ্য ! একটু আগে তোমারই মত একটি বালক এসেছিল।

মঙ্গলা। আমারই মত ? না আমি ?

রাজা। তুমি কি বালক সেজেছিলে ? ধিক্ নির্লজ্জা মেয়ে। এমন ভাবে কি ঠকাতে হয় ? কিন্তু সেনাপতির পরাজয়—একি তোমা দ্বারা সম্ভব ? মঙ্গলা, মঙ্গলা ! বল্ মা তুই কে ?

মঙ্গলার গান।

মঙ্গলা। কে আমি জানিবে কেমনে ?
কভু নারী কভু নররূপে বিচরণ করি ভুবনে।

রাজা। (আশ্চর্য্যভাবে দেখিতে দেখিতে) তাহলে তুই কি মঙ্গলা নস্ ?

মঙ্গলা। মঙ্গলা আমি যবে শান্তিময়ী মা,
অমঙ্গলারূপে অসিকরা শ্যামা,
কখন বাম হই, কখন হই বামা
আমার স্বরূপ কেহ না জানে।

রাজা। তবে আমি এতদিন কাকে রেখেছি। সে কে মা !

মঙ্গলা। চিৎ-শক্তি আমি প্রকৃতিরূপিণী
সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংস ত্রিগুণধারিণী
সত্ব রজঃ তমঃ, এই ত স্বরূপ মম
বিশ্বমাতা আমি চৌদ্দ-ভুবনে।

(গান গাইতে গাইতে চলিয়া গেলেন)।

রাজাও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পদানুসরণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বিরহী।

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ।

তোমারে গো আমি প্রেমেরি ডোরে
বাঁধিয়া রাখিতে চাই,
বিরহের পরে তোমারে গো যেন
আপন করিয়া পাই।
তব প্রেম ভালবাসা,
মোর চিতে দেয় আশা,
তুমি যে আমার চির আপনার!
তাই ত তোমারে চাই॥
কর্ম্মক্লান্ত হতাশ জীবনে
জাগাও নূতন প্রাণ,
অতীতের দুঃখ সকলি ভুলিয়া
শুনিব বীণার তান।
তরুণ জীবনে আমি ছিনু যেথা,
হাত ধ'রে মোরে নিয়ে চল সেথা,
হৃদয়ের মেঘ ধুয়ে নিয়ে যাও
গাহিয়া প্রেমের গান॥
পাষাণ-প্রতিমা! তোমার বিরহে
দিন যে কাঁদিয়া যায়।
একবার এসে দেখা দাও মোরে
হৃদয়-দুয়ারে হায়!
হৃদয়ে ছিল অনেক বাসনা,
পুরিল না মম একটী কামনা,
অন্তর মোর সদা ভরপূর
তোমারি কল্পনায়॥
এ কথা আর বলিব কাহারে
শুনিয়া সকলে হাসে,
কেহ তো কহে না মধুর বচন
আসে না বসিতে পাশে।
যাব আমি আজ তোমারি সাথে,
প্রেম-ভরা ডালি করিয়া মাথে,
জীবনে যদি গো না পাই তোমারে
মরণে পাবার আশে॥

ষটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ডস্ টনিক বা

য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৸০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শ্বেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র

গোল্‌ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পঁচিশ বটিকা পূর্ণ প্রতি শিশি মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্ড লেন, কলিকাতা।

স্বাস্থ্যের পথে

অমৃতবল্লী কষায়

কি রোগী কি সুস্থ

সকলের পক্ষেই ইহা সমান উপকারী।

কবিরাজ
নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
১৮।১, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

PRINTED By N. DUTTA AT THE JANMABHUMI PRESS
39 MANICK BOSE'S GHAT STREET, CALCUTTA.